অমলেন্দু সেনগুপ্ত

জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর

জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর

জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

পার্ল পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬

Joarbhatay Shat-sattor
Amalendu Sengupta

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯৭

ISBN 81-85777-34-9

প্রকাশক
মদন ভট্টাচার্য
পার্ল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬ ফোন ২৪১-০১৭৬

লেজার টাইপ সেটিং
লাইন এন্ড ডট
এ. বি. ২০৫ বিধাননগর
কলিকাতা ৭০০ ০৬৪

মুদ্রণ
প্রিন্টোক্রাফ্‌ট
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেশন হাউস
কলিকাতা ৭০০০০৯

বাঁধাই
দত্ত বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা ৭০০০০৯

দাম ১৫০.০০

ভাই
অরবিন্দ সেনগুপ্ত
স্মরণে

মুখবন্ধ

বিশ্ববিপ্লবের রণাঙ্গন এখন স্তব্ধ। সমাজবিপ্লবের আবেগপ্রবাহ যে শুধু স্তিমিত তাই নয়, জন্ম নিয়েছে পণ্যলোভী সমাজের আত্মসর্বস্বতার আবহ। আবেগের জায়গা নিয়েছে উপযোগিতাবাদ। খোদ রুশদেশেই ফিরে এসেছে পুঁজিবাদ এক বিরাট প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে। রুশ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজবাদ গড়ার আপাতব্যর্থতা সৃষ্টি করেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বিশ্বজোড়া সংকট। সময় যেন এক নিস্তরঙ্গ নদী। কোনো গভীর অসুখের কবলে যেন বর্তমান মানব সমাজ। দুর্জয়, দুর্মর আশাবাদী ছাড়া আজ আর সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন কেউ দেখে না।

কিন্তু যখন কোনো স্বপ্ন নেই, তখনই তো স্বপ্ন দেখার সময়। আপাতত অন্ধকার, কিন্তু আর একবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে এই বিশ্বাস নিয়েঃ নভেম্বর ১৯১৭ আবার ফিরে আসবে এবং আসবে পূর্ণতর মানবিক রূপে। এবং অবশ্যই ফিরে আসবে সেই বিদ্রোহের ঋতুঃ এদেশে যে দিন শুরু হবে ক্ষেতে খামারে কলে কারখানায় খেটে খাওয়া মানুষের জঙ্গী লড়াই — যেমন ঘটেছিল আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে। সেই উথাল পাথাল সময় ছুঁয়েই তো ষাট-সত্তর দশকের ইতিবৃত্ত। নিছক অবিমিশ্র স্বপ্ন ও আশার ঋতু নয় এই দশক দুটি। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ — বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ও আত্মহননের পথ বেয়ে আবর্তিত আরক্ত এই দুই দশক। এবং তাঁরই সঙ্গে ওতোপ্রোত এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনিবার্য ভাঙচুর। মূলত পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে তারই ছবি তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানিতে।

এই বই প্রকাশের মূলে রয়েছে বহুজনের অকৃত্রিম ও উদার সাহায্য। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য :

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ অজিত রায়, অনুজপ্রতিম বন্ধু অমিতাভ চন্দ্র, বিপ্লব চক্রবর্তী, তরুণ বসু ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়— যাঁরা নানা পুস্তক ও পত্রপত্রিকা দিয়ে আমাকে দরাজভাবে সাহায্য করেছেন। উপকরণ সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন শিখা চক্রবর্তী (চট্টোপাধ্যায়), পার্থ মুখোপাধ্যায় ও কিংশুক বসু।

পাণ্ডুলিপি তৈরির শ্রমসাধ্য কাজটির শরিক হলেন ভারতী গুপ্ত — যিনি একাধারে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী, আর কাছের মানুষ শেফালি চক্রবর্তী ও দেবস্মিতা চক্রবর্তী।

এই বই রচনা ও প্রকাশনার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে যিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তিনি হলেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। অপরিসীম তাঁর অবদান। তেমনই অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধু দম্পতি নন্দিনী ও নারায়ণ দাসশর্মার কাছ থেকে পেয়েছি সর্বাঙ্গীণ আনুকূল্য। এছাড়া নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শুভাশিষ চৌধুরী, নীহারেন্দু দাশগুপ্ত ও বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী। তাঁরা আমার আপনজন, তাই সৌজন্য প্রদর্শন এক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগার (কলিকাতা) ও দৈনিক *কালান্তর*-এর কর্তৃপক্ষ-এর প্রতি আমি বিশেষ বাধিত।

কৃতজ্ঞতা জানাই কবি রাম বসুর প্রতি যিনি এই বই-এর অর্ন্তগত বব ডিলন-এর কবিতাটি অনুবাদ করেছেন। প্রচ্ছদ অলঙ্করণের জন্য শিল্পী অজয় গুপ্ত এবং প্রুফ দেখার জন্য সিদ্ধার্থ দত্ত ও অমিতাভ ভট্টাচার্য আমার ধন্যবাদভাজন।

পরিশেষে জানাই, বহুদিন ধরে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে, কপি করেছেন অনেকে। ফলে বানানের সঙ্গতি সব জায়গায় রক্ষা করা যায়নি।

২১ এপ্রিল ৯৭ *অমলেন্দু সেনগুপ্ত*

১৩৬/ ৩এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৪

পর্ববিন্যাস

পঞ্চম পর্ব (১৯৭১-৭৭)

প্রথম পর্ব

বাইরে লড়াই
গর্জন এখন বাড়তে বাড়তে শেলতীব্র
সজোরে ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে উঠবে
তোমার জানলা
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে সমস্ত প্রাচীর।
কারণ, সময় এখন
বদলায় নিজেকে।

—বব ডিলন/ সময় বদলায় নিজেকে

১

বাতাসে বারুদের গন্ধ কবেই মিলিয়ে গিয়েছে। কবে কেটে গেছে দিনবদলের সেই দামাল সময়। তখন ছিল মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা আর পথে পথে রক্তের ছোপ। ছিল অনুসরণ, ছিল পালিয়ে যাওয়া। স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে এক দৃশ্যপট, ছেলেটি দৌড়ুচ্ছে আর তার সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে গোটা পৃথিবী। আর একবার স্মরণ করা যাক মৃণাল সেনের *কলকাতা একাত্তর* ছবিটির ছেলেটির কথা—যে নাকি হাজার বছর ধরে এই কুড়ি বছর বয়স বয়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে মরবার জন্যই তাকে বারবার জন্মাতে হয়। না, সে আর-এক সময়ের কাহিনী।

আমরা ভিন্নতর বর্তমানে শ্বাস গ্রহণ করছি। অশোক মিত্রের ভাষায়, 'হয়তো বছর কুড়ি আগে অপব্যয়িত আবেগের সর্বশেষ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়ে গেছে পৃথিবীর দেশে দেশে, এখন থেকে কিছুদিন বিশ্বকাপ ফুটবল, শ্রীমতী ম্যাডোনার অতিশরীর সঙ্গীত কিংবা ঐ ধরণের অন্য কোনো উন্মাদনা যুব মানসে সাম্রাজ্য বিস্তার করে থাকবে।' কারণ আমরা সবাই বর্তমানে সমাজ-বিপ্লব-দূষণ মুক্তবিশ্বের বাসিন্দা।

পৃথিবীর বুকে লীলায়িত আজ এক অলীক বসন্তকাল। সমাজবিপ্লবের জায়গা নিয়েছে তথাকথিত দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব—যার ছোঁয়ায় সুখ ও সমৃদ্ধির জোয়ার এসেছে দেশে দেশে। যদিও সমাজের এক বৃহৎ অংশ তার আওতার বাইরে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য লড়ে যাবার মতো আদর্শের জায়গা নিতান্তই সঙ্কুচিত। জাপান আমেরিকা দূরস্থান—হঠাৎ সমৃদ্ধির দেশ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সিওল, আজ তাদের বিবেচনায় স্বর্গরাজ্য। বাতিল হয়ে যায় রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব আর চীনের লং মার্চ। নাকচ হয়ে যায় দিয়েন বিয়েন ফু আর চে গুয়েভারার আত্মদান। এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতে কিন্তু রক্তপতাকা আজও ওড়ে এবং গাওয়া হয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। কিন্তু সেসব রিচ্যুয়ালে পর্যবসিত। তার চেয়ে বড় সত্য হয়ে দাঁড়ায় টি-ভি-র পর্দায় উদ্ভাসিত হাজারো ভোগ্যপণ্যের উজ্জ্বল প্রদর্শনী। লোভাতুর মন ধেয়ে যায় বারবার সেদিকে। সোনার হরিণ কিন্তু অধরাই থেকে যায়।

অতএব পালাও এই হতচ্ছাড়া দেশ থেকে। মধ্যবিত্ত বাড়ির তরুণরা পালাতে চায় এ দেশের আশাহীন, দম-আটকানো পরিবেশ থেকে। কোনো আবেগ অনুভূতির বাঁধন তাদের ঠেকাতে পারে না, তারা উত্তরাধিকার ত্যাগ করতে চায়। দেশ থাকুক পড়ে তার দুর্গতির মধ্যে উদ্ধারবিহীন, ভারতে থাকার মানেই হলো হতাশার দৈনন্দিন হাঁড়িকাঠে মাথা গোঁজা। সময় থাকতে পালাও, যতক্ষণ ভিসা আর প্রবেশাধিকারগুলো তুলনায় সহজে হাতানো যায়। তাদের আরেক দল, তারাও দেশের গতিক দেখে সমান অসহিষ্ণু, অন্য পথ বেছে নেয়। তাদের মধ্যে যারা খুন হয় না, জেলে জেলে পচে। তাদেরই একজন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *শ্যাওলা* উপন্যাসের চরিত্র হিরণ্ময় এবং তার উদ্দেশ্যে বলা চলে: কলকাতায় টেলিভিশন এল হিরণ্ময়, রেফরিজারেটার সস্তা হয়ে গেল, বাজার ছেয়ে গেল কতরকম ভোগ্যপণ্যে। মদের দোকানে গিয়ে দেখ এক বেলায় একজন কয়েকশ টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়, কয়েক মুহূর্তের

অস্বাভাবিকতা কেনার জন্য। কত দোকান হয়েছে দেখেছো হিরণ্ময়? তুমি জানো স্টেনলেস স্টীলের কেজি কত করে? কিংবা একটা ন'শ বর্গফুট ফ্ল্যাটের কত দাম? পেট্রলের দাম তিনগুণ বাড়ল হিরণ্ময়। তবু গাড়ি চলা কি কমছে হিরণ্ময়, কমছে ট্রাফিক জ্যাম?

তুমি কি ভুল লড়াই লড়তে, তা হলে? কাদের জন্য লড়াই? তোমার চারদিকে এত সম্পদের আয়োজন দেখে কি মনে হয় না যে এদেশে সর্বহারারাই মাইনরিটি? ফিরে এসো হিরণ্ময়, ফিরে এসো।

তাছাড়াও জিজ্ঞাসা থাকে, হিরণ্ময় কি জানে টু-হুইলার যৌবনের প্রতীক—ধরা বাঁধা দৈনন্দিন একঘেয়েমির মধ্যে একটুকরো ঝড়ের মতো? ছুটে চলাই হলো জীবন, এর নিচে যা কিছু সবই ওই ভিজে মুড়ির মতো নরম ও পরিত্যাজ্য। এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে টু-হুইলারের দামও মধ্যবিত্তের আয়ত্তে। সে কি আরো জানে যে অধুনা আর-এক ভেল্কির খোঁজে সদা অভিনিবেশিত মাস্টার, কেরানী, চাষী, মজুর সবাই—সবাই—সবাই। কী করে টাকা ডবল করা যায়? কোন্ ব্যাঙ্ক, কোন্ ট্রাস্ট, কোন্ স্কীম অথবা কোন্ অর্থলগ্নী সংস্থা! স্কুলে, কলেজে, অফিসে, আদালতে সর্বদা গুন্‌গুন্ রব—উচ্চকিত কলরব—টাকা, টাকা—আরও টাকা।

হায়, হিরণ্ময়দের দিন গিয়েছে। দেশের দশের সমাজের জন্য ত্যাগের আদর্শ আজ বাতিল। অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও পরোপকারের সাদামাটা মূল্যবোধও সেকেলেপনার দৃষ্টান্ত। এমনকি একদা বিপ্লবীরাও শিখেছে আদর্শচ্যুতির আরাম। অথচ রক্তপতাকা আজও ওড়ে এবং আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায়।

এই দম-আটকানো পরিবেশে তাই মন আনচান-করা কোন্ এক কবিতার পঙ্‌ক্তি অর্গলমুক্ত করে স্মৃতির গহনে লুকিয়ে থাকা দিনগুলি :

> দাও ফিরিয়ে দাও সেই ষাটের কলকাতা
> ফিরিয়ে দাও আমার যৌবন আর দ্রোহের আগুন
> বসন্তের ঝোড়ো হাওয়া খোলাপথে দেওয়াল লিখনে
> জ্বলন্ত মশাল যেন হিসহিস করে বলছিল,
> আদুড় গায়ে যে ভিখারির ছেলেটা দেখছ, ওরও নাম ভিয়েতনাম।
> দাও আজ ফিরিয়ে হাতের মুঠোয়
> বিস্ফোরক ইস্তাহার তারুণ্যের উন্মাদ দিনগুলি।
>
> ('শতবর্ষে হো চি মিনকে' : মানস রায়চৌধুরী)

সে এক ঘোর-লাগা সময়ের কাহিনী। সেই প্রজন্মের যুবক-যুবতী বিশ্বাস করত চীন ভিয়েতনাম আলজিরিয়া বলিভিয়ায় আজ যা ঘটছে এদেশেও কাল তা ঘটবে—হাতের নাগালেই বিপ্লব। এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে তারা বেঁচেছিল—তারা মরেছিল। অশোক মিত্রের ভাষায়, 'ঘোরলাগা সময়, তাঁদের ঘিরে গোটা পৃথিবী ঘুরছে এই বুক-ভরা প্রত্যয়, তাঁদের যূথবদ্ধ আক্রমণে রাজশক্তি অচিরে ঢলে পড়বে তাসের দেশের মতো, সেই প্রত্যয়।'

আদর্শের আঁচে তাতানো আবেগের ঋতু যেন দ্রুত ফুরিয়ে গেল। সেই আলোড়নের উন্মাদনা এখন ইতিকথা। দুর্জয় দুর্মর আশাবাদী ছাড়া আজ আর সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন কেউ দেখে না।

কিন্তু যখন কোনো স্বপ্ন নেই তখনই তো স্বপ্ন দেখার সময়।

২

স্মৃতি ও স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা আজো বেঁচে আছেন তাঁদের জীবনে চীন-ভারত যুদ্ধ ও পার্টি ভাগ সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। দুটি ঘটনাই অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেন মণিকুন্তলা সেন। তিনি লিখেছেন, 'চীন ভারত প্রশ্নে পার্টি তখন পরিষ্কার দুভাগ হয়ে গেল, কোন পক্ষ ''ন্যায় যুদ্ধ'' করছে এবং আর কোন পক্ষ অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত তার বিচার করতে আমরা নিজেরাই ঘায়েল হলাম।' আর দিলীপ ভাদুড়ীর মতে, কমিউনিস্ট মাত্রেরই এই ধারণা যে সমাজতন্ত্রী দেশ চীন কখনও আক্রমণকারী হতে পারে না। অথচ এই প্রশ্নে ১৯৬২ সালেই পার্টিতে খাড়াখাড়ি দুটো ভাগ তৈরি হয়। পরে পার্টি ভাঙতে তিনি পরম আত্মীয় বিয়োগের শোক অনুভব করেছেন। পার্টি ভাগ হতে দেখে কবি রাম বসুও তীব্র কষ্ট পেয়েছেন। মনে হয়েছে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে।

চীন আক্রমণ করবে এটাও যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি পার্টি ভাগ হবে সেটাও অভাবনীয়।

বীরেন রায় বলছেন, ১৯৫৯ - ৬০ সালে পার্টির জাতীয় পরিষদ 'চীন কখনও আক্রমণকারী হতে পারে না' এ বিষয়ে একমত। অজয় ঘোষের নেতৃত্বে পিকিং-এ পার্টির যে প্রতিনিধি দলটি যায়, মাও সে-তুং স্বয়ং তাঁদের আশ্বাস দেন, 'আমরা কখনও ম্যাকমাহন লাইন অতিক্রম করব না।'

কিন্তু ১৯৬২ সালে পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত। জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারত সরকারের ভূমিকার সপক্ষে। চীন যদি এককভাবে যুদ্ধ বন্ধ না করত তা হলে হয়তো নেহরুকে পদত্যাগ করতে হত।

এ প্রসঙ্গে শিপ্রা সরকার লিখছেন, 'চীন ভারত যুদ্ধ দীর্ঘ ছায়া ফেলল রাজনীতিতে। দেশে বিদেশে একটা মত বরাবর আছে যে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীনের আক্রমণ আসলে প্রতি-আক্রমণ কারণ ভারত সরকারের কথা ও কাজে চীনকে ক্রমাগত খোঁচা দেওয়া হচ্ছিল।

'আসল প্রশ্ন এখানে রাজনীতির। ভারতের ম্যাকমাহন লাইন আর চীনের চিরাচরিত সীমারেখা যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার। এ ধরণের ঐতিহাসিক অধিকার প্রয়োগ করতে চীন কেন যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হয়েছিল, সমাজবাদের আদর্শ দিয়ে অন্তত তার ব্যাখ্যা হয় না। তাছাড়া চীনের রাষ্ট্রনীতিতে গভীরতার অভাব বোঝা যায় তার তৎপরতার ফলে নেহরু-কৃষ্ণ মেননের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জায়গায় উগ্র দক্ষিণপন্থার সাময়িক প্রাধান্যে।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১ জুলাই ১৯৯৩)

জহরলাল নেহরুর জীবনীকার সর্বেপল্লি গোপালের ধারণা, নেহরু কখনও চীনের তরফ থেকে বড় রকমের আক্রমণের আশঙ্কা করেননি। লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নেহরু বলেন, 'তাহলে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে এবং রণাঙ্গন তখন ভারত সীমানার কাছাকাছি থাকবে না' (*নেহরু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭)। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬১ রাজ্যসভার ভাষণেও নেহরু একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, চীন-ভারত যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে সেটা শুধু বিশ্বযুদ্ধ নয়—পারমাণবিক যুদ্ধে পর্যবসিত হবে। (ঐ, পৃ. ২০৯)

রাজ থাপার-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চীন কখনও আক্রমণ করবে না। কারণ আমাদের একটা

দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠীর খপ্পরে ঠেলে দেওয়া একটা কমিউনিস্ট দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। তাছাড়া এটা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা-বিরোধী কাজ। নেহরু ও কৃষ্ণ মেননের উদারনীতিবাদেই রয়েছে আমাদের আদর্শের প্রতিফলন। দেখা গেল উল্টোটা হল। সেদিন ভোরে বিছানায় শুয়েই শুনলাম নেহরুর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর—তিনি আসামবাসীকে বিদায় জানাচ্ছেন।

পার্লামেন্টে তুমুল হট্টগোল। নেহরু-বিরোধীরা এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন : তারা নেহরুর সমাজতন্ত্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে জাতির এই দুর্বিপাকের জন্য দায়ী করল—যার ফলে নেহরু ও জাতি উভয়েই প্রতারিত।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে চীনারা যেমন বিদ্যুৎগতিতে এসে নেহরুর এই দুর্দশা ঘটাল, তেমনি দ্রুত সরে গিয়ে নেহরুর মান বাঁচাল। (*All these years*, pp. 198, 201-2)

কুলদীপ নায়ার লিখছেন, দিল্লী এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে ১২ অক্টোবর সাংবাদিকদের নেহরু জানান যে ভারতীয় ফৌজকে নেফা অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্যদের হটিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেনারেল থাপারের মতে, এই বিবৃতি পিকিংকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। তার ফলেই যে তারা আক্রমণে নেমে পড়ে তা কিন্তু সত্যি নয়। কারণ চীনারা আক্রমণ শুরু করে ২০ অক্টোবর। মাত্র আট দিনের মধ্যে এত বড় আক্রমণ সংঘটিত করা সম্ভব নয়। ভারত-সীমানা থেকে চীনের নিকটতম শহর কাংতিং-এর দূরত্ব হাজার মাইলের বেশি। আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য জ্বালানি তেল ও অন্যান্য সামরিক সাজ-সরঞ্জাম জড়ো করা মাত্র আট দিনে সম্ভব নয়, আরো বেশি সময়ের প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত সেনাবাহিনীর প্রতি নেহরুর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এস. গোপালের মন্তব্য : ১৯৬১ সালের জানুয়ারি নাগাদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ্ নেহরুকে সতর্ক করেন পরবর্তী চীনা আক্রমণের প্রতিরোধ অথবা চীনা সৈন্যদের পুরোপুরি উৎখাত করার মতো পুরোদস্তুর যুদ্ধের সামর্থ্য ভারতীয় বাহিনীর নেই। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪)।

ইতিমধ্যে চীনা সৈন্যবাহিনী মাখনের মধ্যে ছুরি ঢোকানোর মতোই অনায়াসে ভারতীয় সেনাব্যূহ ভেদ করে এগোতে থাকে। একটার পর একটা ঘাঁটির পতন ঘটে।

পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ১৭ নভেম্বর জেনারেল কল বার্তা পাঠালেন, চীনা বাহিনীর শক্তি এত বেশি যে তাদের ঠেকানোর জন্য বৈদেশিক শক্তির সেনাবাহিনীর সহায়তা প্রার্থনা করা উচিত। সে রাত্রিতেই বিনাযুদ্ধে সেলা গিরিবর্ত্মের পতন ঘটল। স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষ হঠে এলেন। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই পশ্চাদপসরণ এবং ১৯ নভেম্বর বমডিলার পতন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্ভবত তাঁর একজন সতীর্থকে জানান, নেফা, আসাম, উত্তরবঙ্গ সবই অচিরে চীনারা দখল করে নেবে। তিনি আসামের তেলের ডিপোগুলি উড়িয়ে দিতে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু যদিও মুখে বলছেন, ভারত শেষ পর্যন্ত এই নগ্ন নির্লজ্জ ও স্থূল আক্রমণ প্রতিরোধ করবে ও জয়ী হবে, তিনিও কিন্তু আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডকে খরচের খাতায় ধরেছেন। সব তো গিয়েছেই, এখন মধ্য রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যরা, পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে না ঢুকে পড়ে। (*নেহরু*, পৃ. ২২৮)

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়তে থাকে সবাই। নেহরুও বাদ গেলেন না। জনমানসে এখনও তাঁর ভাবমূর্তি অম্লান, তবুও সমালোচনায় মুখর হলেন মোরারজী দেশাই ও জগজীবন রাম প্রমুখ ক্যাবিনেট সদস্যবৃন্দ। চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নামে নেহরু

চীন-ভারত সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় রেখেছেন। তাঁরা যদিও কথাগুলি আড়ালে চুপিচুপিই বলেছেন, কারণ নেহরুকে ঘাঁটানোর মতো হিম্মত তাঁদের ছিল না।

এস. গোপাল লিখছেন, নেহরুর ওপর যেন চার্চিলের আত্মা ভর করেছে। রণাঙ্গন থেকে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে, তবুও তিনি বলে চলেছেন, আমাদের সেনাবাহিনী দুনিয়ার সেরা। আমরা এ যুদ্ধে জিতবই। সরকারের পরিষ্কার হুকুম, আমাদের ভূখণ্ড থেকে চীনাদের ভাগিয়ে দাও। আমরা তাদের ভাগাবই। আর মাঝে মাঝে তাঁর নিত্যসঙ্গী হাতের বেঁটে লাঠিখানি উঁচিয়ে বলছেন, আমি এই লাঠি দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫-২৬)

মস্কো থেকে কোনো সাড়া নেই। প্রত্যাশিত অস্ত্র সাহায্য সেখান থেকে এল না। তারা নাকি দেখতে চাইছিল কৃষ্ণ মেননকে সরানোর দাবি নেহরু অগ্রাহ্য করতে পারেন কিনা। যখন কৃষ্ণ মেননকে সরে যেতে হল তাদের মনোভাবও তুহিনশীতল। প্রকৃত পক্ষে ক্রুশ্চেভ নেহরুকে চিঠি লিখে চীনের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনা শুরু করতে বলেন। এমনকি যুদ্ধবিরতির আগে যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাবও নয়।

এদিকে পরিস্থিতি সঙ্গীন। রণাঙ্গন থেকে ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসছে— নেফা অঞ্চলের অনেকটাই হাতছাড়া। ভারতীয় ফৌজ কেবল হঠেই চলেছে। কোথাও শত্রুর সামনে প্রতিরোধ খাড়া করতে পারেনি। যাদের মুখে এতদিন দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না—তাদের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। নতুন দিল্লীর সবাই যেন বিষাদ আর হতাশার ঘেরাটোপে বন্দী। কেউ জানে না কাল কী হবে—ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে বইছে!

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একের পর এক অস্ত্রশস্ত্রের ফরমায়েশ দিচ্ছে, আর নেহরু প্রায় চোখ বুজেই সই করে সেগুলি আমেরিকার কাছে পাঠাচ্ছেন। অথবা রাশিয়া বা ব্রিটেনের কাছে। এমনকি মার্কিন বিমান বহরের সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনাও বাদ গেল না। মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোল্স্ কুলদীপ নায়ারকে (২৭ মার্চ, ১৯৬৯) জানান যে নেহরুর ইচ্ছা ছিল চীনা বিমান-হানা থেকে মার্কিন বিমান বহর ভারতের শহরগুলিকে রক্ষা করবে এবং ভারতীয় বিমান বহর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে তিব্বতের ওপর হামলা করবে।

ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে রাত নটায় যখন নেহরুর বার্তা গিয়ে পৌঁছাল, প্রেসিডেন্ট কেনেডি তখন বিশ্রামরত। অতএব ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বি. কে. নেহরু কেনেডির বিশেষ সহকারীকে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বার্তা পৌঁছে দিলেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতো উক্ত সহকারী ভদ্রলোক ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে শুনিয়ে দিতে ছাড়লেন না যে, তাহলে আপনারা দু'দিন-ও টিকতে পারলেন না। আর চার্চিল প্রায় বিনা অস্ত্রেই দু'বছর লড়াই করেছিলেন। বি. কে. নেহরু সারাজীবনে এ রকম অপমানিত বোধ করেননি।

২০-২১ নভেম্বর মধ্যরাত্রিতে চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল।

এই অভাবনীয় ঘটনায় সবাই হতভম্ব, এমনকি ভারত সরকারের উচ্চতম মহলের কাছেও অপ্রত্যাশিত। আরও অদ্ভুত যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব ও গোয়েন্দা দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্তাও অন্যদের মতো সমান অন্ধকারে। ভোরবেলা খবরের কাগজ পড়ে সংবাদটা তাঁদের জানতে হলো। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তিনমূর্তি ভবনে গিয়ে নেহরুকে যখন খবরটা দিলেন, নেহরু হিন্দীতে বললেন, 'আমি এরই অপেক্ষায় ছিলাম।' যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভারত যে মেনে নেবে তাতে কারো মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। ভারতীয় সৈন্য বাহিনী শুধু পর্যুদস্ত নয়, চরম বেইজ্জতি

ঘটেছে তাদের। সেনাবাহিনীর বড়কর্তাদের মুখ চুন। তেজপুরে জেনারেল কল শাস্ত্রীকে এর আগেই বলেছিলেন, যে কোনো মূল্যেই হোক, সন্ধি করা ছাড়া ভারতের সামনে আর কোনো পথ নেই।

অতএব ভারত এই অঘোষিত যুদ্ধবিরতি মেনে নিল। চীনাদের এই একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা প্রসঙ্গে এস. গোপাল বলেন, চীনা নেতারা নেহরুকে ধনতন্ত্রের স্তাবক মনে করলেও তাঁরা চাননি যে ভারত সামরিক সাহায্যের জন্য পুরোপুরি পশ্চিমী দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ুক। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০)

এই যুদ্ধের জন্য কোন্ পক্ষ দায়ী—ভারত না চীন? চীনের এটা ন্যায় যুদ্ধ না অন্যায় যুদ্ধ? ভারত আক্রান্ত না আক্রমণকারী? স্বদেশে ও বিদেশে এ নিয়ে বিরামহীন বিতর্ক ও উতরচাপান। প্রখ্যাত চীনা লেখিকা হান সুইন লিখছেন, বার্মা, নেপাল ও বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চৌ এন লাই সীমান্ত সমস্যা মেটাতে সমর্থ হয়েছেন। একমাত্র ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার একগুঁয়েমির জন্য সীমানা নির্ধারণের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। চৌ লেখিকাকে বলেন, 'আমি যতই নেহরুকে বলি না কেন যে আমাদের উভয়ের সমান স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্য আমাদের একত্রে বসে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করা উচিত—তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না। আমি বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।' (*Wind in the Tower*, পৃ. ২৩২)

হান সুইন আরো জানাচ্ছেন, ১৪ অক্টোবর *পিপল্স ডেইলি* পত্রিকায় চীনের পক্ষ থেকে নেহরুর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানানো হয়, 'শ্রীযুক্ত নেহরু, এখন সময় আছে। খাদের কিনারা থেকে সরে আসুন।' (ঐ, পৃ. ২৩৪)

হান সুইন লিখছেন, চীনের কোনো বক্তব্যকে ভারত পাত্তা দেয়নি। উপরন্তু নভেম্বর মাসে নেহরু চীনকে সম্প্রসারণবাদী বলে নিন্দাবাদ করেন এবং চীনকে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত করেন।

লেখিকার মতে, আসলে চীন সম্পর্কে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে। ফলে ভারত সরকারের ধারণা হয়েছিল, এক বড় রকমের বিপর্যয় ঘটেছে চীনে। ১৯৬২-র মে মাসে নেহরু অনবরত চীনে ধারাবাহিক অজন্মা ও ফসলহানির কথা উল্লেখ করতেন এবং আরো বলতেন যে, 'চীনের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিস্ফোরক।' (ঐ, পৃ. ২৩৩)

এস গোপাল লিখছেন, নেহরুর শেষ পর্যন্ত ধারণা হয়েছিল যে কমিউনিজমের দুটি মুখ। একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরটি চীন। সোভিয়েতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব কিন্তু চীনের সঙ্গে নয়। এবং সেক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে সংঘাত অপরিহার্য। (*নেহরু*, পৃ. ২৩৮)

এ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে বার্ট্রান্ড রাসেলের জবানী থেকে। তিনি লিখছেন, 'চীন-ভারত বিরোধের কোনও মতাদর্শগত ভিত্তি নেই। এটা পুরোপুরিই বিতর্কিত সীমান্ত সংলগ্ন কতকগুলি অঞ্চলের দখল নিয়ে বিরোধ। এই বিরোধ যখন সশস্ত্র যুদ্ধে পর্যবসিত, পশ্চিমী দেশের অন্য সকলের মতো আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম সব দোষ চীনের এবং চীনই আক্রমণকারী। তারপর দু'দিন ধরে আমি এই সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টা করছি এবং বিবদমান উভয় পক্ষের বক্তব্য অনুধাবন করার প্রয়াস পেয়েছি। একটা বিষয় আমার কাছে মনোগ্রাহী ও প্রাঞ্জল যে চীন তার সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা

আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করতে পেরেছে। এবং এই দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধ শুরু হবার আগেও চীন সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধ ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসার জন্য বারংবার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমার মতে চীনের আচরণ ভারতের তুলনায় বেশি যুক্তিসঙ্গত।' (*Unarmed Victory*, পৃ. ৮১)

'তারপর ২০ নভেম্বর আকস্মিকভাবেই চীন ঘোষণা করল একতরফা যুদ্ধবিরতি এবং আরও জানাল যে চীনা সৈন্যবাহিনীর ১ ডিসেম্বর থেকে পিছু হঠা শুরু হবে। ১৯৫৯ সালের ৭ নভেম্বর যেখানে তারা ছিল সেই অবস্থানে চীনা সৈন্যবাহিনী হঠে যাবে অর্থাৎ ভারতের যা দাবি ছিল তার চেয়েও বেশি দূরে চীনাবাহিনী সরে যাবে। যদিও মনের কোণে এ ধরণের এক ক্ষীণ আশা ছিল, এতটা কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি। চীনা সৈন্যরা অনায়াসে আসাম দখল করতে পারত এবং পাহাড়ের যুদ্ধের কঠিন লড়াইয়ে তারা ইতিমধ্যে জয়ী হয়েছে তখন সমতলে তাদের সামনে এমন কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল না। এই রকম আর কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই যে বিজয়ী সেনাবাহিনীর অগ্রগতি তার নিজের সরকারের নির্দেশে স্তব্ধ হয়ে যায়'। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪)

'চারদিন পর আমি এক বিবৃতিতে জানাই, যখন চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয় আমার ধারণা ছিল ভারত নিরপরাধ এবং চীনই আক্রমণকারী। নেহরু ও চৌ এন লাই উভয়কেই তারবার্তা পাঠিয়ে আমি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিই। সে-সূত্রে চীন ও ভারত উভয়ের রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে দেখা করে নিজ নিজ সরকারের বক্তব্য নানা দলিল দস্তাবেজ সহযোগে আমার কাছে পেশ করেন। তখন আমি দেখি যে চীনের দাবি গোড়ায় যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত। এমনকি চীনকে আক্রমণকারী বলা চলে কিনা তা নিয়েও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। আমি শুধু যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলতে থাকি। নেহরু কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত করেননি এবং চৌ এন লাই আমি যা চেয়েছি তার চেয়েও বেশি কিছু করেছেন।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬)

৩

বার্ট্রান্ড রাসেল লিখছেন, 'কোনো কোনো মহলের ধারণা কমিউনিস্ট চীন সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কালিমালিপ্ত করেছে। কিন্তু বর্তমানে গান্ধীবাদী ভারতে যা চলছে তাতে কি মহাত্মাকে ভাস্বর করে তোলা হচ্ছে? চীনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও ভারতের বুকে যুদ্ধের জিগির অব্যাহত। মহাত্মার শিষ্যরা তাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সাম্প্রতিক বিপর্যয় হেতু মর্যাদাহানির ফলে মুখরক্ষার জন্য যুদ্ধোন্মাদনাকে প্রায় হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে নিয়ে চলেছে। এই সংবাদ আমি পেয়েছি একজন ভারতীয় বিজ্ঞানের অধ্যাপকের সূত্রে। তিনি লিখেছেন, 'অনেক মাস ধরে প্রায় এক বছরের ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদ এমনকি গান্ধীবাদীদেরও ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪)

চীন-বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদকে রাসেলের চোখে বিকারগ্রস্ততা মনে হলেও শিপ্রা সরকারের

মতে, এই প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য এবং তাতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কারণ, বন্ধু চীনের ব্যবহার মনে হল বিশ্বাসঘাতকতা। পশ্চিমবঙ্গে শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াবার মনোভাব সৃষ্টি হল চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, আর কিছু পরিমাণে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন, ব্যয়সংকোচ, রক্তদান, অপ্রদীপ আর সাইরেন শোনার অভ্যাস, মেয়েদের নানা কাজের পরিকল্পনা হতে লাগল। পরে দেখা গেল প্রতিবাদ মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ। দুঃখের বিষয়, তখনকার গরম হাওয়ায় কলকাতার চীনা বাসিন্দারা কিছুদিন সন্ত্রস্ত ছিলেন, কিছু দোকানপাট বন্ধ হয়। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১ জুলাই '৯৩).

তবে রাজনৈতিক উত্তেজনা যে তখন প্রবল তাতে সন্দেহ কী? এস. গোপাল লিখছেন, চীনের শঠতা ও বলপ্রয়োগ দেশের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। চীনা হামলা রোখার জন্য দলমত-নির্বিশেষে আজ সবাই একজোট। এমনকি কমিউনিস্টরাও একজোট। অবশ্যি কয়েকটি রাজ্য সরকার বেশ কিছু কমিউনিস্ট সদস্যকে গারদে পুরেছে এবং নেহরু ঘটনাটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন ও কমিউনিস্টরা ছাড়া পান।

নেহরু চোখের সামনে নতুন ভারতের অভ্যুদয় দেখে তার জন্য চীনাদের ধন্যবাদ দেন। চীনা আক্রমণ না ঘটলে এই আত্মশক্তির জাগরণ ঘটত না। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০)।

ভি কে আর ভি রাও দেখছেন চারদিকে কেমন দেশপ্রেমের উত্থান। দিল্লীতে রমেশ থাপারের বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডায় এই খবরটা তিনি পরিবেশন করলেন। প্রতিটি ভারতবাসী এই মুহূর্তে দেশপ্রেমের গভীরে ডুবে রয়েছে, এমনকি তাঁর মালি ও চৌকিদার পর্যন্ত যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা দিয়েছে।

এ কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন *দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া* কাগজের সম্পাদক শ্যামলাল। দেহাতি লোকেরা সীমান্তে কী ঘটছে এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। তাছাড়া তারা এর বিন্দু-বিসর্গ জানেও না এবং জানতে চায় না। আসলে শহরে এলিটরাই মনের মাধুরী মিশিয়ে জনগণের মনোভাবকে ব্যক্ত করছে।

উপস্থিত সবাই একমত হলেও ভি কে আর ভি রাও কিন্তু কথাটা মানতে পারলেন না। (*All these years*, pp. 204-205)

কার্যত দেখা যাচ্ছে দেশপ্রেমের আবেগে বুদ্ধিজীবী মহলই বেশি আপ্লুত। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরাও দেশপ্রেমের দৌড়ে তেমন পিছিয়ে নেই। এবং এই দেশপ্রেম কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদে পরিণত তার অন্যতম উদাহরণ *দেশ* পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি :

বিশ্বাসঘাতকদের আঘাত

ভারত সরকার স্বভাবতঃই নরম প্রকৃতির। দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত সহজে করেন না, জরুরী সময়েও নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোর এই স্থিরতা হয়ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চীনের ব্যাপক আক্রমণের পর যখন জাতীয় সংকট তীব্র হয়ে উঠল, তখন দেশবাসী বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ভারত সরকারের মনোযোগ নেই। চীনপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা এখনও দিবালোকে বিচরণ করছেন এবং বক্তৃতায়

ও বিবৃতিতে চীনা আক্রমণকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে যাচ্ছেন। এই অবস্থা যে দৃষ্টিকটু তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যাবে, ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরে জনসাধারণ কমিউনিস্ট বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সরকারকে জানিয়েছে, এই দেশ-শত্রুদের সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সাধারণের দাবী যখন তীব্রাকার ধারণ করল, তখনই ভারত সরকার ভারত রক্ষা আইন বলে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করলেন। দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ভারতে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এই বিবেচনায় যাঁরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আধা-নেতারাই রয়েছেন সংখ্যায় ভারী হয়ে।

চীনাপন্থী, অর্থাৎ কমিউনিজমের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যাঁরা সমর্থক, তাঁরা যে দেশের আপদকালে পঞ্চম বাহিনীর কাজ করছেন এ বিষয়ে ভারত সরকারের দ্বিধা দূর হতে যথেষ্ট দেরী হল। জনসাধারণের অবশ্য তা হয়নি। ঘরের শত্রু বিভীষণকে তারা আপনগুণে পূর্বেই চিনতে পেরেছিল। সরকার যে কেন পারেননি সেটাই আশ্চর্যের। তাঁরা কি ভেবেছিলেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই পঞ্চম বাহিনীদের গ্রেপ্তারের কোনো রকম প্রতিবাদ উঠতে পারে। হয়ত ভারত সরকারের দুর্বল মনে এ ধরণের কোনো দ্বিধা থেকে থাকতে পারে যে, জনসাধারণের মনে এদের বুঝি সত্যিই কিছু স্থান আছে, ফলে ঠিক ওই মুহূর্তে, ব্যাপক গ্রেপ্তার ঘটলে, কোনো কোনো জায়গায় কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, তেমন অঘটন অদ্যাবধি ঘটেনি।

কমিউনিস্ট নেতারা সর্বদাই দাবি করেছেন যে, তাঁদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক গভীর। চাষী মজুর শ্রমিক সাধারণ মানুষের সাচ্চা নেতা হিসেবে এঁদের দাবি বহুবার অহমিকা বাক্য হিসেবে শোনা গিয়েছে। এই সব গায়ে পড়া ট্রাস্টিরা সাধারণ মানুষের কতটুকু বিশ্বাসভাজন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা আজ হয়ে গেল। এই ব্যাপক গ্রেপ্তার সত্ত্বেও কোথাও একটু প্রতিবাদ নেই, ক্ষোভ নেই; কেউ বলছে না এটা অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ হল। বরং ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা, যে সব কমিউনিস্ট নেতা কিছুদিন মাত্র আগে সাধারণের ভোট কুড়িয়ে দেশের আইনসভাদিতে আসন লাভ করেছিলেন, আজ সেই অঞ্চলের জনসাধারণই তাঁদের পদত্যাগ দাবি করছে। কী অল্পে তাদের প্রাসাদ ধসে যায় এই বুঝি তার উদাহরণ। ...(*দেশ*, শনিবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৬২, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯)

দেশপ্রেমের উচ্চকিত ঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টির একদা সহযাত্রীরাও স্বচ্ছন্দে গলা মিলিয়েছেন। চীনের নিন্দাবাদ করা ছাড়াও তাঁদের কেউ কেউ কমিউনিস্ট মতাদর্শকেও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। অনেকে অনুতাপ প্রকাশ করতে লাগলেন মোহভঙ্গ হতে এত দেরী হল বলে। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তবিধির খোঁজ করতে লাগলেন কেউ কেউ। বিলাপ অনুতাপ অভিশাপ উজাড় করে ঢেলে দিলেন *দেশ* পত্রিকার 'শিল্পীর স্বাধীনতা' স্তম্ভে বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত। যেমন ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬২ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় একদা কমিউনিস্ট সাহচর্যের জন্য পরিতাপ করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক মোহমুক্তির বর্ণনা দিয়েছেন।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামে তিনি লিখছেন, '১৯৪৩ সালে ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের নিমন্ত্রণে সম্মেলনের সভাপতিত্ব যখন গ্রহণ করি, তখনও এদের স্বরূপ সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। এই সংঘের প্রথম সভাপতি ঁরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সভাপতি ঁঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। সুতরাং সন্দেহ তখনও করবার কারণ ঘটেনি।...

...প্রথম আঘাতের কথা বলি— এ সংঘের আপিসে একদিন গিয়ে শুনলাম একজন কমিউনিস্ট সাহিত্যিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে গাল দিচ্ছেন বিভীষণ কুইসলিং বলে। সেই দিনই বিরোধ শুরু হল। চোখ খুলল। ...

...তারপর স্বরূপ দেখলাম যে সত্য এদের মধ্যে নেই—যা সত্য তা দলীয় স্বার্থ। দলীয় স্বার্থে মিথ্যাও বরণীয়। ন্যায় নীতি সত্য সব তাই—সব তাই। কম্যুনিস্টদের স্বর্গরাজ্যে কম্যুনিস্টদের একাধিপত্য। সেখানে ব্যক্তি নেই। আছে আত্মাহীন প্রাণ, আছে মৃত্যু, আছে হিংসা, আছে কৌশল, তবেই বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি অন্ন বস্ত্র বস্তুজ্ঞানের। তাতে অবিশ্বাস অনানুগত্যে আছে দণ্ড বন্ধন, মৃত্যু। আত্মজ্ঞান — আত্মা অমৃত — ঈশ্বর তার অধিকারের গণ্ডী থেকে নির্বাসিত ও বিসর্জিতই নয়— ধ্বংসস্তূপের আবর্জনার মত অপসারিত করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।...' (*দেশ*, পৃ. ৬০৫-৬০৬)

দেখা যাচ্ছে বিলম্বে হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরও চৈতন্য লাভ হয়েছে। কমিউনিস্টদের স্বরূপ আজ তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার। ২০ পৌষ ১৩৬৯ তারিখে তিনি লিখছেন, '...আজ দেখছি কমিউনিজম চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমার শত্রু, আমার দেশের শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।' (*দেশ*, পৃ. ৮৯৫)

প্রতিভা বসুর ক্ষেত্রে অবশ্যি কোনোরকম মোহমুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বরাবরই জানেন 'ঋণ, রোগ, আগুন আর কমিউনিস্ট কখনোই বন্ধ হয় না। এদের প্রশ্রয় দেওয়া মানেই সর্বনাশ ডেকে আনা। সুতরাং স্বনিয়মেই আজ কমিউনিস্ট চীন তিব্বতের খোলা দরজা দিয়ে ভারতমাতার চুলের মুঠি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছে। এর পরেও যদি নিরপেক্ষ নীতির মাদুলি গলায় বেঁধে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আর ডুবে মরা ছাড়া গতি থাকে কি?' (*দেশ*, ১৬ মার্চ ১৯৬৩, পৃ. ৫৯৮)

সমবেত শিবারবে কণ্ঠদানে একান্ত অনিচ্ছুক অন্নদাশংকর রায়। তিনি *দেশ*-এর সহকারী সম্পাদককে এক পত্রে লিখছেন, 'নিজেরও তো একটা যোগসাধনা আছে। সৃষ্টিযোগে স্রষ্টার সঙ্গে ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যোগসাধন। আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কি লাভ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র থাকি কার কি ক্ষতি?' (২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ৮৯৫)

অবশেষে চীনের আক্রমণ যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীকুলের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিয়েছে, এটা দেখে শিবনারায়ণ রায় মহাশয় অতিশয় পুলকিত। তিনি লিখছেন, '... এদেশের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এখনো পর্যন্ত এই তথ্যগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেননি। সেই কারণে তাঁদের মধ্যে অনেকের এখনো বিশ্বাস যে চীনেরা সাম্রাজ্যবাদী বলেই তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, প্রকৃত কম্যুনিজম নাকি কখনও সাম্রাজ্যবাদী নয়। এই জাতীয় অবাস্তব সংস্কারের ফলে আমরা অনেকে এখনো

আমাদের প্রকৃত শত্রুর চেহারাটা ধরতে পারিনি। তাই আমরা চীনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রাশিয়াকে আবার মাথায় তুলেছি, পিকিংপন্থী দেশী কম্যুনিস্টদের দমন করতে গিয়ে মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের হুঁকো-কলকে এগিয়ে দিচ্ছি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়ত দোষের নয়, কিন্তু রাশিয়া যে চীনের চাইতে মোটেই কম কড়া সাম্রাজ্যবাদী নয়, মস্কোপন্থী দেশী কম্যুনিস্টরাও যে আসলে ধূর্ত, এই তথ্য বিস্মৃত হলে চীনকে হয়তো আমরা সাময়িকভাবে সীমান্তের [illegible] প্রতিহত করতে পারব কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রকে শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ কম্যুনিস্ট আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব না। মস্কো এবং পিকিং-এর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে যে রেষারেষি শুরু হয়েছে, গণতন্ত্রীরা তাকে নিশ্চয়ই স্বাগত করবেন; কিন্তু তার ফলে এই মারাত্মক ভুল যেন তাঁরা না করেন যে যেহেতু আজ চীন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে সেহেতু সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের সাতখুন মাপ। আমাদের আসল শত্রু একটি ভৌগোলিক অঞ্চল কিম্বা একটি বিশেষ জাতি নয়, আমাদের প্রকৃত শত্রু সর্বগ্রাসী একটি বিশেষ মতবাদ এবং তারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আক্রমণধর্মী একটি বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এবং সেই কারণে এই সংকটে আমরা তাদের বন্ধুত্বের ওপরেই প্রকৃত নির্ভর করতে পারি যারা আমাদের মত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের নিবাস পূবে কিম্বা পশ্চিমে, তাদের চামড়া কালো, বাদামী কিম্বা সাদা এটা নিতান্তই গৌণ।' (৩ ফাল্গুন ১৩৬৯, পৃ. ২১২)

দেখা যাচ্ছে, দেশপ্রেমের মহড়ায় সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র-শিল্পীরাও সামিল, দেশপ্রেমের দৌড়ে তাঁরাও পিছিয়ে থাকতে গররাজী। এই পটভূমিতে সৃষ্টি হল তপন সিংহ পরিচালিত 'আমার দেশ'। *দেশ*-এর প্রতিবেদক জানাচ্ছেন :

একটি ছবির জন্ম
'আমার দেশ'

নবজাগ্রত জাতির উদ্দেশ্যে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের একটি মহৎ উপহার—'আমার দেশ'। দুই হাজার ফুটের একটি ছবি। দেশাত্মবোধ এই ছবির মর্মবাণী। এই ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী, নেপথ্য গায়ক-গায়িকা এবং স্টুডিয়ো ও ল্যাবরেটারির কর্মীরা।

গত ১৯ শে নভেম্বর এই ছবির কাজ শুরু হয় ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্দীপক গান, 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দহে' ও 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'— সেদিন রেকর্ড করা হয়, গানে কণ্ঠদানের জন্য ল্যাবরেটরিতে এসে উপস্থিত হন হেমন্ত মুখোপাধ্যয়, সুচিত্রা মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মৃণাল চক্রবর্তী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, অরুন্ধতী দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা ও মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গানের রেকর্ডিং হল। গানের সঙ্গে বাজালেন যন্ত্রশিল্পীরা। তাঁরা বাজালেন ভি. বালসারা ও অমর দত্তের পরিচালনায়।

সেদিন ল্যাবরেটরিতে অনুভব করলাম এক পবিত্র পরিবেশ। সবাই যেন এক পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ যেন সকলের কাজ, দেশের কাজ। কে কীভাবে এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন তা নিয়ে দেখা গেল এক নিঃস্বার্থ ব্যাকুল আগ্রহ।

দেশপ্রেমের প্রেরণায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত স্তব্ধ হয়ে শুনলেন সকলে শিল্পীদের গান।

চিত্র পরিচালক তপন সিংহ নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে এ ছবি তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে তাঁর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। পরের দিনের স্যুটিং এর জন্য নিজেকে তৈরি করে তুললেন উত্তমকুমার, অনিল চ্যাটার্জী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরাও গানের রেকর্ডিং এর সময় গুনগুন করে গেয়ে নিলেন গান দুটি।

পরের দিন স্টুডিয়ো সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিয়োতে সম্পন্ন হল 'আমার দেশ' এর স্যুটিং। সকাল বেলা সব শিল্পীরা এসে উপস্থিত হলেন স্টুডিয়োতে। গানের সঙ্গে অভিনয় করলেন ও ওষ্ঠ মেলালেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী ও ছায়া দেবী। গত শনিবার গানের সঙ্গে ছবিতে আত্মপ্রকাশ করার জন্য ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালেন সুচিত্রা সেন।

এই ছবিতে বিনা পারিশ্রমিকে অংশগ্রহণ করে সব শিল্পী ও কলাকুশলীরাই যেন কী এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন।

'আমার দেশ' ছবির নেপথ্য ভাষণ পাঠ করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য্য। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে প্রযোজিত 'আমার দেশ' ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পাবে। (১লা ডিসেম্বর ১৯৬২, ১৫ই অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪৬৭-৬৯)

এবার রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকানো যাক। সেখানেও দেশপ্রেমের কিছু ঘাটতি নেই। সলিল চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে 'অঙ্গার' বন্ধ করার দাবিতে মিনার্ভা থিয়েটারে হামলা হলো। নাট্যকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত কিন্তু নির্বিকার। অপরদিকে দেশপ্রেমকে চরম বিকারে পরিণত করলেন নাট্যকার তরুণ রায়। তিনি লিখলেন চীনবিরোধী নাটক *আগন্তুক*। নাটকের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সুধী প্রধান জানাচ্ছেন, 'বাবা বলছেন দেশপ্রেমের কারণে 'আমি ছেলেকে গুলি করে মেরেছি। কারণ ছেলের বাক্সে একটা লিফলেট পাওয়া গিয়েছে'।

অশোক মিত্রের ভাষায়, 'স্রেফ চটকদার দেশপ্রেমের অশ্লীলতায় ক্লেদাক্ত আবহাওয়া। ফেউ আর সুবিধাবাদীদের রাজত্ব চলছে, যুদ্ধের জিগির তুলে কতিপয় তস্কর সাধারণ মানুষের সর্বস্ব নিংড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটুকু বলবার সৎ সাহস কারো নেই, ... দেশের বুদ্ধিজীবীরা হয় চুপ, নয় শেয়ালের দলে নাম লিখিয়েছেন, অনেকেরই প্রাক্তন রাজনৈতিক সৎ সাহস স্তিমিত অথবা মৃত'। কথাগুলি তিনি বলছেন ১৯৬৮ সালে বসে, 'স্থূলে ভুল নেই' নিবন্ধটিতে। নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে কোনো মতে যেন বেঁচে গেছেন। সেই সময় এমন সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল যে মনে হচ্ছিল, 'বুঝিবা আমরা অচিরে অশ্লী[illegible]তার বন্যায় ডুবে যাবো, সত্তা পরিচয়হীন হয়ে যাবে; বাংলাদেশ এমন কি এই দু-টুকরো হওয়া বাংলাদেশও আর থাকবে না। ভারতের এক সামান্য খণ্ডে পরিণত হবে'।

৪

সংবিধানের ১৫২ ধারা প্রয়োগ করে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হল। তারই সঙ্গে ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা। এ সবেরই প্রধান লক্ষ্য কমিউনিস্ট পার্টি ও নির্দিষ্ট করে তথাকথিত চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা। ৭ নভেম্বর ভারতরক্ষা আইনে প্রথম গ্রেপ্তারের ঘটনা মহারাষ্ট্রে এবং পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে প্রথম বলি হলেন বি.টি. রণদিভে। ২১ নভেম্বর যেদিন চীনা সরকার একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে সীমান্ত সংঘর্ষের সমাপ্তি টেনে দিল সেদিনই গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয় ধরপাকড়।

চীন-বিরোধী যুদ্ধের জিগিরের তালে তালে কমিউনিস্টবিরোধী ক্রোধ ও ঘৃণা তাতাতে থাকে সরকারি ও বেসরকারি যাবতীয় প্রচার মাধ্যম। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের উপর হামলা, পার্টি সাহিত্যের বহ্ন্যুৎসব, পার্টি নেতাদের কুশপুত্তলিকা দাহ এবং মারধর সমানে চলতে থাকে। কারণ কমিউনিস্টরা ‘দেশদ্রোহী’।

১৯৬২, নভেম্বর মাসে গড়বেতা শালবনি ইত্যাদি অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে বিষ্ণুপুর যাবার পথে কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। পার্টি অফিসগুলি হয় তালাবন্ধ অথবা বিধ্বস্ত।

কলকাতা জেলা পার্টির তৎকালীন সম্পাদক জলি কলেরও একই অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, পার্টির অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। হামলা ও অফিস পোড়ানো শুরু হয়েছে। এমন ব্যাপক হামলা ১৯৪৬ সালেও হয়নি।

খবরের কাগজের পাতায় জ্যোতি বসু দেশদ্রোহী। কমিউনিস্টরা মীরজাফরের বংশধর। চোখের সামনে একদিন বাগবাজারের পুরনো পার্টি কমরেড চানি কুণ্ডুর বাড়িতে কংগ্রেসীরা আগুন দিল। বই পত্তর বার করে রাস্তার মাঝখানে পোড়াতে লাগল। বাষট্টির কলকাতায় তেত্রিশের জার্মানীর ছায়া দেখছেন বাগবাজারের সলিল চট্টোপাধ্যায়।

একই দৃশ্যের অবতারণা হাওড়া, বর্ধমান, কাটোয়া, নবদ্বীপ, শিলিগুড়ি প্রায় প্রতিটি মফস্বল শহরে।

সে এক ঘনবদ্ধ তমিস্রার সময়— এই অভিজ্ঞতা অশোক মিত্রের এবং অন্যদেরও।

৫

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে মতভেদ বেশ কিছুকালের। ঐক্যেও চিড় ধরেছিল। পরে ফাটল ও অবশেষে ভাঙন। এক পার্টি ভেঙে দুটি পার্টি। চীন-ভারত যুদ্ধ যেন নিয়তির মতো যা সম্ভাব্য ছিল তাকে অনিবার্য করে তুলল। মণিকুন্তলা সেন লিখছেন, ‘চীন ভারত প্রশ্নে পার্টি তখন পরিষ্কার দু’ভাগ হয়ে গেল’।

পুরোপুরি না হলেও এই মন্তব্যের সঙ্গে অংশত একমত অবনী লাহিড়ী। তিনি বলছেন, 'চীন-ভারত যুদ্ধ থেকে এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিপর্যয়ের সূচনা। পার্টি ভাগের এটাই কিন্তু প্রধান কারণ নয়। এটাকে ব্যবহার করা হয় মাত্র। চীনের লাইনের সঙ্গে যাঁরা পুরোপুরি একমত তাঁরাই পার্টি ভাগের উদ্যোগ নেন।'

এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দ্বিখণ্ডিত করার ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সরাসরি ভূমিকা নিশ্চয়ই বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু পার্টির মধ্যে যে তখন ভাঙনের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দিলীপ ভাদুড়ীর মতে, '১৯৬২ সালেই চীন আক্রমণকারী কিনা এ প্রশ্নে পার্টিতে খাড়াখাড়ি দুটো ভাগ তৈরি হয়। কমিউনিস্ট মাত্রেরই এই ধারণা যে সমাজতন্ত্রী চীন কখনও আক্রমণকারী হতে পারে না। দেখা গেল তখন থেকেই পার্টির মধ্যে আলাদা আলাদা সভা ও নিজেদের মধ্যে মারপিট ঘটতে থাকে। আমি নিজেও মার খেয়েছিলাম খিদিরপুরে। আমি কিন্তু ভাবতাম এসব মিটে যাবে।'

পার্টি ভাঙার আবহাওয়া সম্পর্কে পার্টিতে নবাগতরাও তখন বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। সদ্য পার্টিতে আসা সলিল চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'বাষট্টিতেই পার্টি ভাগের চেহারা এসে গিয়েছে। চীন আক্রমণকারী কিনা এ প্রশ্নে আঞ্চলিক নেতারাও দ্বিধাবিভক্ত। আমরা টানা পোড়েনের মধ্যে ছিলাম। দু'পক্ষই পাকড়াও করত। ভাসাভাসা মনে হত চীনাপন্থীরাই অধিকতর সঠিক'।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময় দেশবাসী অবাক হয়ে শুনছেন পার্টি নেতাদের মুখে নানা সুরে কথাবার্তা। পার্টির সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান এস এ ডাঙ্গে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমিক কর্তব্যপালনের আহ্বান জানাচ্ছেন। অপরদিকে পার্টির অন্যতম নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী নেতা জ্যোতি বসু ঘোষণা করছেন, 'কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশ আক্রমণ করতে পারে না, চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ, চীন আক্রমণ করতে পারে না'।

তারপর থেকেই প্রচার মাধ্যমের ভাষায় ভারতের কমিউনিস্টরা যথাক্রমে 'দেশপ্রেমিক' ও 'চীনাপন্থী' এ দুটি অংশে চিহ্নিত।

'সামরিক পন্থায়' নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধের সমাধানের কথা বলেছিলেন ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ ও আরও কয়েকজন। তাঁদের কথা, জাতীয় পরিষদের 'দেশপ্রেমিক' অংশ, 'জনগণ আমাদের কথা শুনবে না'— এই যুক্তিতে চিৎকার করে থামিয়ে দিল।

ই এম এস -এর মতে, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চীন-ভারত সীমানা বিরোধ প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনবাদী এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তিনি লিখছেন, 'মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যে ভ্রান্ত শুধু তা নয়, যে কায়দায় জাতীয় পরিষদের সভায় এই লাইন পাশ করা হল এবং জবরদস্তি কার্যকর করার চেষ্টা হল—তা রীতিমত বিভেদমূলক। তার ফলে পার্টির ঐক্য পুরোপুরি বিনষ্ট এবং আমরা এমন গুরুতর অন্তঃপার্টি সংকটের আবর্তে তলিয়ে গেলাম যা পার্টির ইতিহাসে অভূতপূর্ব।'

আরও গুরুতর ঘটনা হচ্ছে যে ১৯ অক্টোবর পার্টি চেয়ারম্যানের সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর বুর্জোয়া সংবাদপত্র মহলে একটা ধারণা তৈরি হল যে জাতীয় পরিষদের একটি অংশ সমেত পার্টির একাংশ চীনাপন্থী। ন্যাশনাল কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে দাবি জানালেন যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ সমেত 'চীনপন্থী' নেতৃস্থানীয় পার্টি সভ্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

পার্টির একাংশ মনে করে, অপর অংশ 'চীনাপন্থী' অতএব 'দেশদ্রোহী'। এ ধরণের মনোভাব মাথা চাড়া দিলে সরকার যখন পার্টি কর্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক করে তার বিরুদ্ধে পার্টি কোনো জোরালো প্রতিবাদ জানালো না। এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। (*রিভিশানিজম অ্যান্ড ডগম্যাটিজম ইন সি পি আই*)

৭ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে তথাকথিত 'চীনাপন্থী' কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার দিয়ে সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরের অবস্থা পরখ করে নিতে চাইল। যখন দেখা গেল পার্টি নীরব, তখন আরও একধাপ এগিয়ে শুরু হল ২১ নভেম্বর সারা দেশ জুড়ে তথাকথিত 'চীনাপন্থী' কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার।

সুধাংশু দাশগুপ্ত লিখছেন, ২১ নভেম্বর পার্টি দৈনিক *স্বাধীনতা*-র রাতের চার্জে ছিলেন কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরী। রাত দুটোর সময় কমরেড সুশীতল আমাকে ফোন করে চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতির সংবাদটা জানালেন এবং বললেন, 'ঐ সংবাদকে মেইন লীড করা হচ্ছে। কিন্তু রাত তিনটেয় আবার কমরেড সুশীতলের ফোন এলো, পুলিশ সারা ভারতের পার্টি নেতাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করেছে, এখনও করছে— তার সংবাদ এসেছে। কি করবো?

আমি বললাম,—পার্টি নেতাদের গ্রেপ্তারকেই মেইন লীড করুন। হঠাৎ ফোনটা বন্ধ হয়ে গেলো। খানিক পরে আবার ফোনটা বেজে উঠলো। ধরলাম। কমরেড সুশীতল শুধু এই কথাই বলতে পারলেন, 'চললাম সুধাংশুবাবু, ডি. আই. আর এ বন্দী হলাম, পুলিশ পত্রিকা অফিস ঘিরে ফেলেছে।

ফোন করলাম কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। উত্তর এলো—পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে' (*আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে*)। ২১ নভেম্বর ভোর রাত্রিতে পুলিশ মণিকুন্তলা সেন ও জলি কলের ফ্ল্যাটেও হানা দেয়।

মণিকুন্তলা সেন লিখছেন, 'আমাদের পার্টি ভাগ হতে যেটুকু বাকি ছিল, ভারত সরকার নিজেই তা করে দিল। যে রাত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা না করেও পুলিশ তার একাংশকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করল, সে রাত্রে আমি ও জলি কল চিন্তিত মনে প্রায় সারাক্ষণই জেগে ছিলাম। পার্টি বে-আইনী হবে এবং পুলিশ আসবে এরকম একটা আশঙ্কা আমাদের মনে ছিল। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম বিপদ আসবে জেনে প্রস্তুতও ছিলাম। শেষরাতে পুলিশও এলো। বাড়িতে আমরা দুজনে বসে আছি। অপেক্ষা করছি পুলিশ বলবে—'চলুন'। কিন্তু পুলিশ তা বললো না, লেখা কাগজটা খুঁজল, কাকে যেন খুঁজল। পরে কিছু পাওয়া গেল না, লেখা কাগজটা আমাদের দিয়ে সই করিয়ে নিল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কেন এসেছিলেন? কাকে চাইছেন?' ওরা একটু হেসে চলে গেল। আমরা বোকা হয়ে বসে রইলাম। জলি কল বললেন, 'সর্বনাশ' হয়ে গেল। পুলিশ আমাদের নিল না কিন্তু ওরা বেছে বেছে নিশ্চয়ই আজ রাত্রে অনেককে ধরেছে। পার্টি ভেঙ্গে দেবার এতবড় সুযোগ কি পুলিশ ছাড়ে?' (*সেদিনের কথা*)

২১ নভেম্বর সারা দেশে প্রায় নয় শতাধিক কমিউনিস্ট বন্দী হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির ছয়জন ও জাতীয় পরিষদের কুড়িজন সদস্য।

ধরপাকড় অনেক সময় মাথা মুন্ডু বর্জিত। যেমন ৭৭ ধর্মতলা স্ট্রিটে হানা দেওয়া হয় বঙ্কিম মুখার্জিকে ধরার জন্য। অথচ তিনি এক বছর আগে মারা গিয়েছেন। গোয়েন্দাদের ভুল

রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অনুগামী কয়েকজন কমরেডকেও ধরা হয়। যথা অনন্ত মাজী, ছাত্রনেতা নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, পার্টির নদীয়া জেলা পরিষদের সম্পাদক সুশীল চ্যাটার্জী ও ২৪ পরগনার ডাঃ সাধন সেন। সোভিয়েত পার্টির মুখপত্র *প্রাভদা*-য় ভারতের কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও এদেশের কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে নীরব। বহু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের খবরও অপ্রকাশিত। ফলে পার্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষিয়ে উঠল। জেলের ভিতরে ও বাইরে পার্টিতে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের উঁকিঝুঁকি। অভিযোগ উঠলো পার্টির এক অংশ অপর অংশকে ধরিয়ে দিচ্ছে। প্রতিপক্ষ কমরেডরা নাকি সরকারকে অনুরোধ করছে বন্দী কমরেডদের মুক্তি না দেবার জন্য।

চীনপন্থীদের ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই গুজব সলিল চট্টোপাধ্যায়েরও কানে এসেছে। কিন্তু আঞ্চলিকভাবে তার প্রমাণ নেই।

সন্দেহ ও অবিশ্বাসে বিষিয়ে ওঠা পরিমণ্ডলে পার্টি করার যাবতীয় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন মণিকুন্তলা সেন। তিনি লিখছেন, 'এবার আমাকে যেতে হবে। এ পার্টির কোন অংশের সঙ্গেই আমি আর আমার স্থান করে নিতে পারব না। আমি কোনও অংশকেই প্রতিপক্ষ ভাবতে পারি না'।

তিনি লিখছেন, 'আমাদের মধ্যে একের প্রতি অপরের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কত নিম্নস্তরে পৌঁছেছিল, যাবার আগে সেটা জেনে বড় আঘাত পেয়েছিলাম। তখনও পুলিশের ধর পাকড়, জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি চলছিল। হঠাৎ একদিন সকালে কালিঘাটের তিনটি ছেলে আমার কাছে এলো। ওদেরকে ভবানীপুর থানা থেকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গিয়ে দিন কয়েক লকআপে আটকে রেখেছিল। অনবরত জেরা চলছিল ওরা চীনপন্থী কি না তা জানার জন্য। ওদের জবাবে পুলিশ অফিসার খুশি না হয়ে বলেছেন, 'আপনারা 'না' বললে কি হবে, জানেন কি জলি কল আমাদের কাছে যে লিস্ট দিয়েছে তাতে আপনাদের নাম আছে'? পুলিশের এই কথাতেই ঐ ছেলেরা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ওদের জিলা সেক্রেটারী কিনা নিজেই এই বিশ্বাসঘাতকতা করল'!

'...ডাক্তার গণি জেল গেটে ঢোকামাত্রই ওখানকার কোন নেতা নাকি তাঁকে বলেছেন, 'সে কি মশাই জলির লিস্টে আপনারও নাম ছিল, এ তো জানতাম না'।

'...এরকম বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আরও পেতে থাকলাম। স্নেহাংশু আচার্যকে গ্রেপ্তার করার দিন দুই পর পার্ক সার্কাস বাজারের সামনে আমাকে এক কমরেড বলে বসল, দেখলেন স্নেহাংশুদাকেও জলি ধরিয়ে দিল'। (*সেদিনের কথা,* পৃ. ২৯৭ - ৯৯)

পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পরিমণ্ডলে ঐক্যবদ্ধ পার্টির আবেগ আর কতখানি টেকসই হতে পারে? পার্টির ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এক নজিরবিহীন সংকটের আবর্তে গোটা পার্টি। পার্টির একাংশ জেলে বন্দী অথবা গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মগোপন করেছেন। আর এক অংশ ঘোরতর 'দেশপ্রেমিক'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন শুধু নয়—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় তাঁরা মেতে উঠেছেন।

হরিনারায়ণ অধিকারীর মতে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙার ক্ষেত্রে ১৯৬২ সালের 'ভারতরক্ষা আইন'-এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন, 'ভারতরক্ষা আইনে

বিনা বিচারে এবং বিচারাধীন বন্দীরূপে আটক কমিউনিস্ট বন্দীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকলেন বাইরের পার্টি নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। জেলের আটক বন্দীরা ধরেই নিয়েছিলেন, পার্টি নেতৃত্বের সাথে আর চলা সম্ভব নয়। বন্দীমুক্তি সম্পর্কে নীরবতা এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করে।' (*ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* পৃ. ২৫)

এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সেক্রেটারিয়েটের এক বিবৃতি।

'প্রতিরক্ষার কাজে আমাদের পার্টি জনসাধারণকে সমাবেশ করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও আমাদের পার্টি সভ্যদের এখনও গ্রেপ্তার করা হইতেছে দেখিয়া পঃবঙ্গ রাজ্য পরিষদ সেক্রেটারিয়েট বিস্ময়বোধ করিতেছে। আমরা আশা করি সরকার তাহাদের নীতির ভুল বুঝিবেন এবং উহার বদল করিবেন।

তবু আমাদের পার্টি প্রথমাবধি এই কথাই বলিয়া আসিতেছে যে চীন আক্রমণ হইতে উদ্ভূত জরুরী অবস্থার মধ্যে যত বিপদই আসুক না কেন প্রত্যেক সদস্যকে দৃঢ়ভাবে নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকিতে হইবে। পার্টি বরাবরই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়া আসিতেছে বর্তমান অবস্থায় গ্রেপ্তার এড়াইয়া চলার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে পুনরায় ঘোষণা করিতেছে এবং পার্টির সদস্যকে উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলিতেছে। কোনও সদস্যের পক্ষে গ্রেপ্তার এড়াইয়া চলার কোনও প্রয়াসকে পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট অনুমোদন করে না। কোনও কমরেড ঐরূপ কাজ করিলে পার্টির ও পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গের দোষে দোষী হইবেন'। (সোমনাথ লাহিড়ী সম্পাদিত *স্বাধীনতা,* ৫ ডিসেম্বর ১৯৬২)

৬

একদা যা অকল্পনীয় তাই ঘটতে যাচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে চরম তিক্ততার মধ্য দিয়ে। এই দৃশ্য দেখে সেদিন নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন তরুণ কথাশিল্পী কমরেড দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সহযোদ্ধাদের মধ্যে তিক্ততার ভয়াবহতা দেখে নেপথ্যবাসী হলেন কমরেড জলি কল, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক। সেদিন যাঁরা পার্টি ভাগ চাননি এবং দুপক্ষের মধ্যে ঐক্যসূত্র সন্ধানে ব্যর্থ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত দু'পার্টির মধ্যে একটাকে বেছে নিলেন। যাঁরা বেছে নিতে চাইলেন না তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্য অজিত রায়, বীরেন রায়, গোপাল আচার্য, বঙ্কিম সেন, সুবোধ দাশগুপ্ত, চিত্ত মৈত্র, জগৎ বোস, নক্ষত্র ব্যানার্জী, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক, অর্পণাকিংকর ভট্টাচার্য ও মালদহ জেলা কমিটির সম্পাদক, শচী রায়-এর মতো আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কমরেড। দল ভাঙার আবেগের স্রোতে গাভাসাননি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রয়াত আর বাকিরা বরণ করেছেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন। পার্টি ভেঙে যাওয়াতে মর্মাহত যাঁরা, তাঁরা কিন্তু কমিউনিস্ট পরিমণ্ডলেই রয়েছেন এবং নিজেদের কমিউনিস্ট ছাড়া আর

কিছুই ভাবতে পারেন না। কালক্রমে ঐক্যবদ্ধ পার্টির স্মৃতি ফিকে হতে থাকলেও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি অনেকের ক্ষেত্রে। যেমন সম্প্রতি দু'পার্টিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসী হতে আবেদন জানিয়েছেন দুজন প্রবীন কমরেড, সুধী প্রধান ও নন্দলাল বসু। চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-এর পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস (এপ্রিল, ১৯৯৫)-এর ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে এক প্রতিবেদনে তাঁরা বলেন, ছোটোখাটো মতপার্থক্য উপেক্ষা করে দুই কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা এখনই শুরু করতে হবে।

নতুন প্রজন্মের পার্টি কমরেডদের কাছে এই আবেদন কতখানি অর্থবহ বলা কঠিন, কারণ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব তাঁদের অভিজ্ঞতার বাইরে। ঐক্যবদ্ধ পার্টির আবেগমথিত স্মৃতির শরিক হবেন কী করে তাঁরা? অতএব ঐক্যবদ্ধ পার্টি ও দু'পার্টির জন্ম, তাঁদের কাছে আজ শুধু ইতিহাস।

তারপর তিন দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। পিছন ফিরে তাকালেই দেখা যাবে এদেশে সেদিন পার্টি ভাঙার আবেগমত্ততার প্রেক্ষাপট জুড়ে ছিল বিশ্বের বৃহত্তম দুই কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ রুশ ও চীন পার্টির মধ্যে মহাবিতর্ক। বিশ্ববিপ্লবের পথ নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত, উত্তাপ বাড়তে বাড়তে সৃষ্টি হল দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অবাঞ্ছিত তিক্ততা ও গড়ে উঠল দুই সমাজতন্ত্রী দেশের মধ্যে বৈরিতামূলক সম্পর্ক। বিতর্কের ঝাঁঝালো আবহাওয়ায় দেশে দেশে কমিউনিস্টরা বিভক্ত হল দুটি বিবাদমান শিবিরে এবং এদেশেও।

[illegible] interpretation (ব্যাখ্যা) নিয়ে চীন ও সোভিয়েতের পেছনে লাইন লাগিয়ে দিল সবাই। কর্তাভজামিই আমাদের মূল দোষ। একমাত্র ব্যতিক্রম অজয় ঘোষ। অজয় বেঁচে থাকলে split (পার্টিভাগ) সহজে হত না।'

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙনকে এদেশে পার্টিভাগের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন অবনী লাহিড়ী। তিনি বলেন, 'পার্টি split-এর অবস্থা রণদিভে যুগেও সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু হয়নি, কারণ world centre-এ split হয়নি। পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ভারতের বাইরে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতরেই সোভিয়েত domination (আধিপত্য) -এর বিরুদ্ধে ঘটছে লড়াই'।

এই সূত্রে ভবানী সেন পার্টি ভাঙার জন্য চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে সরাসরি দায়ী করেন। তিনি লিখেছেন, 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ভারতীয় কমিউনিস্টদের পার্টি নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে অথবা ঐ পার্টি ছেড়ে নতুন পার্টি গড়ার আহ্বান জানান, ... ওরা (দলছুটরা) পার্টি ভাঙার উৎসাহ পেয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মাওবাদী নেতৃত্বের আদেশনামা থেকে'। (*সি পি এম-এর স্বরূপ*)

অপরপক্ষে বিশেষজ্ঞ লেখক মোহন রাম পার্টি ভাঙার জন্য সোভিয়েত পার্টিকে পরোক্ষে দায়ী করেন। তিনি বলেন, ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে যেদিন নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ও জাতীয় পরিষদের বৈঠকে রুশ-চীন মতাদর্শগত বিরোধে পুরোপুরি রুশ পক্ষে সামিল হবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেদিনই পার্টিভাগ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। ঐ বৈঠকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের গুরুতর মতপার্থক্যের জন্য চীন ও আলবানিয়া পার্টিকে দায়ী করা হয়। কারণ তাঁরা ১৯৫৭ সালের ৮১ পার্টির দলিল ও ১৯৬০ সালে গৃহীত মস্কো ঘোষণার অবমাননা করেছেন।' (*Split within Split, pp. 145-46*)

গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতে, পার্টি আসলে মনে মনে ভাগ হয়ে গেছে সোভিয়েত বিংশতি কংগ্রেসের পরে। গৌরী ঘটকের মতও তাই। তিনি বলেন, 'বিংশতি কংগ্রেসের অধিবেশনে ক্রুশ্চেভের de-stalinisation-এর বক্তৃতা থেকে পার্টির মধ্যে ভাঙনের সূত্রপাত। পার্টি র‍্যাংকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্তালিনের অবমূল্যায়ন মেনে নিতে পারেনি। আমিও পারিনি।'

নরহরি কবিরাজ মনে করেন, 'যে আন্তর্জাতিকতাবাদের দোহাই পেড়ে split সেটা আসলে tainted internationalism (দাগলাগা আন্তর্জাতিকতাবাদ)। মস্কো- পিকিং উভয় পক্ষই ঝগড়ার উন্মত্ততায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে সরে গিয়েছিল। মস্কো-চীনের ঝগড়ার ফলে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা কচুকাটা হল। আর যে এর জন্য দায়ী সেই সুহার্তকে 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি দেওয়া হল। মস্কো-চীন উভয়েই vulgarised position নিয়েছে internationalism-এর নামে। আর আমরা এই পক্ষ বা ঐ পক্ষের বক্তব্যকে whole truth বলে মেনে নিয়ে পক্ষাবলম্বন করেছি। তিনি বলেন, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র নিয়ে পার্টিতে মতবিরোধ আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। এ নিয়ে নিশ্চয় split হত না। এটাকে যুক্ত করা হয় চীন-রুশ বিরোধের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ না ঘটলে, কখনোই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মূল্যায়ন নিয়ে split ঘটত না'।

ভারতের ক্ষেত্রে পার্টির মধ্যে চিরাচরিত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে পার্টিভাগের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে চিহ্নিত করেন হরিনারায়ণ অধিকারী। তিনি লিখছেন, 'গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব জর্জরিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ উর্ব্বর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিতর্ক পার্টি ভাঙ্গনের বীজ ছড়িয়ে দিল।' (*ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী*, পৃ. ২৫)

একই ধারণা পোষণ করেন সুধী প্রধান। তিনি বলেন '১৯৪৯ - ৫০ সাল থেকেই পার্টি ভাগের জমি তৈরি হয়। সে সময় থেকেই বিভিন্ন চক্রের উদ্ভব। একটা vicious atmosphere (বিষাক্ত আবহাওয়া)। সেটাই পার্টি ভাগের উৎস।'

সাধন গুপ্ত কিন্তু পার্টিভাগের মূল কারণ factional বা উপদলীয় সংঘাতের জের বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, পার্টিভাগ অনিবার্য ছিল যেহেতু পার্টির মধ্যে fundamental difference ছিল। এক পক্ষের dominant stand ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে একসাথে চলা। অপরপক্ষের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনে principled militancy এবং কৃষক আন্দোলনের আওতায় গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার প্রয়াস। অতএব পার্টি ভাগ অনিবার্য ছিল। একটা principle-এর ওপর এই split। ভাগটা কিন্তু পিকিংপন্থী-মস্কোপন্থী নয়।'

কমল চ্যাটার্জী মনে করেন, ১৯৫১ সাল থেকে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চলছিল, পার্টিভাগ তারই পরিণাম।

অজিত রায় কিন্তু মনে করেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদই এদেশে পার্টি ভাঙ্গার প্রধান কারণ। যতই রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকুক বা উপদলীয় বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চিড় না ধরলে কারো মুরোদ বা মনের জোর ছিল না পার্টি ভাঙার।

দীপেন ঘোষের মতে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত বিরোধ আর আমাদের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম এ দুটো co-incide করে গেল। তাই যারা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

লড়ছিল, তাদের চিহ্নিত করা হল 'চীনপন্থী' আর অন্যরা 'রুশপন্থী'। এভাবে পার্টিভাগের অবস্থা তৈরি হল।

সুধাংশু দাশগুপ্তের মতে, পার্টি ঐক্য আসলে আপসরফার মাধ্যমেই প্রায় এক দশক ধরে টিকেছিল। অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর আপসরফার সুযোগ আর রইল না।

তিনি লিখছেন, 'অমৃতসরে ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম কংগ্রেস। এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ১৯৫৭ এর মস্কো ঘোষণাপত্রের ভূমিকায়। ... এরই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলির কার্যকলাপ বেশ বেড়েই চলেছে।

... পার্টির মধ্যে তখন যে দু'ধারার বিতর্ক চলছিল তার একটা সাময়িক মীমাংসা পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে করা হল। ... একই সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে একদিকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, অপর দিকে কংগ্রেস সরকারের কর্মনীতির বিরুদ্ধে ... মীমাংসাটা ছিল একেবারেই আনুষ্ঠানিক।' (*আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে,* পৃ. ১১৫)

তিনি আরও লিখছেন, 'যাঁরা আশা করেছিলেন যে ৮১ পার্টির সম্মেলনের (১৯৬০, নভেম্বর, মস্কো) পর ৮১ পার্টির বিবৃতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত বিরোধের অবসান ঘটাবার সূত্র পাওয়া যাবে, তাঁরা অল্প কিছুকালের মধ্যে হতাশ হলেন।

... ৮১ পার্টির বিবৃতি নিয়ে কার্যকরী কমিটি বা জাতীয় পরিষদে কোথাও আলোচনা হল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে কর্মসূচী, কর্মনীতি ও মতাদর্শ নিয়ে যে মতপার্থক্য দিনের পর দিন বেড়ে উঠছিল এবং তীব্র হয়ে উঠছিল তা দূর করার কোনও প্রচেষ্টাই করা হল না।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭ - ৮)

রুশ চীন বিরোধ অথবা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঘরোয়া বিরোধ এর কোনও একটি বা দুটি পার্টি ভাঙার প্রধান কারণ— এ ধরণের ব্যাখ্যা জলি কলের মনঃপূত নয়। তাঁর মতে ভাঙনের উৎস আরও গভীরে। পার্টিভাগ একটি বহুমাত্রিক ঘটনা। তাঁর মতে পার্টিভাগের মূল কারণ চারটি।

১. জন্মকাল থেকেই পার্টির মধ্যে উপদলের অস্তিত্ব বর্তমান এটাই যার দীর্ঘ ইতিহাস। বিশের দশক থেকে বলা যায়, বম্বে উপদলের প্রধান কেন্দ্র ডাঙ্গে বনাম রণদিভে।

২. Understanding of Indian reality. স্বাধীনতার পর তাকে comprehensively বোঝার চেষ্টা হয়নি। এক এক সময় তার এক একটা aspect-কে বড় করে দেখানো হয়েছে। ফলে পার্টির মধ্যে attitude towards Government or Congress এই প্রশ্নে দুটো extreme views-এর অস্তিত্ব। একপক্ষ সরকারকে পুরোপুরি সমর্থন জানায় এবং অপরপক্ষ মনে করে তার যাবতীয় ঘোষণা ও কার্যকলাপ পুরোপুরি ভাঁওতা। এটাই আসলে factionalism-এর ideological basis.

পালঘাট কংগ্রেস (১৯৫৬) এর পর থেকে factionalism শুরু হয় জোর কদমে। CPM-এর পক্ষে যারা তাদের সরল ব্যাখ্যা এই, 'একাংশ লেজুরবৃত্তি করছে অতএব আমরা বেরিয়ে গেলাম।'

৩. Immediate cause of the rift হল late fifties-এ International rift। অতীতে যখন rift-এর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, international intervention এর ফলে তাকে ঠেকানো গিয়েছে। যখন এই দুই giant (বৃহৎ) পার্টির মধ্যে rift ঘটল, তখন সেই সম্ভাবনা তিরোহিত।

বিশেষ করে তখন মাও সে তুং-এর মর্যাদা তুঙ্গে। আর তখন চীনা পার্টির লাইন হল সব দেশে দুটো পার্টি করা, revolutionary ও reformist। ফলে পার্টিভাগ দেশে দেশে অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। এশিয়ার বুকে বলা যায় তখন Maoist section পার্টির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় major অংশ আর ভারতে আধাআধি।

৪. সংসদীয় রাজনীতির যুগের প্রভাব পড়েছে পার্টি জীবনে। ১৯৫২ সালে প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেকে সংগঠনের আন্দোলনের দোহাই পেড়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রায় কেউ দাঁড়াতে চাইছে না। সংসদীয় রাজনীতির স্থান তখন নিতান্তই গৌণ। ১৯৫৭ সালে কিন্তু ছবি একেবারেই উল্টো। ভালো আসনগুলির জন্য শুরু হল competition আর rivalry। পার্টির মধ্যে corruption তখন থেকে শুরু।

নির্বাচনী আঙিনায় প্রার্থী পদের জন্য পার্টিতে প্রতিযোগিতা ক্রমবর্ধমান। প্রবল থেকে প্রবলতর।

এ ধরণের প্রবণতা যখন পার্টিতে মাথা চাড়া দেয় তখন factionalism gets aggravated. Nomination-এর জন্য রেষারেষির সূত্রপাত থেকে পার্টির বড় নেতা যারা নির্বাচন প্রার্থী তাদের জন্য বরাদ্দ হয় বড় অংশের টাকা ও ক্যাডার deployment-এর সময় তাদের এলাকার জন্য ভালো ভালো ক্যাডার সবাইকে তুলে নেওয়া হয়। বাকি কমিউনিস্ট প্রার্থীদের জন্য পৃথক হয় বন্দোবস্ত।

দেখা যায় পার্টি কমিটির composition অথবা এসেম্বলী nomination সবই factionally decide হয়।

জলি বলছেন, virtually '56 থেকেই পার্টি এক হলেও পার্টির মধ্যে দুটো faction আলাদাভাবে function করছিল। তিক্ততার আরম্ভ সেখান থেকেই।

চীন ভারত যুদ্ধ প্রসঙ্গে যে তিক্ততা শুরু হল সে সূত্রে দেখা যাচ্ছে CPI section মনে করছে, অপর section পার্টিকে patriotic masses থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। অপর পক্ষের ধারণা, এরা আন্তর্জাতিকতাবাদ জলাঞ্জলি দিয়েছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সরে গিয়েছে।

পার্টির মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির পুরো সুযোগ সরকার ও পুলিশ নিয়েছে। পুলিশের এটাই traditional চরিত্র। পুলিশ এটা cleverly use করেছে এবং definitely কিছু পুলিশের লোক পার্টিতে infiltrate করছিল। না হলে কার কী ভাবনাচিন্তা এরা খবর পেত কী করে?

এরা যখন তথাকথিত চীনপন্থী লোকদের ধরা শুরু করে তখন রটিয়ে দেয় যে অপরপক্ষ খবর দিয়েছে। যেমন, আজও অনেকের এই ধারণা। আমি নাকি স্নেহাংশুকে ধরিয়ে দিয়েছি।

পার্টি ভাগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ব্যাক্তিত্বের ভূমিকাও প্রাসঙ্গিক। ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া হয়তো ত্বরান্বিত হয়েছে কোনো বিশেষ নেতার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণের দ্বারা। আবার কোনো নেতা হয়তো বেঁচে থাকলে সেদিন উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোনো ঐক্যের সূত্র বার করতে পারতেন। চেয়ারম্যান ডাঙ্গের উপস্থিতি ও অজয় ঘোষের অনুপস্থিতি পার্টি ভাঙা বা না ভাঙার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পার্টির যে অংশ চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেছিল অপর পক্ষের চোখে তারা ডাঙ্গেপন্থী বলে চিহ্নিত। সে ক্ষেত্রে ডাঙ্গের নেতৃত্বে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

অপরদিকে বিগত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, অজয় ঘোষ আন্তঃপার্টি বিতর্কের মীমাংসা সূত্র বার করে পার্টি ঐক্যরক্ষা করেছেন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে একাধিকবার। রণেন সেনের ধারণা, অজয় ঘোষ বেঁচে থাকলে পার্টিভাগ এত সহজে হতে পারত না। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ কুৎসেবিনের অভিমতকে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বইতে। রণেন সেন আরও লিখছেন, 'অজয় বেঁচে থাকলে অন্ততঃ ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু বা রামমূর্তি পার্টি ভাগ করার পথে যেতে পারতেন না, আর অন্য দিকে ডাঙ্গে, যোশী, রাজেশ্বর রাও বা ড. অধিকারী-ও পারতেন না। সেই যুগসন্ধিক্ষণে অন্তত ভুপেশ বা যোশী বা আমি বামপক্ষের দিকে থাকলেও পার্টি বিভাজন চাইনি বা তা রুখতে চেষ্টা করেছি। আমরা প্রতিক্ষণ অজয়ের অনুপস্থিতিরও অভাব অনুভব করেছি।' (*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা,* পৃ. ২৩)

সুধাংশু দাশগুপ্তও স্বীকার করেন অজয় ঘোষের মৃত্যু পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করে। তিনি লিখছেন, 'জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা ই এম এস কে জেনারেল সেক্রেটারির পদে নির্বাচিত করতে চাইলেন। ডাঙ্গে গ্রুপ একটি শর্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ডাঙ্গেকে চেয়ারম্যান করতে হবে। পার্টির সম্ভাব্য ভাঙন রোধের জন্য একটা আপোষের ব্যবস্থা হল। সব মতের কমরেডদের নিয়ে একটা কম্পোজিট সেক্রেটারিয়েট গড়া হল কিন্তু পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল না পার্টি ভাঙনের দিকেই এগিয়ে গেল। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১)

৭

১৯৬১ সালে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হল, অন্ধ্ররাজ্যের বিজয়ওয়াড়ায় ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস। রণেন সেন লিখছেন, 'এই কংগ্রেসের প্রাক্কালেই পার্টি ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত বাম ও দক্ষিণপন্থীরা প্রায় ঠিক করে ফেলেন ও তার প্রস্তুতি চলতে থাকে।'

এ প্রসঙ্গে হরকিষেন সিং সুরজিৎ লেখেন, 'বিজয়ওয়াদায় ষষ্ঠ কংগ্রেসে আমরা কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের দুটি পৃথক খসড়া নিয়ে গিয়েছিলাম। কংগ্রেস সমানভাবে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। পার্টি ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু যেহেতু নির্বাচন সামনে এসে গিয়েছিল তাই ভাঙন এড়িয়ে যাওয়া হয়। সে সময় কোনও ভাঙন হলে তা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতো। সুবিধা পেত শাসকদল।' (*গণশক্তি,* ৭ নভেম্বর, ১৯৯৪)

এভাবে পার্টির আনুষ্ঠানিক ঐক্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে, মোহন কুমারের মতে 'সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা সুশলভের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুশলভেরই পরামর্শে অজয় ঘোষ তাঁর মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবকে বামদের গ্রহণযোগ্য করার জন্য যথেষ্ট রদবদল করেন। সমাপ্তি ভাষণে তার ছাপ স্পষ্ট। তাতেও কিন্তু সব সমস্যার নিরসন হয়নি।' রণেন সেন লিখছেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বামপক্ষীয় কমরেডরা নিজেদের নাম প্রস্তাবিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির প্যানেল থেকে প্রত্যাহার করে নেন। কংগ্রেসে অসম্ভব উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী কমরেডরাও বেশ ভীত ও উদ্বিগ্ন হন। মাঝ রাত্রে নিদ্রিত অজয়কে (সে অনেকদিন ধরে অসুস্থ) ডেকে কংগ্রেসে হাজির করা হয়। তিনি সব শুনে

বলেন যে কোনো পক্ষের প্রাধান্য থাকবে না, উপযুক্ত কমরেডদের কমিটিতে নিতে হবে এবং কেউ নাম প্রত্যাহার করতে পারবে না। বিপুল হাততালির মধ্যে অজয়ের এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪)

জানুয়ারি '৬২ তে অজয় ঘোষ প্রয়াত হন। রণেন সেন লিখছেন, 'তার মৃত্যুর পর আবার দক্ষিণ ও বামের লড়াই পার্টির অভ্যন্তরে তীব্রভাবে মাথা চাড়া দেয়। পার্টি দু'টুকরো হয়ে যাওয়া রোধ করতে জাতীয় কর্মকর্তার কিছু রদবদল করার কথা জাতীয় পরিষদের সভায় স্থির হয়। কমরেড ডাঙ্গেকে পার্টির চেয়ারম্যান (নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়) এবং ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। আশা ছিল যে এই রদবদলের ফলে কিছুটা সুফল পাওয়া যাবে।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০)

পার্টির বন্দী নেতারা মুক্ত হবার সঙ্গে পার্টির মধ্যে বিরোধ মাথা চাড়া দেয়। রণেন সেন লিখছেন, 'বাম দক্ষিণীদের ফ্যাকশান মিটিং আর রেখে ঢেকে চলে না।' তাঁর মতে বিভিন্ন মতের নেতাদের পৃথকভাবে গোপনে মিলিত হওয়ার সূত্রপাত হয় পালঘাট কংগ্রেসের সময় থেকে। '১৯৫৪-৫৫-র মধ্যেই পার্টির ভিতর বাম ও দক্ষিণপন্থী মতবাদের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে।'

রণেন সেনের ভাষায়, 'পালঘাটে ও পরে বিজয়ওয়াদায় উভয় পক্ষই গোপনে ফ্যাকশন মিটিং করেছেন, পার্টির বিভক্তির চেষ্টাও চালিয়েছেন যা সম্পূর্ণ হল চীনের ভারত আক্রমণের সময়।'

পার্টির মধ্যে যে মেরু বিভাজন সৃষ্টি হয় সে পটভূমিতে রণেন সেন 'দক্ষিণীদের পাণ্ডা ডাঙ্গে, যোশী, ড. আহ্মদ, ড. অধিকারী, সরদেশাই, রাজেশ্বর রাও, অন্যদিকে সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নিয়া, সুরজিৎ, এ.কে গোপালন'-কে চিহ্নিত করেন।

তিনি আরও লেখেন যে বাংলার পার্টিতে বেশ কিছু পুরাতন কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে উভয় ফ্যাকশনের বাইরে পার্টির ঐক্যকামী শক্তিদের জমায়েত করবার চেষ্টায় থাকেন। কিন্তু কোনও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লাইন না থাকায় এবং ভারতের অন্যপ্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় এই কমরেডরা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন না। ফলে জ্যোতি বসুর সঙ্গে বামদের যোগাযোগ হয়, তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এবং বাংলার এই কমরেডরা ধীরে ধীরে দুদিকে চলে যেতে থাকেন। কিন্তু সর্বভারতীয় পার্টি এত বিভেদ সত্ত্বেও তখনও একটাই গোটা ছিল। উভয়পক্ষের গোঁড়া ভক্তরা নেতাদের পরামর্শে বুঝলেন যে এক পার্টিতে থাকা যাবে না। প্রত্যেকেই 'মার্কসবাদের বিশুদ্ধতার' দোহাই পাড়লেন। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬ ও ২৪৩)

স্পষ্টতই পার্টিতে যাঁদের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ অবস্থান তাঁদের ভূমিকা দ্রুত ফুরিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত যে কোনো একটি পক্ষ বেছে নিতে হয় তাঁদের।

১৯৬৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অভিন্ন অস্তিত্ব নামে মাত্র। প্রত্যেক রাজ্যে ও কেন্দ্রে দুটো পার্টি। আলাদা অস্তিত্ব ও সমান্তরাল কার্যকলাপ। এ প্রসঙ্গে হরিনারায়ণ অধিকারী লিখছেন, 'জেলের অভ্যন্তরে এবং জেলের বাইরের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ঢেউ পার্টির সব স্তরের কমরেডদের আন্দোলিত করে তুলল। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময় যে গোষ্ঠী যে রাজ্যে শক্তিশালী সে রাজ্যেই সে গোষ্ঠী তরুণ পার্টি সভ্য, কর্মী সমর্থকদের নিজ গোষ্ঠীভুক্ত রাখার জন্য তৎপর। বিশেষ করে ছাত্র যুব পার্টি সদস্যদের নিয়ে এই তৎপরতা অন্ধ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে'।

হরিনারায়ণের বক্তব্যের সমর্থনেই যেন সুধাংশু দাশগুপ্ত লিখছেন, 'আমার পার্টি জীবনে ১৯৬৩ সাল এলো মতাদর্শগত সংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে। এই সম্ভাবনাকে আমি ব্যবহার করলাম। একই মতাবলম্বী অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা পাড়ায় পাড়ায় এলাকায় এলাকায় পার্টির দু'তিনটে ব্রাঞ্চকে একত্রিত করে মিটিং করতে শুরু করলাম। সেই সব মিটিং-এ আমরা সংশোধনবাদীদের মুখোশ খুলে দিতে লাগলাম।

শ্রেণী সহযোগিতায় লাইনের নেতারা যে সাধারণ পার্টি সভ্যদের থেকে কত বিচ্ছিন্ন তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম উত্তর কলকাতার একটি জেনারেল বডি মিটিং-এ।

উত্তর কলকাতার জেনারেল বডি মিটিং আমার এবং সহকর্মীদের চোখ খুলে দিল। বুঝলাম এরাজ্যে সংশোধনবাদীদের ঠাঁই হবে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম যে নীচের তলার কমরেডদের সংগঠিত করার জন্য তক্ষুনি চাই একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১৬ আগস্ট, ১৯৬৩ প্রকাশিত হল 'দেশহিতৈষী' প্রথম সংখ্যা। ছাপা হয়েছিল সাড়ে পাঁচ হাজার কপি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কাগজ শেষ। কমরেডদের অসম্ভব ভীড় 'দেশহিতৈষী'র ঐ ছোট্ট ঘরের সামনে। প্রশ্ন: এত অল্প কাগজ কেন ছাপা হল? আপনারা কি আমাদের চাহিদা বুঝছেন না? দ্বিতীয় সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার, আর তৃতীয় সংখ্যা সাড়ে বারো হাজার। 'দেশহিতৈষী'র মধ্য দিয়েই অসংখ্য পার্টি সদস্য চলার পথের সন্ধান পেলো, পেলো মতাদর্শের সংগ্রামের হাতিয়ার।' (পূর্বোক্ত পৃ. ১২৭-২৮)

শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতে পাল্টা পার্টি গড়ার তোড়জোড় চলছে। হরিনারায়ণ অধিকারী এ প্রসঙ্গে লিখছেন, দিল্লীতে কমরেড এ কে গোপালনের এম পি কোয়ার্টার কার্যত হয়ে দাঁড়াল পাল্টা পার্টি কেন্দ্র। সেখানে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধী নেতারা প্রায়ই মিলিত হতেন। এই কোয়ার্টারেরই কোনো একটি গোপন সভায় তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন—পাল্টা পার্টি গড়তে হবে। পাল্টা পার্টি গঠনের প্রাক্-প্রস্তুতি হিসেবে রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গোপন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। ভারত সরকারের আক্রমণ এলে সব নেতারা পুলিশের হাতে ধরা দেবে না, একটা অংশ আত্মগোপন করবেন। সারা ভারত কৃষক সভার তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগজিৎ সিং লয়ালপুরীর উপর কেন্দ্রের গোপন কেন্দ্র চালাবার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

আর পশ্চিমবঙ্গে কমরেড সমর মুখার্জী আত্মগোপন করেন, 'পৃথ্বিরাজ' ছদ্মনাম নিয়ে রাজ্য পার্টির পাল্টা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১)

এই ডামাডোলের মধ্যে সবচেয়ে বেকায়দায় যাঁরা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের বাইরে। বীরেন রায় বলছেন,

'একদিকে গোটা দেশে কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ চলছে, অনেকেই গ্রেপ্তার। আর পার্টি কার্যত দ্বিধা বিভক্ত। পার্টির মধ্যে সর্বস্তরে মতবিরোধ দানা বেঁধেছে। কলকাতায় তখন পার্টির মধ্যে পার্টি তৈরি হয়েছে এবং সমান্তরাল দুটো পার্টি চলছে। পার্টি র‍্যাংকের বড় অংশ আত্মগোপনকারী পার্টি নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত রাজ্যকমিটিকে ভেঙে দিয়ে পি ও সি বসিয়ে দিল।

কলকাতা জেলা কমিটির অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মতো। পার্টি তহবিলে টাকা জমা পড়ছে না। কমতে কমতে সেটা গিয়ে মাসে পাঁচশ টাকায় ঠেকল। ঐ দিকে শুনি যে জেলেও প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বোসের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হয়েছে। এই ডামাডোলের মধ্যেও কলকাতা জেলা কমিটি বন্দীমুক্তি আন্দোলন করা স্থির করে। বক্তৃতা অনুবাদ করতে গিয়ে হেনস্থা হলেন গীতা মুখার্জী। শ্রোতাদের একাংশ সমানে গালমন্দ করতে থাকে গীতাকে।

পিতার মৃত্যুতে জ্যোতি বোস জেল থেকে প্যারোলে কয়েক ঘন্টার জন্য বাড়ি আসেন। মৃতকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একটা মালা হাতে গেলাম সেখানে। জ্যোতিবাবু জানতে চাইলেন খবর কি? বললাম এক পার্টি আর থাকতে পারছে না। জ্যোতি বোস বললেন, যাই হোক, পার্টি ভাঙা চলবে না।'

চারদিকের অবস্থা দেখে জ্যোতিবাবুর এই মন্তব্যে বীরেন রায় কিন্তু মোটেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

৯

পার্টি ভাঙার নির্দেশ বাইরের থেকে আসছে, এই অভিযোগ আনার সুযোগ পেয়ে গেল জাতীয় পরিষদের দক্ষিণপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। পার্টির মধ্যে মতানৈক্য যখন তুঙ্গে সেই সন্ধিক্ষণে প্রকাশিত হল ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডি এম আইদিতের প্রতিবেদন (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩)। আইদিত বলছেন, 'ডাঙ্গে চক্র আসলে নেহরুর গুপ্তচর এবং ভারতে নেহরু সাচ্চা কমিউনিস্টদের ধরবার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।' আইদিতের মতে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদীদের পুরোপুরি কব্জায় এবং সেখান থেকে সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিতাড়িত। অতএব বিতাড়িত সাচ্চা মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের বীরোচিত সম্বর্ধনা দানের জন্য ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট পার্টি সদা প্রস্তত।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির মতে, আইদিতের এ হেন বিবৃতি ভারতে পাল্টা পার্টি গড়ার আহ্বানের সামিল। ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট নেতার বিবৃতিকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘটনাটি বিশ্বের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে কার্যকরী সমিতি অবহিত করেন। তারই সঙ্গে পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের চীনা অথবা ইন্দোনেশিয়া পার্টি নেতৃত্বের পার্টি ভাঙার প্রকাশ্য আহ্বান সম্পর্কে সতর্ক করা হয়।

তার তিন সপ্তাহের মধ্যেই চীনা পার্টির বক্তব্য আত্মপ্রকাশ করে প্রখ্যাত সপ্তম মন্তব্যের' (Seventh Comment) মাধ্যমে। চীনা পার্টির সমর্থন যে পুরোপুরি বিরোধীদের দিকেই তাতে

কোনও আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই নিবন্ধে বলা হয়, 'মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি অনুগত সমস্ত বিপ্লবী কমরেডদের আমরা সমর্থন করি। আমাদের এই সমর্থন জানানোকে সি পি এস ইউ নেতারা বিভেদকামী বলে অভিহিত করে থাকেন। আমাদের মতে এটা নিছক সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য যেটা আমরা পালন করে থাকি।'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উক্ত নিবন্ধে স্থান পায় এক দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা। যথা, নেহরু সরকারের প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রতি সমর্থন, ১৯৬৩ আগস্ট মাসে বাড়তি কর বসানোর প্রতিবাদে বোম্বের হরতাল বানচাল করা, কলকাতায় কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তি আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি, উগ্র চীন বিরোধিতা ও নেহরু সরকারের সম্প্রসারণবাদী নীতির প্রতি ঢালাও সমর্থন।

উপসংহার টেনে বলা হয়, দলত্যাগী ডাঙ্গে চক্রের স্বরূপ পার্টির সাধারণ কর্মীদের কাছে পুরোপুরি উদ্ঘাটিত। তার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্রমবর্ধমান। তারা ক্রমশ বুঝতে পারছে যে ডাঙ্গে ও তার সাঙাৎরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় জাতির কলঙ্ক। তারা এখন পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে কৃত-সংকল্প। এই কমরেডরা ভারতীয় সর্বহারা ও ভারতীয় জনগণের সাচ্চা প্রতিনিধি ও একমাত্র ভরসাস্থল।

("Leaders of the CPSU are the greatest splitters of our times. Seventh Comment on the Open Letter of the CPSU of 14 July 1963" *Red Flag.* 4 Feb 1964)

ভারতের পার্টির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিবন্ধটিকে আনুষ্ঠানিক পার্টিভাগের প্রকাশ্য আহ্বান বলে চিহ্নিত করে। আরও বলা হয় যে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদতত্ত্বের একটি সুচারু নিদর্শন এই নিবন্ধটি এবং যারা চীনের পার্টির সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে সে সব পার্টিকে দু'টুকরো করার একটি নিন্দনীয় প্রয়াস।

আন্তঃপার্টি সংগ্রামে ইন্দোনেশিয় ও চীনা পার্টির প্রকাশ্য সমর্থন নিঃসন্দেহে বিরোধী গোষ্ঠীর র‍্যাংককে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবং পার্টি ভাঙার পথে মানসিক প্রতিরোধের শেষ বাধাটুকুও আর রইল না, কারণ পার্টি ভাঙাটাই এখন বৈপ্লবিক কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে গবেষক লেখক ভবানী সেনগুপ্ত লিখছেন, 'ভারতে নয় শুধু, চীন-সোভিয়েত বিরোধের জের হিসেবে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, মালয়েশিয়া ও সিংহলের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু। কারণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সদ্যমুক্ত দেশগুলির জন্য চীন বিপ্লবই সমাজ বিপ্লবের একমাত্র মডেল বলে ঘোষণা করেছেন। এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা। তারই ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ঢেলে সাজাতে তারা উদ্যোগী।'

ভারত প্রসঙ্গে তিনি দু'জন বিশিষ্ট গবেষকের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর গবেষণা গ্রন্থ, *Communism in Indian Politics*-এর প্রথম পরিচ্ছেদে। প্রথম জন হলেন হ্যারি গোলম্যান, যিনি মনে করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'চীন-সোভিয়েত রণক্ষেত্র'-এ পরিণত হতে বাধ্য। তার কারণ ভারতের পার্টির ইতিহাসে নিহিত। অতীতেও দেখা গেছে ভারতের পার্টির মধ্যে সোভিয়েত পার্টি ও চীন পার্টি উভয়েরই প্রভাব বারেবারে সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় জন, জন বি উড এই অভিমতকে বাতিল করে দিয়ে বলেন, আসলে পার্টির একাংশের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। নিজের দেশের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাঁদেরই এই মানসিকতার প্রাধান্য পেয়েছে পার্টির এক বড় অংশের মধ্যে। অপরাংশ অবশ্য পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কাঠামোয় নিজেরা একটু জায়গা পেলেই সন্তুষ্ট। তাঁরা সমাজবিপ্লবের কর্তব্য বুর্জোয়া সরকারের উপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

পার্টি বিভাজনের কারণ প্রসঙ্গে ভবানী সেনগুপ্ত মোটামুটি দ্বিতীয় অভিমতের সমর্থক।

১০

পার্টির ঐক্য এখন সুতোর ওপর ঝুলছে। গত তিরিশ বছর ধরে অগণিত পার্টিসদস্য ও সাধারণ মানুষের রক্ত অশ্রু ও শ্রমে গড়া পার্টির আসন্ন ভাঙনের মুখোমুখি হয়ে পার্টির বেশির ভাগ সদস্য মর্মাহত। অনৈক্যের উৎস কী? পার্টিতে ঐক্য ফিরিয়ে আনার পথে বাধা কীভাবে অপসারিত করা যায়? একজন কমিউনিস্টের জীবনের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন দুটির উত্তর খুঁজেছেন জেল থেকে সদ্যমুক্ত বাসবপুন্নায়া, সুন্দরায়া, গোপালন, মোহন পুনামিয়া ও আর পি স্রফ প্রমুখ সতেরজন নেতৃস্থানীয় কমরেড এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে।

১. পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ দীর্ঘ দিনের, বলা যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময় থেকে। বিতর্কের বিষয় ছিল মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের সঠিক শ্রেণীগত মূল্যায়ন।

পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক সংগ্রাম গড়ে তোলার সূত্রে আরও জটিল সমস্যা জড়ো হয়ে বিতর্কের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে।

২. দুর্ভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমসাময়িক বিরোধ দ্বন্দ্ববিদীর্ণ এ দেশের পার্টির নিজস্ব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধকে তীব্রতর করেছে। এই পটভূমিতে আন্তঃপার্টি ঐক্য গড়ে তোলার কাজ আদৌ সহজ নয়।

৩. সরকার ও একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদপত্র ধারাবাহিকভাবে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভেদ আনার জন্য তারা পার্টির একাংশকে চীনপন্থী ও অপরকে জাতিয়তাবাদী দেশপ্রেমিক তকমা এঁটে দিচ্ছে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের অব্যবহিত পরে ডি আই আর-এর বলে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এক হাজারের মতো কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর একবছর অতিক্রান্ত অথচ আজও চারশ কমিউনিস্ট বন্দীজীবন যাপন করছেন, সংবাদপত্রের মালিকরা মাঝে মাঝে কমরেড এস এ ডাঙ্গে প্রমুখ পার্টির নেতাদের কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের পরামর্শও দিয়ে থাকে। তাদের বিবেচনায় ওরা নাকি পিকিংপন্থী।

৪. অতএব আন্তঃপার্টি বিরোধের পরিধি সুবিস্তৃত। রাজনৈতিক তত্ত্বগত ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিরোধ তো রয়েছেই, উপরন্তু ঘরোয়া বিরোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিরোধের বিষয়বস্তুও মিলে মিশে একাকার।

৫. ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে পর পর দুবার মস্কোয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধ মীমাংসার জন্য বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলন থেকে ১৯৫৭ সালের পর ১২ পার্টির 'ঘোষণা' ও ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টির 'বিবৃতি' শীর্ষক দুটি ঐতিহাসিক দলিলের ব্যাখ্যা নিয়ে এমন তুমুল তত্ত্বগত রাজনৈতিক বাদানুবাদ সৃষ্টি হয় যার ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল ভিতই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

স্বভাবতই আমরা ভারতের কমিউনিস্টরা এই ঐতিহাসিক বিতর্কে উদাসীন দর্শক হয়ে থাকতে পারি না অথবা অন্ধভাবে সি পি এস ইউ বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারি না। অতএব আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি চাই এবং তার জন্যে চাই এক্ষুনি আন্তঃপার্টি সুসংগঠিত আলোচনা।

৬. এটা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন নয় যে আমাদের পার্টি আজ সমান দু'ভাগে বিভক্ত। অতএব হয় সি পি এস ইউ নয়তো চীনের পার্টি লাইন সমর্থন করার সিদ্ধান্ত ওপর থেকে তড়িঘড়ি চাপিয়ে না দিয়ে অবিলম্বে সংগঠিত করা দরকার আন্তঃপার্টি আলোচনা। আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে কোনো পার্টি বা নেতাবিশেষকে অভ্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবতে আমাদের কমরেডরা আর রাজি নয়। সেই আস্থা এখন একদম চুরমার। কিছু কমরেড মনে করেন, সি পি এস ইউ-অনুসৃত তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক লাইন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিপন্থী, সংশোধনবাদী লক্ষণাক্রান্ত; আবার কিছু কমরেডের মতে, চীনা পার্টির লাইন গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবাদের দোষে দুষ্ট। তাছাড়াও এমন অনেক কমরেড রয়েছেন যাঁদের মতে এ ধরণের প্রকাশ্য বিতর্ক ও উত্তপ্ত বাদানুবাদের ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। দিনের পর দিন বিতর্কের মান অমর্যাদাকর কোন্দলের স্তরে গিয়ে ঠেকছে দেখে তাঁরা বিমর্ষ বোধ করছেন। আর সাধারণ লোকের জিজ্ঞাসা : 'নতুন যুগের' তাৎপর্য কোথায় থাকে যদি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন দু'টুকরো হয়ে পড়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জনগণতান্ত্রিক চীনের মাঝখানে গড়ে ওঠে বিচ্ছেদের দেয়াল! এদিকে একচেটিয়া-বুর্জোয়া-পরিচালিত সংবাদপত্র জগৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থনের ভাণ করে ও চীনের প্রতি প্রকাশ্যে বিষোদগার করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চীন-সোভিয়েত বিরোধের কাহিনী পরিবেশন করে চলেছে। তার ফলে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি কেবল বেড়েই চলেছে।

অতএব আমাদের আন্তঃপার্টি আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সি পি এস ইউ (রুশ) অথবা চীনের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ্যে সমর্থন অথবা সমালোচনা করা অনুচিত হবে।

৭. চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করতে গিয়ে পার্টিতে তীব্র মতদ্বৈধ সৃষ্টি হয়েছে। অন্তত একটা বিষয়ে আমরা একমত যে এই সংঘর্ষের পরিস্থিতি ভারত ও চীন উভয় দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই সংঘর্ষের ফলে আফ্রো-এশীয় সংহতি ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন। অপর দিকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পোয়াবারো। আমরা নিশ্চয়ই এ বিষয়েও একমত যে এই বিবাদ নিরসনের একমাত্র সঠিক উপায় শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা। সামরিক পদ্ধতিতে সমাধানের প্রয়াস সংশ্লিষ্ট উভয় দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

৮. এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একমত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পার্টি এই দাবিতে জনমত গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়নি। বিগত চার বছর ধরে সীমান্তের উত্তেজক পরিস্থিতি ও

বিশেষ করে গত বছর অক্টোবর-নভেম্বরের পুরোদস্তুর সামরিক সংঘর্ষের ফলশ্রুতি স্বরূপ দেশের মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক শক্তি।

৯. এই পটভূমিতে পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত প্রশ্নে যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে, নিছক সাংগঠনিক পদ্ধতিতে তার সমাধানের চেষ্টা পার্টির মধ্যে মতবিরোধকেই কেবল বাড়িয়ে তুলবে ও তাতে পার্টি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে।

১০. পার্টির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হলে গত এক বছর ধরে জাতীয় পরিষদ যে সব সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব :

(ক) প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি ভেঙে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচিত রাজ্যপরিষদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(খ) যখন পাইকারি হারে গ্রেপ্তার চলছিল ১৯৬২ সালের সেই জরুরি অবস্থার সময় পাঞ্জাবে তাড়াহুড়ো করে এক বিশেষ প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবং তা থেকে এক নতুন রাজ্য কমিটিও নির্বাচিত হয়। এ বিষয়ে আর বিতর্ক না বাড়িয়ে যখন বেশির ভাগ বন্দী নেতারা ছাড়া পাবেন তখন যেন এক বিধিসম্মত সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়।

(গ) কমরেড গোপালন ও সুন্দরায়া প্রমুখ নেতাদের আচরণ সংক্রান্ত যাবতীয় তদন্তকার্য বন্ধ করা হোক এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনকে এ জাতীয় কার্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হোক।

১১. পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের ভিত্তি স্বরূপ বেজওয়াদা কংগ্রেস যে সদস্য তালিকার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাকেই গ্রহণ করা হোক। কারণ উক্ত তালিকা সর্বজন-সম্মত ছিল। সমস্ত পার্টি সদস্যকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পার্টি সভ্যপদ পুনর্ণবীকরণের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং যে সব জায়গায় এখনও দমন পীড়ন চলছে, সে সব ক্ষেত্রে পুনর্ণবীকরণের সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে।

১৪-১৯ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের সভায় এই প্রতিবেদন উপস্থাপিত করা হয়।

জাতীয় পরিষদের সতেরজন সদস্যের প্রতিবেদনের জবাবে ডাঙ্গে লেখেন, এই সতেরজন কমরেডের বক্তব্য থেকে মনে হয় পার্টি আর অখণ্ড নেই—যেটুকু আনুষ্ঠানিক ঐক্যের অস্তিত্ব রয়েছে তাও ক্ষীণ সুতোয় ঝুলছে। এ বিষয়ে জাতীয় পরিষদও অবহিত যে পার্টির ঐক্য সত্যিই বিপন্ন। গত সভা থেকেই তার সূচনা। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে একটি সমান্তরাল পার্টি কেন্দ্র ইতিমধ্যেই সক্রিয়। এবং তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমরেডদের খুঁজে বার করার জন্য কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনকে বলা হয়েছে। আমাদের স্বীকার করতে কোনোও দ্বিধা নেই যে ভারতের ও বিশ্বের পরিস্থিতি বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসের পর বদলে গিয়েছে এবং এই বেজওয়াদায় গৃহীত বিচার বিশেষণগুলির পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক।

এই সতেরো জনের দলিলের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা অনেক কিছু সংখ্যা-গরিষ্ঠের কাছে দাবি করেছেন, কিন্তু একবারও নিজেদের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন নি।

অতএব আমরা তাঁদের ও তাঁদের সমর্থকদের কাছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখছি :

১. যে পার্টির তাঁরা নিজেরাও সদস্য সেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টি বলে স্বীকার না করে নিছক চক্র বলে কুৎসা রটাচ্ছে— তাঁরা কি তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করতে রাজি আছেন?

২. বর্তমান নেতৃত্ব ও তার অনুগামীরা, গ্রেপ্তার করার জন্য পার্টিসভ্যদের তালিকা পুলিশের কাছে তুলে দিয়েছে বলে যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের কি তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করবেন?

৩. আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে মতবিরোধের পর চীনের পার্টি যখন ভারত সহ পৃথিবীর সব দেশের তথাকথিত 'সাচ্চা' কমিউনিস্টকে তথাকথিত 'ঝুঠা' কমিউনিস্টদের থেকে আলাদা হবার জন্য ডাক দিয়েছে—তাকে তাঁরা নিন্দা করতে রাজি আছেন?

৪. পার্টির পত্র পত্রিকার সমান্তরাল যে সব পত্র-পত্রিকা তাঁরা দেশ জুড়ে বার করেছেন—যেখানে পার্টির সরকারি লাইনের বিরোধী বক্তব্য ছাপা হচ্ছে—সেগুলি বন্ধ করতে কি তাঁরা রাজি আছেন?

সংক্ষেপে সরাসরি বলতে গেলে প্রশ্ন এই, তাঁরা কি সত্যিই ঐক্য চান না ঐক্যের নামে চালাকি করছেন? আমরা ধরেই নিচ্ছি তাঁরা সত্যই পার্টির ভাঙন রোধ করতে চান। যে সব ব্যবস্থার কথা তাঁরা প্রস্তাব করেছেন বাস্তবে সে সব কিন্তু বিপরীত ফল প্রসব করবে।

সতেরজনের দলিল জাতীয় পরিষদের সভায় ভোটাধিক্যে বাতিল হয়। ডাঙ্গের উত্তর সহ দলিলটি পার্টির সদস্যদের অবগতির জন্য প্রচারিত হয়। পরের দফায় ১৯৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি কার্যকরী সমিতির সভায় জ্যোতি বসু, রামমূর্তি, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, মোহন সিং যোশী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুন্দরায়া, বাসবপুন্নায়া প্রমুখ কার্যকরী সমিতির এগারজন সদস্য নতুন করে পার্টির সরকারি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ উত্থাপন করেন।

তাঁরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঐক্যের ডাকে সাড়া দেননি। পার্টি ঐক্য যে কতখানি বিপন্ন তা তাঁদের উপলব্ধির বাইরে। পার্টি ঐক্যের স্বার্থে নয়, উপদলীয় দৃষ্টিভঙ্গিই পার্টি চেয়ারম্যানের জবাবের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে অনুমিত হয় পার্টি ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে পার্টি ভাঙার জন্যই যেন তাঁরা বদ্ধপরিকর। প্রমাণস্বরূপ কতকগুলি উদাহরণ :

১. অন্ধ্রে বর্তমান নেতৃত্ব সুন্দরায়া, বাসবপুন্নিয়া, হনুমন্ত রাও, নাগি রেড্ডি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্ধ্রের ছাত্র ফেডারেশন ভেঙে পাল্টা ছাত্র ফেডারেশন গড়া হয়েছে।

কমরেড রাজেশ্বর রাও-এর নামে অনুমোদিত পার্টি দলিল পার্টির এক বিশেষ অংশের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।

২. পাঞ্জাবে কারারুদ্ধ কমরেডরা মুক্তি পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে একত্র বসে কী করে ঐক্যবদ্ধভাবে পার্টির কাজকর্মের প্রসার ঘটানো যায় এই আলোচনার পরিবর্তে রাজ্য পার্টি সম্পাদক কমরেড সুরজিৎ ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেশরাজ চাড্ডার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩. 'বি. টি. আর. জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে একজন কমরেডের সদস্যপদ সাময়িকভাবে খারিজ করা হয়।

৪. দিল্লীতে একটি মহল্লায় দেওয়ালী অনুষ্ঠানে কমরেড এ কে গোপালনকে প্রধান অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। দিল্লীর রাজ্য কমিটি গোপালনকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বারণ করার প্রস্তাব নিয়েছে।

৫. এক তামিল সাপ্তাহিকের সম্পাদক কমরেডকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কত পার্টি কমরেডই তো কত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন এবং সে সব কাগজে পার্টির গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে লেখালেখি হয়ে থাকে। তাঁদের কাউকে কিছু বলা হয় না। অথচ এই একজন মাত্র কমরেডকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য বাছাই করা হল। পার্টির মুখপত্র *নিউ এজ* তো আর দলের মুখপত্র নয়, এক গোষ্ঠী বিশেষের মুখপত্র।

৬. জলন্ধর ও বোম্বেতে পার্টি-স্কুলে পার্টির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে পার্টি চেয়ারম্যান পার্টির পুরো অতীতকেই প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এমনকি কয়েকজন নেতা এবং বিশেষ করে কমরেড ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও তিনি ছাড়েননি। পার্টির ঐক্য রাক্ষা করতে চান যিনি, তাঁর মতো দায়িত্বশীল নেতার পক্ষে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কি বাঞ্ছনীয়?

৭. কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে পার্টি নেতৃত্বে সত্যিকারের বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে চাওয়া হয়নি।

৮. কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বাত্মক ঐক্যের লাইন ক্রমশ কার্যকর করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাদে তিনটি উপনির্বাচনের প্রত্যেকটিতেই কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানানো হয়েছে। এই সূত্রে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী কংগ্রেসের কাছ থেকে এমনকি অর্থ সংগ্রহের অধিকার পর্যন্ত কমরেডদের দিয়েছেন।

৯. পার্টি চেয়ারম্যান, ড. আমেদ ও কমরেড সরদেশাই প্রমুখ কমরেডরা বহুক্ষেত্রে পার্টির স্বীকৃত নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছেন। পার্টি নেতৃত্বের প্রশ্রয় পেয়ে পার্টি সদস্যরা নানা পত্র-পত্রিকায় পার্টির স্বীকৃত নীতির বিরুদ্ধে লেখালেখি করে থাকেন। *মেন স্ট্রীম* কাগজেও বিভিন্ন পার্টি কমরেডের লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ হেন *মেন স্ট্রীম*-এ ১৯৬২ সালের নভেম্বরে মন্তব্য প্রসঙ্গে জল্পনা করা হয় : কেন জ্যোতি বসুকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বক্তৃতা ও বিবৃতিদানের জন্য জেলের বাইরে রেখেছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে কোন পার্টি সদস্য *লিঙ্ক* কাগজের সাথে সংশ্রব রাখবেন না। অথচ *লিঙ্ক* -এর বার্ষিক সংখ্যায় পার্টি চেয়ারম্যানের বাণী ছাপা হয়েছে।

অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ। এই বাতাবরণে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল প্রখ্যাত 'ডাঙ্গের চিঠি'র আকার নিয়ে। এ প্রসঙ্গে রণেন সেন লিখছেন, 'বাম কমরেডদের একজন প্রচণ্ড সমর্থক কমরেড দ্বিজেন নন্দী, তিনি এই সময় সরকারী মহাফেজখানায় কিছু গবেষণার কাজ করছিলেন। তিনি একটা চিঠি বহু পুরাতন সরকারী ফাইল (কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র) থেকে আবিষ্কার করেন। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'যদি আমার কথা বিবেচনা করা হয় তো আমি তোমাদের সাহায্য করতে রাজী।' তলায় সই শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে। ডাঙ্গে বলেন, চিঠিটি জাল ও তাঁর লেখা নয়। রাজেশ্বর রাও, জ্যোতি বসু সমভিব্যাহারে মহাফেজখানায় দলিলটি দেখেন। রাও বলেন ওটি জাল, বসু বলেন সঠিক। আমিও কয়েকজন পরিষদ সদস্যের সঙ্গে চিঠিটি পরীক্ষা করে বলি যে একমাত্র হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ সঠিক বলতে পারেন না।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮)।

সীতাপুর জেল থেকে বৃটিশ ভাইসরয়কে লেখা চিঠিখানির মর্মবস্তু : কমরেড এস. এ. ডাঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তি চেয়েছেন। এই চিঠির নকল বোম্বাই থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *কারেন্ট* কাগজে ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর সব ইস্যু তলিয়ে গেল। 'ডাঙ্গে চিঠি' হয়ে দাঁড়াল পার্টি ভাগের কেন্দ্রবিন্দু। রণেন সেন লিখছেন, 'বামপন্থী কমরেডরা প্রকাশ্যে বলেন যে ডাঙ্গের মতো ব্রিটিশ এজেন্টদের সঙ্গে এক পার্টিতে থাকা সম্ভব নয়।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮)

প্রসঙ্গত, ৬ আগস্ট ১৯৬৪ *ফ্রি প্রেস* জার্নাল-এর একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এস. মিরাজকর বলেন, ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ গভর্মেন্টকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাঙ্গে তদানীন্তন লাট সাহেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা সত্যি ঘটনা। পার্টি ঐক্য রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে তিনি এ সম্পর্কে গত চল্লিশ বৎসর চুপচাপ ছিলেন। (*গণশক্তি*, ১৫ আগস্ট ১৯৬৪)

শেষ পর্যন্ত, অবনী লাহিড়ীর মতে, 'ভারতবর্ষে split-টা কিন্তু personal issue-তে দাঁড়িয়ে গেল। রাজনীতিগত ভাবে ভূপেশ গুপ্ত ছিলেন অপরপক্ষে, কিন্তু রয়ে গেলেন সি পি আই এ। ভূপেশ যেখানে সরকারী লাইনের critic, সেক্ষেত্রে রামমূর্তি 200% supporter এবং তিনি গেলেন সি পি আই (এম)-এ। ভূপেশ আর ই এম এস-এর ভূমিকা ছিল পার্টিকে এক রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গে-কে নিয়ে পার্টি ভাগের সূত্রপাত। ডাঙ্গে যদি involved না হতেন তা হলে পার্টি ভাগের major ground ই থাকত না। যে ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভা থেকে বত্রিশ জনের ওয়াক আউট আর পার্টি সত্যি ভাগ হয়ে গেল, সে সময় দিল্লীতে বাংলার নেতাদের আমার বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিলুম। এসেছিল ভূপেশ গুপ্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জি, সরোজ মুখার্জি ও নিরঞ্জন সেন। হঠাৎ শুনি চেঁচামেচি হচ্ছে। শুনতে পেলাম জ্যোতি বোস বলছেন, I shall not touch a party led by a police agent.'

ডাঙ্গে অবশ্যি এই অভিযোগের জবাবে বলেছেন, চিঠিখানা জাল। জাল না আসল এই প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ মীমাংসা বোধহয় সেদিন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ ও দুই রাজনৈতিক মেরুতে বিভক্ত পার্টির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই গুরুতর অভিযোগ বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য—প্রশ্নটির কেন্দ্রমূলে রাজনীতি। যাঁরা ডাঙ্গের রাজনীতির সমর্থক তাঁদের দৃষ্টিতে চিঠিখানি বিরোধীদের কুৎসা রটনার একটি হাতিয়ার মাত্র আর পার্টি ভাঙার চক্রান্তেরই অঙ্গ। প্রতিপক্ষের কাছে ডাঙ্গে তো পার্টিতে শোধনবাদী রাজনীতির প্রতীক। তাছাড়া একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি—যার জায়গা কমিউনিস্ট পার্টিতে হওয়া উচিত নয়। ডাঙ্গের চালচলন-জীবনযাত্রা নিয়ে নানা প্রশ্ন সাধারণ কমরেডদের মনে। সমসাময়িক আর একটি অভিযোগ ডাঙ্গের বিরুদ্ধে : দিল্লীর *পেট্রিয়ট-লিঙ্ক* গোষ্ঠীর পত্রিকার শেয়ার তিনি কিনলেন কী ভাবে?

ডাঙ্গের চিঠি নিয়ে বিরোধীরা পার্টিগত তদন্তের প্রস্তাব আনলেন। এ বিষয় আলোচনার জন্য কার্যকরী সমিতির বৈঠক ডাকা হল ৯ এপ্রিল। বিরোধীদের দাবি : ডাঙ্গে যেন সভা পরিচালনা না করেন। এ দাবি যদিও অযৌক্তিক নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত রেষারেষির উত্তপ্ত বাতাবরণে ঐ দাবি অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ডাঙ্গে-বিরোধীদের সভাস্থল ত্যাগ। যাঁরা ওয়াক আউট করেন তাঁদের অন্যতম ভূপেশ গুপ্ত।

১১ এপ্রিল ১৯৬৪। ঠিক দুদিন পরে জাতীয় পরিষদের সভা একই বিষয় নিয়ে এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান বত্রিশজন পরিষদ সদস্য যাঁরা আর কোনদিন

ফিরে আসেননি। অবশ্যি এই বত্রিশ জনের মধ্যে ভূপেশ গুপ্ত ছিলেন না এবং এরই সাথে পার্টি ভাগ সমাপ্ত.

সেদিনের কথা মনে করে রণেন সেন লিখছেন, 'তুমল হৈ হট্টগোলের মধ্যে জাতীয় পরিষদের সভা এন. এম. যোশী হলে হয়। সে সভাকক্ষ থেকে ৩২ জন পরিষদ সভ্য সুন্দরাইয়া প্রভৃতির নেতৃত্বে বের হয়ে যান। আমি. ভূপেশ, ওয়াই, ডি. যোশ, হীরেন মুখার্জি (তিনি আমাদের মতের সমর্থক ছিলেন) সভা ত্যাগ করি না।

কমরেডদের এত দুঃখ, কষ্টবরণ, অনাহার ও জেলভোগ, আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের ফলে নির্মিত ও সংগঠিত পার্টি দুভাগ হয়ে গেল। আমরা কিছু লোক স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়ে সভায় বসে থাকলাম।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮)

১১

'ডাঙ্গে চক্রকে অস্বীকার করুন' পার্টি সভ্যদের প্রতি আহ্বান জানালেন জাতীয় পরিষদের বত্রিশ জন সদস্য। তারই সঙ্গে সূচিত হল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুন এক অধ্যায়।

জাতীয় পরিষদের বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসা ৩২ জন নেতা ১৪ এপ্রিল ১৯৬৪ এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, ডাঙ্গে এবং ডাঙ্গের সমর্থকদের বিভেদমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ও তাঁদের সংস্কারবাদী রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এবং পার্টি ইউনিটগুলির নিকট আমাদের আহ্বান—ডাঙ্গে এবং তার গোষ্ঠীকে অস্বীকার করুন, কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের তাঁদের সংস্কারবাদী রাজনৈতিক লাইনকে অগ্রাহ্য করুন, সাজানো পার্টি কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের বিভেদমূলক প্রস্তুতিকে, জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ডাঙ্গের সন্দেহপূর্ণ কার্যকলাপের চিঠি সংক্রান্ত অভিযোগকে চুনকাম করার প্রচেষ্টাকে বরবাদ করুন।' যদি ডাঙ্গে গোষ্ঠী তাঁদের পার্টি বিরোধী সাংগঠনিক কাজ কর্মের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এবং আমাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষ আন্তঃপার্টি আলোচনাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করে এবং প্রকৃত পার্টি সভ্যদের প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেয় তাহলে পার্টির গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে সফল করতে সমর্থন ও সহযোগিতা আমরা করতে পারি। কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলী ও তার সমর্থকরা যদি তাঁদের মনোভাবে অবিচল থাকেন, তাহলে সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহ্বানে আমাদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য সমগ্র পার্টি সদস্যদের কাছে আমরা আবেদন জানাব। বিপ্লবী ঐতিহ্যকে বর্জন করার ডাঙ্গেদের যে চরিত্র এবং চরিত্রানুগ সংশোধনবাদী বিভেদমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই সপ্তম কংগ্রেস হবে সংগ্রামের কংগ্রেস।'

ওয়াক -আউটকারী জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য হলেন :

অন্ধ্র : (১) পি সুন্দরায়া (২) এস বাসবপুন্নায়া (৩) টি নাগী রেড্ডি (৪) এম হনুমন্তরাও (৫) ভেঙ্কটেশ্বর রাও (৬) এন প্রসাদ রাও (৭) জি বাপান্নায়া।

কেরল : (৮) ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, (৯) এ কে গোপালন (১০) এ ভি কুন্তাবু (১১) সি এইচ কানারন (১২) ই কে নায়নার (১৩) ভি এস অচ্যুতানন্দ (১৩) ই কে ইম্বেচীবাবা।

পশ্চিমবঙ্গ : (১৫) প্রমোদ দাশগুপ্ত (১৬) মুজফ্ফর আহ্‌মদ (১৭) জ্যোতি বসু (১৮) আবদুল হালিম (১৯) হরেকৃষ্ণ কোঙার (২০) সরোজ মুখোপাধ্যায়।

তামিলনাড়ু ঃ (২১) পি রামমূর্তি (২২) এম্ আর ভেঙ্কটরমন (২৩) এম সাঁকারিয়া (২৪) কে রমানী।

পাঞ্জাব ঃ (২৫) এইচ্. এস্. সুরজিৎ, (২৬) জগজিৎ সিং লয়ালপুরী, (২৭) ডি. এস্. তপিয়ালা, (২৮) ভাগ সিং, ডাঃ।

উত্তরপ্রদেশ : (২৯) শিউ কুমার মিশ্র, (৩০) আর. এম. উপাধ্যায়

রাজস্থান ঃ (৩১) মোহন পুনামিয়া

জম্মু-কাশ্মীর ঃ (৩২) আর. পি. স্রফ

বত্রিশজনের আহ্বান আসলে পাল্টা পার্টি করার আহ্বান। পশ্চিম বাংলা, কেরল, অন্ধ্র ও পাঞ্জাবে এই আহ্বানে উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলেছে এবং দেখা গেল ঐ সমস্ত রাজ্যে পার্টি সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিরোধী নেতাদের ডাকে সামিল। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় পাল্টা পার্টি গড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বেশ কিছু কাল আগে। ১৯৬৩ সালের ১৬ আগস্ট প্রকাশিত হয় *দেশহিতৈষী* এবং ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হয় বন্দী মুক্তি ও গণদাবী আন্দোলনের প্রস্তুতি কমিটি। অর্থাৎ নতুন পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র ও গণ-আন্দোলনের মঞ্চ উভয়ই প্রস্তুত। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এ প্রসঙ্গে সুধাংশু দাসগুপ্ত লিখছেন,

'আমাদেরই প্রচেষ্টায় ১ লা সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) মুস্লিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হলো একটি গণতান্ত্রিক কনভেনশন। সেই কনভেনশন থেকে রণধ্বনি উঠল, 'বন্দীমুক্তি ও গণদাবির ভিত্তিতে এক হও।' গঠিত হলো বন্দীমুক্তি ও গণদাবি আন্দোলনের প্রস্তুতি কমিটি।'

২৮ সেপ্টেম্বর খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কল্পে, জরুরি অবস্থার অবসান, রাজবন্দীদের মুক্তি ও অন্যান্য আশু গণতান্ত্রিক দাবিতে মনুমেণ্ট ময়দানে এক প্রকাশ্য সমাবেশ।

হাসপাতাল থেকে কমরেড মজফ্ফর আহ্‌মদ সমাবেশকে সফল করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি লিখলেন, 'আমি একান্তভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যে কলকাতার ও আশেপাশের জিলাগুলির মানুষ হাজারে হাজারে ২৮ শে সেপ্টেম্বর সমাবেশে যোগদান করুন। ওখানেই হবে কাজের শুরু। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' যে একটি কবিতা লিখেছিলেন তার দুটি পংক্তি আজ আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি।

"আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পেছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

ভবানী সেনের সেক্রেটারিয়েট ২৮শে সেপ্টেম্বরের সমাবেশকে চীনাপন্থীদের সমাবেশ বলে অভিহিত করে কুৎসা রটনা করেছিল। কিন্তু তাদের কুৎসার জবাব দিয়েছিল ২৮ সেপ্টেম্বরের সমাবেশে লক্ষাধিক জনতা। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন কমরেড নারায়ণ রায় আর

ভাষণ দিয়েছিলেন কমরেড এ. কে. গোপালন।

এই সমাবেশে চীনাপন্থীদের সমাবেশ ইত্যাদি কুৎসার জবাবে কমরেড গোপালন বলেছিলেন,

'এই বিশাল জনসমুদ্রের জোয়ারে মিথ্যা ভেসে গিয়েছে, পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী জনগণ যে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন এই সমাবেশ তার প্রমাণ।' (*আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে*, পৃ. ১২৯ - ৩০)

পশ্চিম বাংলার পার্টি সদস্যদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন 'কাকাবাবু'—কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফার আহ্‌মদের সমর্থন যেদিকে, সেদিকে অবশ্যই পাল্লা ভারি হওয়ার কথা। বত্রিশজন স্বাক্ষরকারীর তালিকায় 'কাকাবাবু'-র নাম অনেককে এদিকে টেনে এনেছিল। যাঁরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলছিলেন তাঁদের পক্ষেও মনস্থির করতে অসুবিধে হল না। তাঁরা 'কাকাবাবু'র দলে যোগ দিলেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পার্টির রাজ্য পরিষদ রয়েছে বিরোধীদের দখলে।

২১ মার্চ (শনিবার) ১৯৬৪, সরোজ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র *গণশক্তি*। ২৫ এপ্রিল *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় নিবন্ধে বত্রিশ জন নেতার আহ্বানকে স্বাগত জানান হল।

সম্পাদকীয়

'কমিউনিস্ট পার্টির ৩২ জন সর্বভারতীয় নেতা পার্টির সাধারণ সভ্য ও দরদীদের প্রতি এক আহ্বান জানাইয়াছেন। এই আহ্বান পার্টির ভিতরে কংগ্রেসের সহিত সাধারণ সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ার সংস্কারবাদী রাজনৈতিক লাইনকে পরাস্ত করার আহ্বান।

এই আবেদন কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতেছে। এই আবেদনে বিপুল সংখ্যক পার্টি সভ্য ও দরদী সমর্থন জ্ঞাপন করিলে কমিউনিস্ট পার্টি আরও শক্তিশালী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। অসংখ্য শহীদের মহান আত্মদান ও জনগণের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে তাকে আরো শক্তিশালী করিয়া তোলা ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরা আজ প্রতিটি সৎ ও সাচ্চা কমিউনিস্ট এবং গণতান্ত্রিক মানুষের কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেন এই আবেদন? শ্রী ডাঙ্গের পত্রাবলী সম্পর্কে তাঁহার সন্দেহজনক আচরণকে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা চলিয়াছে। বিগত জাতীয় পরিষদের সভায় বৃটিশকে সেবা করার প্রতিশ্রুতিতে কারামুক্তির জন্য শ্রী ডাঙ্গের যে সকল চিঠিপত্র ভারতের মহাফেজখানা হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সে সম্পর্কে জাতীয় পরিষদে সুস্থ আলোচনা ও সুষ্ঠু তদন্ত অনুষ্ঠানের গুরুতর বিষয়টিকে ডাঙ্গে ও তাঁহার অনুগামীরা পার্টির ভিতরে তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের আঘাত করার কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মর্যাদা রক্ষার জন্য নিম্নতম কর্তব্যটুকুও তাঁহার সমাধা করিতে বাধা দেন। জাতীয় মহাফেজখানায় শ্রী ডাঙ্গের চিঠি বলিয়া কথিত পত্রাবলীর অস্তিত্ব তর্কাতীত বিষয়। অভিযোগ হইল পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী ডাঙ্গের বিরুদ্ধে, আর সাজা দেওয়া হইল জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্যকে। কারণ তাঁহারা দাবি করিয়াছেন — এই প্রশ্নটি সর্বপ্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন এবং এই আলোচনার সময় তাঁহাকে সভাপতির আসন খালি করিয়া দিতে হইবে। ডাঙ্গে ও তাঁহার অনুগামী সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ ইহাতে বাধা দেন এবং কংগ্রেস কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্ট গঠনের

সংশোধনবাদী রাজনৈতিক লাইনের বিরোধী সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নটি তাঁহারা ইহার সহিত জড়িত করিবার চেষ্টা করেন। শ্রী ডাঙ্গের প্রতি অন্ধ আস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ জাতীয় পরিষদে ডাঙ্গের সমর্থকদের মধ্যে এতই প্রবল হইয়া উঠে যে তাঁহারা কিছুতেই উপরিউক্ত দাবি মানিতে স্বীকৃত হলেন না। ইহাতে পরিষদের এই সকল সদস্যদের রাজনৈতিক চরিত্র খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। কাজে কাজেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষার পথ নিধারণের জন্য সাধারণ পার্টি সভ্যদের নিকট আবেদন করা ছাড়া এই বত্রিশজন কমিউনিস্ট নেতার আর কোনও পথই ছিল না।

সমগ্র পার্টির ভিতরে শ্রী ডাঙ্গের চক্রের এই রাজনৈতিক আচরণ ও কৌশলকে পরাস্ত করিবার ও শ্রী ডাঙ্গে নেতৃত্বকে অস্বীকার করিবার জন্য ব্যাপক অভিযানের জরুরী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গণ আন্দোলন ও জন জীবনের সংগ্রাম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের দুর্নীতি ও ক্লেদ দূরীকরণের কাজ আজ অঙ্গাঙ্গী কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা আশা করি, কমিউনিস্ট পার্টির এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সাধনে সকলে আগাইয়া আসিবেন।'

২রা মে *গণশক্তি-র* পাতায় প্রকাশিত হয় রাজ্যে রাজ্যে 'ডাঙ্গে চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের' খবর। (বিশেষ প্রতিনিধি) :

পশ্চিম বাংলা, কেরালা, অন্ধ্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ডাঙ্গে চক্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী ভিত্তিতে গড়িয়া তোলার অভিযান শুরু হইয়াছে। গত দশদিন ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে পার্টি সভ্যদের সাধারণ সভা ও জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডাঙ্গে-চক্রের কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যের রাজনৈতিক লাইন ও বিভেদপন্থী সাংগঠনিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আলোচনা চলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে

গত ২৩শে, ২৪শে, ও ২৫শে এপ্রিল যথাক্রমে হাওড়া, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা জেলার পার্টি সভ্যদের তিনটি সভায় উপস্থিত যথাক্রমে সতের শত, নয় শত এবং দুই হাজার। বক্তা ঃ পি. রামমূর্তি।

আগামী পনের দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পার্টি সভ্য ও দরদীদের মধ্যে এই অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজ্যপরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন।

কেরালায়

ই. এম. এস ও এ. কে. গোপালন সহ কেরালার যে ছয়জন সদস্য ৩২ জনের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা কেরালা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পার্টি সভ্য ও জনসাধারণের সভা আহ্বান করিয়া ডাঙ্গে চক্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতেছেন। ইতিমধ্যে কালিকট, ক্যামানোর, আলেপ্পী প্রভৃতি জেলার জেলা-পরিষদ ৩২ জনের আবেদনপত্র অনুমোদন করিয়াছেন।

অন্ধ্রে

সুন্দরাইয়া, নাগী রেড্ডী, হনুমন্তরাও প্রমুখ নেতৃবর্গ বিভিন্ন জেলায় ডাঙ্গে চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছেন। অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬৪টি সভা। গুন্টুর, খামাম, কুর্নুল, নিজামাবাদ

প্রভৃতি জেলা-পরিষদের সভায় এবং বিজয়ওয়াদা শহর কমিটির সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে ৩২জনের আবেদন পত্র অনুমোদিত। কোন কোন জেলায় এবং এলাকায় শতকরা ১০০ জন পার্টি সভ্য সমর্থন জানিয়েছে।

পাঞ্জাবে

হরিকিষেণ সিং সুরজিৎ, জগজিৎ সিং, লায়ালপুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে রোটক, মহিন্দর গড়, পাতিয়ালা, আম্বালা, হিসার জেলার লুধিয়ানা শহরের পার্টি সভ্যদের সহিত সভা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই সব জেলার শতকরা ৯৫ জন পার্টি সভ্য ডাঙ্গে চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে প্রস্তুত।

২রা মে *গণশক্তি*র প্রধান সংবাদ শিরোনাম : ডাঙ্গে গ্রুপের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের আহ্বান—

ডাঙ্গে গ্রুপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের আহ্বান
(বিশেষ প্রতিনিধি)

'কলিকাতায় বিগত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সভা হইতে রাজ্যের পার্টি সভ্য ও দরদীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলা হইয়াছে : ডাঙ্গে গ্রুপের বিভেদপন্থী সাংগঠনিক লাইন এবং শ্রেণী সমন্বয় সাধনের রাজনৈতিক লাইনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে শক্তিশালী সংগঠন রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ৩২ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের আবেদনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া আবেদনে বর্ণিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য রাজ্যের সমস্ত পার্টি শাখার প্রতি রাজ্যপরিষদ আহ্বান জানাইতেছেন।'

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদ বত্রিশজন সদস্যের আবেদনের প্রতি সমর্থন জানানর আহ্বানের পর পার্টি দু'টুকরো হয়ে গেল। *গণশক্তি*-র সংবাদ সূত্রে জানা যায় একের পর এক জেলা পরিষদ ও পার্টি ইউনিট এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার পার্টি সদস্যরা দলে দলে সামিল হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ৩০ এপ্রিল ২৪ পরগণা জেলা পার্টির সম্পাদক খগেন রায় চৌধুরী ৩২ জনের আবেদন পত্রের সমর্থনসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করলে, তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একই দিনে হাওড়া জেলা পরিষদ এবং ২ মে, হুগলী জেলা পরিষদ রীতি মতো সভা করে বত্রিশ জনের আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

গণশক্তি-র সংবাদসূত্রে আরো জানা যায়, ২রা মে, বর্ধমান টাউন হলে সদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমার পার্টি সদস্যদের সাধারণ সভা থেকেও একই মত ব্যক্ত হয়েছে।

৩রা মে বরানগর, ৪ঠা মে আসানসোল ও আন্দুল, ৫ মে মহেশতলা এবং ৬ই মে নবদ্বীপে পার্টি সভ্যদের সাধারণ সভা থেকে বত্রিশজনের আবেদনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

তাছাড়াও অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের পার্টি সভ্যদের সাধারণ সভা

থেকে; যেমন ২২ এপ্রিল ঘাটাল, ২রা মে ডায়মণ্ডহারবার, ১৯ এপ্রিল পানিহাটি লোকাল কমিটির পূর্ব নাটাগড়শালা, ২৯ এপ্রিল, নদীয়া জেলার কাষ্ঠডাঙ্গা ও নগর উখরা শাখা।

রাজ্য পরিষদ - জেলা পরিষদ - লোকাল কমিটি- পার্টিশাখা— দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায় পার্টি সংগঠনের প্রতিটি স্তর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পার্টি ভাঙার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পার্টি সভ্যরা যেন দলে দলে পার্টি সংগঠনের প্রচলিত নিয়ম শৃঙ্খলা অমান্য করে বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। যে আচরণ সাধারণ সময়ে ঘোরতর নিন্দনীয়, বর্তমান সময়ে অভিনন্দনযোগ্য। কারণ পার্টি ভাঙাটাই এখন বৈপ্লবিক কর্তব্য।

পার্টি সভ্যদের অনুরূপ সাধারণ সভার খবর ১৬ মে *গণশক্তি*-র সংবাদসূত্রে আরও পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে, কলকাতা পার্টির তিরিশটি শাখা জাতীয় পরিষদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শাখাগুলির নাম দক্ষিণ বড়তলা, বাগবাজার, ১৭ নং ওয়ার্ড, ৩ নং শাখা (চিৎপুর), ৩৬ নং শাখা, ৮০ নং শাখা, জোড়াবাগান, উত্তর বড়তলা, ৮ নং শাখা, ৭ নং শাখা, পাইওনীয়ার শাখা, ৯ নং ওয়ার্ড, জোড়াসাঁকো, ৫০ ও ৫১ নং, ৪৫ ও ৬৪ নং, পাইকপাড়া, কুমারটুলি, ৪৩ নং ওয়ার্ড, ৪৪ নং ওয়ার্ড, ৩০ নং ওয়ার্ড, বেলগাছিয়া শাখা, চৌরঙ্গী শাখা, ৭৭ নং ওয়ার্ড, ৪২ নং ওয়ার্ড, পার্ক সার্কাস শাখা, ৬৭ নং শাখা, ৫৬ নং ও ৫৮ ওয়ার্ড ব্রাঞ্চ কমিটি।

তাছাড়া ১৩ মে বেহালা আঞ্চলিক কমিটির বর্ধিত সভা থেকে বত্রিশজনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

একই ধরণের সভা ও একই প্রস্তাব পাশের খবর আসছে কলকাতার বাইরে নানা জায়গা থেকে। *গণশক্তি*-র সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ১৬ মে দার্জিলিং জেলার পরিষদ, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বীজপুর লোকাল কমিটি (১৬ মে), রাজারহাট লোকাল কমিটি (২০ মে) এবং বাগুইআটি ব্রাঞ্চ (২৪ মে)। বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্ব মঙ্গলকোট ব্রাঞ্চ (১২ মে)। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটাল থানার সমস্ত ব্রাঞ্চ (১৬ মে), পুলশিঠা শাখা (১৪ মে)। হাওড়ার অন্তর্গত আন্দুল, পানিয়াড়া, দুইল্যা, মৌড়ী প্রভৃতি ব্রাঞ্চ ও সাঁকরাইল লোকাল কমিটি। হুগলীর অন্তর্গত সিঙ্গুর থানা লোকাল কমিটি, উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, হিন্দমোটর ও কোতরং ব্রাঞ্চের যুক্ত সভা, ভদ্রেশ্বর লোকাল কমিটি, বাগাঠি খলিসানি ইউনিয়ন ব্রাঞ্চ, শ্রীরামপুর চাতরা, গুরাপ, খেজুরদহ, সোমসপুর, ভাণ্ডারহাটি ও দশঘরা ব্রাঞ্চগুলির যুক্ত সভা, বলাগড়, সোমড়া-গুপ্তিপাড়া, পাণ্ডুয়া, মহানাদ, বৈদ্যবাটি, পোলবা, জঙ্গীপাড়া ও চন্দননগর।

১৬ মে, *গণশক্তি*-র পাতায় প্রকাশিত, 'ভারতের বিভিন্ন স্থানে পার্টির সভায় ডাঙ্গে চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প।'

উড়িষ্যায়

ডাঙ্গে চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে সামিল পার্লাকেনেদি ও গুণপুর আঞ্চলিক কমিটি। রাজ্য পরিষদের সভায় ডাঙ্গে পরিচালিত জাতীয় পরিষদের প্রতি সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব আনা হইলে দুইজন পরিষদ সদস্য জগন্নাথ মিশ্র ও ভুবন মোহন পট্টনায়ক তাহার বিরোধিতা করেন।

আসাম

১। কাছাড় ও জোড়হাট জেলা পরিষদের তিন চারটি ছাড়া বাকী সমস্ত ব্রাঞ্চ।

২। ডিব্রুগড় টাউন ব্রাঞ্চ (আটজন পক্ষে এবং চারজন বিপক্ষে)।
৩। তিনসুকিয়া ব্রাঞ্চ (সর্বসম্মতিক্রমে)
৪। ডিগবয়, ডুমডুমা, মাকুম ও লামডিং ব্রাঞ্চগুলির সভায় (সর্বসম্মতিক্রমে)।
৫। গৌহাটির টাউন ছাত্র কমিটির সভা (সর্বসম্মতিক্রমে)।

মহারাষ্ট্রে

থানা জেলা পরিষদের ওয়ার্লি এলাকার ব্রাঞ্চগুলি *গণশক্তি*-র বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'কেরলে ডাঙ্গেপন্থী অচ্যুৎ মেননের হাত থেকে *দেশাভিমানী* পত্রিকা দখল করা হয়েছে।

বারাণসী জেলা পরিষদের সদস্য সুনীল দাশগুপ্ত, সত্যনারায়ণ তেওয়ারী, কমলাপতি ত্রিপাঠী, সত্যনারায়ণ সিংহ, অম্বিকা সিংহ ও নরেশ কুমার সিংহ এক যুক্ত বিবৃতিতে ডাঙ্গে-জেড.এ. আহমদ চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য পার্টি সভ্যদের কাছে আহ্বান জানান।

কানপুরে পার্টি সভ্যদের সভায় ভোটাভুটিতে দেখা যায় বামপন্থীদের পক্ষে ২৫০ জন আর ডাঙ্গে-আহমদ চক্রের দিকে রয়েছেন ৩৮ জন। তারপর দুটো সভা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বামপন্থীগণ পার্টির কাজ পরিচালনার জন্য একটি নতুন কমিটি গঠন ও গান্ধীনগরে একটি দপ্তর খুলেছেন।

গত ৬ই মে, ডাঙ্গে-আহমদ কবলিত উত্তর প্রদেশ রাজ্য পরিষদ বর্জন করে ৭১ জনের একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত বামপন্থীদের কনভেনশন থেকে। সম্পাদক হয়েছেন 'বত্রিশজনের' অন্যতম কমরেড শিবকুমার মিশ্র।

অবশেষে ডাঙ্গে চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান প্রকাশ্য রূপ নিল জনসমাবেশের মাধ্যমে। ১৬ মে *গণশক্তি*-র প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বড় অক্ষরের শিরোনামাসহ তার বিবরণ :

কলকাতা ময়দানে বিশাল সমাবেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিশুদ্ধীকরণ অভিযান।

সরকার বিরোধী গণ আন্দোলনের অন্তরায় ডাঙ্গে চক্রকে পরাস্ত করার আহ্বান
নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পার্টির সভ্য, দরদী ও জনগণের সহযোগিতা কামনা।

(স্টাফ রিপোর্টার)।

'৯ মে মনুমেন্টের তলায় প্রায় সত্তর হাজার নরনারীর সমাবেশে জ্যোতি বসু ও পি. রামমূর্তি সভ্য, দরদী, ও জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলেন, 'বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের সরকার কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান অন্তরায় ডাঙ্গে-চক্র কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ শত্রু। কমিউনিস্ট পার্টিকে লেজুড়ে পরিণত করার জন্য ডাঙ্গে চক্রের অপপ্রয়াসকে পর্যুদস্ত করিয়া কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতে হইবে।

ডাঙ্গে সমর্থক জাতীয় পরিষদ সদস্যদের মার্কসবাদ বিরোধী রাজনৈতিক আচরণ ও বিভেদপন্থী কৌশলকে পরাস্ত করিয়া ইতিহাসের আবর্জনা স্তুপে তাহাদের নিক্ষেপ করিবার এই সংগ্রামে সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

কলকাতা, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা থেকে সভায় কয়েকটি বিশাল মিছিল আসে। সভার শুরুতে কমরেড সাধন গুপ্ত 'অবাক পৃথিবী' গানটি পরিবেশন করেন। সভাপতিত্ব করেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত ধর্মঘটী জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের সাহায্যের আবেদন জানান।'

পাঁল্টা পার্টি গড়ার উদ্যোগ আয়োজন সমাপ্ত। তারই পদক্ষেপ হিসেবে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলা পার্টি কনভেনশন। তার আগে ১০ মে ১৯৬৪ কলকাতা জেলা পরিষদের সভায় আট ভোটের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাবটিতে বলা হয়, জাতীয় পরিষদকে ৩২ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তুলে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে ও ৩২ জনকে বলা হচ্ছে তাঁদের সর্বশেষ বিবৃতিটি প্রত্যাহার করে নিতে।

বলা যেতে পারে, পার্টির ঐক্য রক্ষার শেষ মুহূর্তে একটি মরিয়া চেষ্টা করেন কলকাতা জেলা পরিষদের ৩৮ জন সদস্য। তাই এই প্রস্তাব।

কিন্তু যাঁরা পাল্টা পার্টি গড়ার জন্য অনেকদূর এগিয়েছেন তাঁদের কাছে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা মনে করেন, কলকাতার পার্টি সংগঠনের সভ্যদের চিন্তাধারার প্রতিফলন এই প্রস্তাবে নেই। কারণ কলকাতার বেশির ভাগ পার্টি ব্রাঞ্চ ইতিমধ্যেই ৩২ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের বিবৃতিটিকে সমর্থন জানিয়েছে এবং সমর্থনকারী ব্রাঞ্চের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

এই অবস্থায় একটা জেলা পার্টির কনভেনশন ডাকার প্রস্তাব নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। ২০ ও ২১ জুন জেলা পার্টি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

আহ্বায়ক

১। নরেন সেন, ২। কেষ্ট ঘোষ, ৩। সুধাংশু পালিত, ৪। শৈলেন বসু, ৫। কালী ব্যানার্জী, ৬। লক্ষ্মী সেন, ৭। নরেশ পাল, ৮। বিমল বসু, ৯। নরেন ঘোষ, ১০। শচীন সেন (বালিগঞ্জ) ১১। প্রভাত চক্রবর্তী, ১২। সুশীল গাঙ্গুলী, ১৩। রাজদেও গোয়ালা, ১৪। শচীন সেন (৮০ নং),১৫। এস. মিত্র., ১৬। নক্ষত্র ব্যানার্জী, ১৭। জগৎ বসু, ১৮। জ্যোতি দেবী, ১৯। অনিল বসু, ২০। ফণী বাগচী, ২১। জুড়ন গাঙ্গুলী, ২২। বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, ২৩। নিরঞ্জন মুখার্জী, ২৪। নীরেশ ঠাকুর, ২৫। মোক্ষদা চক্রবর্তী, ২৬। যতীন দত্ত, ২৭। প্রশান্ত শূর এবং আরও ৯ জন।

২০ জুন '৬৪ *গণশক্তি*-র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মেদিনীপুর জেলা পার্টি কনভেনশন থেকে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৪ জন জেলা পরিষদ সদস্যের আহ্বানে গড়বেতা শহরে ৬ই ও ৭ই জুন এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ২২৫ জন প্রতিনিধি এসেছেন কাঁথি, মেদিনীপুর সদর (উত্তর), সদর (দক্ষিণ), ঘাটাল, গড়বেতা ও তমলুক লোকাল কমিটি, মেদিনীপুর শহর ও খড়গপুর শহর কমিটির এলাকাধীন ব্রাঞ্চগুলি থেকে। সুকুমার সেনগুপ্ত (সম্পাদক), শুভেন্দু মণ্ডল, যতীন মিত্র, শশাঙ্ক কর ও প্রফুল্ল মাইতিকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী এবং মোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে।

এই কনভেনশনকে ভণ্ডুল করার জন্য ডাঙ্গেপন্থীরা পার্টি কর্মীদের উপর ফর্মান জারি ও ইশতাহার বিলি প্রভৃতির মাধ্যমে নানাভাবে চেষ্টা করে। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা কমিটির ২২ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জনের আহ্বানে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রমোদ দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে। বর্তমান

সম্পাদক হরি ভট্টাচার্যের বিভেদমূলক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে অপসারিত করে যামিনী মজুমদারকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

১৩

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় প্রতিটি রাজ্যেই পার্টি কার্যত বিভক্ত। এবং এই বিভাজন আনুষ্ঠানিক ও চূড়ান্ত রূপ নিল ঐতিহাসিক তেনালী কনভেনশনের মাধ্যমে। বত্রিশজন জাতীয় পরিষদ সদস্যের আহ্বানে ১৯৬৪ সালের ৭ জুলাই থেকে ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় অন্ধ্ররাজ্যের তেনালীতে সর্বভারতীয় পার্টি কনভেনশন। উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী ১ লক্ষ সভ্যের তরফ থেকে মোট ১৪৬ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে সামিল।

লাল পতাকা উত্তোলনের সময় কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদ বলেন, 'আজিকার এই ঝাণ্ডা তোলার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হউক'। (*গণশক্তি*, ১১ জুলাই ১৯৬৪)

এই কনভেনশনের কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে হরকিষেণ সিং সুরজিৎ লেখেন,

'মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে রক্ষা করা এবং বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আর কোনো বিকল্প না থাকায় পার্টিকে পুনঃসংগঠিত করা ও তার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তেনালীতে আমরা এক কনভেনশন করি। গঠন করা হয় সাংগঠনিক কমিটি। কমিটিতে দায়িত্ব দেওয়া হয় পার্টি কর্মসূচীর খসড়া তৈরী করার। কমিটি আরও ঠিক করে যে, মতাদর্শগত প্রশ্নে অবস্থান চূড়ান্ত করার চেষ্টা আমরা করব না এবং পার্টি কংগ্রেসের পর সমগ্র পার্টির অভ্যন্তরে এ নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে। এর মানে এই নয় যে, কোন মতাদর্শগত ভিত্তি ছাড়াই আমরা পার্টি কংগ্রেসে যাচ্ছি। কর্মসূচী তৈরীর সময়ই আমরা মাথায় রেখেছিলাম যে, তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতি ও আমাদের দেশে তার বাস্তব পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রয়োগের ভিত্তিতেই তৈরী হবে।' (*গণশক্তি*, ৭ নভেম্বর, ১৯৯৪)

দেখা যাচ্ছে কনভেনশনের উদ্যোক্তারা আপাতত মতাদর্শগত বিরোধের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেন। হরিনারায়ণ অধিকারী মনে করেন, রাজনৈতিক মতাদর্শগত এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে আলোচ্য সূচী নির্ধারণের ফলে এই কনভেনশনই দ্বিতীয়বার ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ভাঙ্গনের বীজ বপন করে রাখল। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪)

সাংগঠনিক কমিটিতে ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত করা হল এস এস শ্রীবাস্তব (বিহার), অচিন্ত্য ভট্টাচার্য (আসাম), এস. ওয়াই. কোলাতকার (মহারাষ্ট্র) এবং বনমালী দাস (উড়িষ্যা)-কে। সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির দায়িত্ব পালনের জন্য এই কমিটি। সপ্তম কংগ্রেসের স্থান ও কাল কলকাতা, ২৪ অক্টোবর '৬৪ থেকে ৩১ অক্টোবর '৬৪। পার্টি কংগ্রেসের আলোচ্যসূচি : (১) পার্টি কর্মসূচি গ্রহণ, (২) পার্টি গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গ্রহণ (৩) বেজওয়াদা কংগ্রেস-পরবর্তী অধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট বিবেচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা (৪) নতুন নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচন।

আবার নতুন করে ধরপাকড়ের মধ্য দিয়ে তিন মাস পর আর একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম।

সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধন ২৪ অক্টোবরের পরিবর্তে ৩১ অক্টোবর '৬৪ এবং সমাপ্তি ৭ই নভেম্বর '৬৪। ৩১ অক্টোবর সকালেই ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করা হল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, নিরঞ্জন সেন, নীরেন ঘোষ, সমর মুখার্জি, কৃষ্ণপদ ঘোষ, নরেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ পশ্চিম বাংলা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের। সরকারের মতলব নিঃসন্দেহে 'পার্টি কংগ্রেস' বানচাল করা। সরকারের যাবতীয় হামলা ও প্ররোচনা সত্ত্বেও 'সপ্তম পার্টি কংগ্রেস' সফল। উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী তাঁদের অনুগামী পার্টি সভ্য সংখ্যা ১,০৪,০২১ জন। রাজ্যভিত্তিক হিসাবে দাঁড়ায়, আসাম—১৪৮, অন্ধ্র—২৮৩৪, দিল্লী—৫০০, হিমাচলপ্রদেশ—৩০০, জম্মুকাশ্মীর—৯২৫, কর্ণাটক—১৭০০, কেরল—১৮০০, মধ্যপ্রদেশ—৭০০, মহারাষ্ট্র—৪৫৮২, মনিপুর—৩০০, উড়িষ্যা—১১২৫, পাঞ্জাব—৬৬৬৮, রাজস্থান—১৬৮০, তামিলনাড়ু—১১,৫৫১, উত্তরপ্রদেশ—৯,২৫৩, পঃবাংলা—১৩,৪২৯, অন্যান্য—২১০।

লক্ষাধিক সদস্যের পক্ষ থেকে মোট ৪২২ জন প্রতিনিধি পার্টি কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত কলকাতা ৭ম পার্টি কংগ্রেসের ঘোষণা পত্রের মুখবন্ধে বলা হয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, 'এখানে যে প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত হয়েছেন তাঁরা হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত প্রতিনিধি এবং ডাঙ্গে গোষ্ঠীর কোন অধিকার নেই নিজেদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলার।'

৭ম কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হরকিষেণ সিং সুরজিতের মন্তব্য :

'অনেকে মনে করেছিলেন, যেহেতু আমাদের পিছনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মদত নেই তাই আমরা পার্টি সদস্যদের বিরাট সংখ্যায় সমবেত করতে পারব না। কলকাতা কংগ্রেসের জমায়েত অবশ্য বিরোধীদের বিমূঢ় করে দিয়েছিল। .... কংগ্রেসের সাফল্য বুর্জোয়া-জমিদার সরকার এবং সংশোধনবাদী, উভয় পক্ষকেই চমকে দিয়েছিল। এর তাৎক্ষণিক পরিণতি ছিল আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ। ই.এম.এস. এবং জ্যোতি বসু ছাড়া পলিটব্যুরোর সব ক'জন সদস্যকে কেরালায় বৈঠক চলাকালীন গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। এ রকম গ্রেপ্তার পর্ব চলে বহু রাজ্যে। সরকারের এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাইতে সি.পি.আই-র কংগ্রেস ডাকা হয়। আমাদের এবং আমাদের দলকে ধিক্কার দেবার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পার্টিকে সেই কংগ্রেসে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একটা শব্দও বলা হয়নি কংগ্রেস সরকারের নিন্দায়। আমাদের সম্মেলন এবং সি.পি.আই-র কংগ্রেসে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেউ একজন ই.এম.এস. কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে আপনার পার্টিকে সমর্থন করছে? ই.এম.এস তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী। বিপ্লব যাঁদের করতে হবে আমাদের পক্ষে রয়েছেন তাঁরাই।' (*গণশক্তি*, ৭ নভেম্বর ১৯৯৪)

পার্টির ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অবিভক্ত পার্টির উভয় অংশই যথাক্রমে কলকাতা ও বোম্বাই পার্টি কংগ্রেসকে সপ্তম পার্টি কংগ্রেস বলেই চিহ্নিত করে। উভয়ই দাবি করে তারা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী অতএব উভয়ের নাম

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় শুরু। কারা কোন্ পার্টিতে কেন গেলেন তার সদুত্তর সহজলভ্য নয়। রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকে ভূপেশ গুপ্ত বামপন্থী বলে পরিচিত, যদিও কোন ভাবেই চীনের রাজনীতির সমর্থক নন। তিনি রয়ে গেলেন সি.পি.আই-এ। রণেন সেনও তাই। পার্টির মধ্যে মধ্যপন্থী বলে পরিচিত অজয় ঘোষের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ গেলেন নতুন পার্টিতে। উল্লেখ্য যে তেনালী কনভেনশনে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলীতে ই.এম.এস. ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দল বাছাই-এর ক্ষেত্রে নেতারা নিজস্ব মতাদর্শগত বিশ্বাসের প্রতি তেমন অবিচলিত নন। দুই পার্টির বিভাজন-রেখা নিছক রাজনৈতিক নয়, অর্থাৎ এক পক্ষের নেতারা বিশুদ্ধ দক্ষিণপন্থী এবং অপর পক্ষ বিশুদ্ধ বামপন্থী—এভাবেও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। যেমন পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের অন্ধ্র গোষ্ঠীর 'মাওপন্থী' নেতা রাজেশ্বর রাও বর্তমানে ডাঙ্গে গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক অথচ মাও-বিরোধী রণদিভে মার্কসবাদী তথা বিরোধী গোষ্ঠীর একজন প্রধান মুখপাত্র। আবার পি.রামমূর্তি যিনি পাঁচের দশকের মাঝামাঝি 'শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় মঞ্চ'-এর স্লোগান তুলেছিলেন, তিনি যোগ দিলেন বিরোধী পক্ষে, আর ভূপেশ গুপ্ত, যিনি অল্প কিছুদিন আগেও ডাঙ্গের সমালোচনায় মুখর, তিনি রয়ে গেলেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে।

ভবানী সেনগুপ্তের মতে 'কমিউনিস্ট' ও 'কমিউনিস্ট-মার্কসিস্ট' এই শিবির বিভাজনের পেছনে রয়েছে নেতাদের ব্যক্তিগত অতীত ইতিহাস, তাঁদের বয়স ও শ্রেণীগত অবস্থান। দেখা যাচ্ছে পার্লামেন্টের বেশিরভাগ সদস্য রয়ে গেলেন পুরনো পার্টিতে, আর গায়ে গতরে যাঁরা পার্টির কাজ করেন তাঁদের বেশির ভাগ চলে গেলেন নতুন পার্টিতে। কৃষক ফ্রন্টের চেয়ে ট্রেড ইউনিয়নের বেশির ভাগ কর্মী রয়ে গেল সি পি আই-এ। উচ্চবর্ণের যে সব নেতার বয়স পঞ্চাশের বেশি এবং বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত তাঁদের বেশির ভাগের আনুগত্য সি পি আই-এর প্রতি।

মহারাষ্ট্র ও হিন্দীভাষী উত্তর ভারতের কমিউনিস্ট-প্রভাবিত বলয়ে সি.পি.আই-এর রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রইল। কিন্তু সি পি আই (এম) বাংলা, মাদ্রাজ, কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশে সি পি আই-এর তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে।

পার্টি ভাগের পর সি পি আই-এর আনুগত্য মস্কোর প্রতি যথারীতি অটুট। অপর পক্ষে নতুন পার্টি সি পি আই (এম) মস্কো-পিকিং নিরপেক্ষ স্বাধীন ও সার্বভৌম দল বলে নিজের পরিচয় দিল।

প্রসঙ্গত, বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সি পি আই-এর সপ্তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিবেদনেও বলা হয়, 'বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় তার জন্য প্রয়োজন একটি আন্তর্জাতিক লাইনের কাঠামোর মধ্যে, স্বকীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নিজস্ব নীতি-নির্ধারণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। বিশ্বের কোনো কমিউনিস্ট পার্টি যেন অন্য কোনো কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। শুধু তত্ত্বে নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে হবে এবং একমাত্র এরই ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য অটুট থাকবে।'

পশ্চিমবাংলায় দেখা যাচ্ছে, যাঁরা একদা বামপন্থী বা 'চীনাপন্থী' বলে পরিচিত তাঁরা সবাই নতুন দলে আসেননি। সরকারি ভাষায় যাঁরা 'চীনাপন্থী' বলে কারাবাস করলেন তাঁদের মধ্যে নরহরি কবিরাজ, নির্মাল্য বাগচী ও সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার রয়ে গেলেন পুরনো পার্টিতে। তাঁরা অবশ্যি নিজস্ব মুখপত্র মূল্যায়ন চালু রাখবার অধিকার পেলেন। খগেন রায়চৌধুরী, ২৪ পরগণা জেলা পার্টির সম্পাদক, যিনি ৩২ জনের বিবৃতির অন্যতম সমর্থক, তিনি চলে গেলেন সি পি আই-তে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাঁরা পার্টি ঐক্যের সপক্ষে বলেছেন তাঁরা এখন নিরুপায়। ঐক্যকামী শক্তির সামনে কোনো ভবিষ্যৎ রইল না। তাঁদের সঙ্গে পার্টি র‍্যাংক থাকবে কেন? তাঁদের দৈনন্দিন কাজ কী হবে? সক্রিয়তা ছাড়া পার্টি জীবন কি বাঁচে? তাছাড়া সামনে নির্বাচন। যাঁরা এম এল এ বা একদা এম এল এ ছিলেন তাঁদের ধারণা-এ পার্টি বা ও পার্টি গেলে এম এল এ হওয়া যেতে পারে। অতএব ঐক্যকামী শক্তির মঞ্চ কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি (সি ইউ সি) -র বিলোপ ঘোষিত হল। শেষ বারের মতো তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল *প্রতিদিন* সান্ধ্য দৈনিকের সম্পাদকীয় নিবন্ধে, 'কমিউনিস্ট ঐক্য ইতিহাসের দাবী' (৪ মে, ১৯৬৬)। ব্যতিক্রম শুধু কয়েকজন, বাকিরা দুটোর মধ্যে একটা পার্টি বেছে নিতে বাধ্য হলেন।

অবশ্য কলকাতা জেলার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কমরেড, অজিত রায়, গোপাল আচার্য, বীরেন রায় ও সুবোধ দাশগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *Marxist Review* নামে মাসিক সাময়িকপত্র। সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লড়াই করতে লাগলেন তাঁদের সাধ্যমতো ১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে এই সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। গোপাল আচার্য ও বঙ্কিম সেন কোনও পার্টিতে না গেলেও তাঁদের স্ত্রীরা গেলেন নতুন পার্টিতে। গোপাল আচার্যের স্ত্রী মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য আমৃত্যু সি. পি. আই (এম)-এ ছিলেন। প্রয়াত বঙ্কিম সেনের স্ত্রী অমিয়া সেন প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেত্রী।

অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু জ্যোতি বসু ও ভূপেশ গুপ্ত এখন দুই বিপরীত শিবিরে। গোপাল আচার্য ও নরেন সেন জুটিটিও ভেঙে গেল। গোপাল আচার্য কোনো পার্টিতে গেলেন না আর নরেন সেন নতুন পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, কলকাতা জেলা-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

হারিয়ে গেল অনেক পুরনো মুখ। পার্টিভাগের আচমকা ধাক্কায় বেশ কিছু কমরেড সাময়িকভাবে বসে পড়লেন। আবার ফিরেও এসেছেন অনেকে, কিন্তু সবাই নন। যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁরাও তেমন স্বস্তি পাননি। কারণ চারদিকে থৈ থৈ করছে নতুন মুখ। দুটো পার্টিরই খোল-নলচে যেন বদলে গেছে। চল্লিশের দশকে বা পঞ্চাশের দশকের ধ্যানধারণা মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা কমরেডরা এই বদলে যাওয়া পরিবেশে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ এবং অবান্তর। অবশ্যি যাঁরা পার্টির ওপর তলার বাসিন্দা তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। একদা লাল পরিবার বলে চিহ্নিত পরিবারগুলির গায়েও লাগল পার্টি ভাঙার আঁচ। বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম তেমন একটা পরিবারে যেখানে বাবা ও মা দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। সে যুগে সমস্ত কমিউনিস্টই এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য। বাবা সত্যেন গাঙ্গুলী রেল শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং মা করেন মহিলা আন্দোলন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মুখপত্র *ঘরে বাইরে* সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত মা উমা গাঙ্গুলী। তিনি কনক মুখোপাধ্যায়, বেলা লাহিড়ী ও মুক্তি মিত্র প্রমুখ পার্টি নেত্রীদের সঙ্গে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা বোলানদের

কেউ কাকীমা, কেউবা মাসীমা, আবার কেউ বা দিদি। যখন সে খুব ছোটো, উমা তাকে তার দিদিমার কাছে রেখে পার্টির কাজে বেরিয়ে যেতেন। বোলান যখন একটু বড় হল, বাবা তাকে সঙ্গে করে ইউনিয়ন অফিসে বা পার্টি অফিসে নিয়ে যেতেন। সেখানে তাকে কোনো কোনো দিন কয়েক ঘন্টা বসে থাকতে হত। তার খারাপ লাগত না। এভাবে পার্টি পরিমণ্ডলে সে বড় হতে থাকে। তাই কোন দামী জামা কাপড় বা দামী খাবারদাবারের বায়না তার ছিল না। বাড়িতে হরদম লোকের আনাগোনা। যদিও বাড়ি ছোটো। ছোটো পরিসরে সবাইকে থাকতে হত, খেতে হত, ঘুমুতে হত। কৃচ্ছ্রতা আছে অথচ দারিদ্র নেই। বাড়তি সামগ্রীর চাহিদা বোধহয় একেবারেই নেই। কোনো রকমে চলে গেলেই হল, স্বচ্ছলতার প্রয়োজন নেই। বেশি টাকা করার মনোভাব এখানে স্বভাবতই নিন্দিত।

পার্টি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বোলানের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। কেমন করে যে তার চেনা জগৎ একদম অচেনা হয়ে গেল। ঘরে বাইরে সর্বত্র ভাঙন। মতবিরোধ পরিণত হল মনোমালিন্যে। বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাড়িতে মানুষ আসা বন্ধ হল। নীল জামা পরা রুক্ষ চেহারার সেই খালাসি গ্যাংম্যানরা আর আসে না। অপর দিকে *ঘরে বাইরে* কাগজও বন্ধ হয়ে গেল। বাবা ও মা দুজনেরই সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে ছেদ পড়ল—যা বাবা ও মা উভয়ের পক্ষেই অসহনীয়। ওকালতি পাশ করে লেবার ট্রাইবুনালের আইনজীবী হলেন বাবা এবং আর এক সত্যেন গাঙ্গুলীর জন্ম হল। যদিও শ্রমিকের হয়েই তিনি মামলা লড়েছেন এবং বহু ক্ষেত্রে বিনা পয়সায়। স্বচ্ছলতার মুখ দেখল গাঙ্গুলী পরিবার। এই স্বচ্ছলতা বোলান চায়নি। তার কাছে সুখের দিন ছিল আগের অস্বচ্ছল দিনগুলি। সেই দিনগুলি ছিল তার একান্ত গর্বের, যেহেতু তার বাবা মা দুজনেই পার্টি করতেন। অভাব তখন অভাব নয়, কারণ বাবা-মা ও পার্টির সবাই তখন সমাজবিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর।

পার্টি ভাগের পর গাঙ্গুলী পরিবারে অশান্তি। বোলানের ভাষায়, মা উমা গাঙ্গুলী রাজনীতিতে ডাঙ্গেপন্থী। তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান বাবা সত্যেন গাঙ্গুলীর। অথচ তিনি নতুন পার্টিতে যোগ দিতে পারছেন না, উমার আপত্তিতে। বোলান মনে করে, তাহলে মা বাবাকে ডিভোর্স করবে।

পশ্চিমবাংলার পার্টি র‍্যাঙ্কের বৃহত্তম অংশ চলে গেল নতুন পার্টিতে। তার কারণ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত নবগঠিত পার্টির নেতা। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে পশ্চিমবাংলার পার্টির শীর্ষে তাঁরাই রয়েছেন। পার্টির সাধারণ কর্মীদের দৃষ্টিতে এই ত্রয়ী পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃত নেতা। আবার যাঁরা বুদ্ধিজীবী কমরেড বলে পরিচিত তাঁদের অধিকাংশ রয়ে গেলেন পুরনো পার্টিতে। তাঁরা মূলত শান্তি-সংসদ, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপত্র *পরিচয়*, গণনাট্য সংঘ ও অধ্যাপক সমিতির সঙ্গে যুক্ত।

দেবকুমার বসুর ভাষায়, মাথা রয়ে গেল পুরনো পার্টিতে আর ধড় চলে এল নতুন পার্টিতে।

দ্বিতীয় পর্ব

আমার মনে শান্তি নেই।
যদি ঝড় নেমে আসে,
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ করে
অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে,
ঝড় নেমে আসে বিশাল গভীর অন্ধকারে;
তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।

—সমর সেন/ ঝড়

১

অশোক মিত্র লিখছেন, '১৯৬৪ সালের যে সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে দু'ভাগ হয়, সেই সপ্তাহেই বাবা মারা যান। ঘনবদ্ধ তমিস্রার সময় গেছে সেটা, আন্দোলন ছত্রভঙ্গ, পরিপার্শ্ব নির্জীব। ভদ্রলোক মৃত্যুর অব্যবহিত আগে মনে পড়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'যা ব্যাপার স্যাপার ঘটে গেল, গোটা, পঁচিশ বছরের মধ্যেও আর দেশে কমিউনিজম আসবে না।'

হয়তো সেদিন অনেকেই এরকম কিছু ভেবেছিলেন। তারপর কিন্তু অশোক মিত্রের ভাষায় 'মাত্র পাঁচ বছরেই ভেল্কিবাজি হয়েছে' (*কবিতা থেকে মিছিলে*, পৃ. ৭৩)

পরিস্থিতি যে বদলাচ্ছে সেটা শিপ্রা সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনিও মনে করেন 'অস্থিরতার দিন এল। পাঁচের দশকে খাদ্য সংকট থাকলেও ১৯৬৬ সালের আগে বড় রকমের আন্দোলন হয়নি। তার বড় কারণ এই সময়ে অনেক সমস্যা সত্ত্বেও সামাজিক জীবনে এক ধরণের স্থিরতা এসেছিল। দুটি পরিকল্পনার অন্তত আংশিক সাফল্য বোঝা যাচ্ছে। যতই সাময়িক হোক, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়ছে না, কর্মসংস্থানের নতুন পথও খুলে যাচ্ছে। .... এই অবস্থায় কোনও মৃত্যুপণ সংগ্রামে নামার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা রাজনৈতিক নেতাদের থাকলেও তাঁরা জনসমর্থন পেতেন না। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১ জুলাই ১৯৯৩)

ষাটের দশকের মাঝামাঝি দৃশ্যপটে আমূল পরিবর্তন। শিপ্রা সরকার লিখছেন, 'এর পরে চতুর্থ পরিকল্পনা ঠিক দাঁড়াল না। কিছুদিন হিসাব করার পরে তিন বছরের বিরতি (১৯৬৬-৬৯) বা 'প্ল্যান হলিডে' দরকার মনে হয়েছিল। প্রথমবার টাকার অবমূল্যায়নে এক ডলারের দাম ৪.৭৬ টাকার জায়গায় ৭.৫০ টাকা দাঁড়াল (১৯৬৬)'। (ঐ)

১৯৬৬ সালে নথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ১৭ হাজার, ১৯৫৩ সালে যার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৩ হাজার।

রাজনীতিতে অস্থিরতার ঢেউ। কমিউনিস্ট পার্টিতে যখন প্রবল ভাঙচুর, ঠিক সে-সময় নেহরু চলে গেলেন। ২৭ মে, ১৯৬৪ জহরলাল নেহরু প্রয়াত হলেন। তারই সঙ্গে, ভবানী সেনগুপ্তের মতে, স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। তারপর থেকেই দল ভাঙাভাঙির সূত্রপাত। ভাঙন শুধু কমিউনিস্ট দলে নয়, বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সব দলেই, এমন কি কংগ্রেসেও। ১৯৬৯ সালে যখন তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, কংগ্রেসও তখন দুটো প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত : আদি ও নব।

সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সব মিলিয়ে এক সার্বিক সংকটের পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন অজিত রায়। তিনি বলছেন : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৫০-৫১—১৯৫৫-৫৬) পরিকল্পনার যুগে উন্নয়নের হার ছিল ঊর্ধ্বমুখী এবং মাথাপিছু উৎপাদন হারের গড় বৃদ্ধি ১.৮% এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৫৫-৫৬—১৯৬০-৬১) পরিকল্পনার যুগে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২.৮% । কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ০.৩% । তারপর অনেকদিন অবধি

কোনো পঞ্চবার্ষিকীতেই গড় বার্ষিক উন্নয়নের ২য় পঞ্চবার্ষিকীর স্তর আর অর্জন করেনি, বরং ১ম পঞ্চবার্ষিকীর বৃদ্ধির হারের চেয়েও সেটা কম।

পরপর দুবছর (১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭) নীট জাতীয় উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের মুদ্রামূল্যের হিসাবে হ্রাস পেতে থাকে এবং সেই হ্রাস ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩২৫.১ টাকা থেকে ৩১০.৯ টাকায় দাঁড়ায় এবং পরের বছর আরও নিচে নেমে দাঁড়ায় ৩০৭.১ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের আগে পর্যন্ত জাতীয় আয়ের পূর্বতন শিখরে আর পৌঁছুতে পারা যায়নি। চীন-ভারত যুদ্ধের ধাক্কায় উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ কমাতে হল, কারণ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করতে হল আরও দু'হাজার কোটি টাকা।

খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার প্রশ্নই ওঠে না। ৬০ লক্ষ টন গম আমেরিকা থেকেই আমদানি করা হত প্রায় প্রতি বছর। Ship to Mouth অর্থাৎ জাহাজ থেকে মার্কিনী গম সরাসরি চলে আসত রেশন শপে। খাদ্যে ভয়াবহ ঘাটতি। অতএব গমের দাম বাড়ল দেশের ভেতরে। সরকার চাইল গমের দাম বেঁধে দিতে। ফলে ধনী চাষী সম্প্রদায় অখুশি এবং তার পরিণতিতে কংগ্রেসে ভাঙন। গড়ে উঠল বাংলা কংগ্রেস, জন কংগ্রেস প্রভৃতি আঞ্চলিক দল। এবং অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম রাজনৈতিক প্রকাশ ১৯৬৭ সালে দেখা যায় ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনে।

দেশের মধ্যে ঘনায়মান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের অভিঘাত সামাজিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে ছাত্রদের ওপরেও পড়েছিল। দেশজুড়ে ছাত্র বিক্ষোভের ঢেউ ভারত সরকারের টনক নড়িয়ে দিল। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক স্বীকার করলেন ছাত্র বিক্ষোভ ও শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্তি ক্রমবর্ধমান। সরকারি সূত্রে জানা যায় ছাত্রদের অবাধ্যতার ঘটনা ১৯৬৫ সালে ২৭১টি, ১৯৬৬ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৭টি। তারমধ্যে শতকরা বিয়াল্লিশটি ঘটনা আবার হিংসাশ্রয়ী। ভারত সরকার তার প্রতিকারের পথ খুঁজতে বললেন শিক্ষাব্রতী ও মান্যবর ব্যক্তিদের।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেনের মতে, ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতর জন্য দায়ী তাদের অভিভাবকেরা; বাড়িতে এইসব ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পায় না।

মধ্যপ্রদেশের মোট ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটির উপাচার্য মনে করেন, ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই। এটি মুখ্যত আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন।

বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্র বিক্ষোভের ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় হতে বললেন। ছাত্রদের সম্পর্কে গোয়েন্দারা যেন নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখে।

উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অভিমত ছিল যে, যোগ ব্যায়ামে ছাত্রদের গরম মাথা ঠাণ্ডা করতে পারলে তবেই ছাত্র বিক্ষোভ ঠেকানো যাবে। উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতএব যোগ ব্যায়ামের অধ্যাপকপদ সৃষ্টি হল।

ছাত্র অশান্তি দূর করার জন্য তাদের নিয়মিত *মহাভারত* পাঠ করতে বললেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন।

শৈবাল মিত্র লিখছেন, 'দেশের মধ্যে ছাত্রবিক্ষোভ নিয়ে যখন শিক্ষাব্রতী এবং দেশশাসকদের এত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ছাত্ররা তখন ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দারুণ শঙ্কিত। সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে, একটি ব্যাঙ্কে কয়েকজন করণিকের চাকরীর জন্যে বিজ্ঞাপনে ২৮২৪৪ জন আবেদন করেছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে আছেন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা পাওয়া ৩০০ ইঞ্জিনিয়ার,

আর্টস ও সায়েন্সের অসংখ্য এম.এ.-এম.এস.সি, আইনে স্নাতক এবং বারো হাজার গ্র্যাজুয়েট।' ('ষাটের ছাত্র আন্দোলন,' পৃ. ২৯)

ছাত্র বিক্ষোভের অবশ্যই বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপট ছিল। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ, আফ্রিকা, এশিয়া, এবং লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, বিশ্বের যুব-ছাত্রসমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল। এদেশের ছাত্ররাও আর গতানুগতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে যোগ দিয়ে খুশি হচ্ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক, মরশুমি, মামুলি ছাত্র আন্দোলনের বাইরে বৃহত্তর কোনো এক আন্দোলনের দিশা খুঁজছিল ছাত্রসমাজ। একটা অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল র‍্যাডিকাল ভাবধারা। শুধু প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা নয়, গোটা সমাজব্যবস্থাকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তার অনুপ্রেরণা ছিল সেদিন হাওয়ায় হাওয়ায়।

২

১৯৬৪' সাল। কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন এবং তৎসত্ত্বেও ছাত্র শ্রমিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার। ক্রমবর্ধমান খাদ্যসংকট ও জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং তারই পাশাপাশি ভ্রাতৃঘাতী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এসব মিলিয়ে তৈরি সময়ের চালচিত্র। এক অস্থির সময়ের চালচিত্র।

বছরের শুরু শোকাবহ ঘটনা দিয়ে। প্রথমে দাঙ্গা বাধল এপার বাংলার মালদহে, তারপর ওপার বাংলার রাজশাহীতে। তারপর সাম্প্রদায়িকতার অলাতচক্রে জড়িয়ে পড়ে দুই বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাময়িকভাবে দিশেহারা। শিপ্রা সরকারের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে, 'রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা লক্ষণীয় ..... চিন্তাবিদ্‌রাও দেরি করে বিবৃতি দিয়েছেন। পুলিশ নিস্ক্রিয় ছিল অনেকটা রাজনৈতিক চাপে ..... শেষপর্যন্ত সৈন্যবাহিনী তলব করে কঠোর ভাবে দাঙ্গা দমনের নির্দেশ দেওয়া হল।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২১ জুলাই ১৯৯৩)

সাম্প্রদায়িকতা অস্ত্র যে এতটুকু ভোঁতা হয়নি, নতুন করে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে ফরওয়ার্ড ব্লক, পি. এস. পি., জনসংঘ ও হিন্দু মহাসভার আহ্বানে ১৭ মার্চ পশ্চিমবাংলায় শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হল এবং ঠিক আগের ১৬ মার্চ বেলঘরিয়ায় সংঘটিত হল এক চরম বর্বরতা। *সাপ্তাহিক গণশক্তি*-র খবরে প্রকাশ :

'বেলঘরিয়ায় দুর্বৃত্তদের বীভৎস হত্যালীলা। দলবদ্ধভাবে মুসলমান শ্রমিকদের উপর আক্রমণ; সরকারী হিসেবেই ১৯জন নিহত।

গত ১৬-ই মার্চ সোমবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় মোহিনী মিলস্-এর শতখানেক মুসলমান শ্রমিকের উপর বেশ কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অতর্কিত আক্রমণ চালায়।' এই শ্রমিকেরা রাতের শিফ্‌টে কাজ করবার জন্য কারখানায় যাচ্ছিলেন। এই আক্রমণ পূর্বপরিকল্পিত এবং অত্যন্ত গুপ্তভাবে সংগঠিত হয় বলে অনেকের ধারণা।

বিধানসভায় জ্যোতি বসু বলেন যে ঘটনাস্থল তিনি পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে সংখ্যালঘুদের মধ্যে গভীর আতঙ্ক বিরাজ করছে। (*গণশক্তি,* ২১ মার্চ ৬৪)

ঘটনাটি মর্মান্তিক এবং অভাবনীয়। হতাহত শ্রমিকেরা লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের সদস্য এবং ঘটনাস্থল কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো প্রভাবাধীন অঞ্চলের আওতায়। এবং ১৯৪৬ সালের ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত আগস্ট মাসের পর পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের উপর এধরণের ঘৃণিত হামলা হয়েছে কি? সম্ভবত না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল শিল্পাঞ্চলে। এবং তার বলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা।

এই নূতন বিপদ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে (৪.৪.৬৪)।

'ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে এবং শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গার আগুন জ্বালাইবার সুপরিকল্পিত চেষ্টা হইতেছে।'

কিন্তু চক্রান্ত ব্যর্থ করা যায়নি। সম্ভব হয়নি সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দাঙ্গাবাজদের শায়েস্তা করা। তার সবচেয়ে বড় কারণ, কমিউনিস্ট আন্দোলন টালমাটাল এবং পার্টি কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। এবং তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির একাংশ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে এক মঞ্চে আসীন। অতএব দাঙ্গাবাজরা অপ্রতিহত এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন নির্জীব। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নগুলি অসহায় দর্শক। মার্চের শেষাশেষি মাত্র সাতদিনে বেলঘরিয়া, জামসেদপুর, রায়গড়, রৌঢ়কেল্লা, ঝাড়দুগুড়া প্রভৃতি স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত আক্রমণ চলেছে। দুই শতাধিক শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রাণহানির চেয়ে লুঠতরাজ আর গৃহদাহের ঘটনাই বেশি। কলকাতার বুকে এটাই ছিল এবারের দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য। গৃহহারাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই গরীব 'দিন আনি দিন খাই' মানুষ। পাটোয়ারবাগানের দপ্তরিপাড়া পুড়ে ছাই এবং তারই সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের কয়েক লক্ষ ফর্মা। লেখক ও প্রকাশকদের মাথায় হাত। কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দাঙ্গার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান মর্মাহত লেখকদের পক্ষে *দেশ* পত্রিকায় (১৯৬৪) 'সুনন্দর জার্নাল'-এর পাতায়।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনে অসমর্থ হলেও কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থান ছিল সঠিক। তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লক, পি. এস. পি প্রমুখ তথাকথিত বামপন্থী অর্থনৈতিক অবরোধের পথকে সর্বনাশা পথ বলে চিহ্নিত করেন, সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার বিরুদ্ধে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের শ্রেণী ভ্রাতৃত্বের পতাকাকে তুলে ধরেন। কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিল: শ্রেণীসংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে, মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলনের আঘাতে সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস করুন। (*গণশক্তি*, ২১.৩.৬৪)

৩

গরীব মানুষের পোড়া বস্তির ছাই আর বাতাসে উড়ছে না। মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মৃতদের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, পার্টি নেই। আবার ফিরে এসেছে কলকাতার বুকে শান্তি আর জনজীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আর তারই সঙ্গে জেগেছে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন প্রাণের সাড়া।

অসীম রায় যথার্থই লিখছেন, যখন কোনো স্বপ্ন নেই ঠিক তখনই স্বপ্ন দেখার সময়।' তাই সাম্প্রদায়িকতা-কলুষিত পরিবেশেও শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত। *গণশক্তি* (২১.৩.৬৪)-র খবরে প্রকাশ :

জয়ার শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই

আজ ৯৬ দিন ধরে জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ৭ হাজার বীর শ্রমিকেরা যে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন তা অভূতপূর্ব। মালিকের অনমনীয় একগুঁয়ে জিদের বিরুদ্ধে সরকারী শ্রম দপ্তরের হৃদয়হীন উপেক্ষা ও মালিক-তোষণ নীতির প্রতিবাদে, পুলিশের রক্তচক্ষু ও ডাণ্ডাকে পরোয়া না করে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সময়েও শুধু জয়ার শ্রমিকদের মধ্যেই নয়, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যকে অম্লান রেখে তিনমাসের ওপর এই ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসেও নতুন স্বাক্ষর রেখেছে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে শ্রমিক ঐক্য

জয়ার বীর শ্রমিকেরা শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষা করেছেন। হিন্দু মুসলমানের একতা রক্ষা করেছেন, ঐ এলাকায় কোন দাঙ্গা হতে দেননি। সর্বোপরি নিজেদের ধর্মঘটকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

জয়ার শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অন্যান্য শিল্প শ্রমিক ও বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিক। ৫ই ফেব্রুয়ারী ময়দানে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার আহ্বানে ধর্মঘটী জয়ার শ্রমিকদের সমর্থনে ৫০ হাজার মেহনতী মানুষ সমবেত হন।

১৮ই মার্চ সারা পশ্চিমবাংলায় শ্রমিকদের সমর্থনে ব্যাজ ধারণ করে সৌভ্রাতৃত্বের অপূর্ব নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন।

৩১ মার্চ জয়ার ধর্মঘটের সমর্থনে সমগ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন 'মেটাল অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেডারেশন'।

জয়ার ধর্মঘটীদের জন্য বাউড়িয়ার গ্লস্টার কেবল কারখানার ধর্মঘটও অব্যাহত। আজ ১১০ দিন পূর্ণ হল। (*গণশক্তি*, ২১.৩.৬৪)

দশ হাজার ট্রাম শ্রমিকও নানা কারণে বিক্ষুব্ধ। ১৫ জানুয়ারি থেকে যে সাধারণ ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল তা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সুস্থ চেতনা ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

কর্মচারী আন্দোলনেও দেখা গেল নতুন জোয়ার। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীগণ ১২ মার্চ দেশব্যাপী দাবিদিবস পালন করেন। সরকারি কর্মচারীদের এক বিশাল সুসজ্জিত মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সমাবেশে যোগদান করে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি শ্রী কে জি বসু এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা একটি সমাবেশে মিলিত হয়ে কতগুলি জরুরি দাবি পেশ করার সিদ্ধান্ত নেন।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের কর্মচারীরা সংশোধিত বেতন হার ও বর্ধিত

মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২৪ মার্চের মধ্যে কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে তাঁরা অনশন ধর্মঘট করবেন।

জীবনবীমা কর্মচারীরাও বিক্ষোভ-মিছিলে পথে বেরিয়েছেন। ১৬ মার্চ তাঁরা হিন্দুস্তান বিল্ডিং-এর সম্মুখে সমবেত হন। অন্যতম দাবি ১৭ জন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহাল এবং দিনমজুর ভিত্তিতে নিয়োজিত দুইশত অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী করা। প্রধান দাবি বীমা ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

জানা গেল ব্যাংক ও বীমা কর্মচারীগণ যুক্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ১৭ এপ্রিল তাঁরা পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্কল্প করেছেন।

৪

শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠি, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে ডি. আই. রুল প্রয়োগ এবং ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষিত। তবুও জয়ার ধর্মঘট অব্যাহত। জয়ার ধর্মঘটী শ্রমিক আজ সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর গৌরব। মালিকের পক্ষে প্রায় এক হাজার পুলিশ সক্রিয়। তারা জবরদস্তি দোকান ও কারখানা থেকে সেলাই মেশিন, পাখা ও অন্যান্য মাল বার করছে। তারা গ্রেপ্তার করেছে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুশোভন রায় ও অন্যান্য নেতাদের। কারখানা এলাকায় তারা কায়েম করেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। তবুও মাথা নত করেননি জয়ার শ্রমিকরা।

'জয়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য সব কিছু' এই আওয়াজ তুলেছে পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষ। ১৬ এপ্রিল জয়া শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে সাড়া দিলেন লক্ষাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক যা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক কথায় অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে একটি সমগ্র শিল্পে এ ধরনের সংগ্রামী সৌভ্রাতৃত্বের নজির আছে বলে জানা নেই। প্রতীক ধর্মঘটে যারা অংশ নিয়েছেন:

আসানসোল : সেন র‍্যালে সাইকেল কারখানা।

হাওড়া : বার্ণ, গেস্টকীন, শাণ্ডে ইলেকট্রিক, শালিমার।

খিদিরপুর : ব্রেথওয়েট, বি.বি.জে. মেটাল ব্লক, রবার্ট হার্ডসন, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন।

বেহালা : ইণ্ডিয়া ফ্যান, ভারত ইলেকট্রিক, রেকেট কোলম্যান, এম.জি.মৌজি, ভলকান, ন্যাশনাল কেবল্।

তারাতলা রোড : ব্ল্যাকউড হাউজ, জে. স্টেনি, এয়ার কণ্ডিশনিং, সিমেন্স ইত্যাদি।

টালিগঞ্জ : বেঙ্গল ল্যাম্প

বালিগঞ্জ : ভারত ইলেকট্রিক

দমদম : জেসপ, গ্রামোফোন সহ অসংখ্য ছোটবড় কারখানা।

মেটিয়াবুরুজ : গার্ডেনরীচ্-ওয়ার্কশপ, কিলবার্ণ

পূর্বকলকাতার স্যাক্সবি ফারমার, ওরিয়েন্ট ফ্যান ও বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো ইত্যাদি অসংখ্য কারখানায় এই ধর্মঘট পালিত। (*গণশক্তি*, ১৮ এপ্রিল '৬৪)

জয়ার শ্রমিকের লড়াই অবশেষে সার্বিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত। কমিউনিস্ট পার্টি, আর.এস.পি, এস.ইউ.সি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টি, আর এস.পি.আই ও ওয়ার্কাস পার্টি প্রমুখ সাতটি বামপন্থী দল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও জয়ার ধর্মঘটের সম্মানজনক মীমাংসার দাবিতে ২০ মে বুধবার রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিল।

সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ব্যর্থ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সব কিছুই করা হয়। সারা রাজ্যে দুহাজার গ্রেপ্তার (তার মধ্যে অর্ধ শতাধিক ভারতরক্ষা আইনে আটক), লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস প্রায় কিছুই বাদ যায়নি। এবং সরকারের হিংস্র চণ্ডনীতি ব্যর্থ, রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে অপূর্ব সাড়া। (*গণশক্তি*, ২৩ মে ৬৪)

অবশেষে জয়ার শ্রমিক জয়যুক্ত। যে ধর্মঘট ১৯৬৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর শুরু, ১৬৩ দিন পর ১৯৬৪ সালের ২৭ মে ত্রিদলীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত। ২৯ মে জয়া কারখানায় ৭ হাজার শ্রমিকের সাধারণ সভায় এই চুক্তি অনুমোদিত হবার পর শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিল।

জয়ার শ্রমিক পথ দেখালেন। কী দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁরা এতদিন মরণপণ সংগ্রাম করলেন সেটা অবান্তর। তাঁদের লড়াই-এর তাৎপর্য অন্যখানে। পশ্চিমবাংলার শ্রমিক আন্দোলন বেশ কিছুকাল ধরে অনড় নিথর। জয়ার শ্রমিক ধর্মঘট জোয়ার নিয়ে এল শ্রমিক আন্দোলনের মরা গাঙে। সাম্প্রদায়িক বিষ-বীজাণু নাশ করে পশ্চিমবাংলাকে আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনল। তারই প্রমাণ ২০ মে তারিখের সার্থক সাধারণ হরতাল ও ধর্মঘট।

আবার চলা শুরু। সস্তাদরের খাদ্যের দাবিতে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মানুষের অভিযান। জেলায় জেলায় মিছিল ও সমাবেশ। *গণশক্তি*-র (২৯.৮.৬৪) সংবাদসূত্রে জানা যায় ২০ শে মে'র সাধারণ ধর্মঘটের পর থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাসে এ পর্যন্ত মোট ৬১টি স্থানীয় ও জেলা কনভেনশন, ২১২টি জনসভা ও মিছিল এবং কলকাতায় ৭টি কেন্দ্রীয় জমায়েত অনুষ্ঠিত। এসব সমাবেশে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

৫

আন্দোলন ছড়াচ্ছে যেহেতু দেশের বুকে আকালের ছায়া।

সাপ্তাহিক *গণশক্তি*-র (২৫.৪.৬৪) সংবাদ শিরোনামা, 'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি'। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ডাল, তেল ও আলু বাঙালীর এই অবশ্য প্রয়োজনীয় তিনটি জিনিসের দর যেভাবে কয়েকদিনের মধ্যে বেড়ে গিয়েছে তাতে সকলে উদ্বিগ্ন। তার সঙ্গে চাল ও মাছের অগ্নিমূল্য।

অস্তিত্বের সংকট যেখানে, সেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিতান্তই গৌণ। দেখা গেল 'দাঙ্গা নয়—শান্তি চাই' মিছিলের চেয়ে সস্তাদরে খাদ্য ও ন্যায্য মূল্যে জিনিসের দাবিতে মিছিল অনেক বেশি কার্যকর। গ্রাম ও শহর, হিন্দু ও মুসলমান তাতে সামিল।

সংকট গভীর থেকে গভীরতর। 'কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে কোথাও খোলাবাজারে [illegible]' •*গণশক্তি*, ৬.৬.৬৪)

সংকটের মোকাবিলায় আন্দোলন ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে। কিছুটা সংগঠিত ও মূলত স্বতঃস্ফূর্ত। সেই চীন-ভারত যুদ্ধের পর থেকে এতদিন কোথাও সাড়া শব্দ ছিল না। মালিক ব্যবসাদার মজুতদার চোরা কারবারী সবাই লুটেছে দু'হাতে। আর মানুষ সব কিছুই সয়েছে মুখ বুজে। যুদ্ধের পর দাঙ্গা। মানুষ আরও বিভ্রান্ত। আন্দোলন ও প্রতিবাদের রাস্তা হাতড়াচ্ছিল শুধু।

সাধারণ মানুষের আন্দোলনমুখী মেজাজ যে ক্রমশ চড়ার দিকে তার প্রমাণ ২৪ জুলাই, গঙ্গারামপুর (পশ্চিমদিনাজপুর) বিডিও-র কাছে ছয় সহস্রাধিক নরনারীর ভুখা মিছিল।

২৯ জুলাই প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরে দুই সহস্রাধিক নরনারীর বিক্ষোভ মিছিল। বৃষ্টির মধ্যেই শহর প্রদক্ষিণ করে তারা জেলা শাসকের কাছে দাবি পেশ করতে যায়। ৩১ জুলাই কাটোয়ার এক হাজার মানুষের গণডেপুটেশন যায় এস.ডি.ও-র কাছে। ২ আগস্ট বর্ধমানের কালনায় অনুষ্ঠিত হয় বন্দীমুক্তি ও খাদ্যের দাবিতে জনসভা ও কনভেনশন। থানার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু অঞ্চলপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যসহ একশত প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে এক বিরাট মিছিল চকবাজারের জনসভায় সামিল হয়। সভার বক্তা ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার ও মহাদেব ব্যানার্জী।

আগস্ট মাসের মধ্যে জেলায় জেলায় খাদ্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। সর্বস্তরের মানুষ সভা মিছিল ও সম্মেলনের মাধ্যমে সস্তায় খাদ্য সরবরাহের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা এবং মজুতদারদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দাবি করেছেন। *গণশক্তির* সংবাদসূত্রে জানা যায় : ৫ আগস্ট বীরভূম জেলা মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে কয়েকটি আশু দাবি পেশ করা হয়।

৭ আগস্ট শ্রীরামপুরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল থেকে কারখানায় সস্তা খাদ্য সরবরাহের দাবি জানান হয়।

৯ আগস্ট ব্যারাকপুরে খাদ্যের দাবিতে নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে পাঁচলা টাউন হল প্রাঙ্গনে আড়াই হাজার মানুষের জনসভা হয়।

অদ্ভুত এক সময়। টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলন, অথচ পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। সাধারণ মানুষ শহরে ও গ্রামে আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে।

৬

খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। এ বছর (১৯৬৪) সারা দেশে খাদ্য সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সস্তাদরে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ সর্বত্র ফেটে পড়ছে। ৩১ জুলাই কেরালায় হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। গুজরাটে পালিত হয়েছে ৫ আগস্ট সাধারণ ধর্মঘট এবং মহারাষ্ট্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

গণশক্তি-র (১৫.৮.৬৪) সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হলে সারা ভারতে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করার জন্য সমস্ত বিরোধী দল প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রত্যেকটি রাজ্যে বামপন্থী দলগুলি এই ধর্মঘটের জন্য ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করেছেন।

পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন যুক্ত হওয়াতে আগস্টের শেষাশেষি খাদ্য আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ২১ আগস্ট '৬৪ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির একটি কনভেনশন থেকে স্থির হয় যে ৩১ আগস্ট সমস্ত কারখানায় দাবি দিবস পালিত হবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর '৬৪ ময়দানে বৃহত্তম শ্রমিক কর্মচারী ও জনতার সমাবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। কনভেনশনে বক্তৃতা করেন মনোরঞ্জন রায়, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, রণেন সেন, যতীন চক্রবর্তী, শৈলেন পাল, মহম্মদ ইসমাইল, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, ধীরেন মজুমদার প্রমুখ শ্রমিকনেতৃবৃন্দ।

জেলায় জেলায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে।

৩০ আগস্ট, খাদ্যের দাবিতে সমাবেশের পর সাত হাজার শ্রমিকের মিছিলটি আসানসোলের ইতিহাসে দীর্ঘতম।

৩১ আগস্ট, বর্ধমান শহরে তিন সহস্রাধিক নরনারীর এক বিরাট মিছিল বার হয়। একই দিনে নানা জায়গায় সভা সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। হুগলী জেলার কোতরং-এ সমাবেশ, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে দু'শ লোকের মিছিল, মিছিল জঙ্গিপাড়ায়, হাবড়ায় ও কাটোয়ায়। কোথাও দু'শ, পাঁচশ বা হাজার, দু'হাজার। আন্দোলনের স্পন্দন জনজীবনের সর্বত্র। প্রায় প্রতিটি জেলা শহরে জনসভা ও সেখানে ভাল জমায়েত। সিউড়ি ও কালনার সভায় মানুষের উপছে-পড়া ভিড়।

সাতটি বামপন্থী দল, বি পি টি ইউ সি ও ইউ টি ইউ সি মিলিতভাবে ২৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের ডাক দিল।

গণশক্তি-র (২৬.৯.৬৪) সংবাদ সূত্রে জানা যায়, 'সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ। ৪১৫টি ট্রাম ও ৭০০টি সরকারী বাসের মধ্যে ৪০খানি ট্রাম ও ৭০টি বাস চলাচল করে।

টিটাগড়ে ট্রেন চলাচলে বাধা দেওয়াতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তুফানগঞ্জে সাবরেজিস্ট্রি অফিস ঘেরাও করলে পুলিশ দুই রাউণ্ড গুলি চালায়। রাণীগঞ্জে ও আসানসোলে সমস্ত কারখানায় ধর্মঘট। গ্রেপ্তারের সংখ্যা মোট আড়াই হাজার। তার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়নের শতাধিক নেতা ভারতরক্ষা আইনে আটক। এই সাধারণ ধর্মঘটে হুগলী জেলার শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; হিন্দমোটর, শ্রী দুর্গা কটন মিল, প্রেসিডেন্সী জুট মিল, হিন্দুস্থান বেল্টিং, কিমার বক্স প্রমুখ ১৩টি কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন।

অক্টোবরে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি। তাতে রয়েছে সারা ভারত ব্যাঙ্ককর্মী সমিতি, এ আই টি ইউ সি, হিন্দু মজদুর পঞ্চায়েত ও সারা ভারত সংবাদপত্রসেবী সংঘ। শ্রমিক আন্দোলনের একটি নতুন দিকচিহ্ন। এই সমিতির বৈঠকে স্থির হয় আগামী ২০ ও ২১ নভেম্বর দু'দিন ধরে ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হবে।

রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে ১১ মার্চ '৬৫ বিধানসভা অভিযানে বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক কর্মচারী সামিল হন। তার আগে কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর শ্রমিক কর্মচারীরা মনুমেন্ট ময়দানে এসে হাজারে হাজারে জড়ো হন।

১৯৬৪ সালের গোড়ায় যা ছিল নৈরাশ্যের পরিবেশ নিষ্ক্রিয় নিশ্চল আন্দোলনবিমুখ আবহ, মানুষ বঞ্চনার দিকে আঙুল তুলেছে। কণ্ঠে শ্লোগান নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে প্রতিবাদী মানুষ।

৭

মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্তের *কল্লোল* দেখার পর উচ্ছ্বসিত অশোক মিত্র কবুল করছেন, 'সেই আগুন খাইবার জাহাজ আর শার্দূল সিং যার প্রতীক, নাটকের মঞ্চ থেকে নেমে এসে আমাদের প্রাত্যহিকতাকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়েছিল।' তবে কি সেই আগুনের ছোঁয়া লেগেছিল দেশের নিরন্ন মানুষের দেহে মনে? বাদুড়িয়া-হাসনাবাদ-কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর-কোন্নগর-বেহালার ভুখা মানুষ না হলে এভাবে আচরণ করবে কেন—যার নাম আন্দোলন নয়, বিদ্রোহ।

পালাবদল ঘটবে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক জীবনে এবং ক্ষমতাচ্যুত হবে শাসকদল কংগ্রেস। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল জুড়ে যেন অভিনীত হল এক রুদ্ধশ্বাস নাটক যার কুশীলব লক্ষ লক্ষ আটপৌরে মানুষ। এই অনন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি একজন আশাবাদীর মনে হতে পারে: কলকাতাতে, পশ্চিমবাংলায়, ভারতবর্ষে বিপ্লব এবার অপ্রতিরোধ্য।

মোটেই আকস্মিক নয় এই বিস্ফোরণ। বিগত বছরের দিনগুলিতে জমা ছিল তার পূর্বাভাস। ১৯৬৪ সালের গোড়ায় যে নৈরাশ্যের আবহ বিরাজ করছিল জনজীবন জুড়ে, তার পরিবর্তন চোখে পড়ছিল ১৯৬৫ সালের শুরু থেকেই। গোটা ১৯৬৫ সাল জুড়ে বাতাসে ভেসে আসছিল বারুদের গন্ধ। চাপা ক্রোধ আর অসন্তোষের বারুদ।

ক্ষুধাই একমাত্র না হলেও প্রধান উদ্দীপক সব দেশে সব কালে বিদ্রোহ-বিপ্লবের। অতএব এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বাতাসে বারুদের গন্ধ, যেহেতু দেশজোড়া আকাল। সরকারের হিসেবে সারা দেশে উপোসী মানুষের সংখ্যা তিন কোটি। খাদ্য সমস্যা লেগেই ছিল। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকেই সারা ভারতে খাদ্যের দাম চড়া। যা ছিল সমস্যা তা এখন সংকটে পরিণত। অবশ্যি কেন এই খাদ্য সংকট তা নিয়ে চমকপ্রদ থিওরিও কিছু কম নেই। যেমন মার্কিন সাহায্য সমীক্ষা থেকে একটা নতুন তথ্য জানা গিয়েছে। তাঁদের মতে খাদ্য ঘাটতির কারণ শস্যহানি বা মাথা পিছু উৎপাদন হ্রাস নয়, কারণ হল লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্যক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি। ভারতের ইতিহাসে এ এক নতুন নজির। ভারতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির গড় ১৩.১ শতাংশ। কিন্তু প্রতিবছর ৩.৩৬ শতাংশ হারে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে বলে উৎপাদনের হার যথেষ্ট নয়। ৩.৩৬ হারে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে ২ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ও ১.৩৬ শতাংশ মাথা পিছু খাদ্যের চাহিদা বাড়ার জন্য। সমীক্ষায় বলা হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে দিনে ২৫০০ ক্যালোরি পায় এই হিসাবে যদি শস্য সরবরাহ করা হয় তবে ৪৮ কোটি লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ লোককেই অভুক্ত থাকতে হবে। আর খাদ্য যদি প্রত্যেকে দিনে ৩১৯০

ক্যালোরি করে পায় (যেমন আমেরিকানরা পায়) তা হলে ১৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি লোককে অভুক্ত থাকতে হবে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩.১.৬৬)

এই থিয়োরির সূত্রে ভারতে অভুক্তের সংখ্যা জানা শেষ পর্যন্ত কত কোটিতে দাঁড়াল তা অনির্ণীত থাকলেও দেশ যে দুর্ভিক্ষের কিনারায় এ তথ্য অজানা নেই বিশ্বের কারো। স্বয়ং পোপ বিচলিত হয়ে অনাহারক্লিষ্ট ভারতবাসীর জন্য অর্থ পাঠিয়েছেন। পোপ পল ভারতের খাদ্য সংকটে সাহায্য পাঠাবার জন্য আবেদন করেছেন সবাইকে।

খাদ্যসংকট-কবলিত ভারতের জন্য আমেরিকা পি.এল ৪৮০ অনুযায়ী অতিরিক্ত ১৫ লক্ষ টন গম সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে। তাছাড়া সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যাণ্ডস, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া প্রমুখ দেশ। বিশ্বখাদ্য সংস্থা ভারতের জন্য ৫৪ হাজার টন বরাদ্দ করেছে। এমনকি আর্মস্টারডামের কুড়িটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত ভারতে খাদ্য পাঠাবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। নেদারল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার হাতে ঐ টাকা তুলে দেওয়া হবে।

২৮ জানুয়ারি '৬৬ নতুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে জানালেন, 'সবাইকে খাদ্য দেওয়াই নতুন সরকারের কাজ এবং তার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য আমদানির পরিকল্পনা করা হয়েছে'। অর্থাৎ আমদানির উপর নির্ভরতাই সরকারের খাদ্য নীতির বৈশিষ্ট্য। ইতিমধ্যে খাদ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শাহনওয়াজ খান পশ্চিম ইয়োরোপের নানা দেশ সফর করে বেড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য এই দেশগুলিকে ভারতের প্রায়-দুর্ভিক্ষ বিষয়ে অবহিত করা।

৮

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা লেগেই ছিল। ফসল ভালো হলেও তার ব্যতিক্রম হত না। খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং দর বেঁধে দেওয়া -এর কোনোটাই রাজ্য সরকার কোনো দিন কার্যকর করতে পারেনি সার্থকভাবে। অতএব খাদ্য আন্দোলন এখানে বাৎসরিক অভিজ্ঞতা। প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্যের দাবিতে সত্যাগ্রহ এক পরিচিত দৃশ্য।

বর্তমানে পরিস্থিতি আরো জটিল যেহেতু গোটা দেশ জুড়ে খাদ্য সংকট। অস্বাভাবিক যেটা সেটা হল আমন ধান ও অন্যান্য ফসলের ভালো ফলন অথচ খাদ্যাভাব। খাদ্য সংকট মোকাবিলার কর্মসূচি :

কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং (মাথা পিছু চাল ও গম মিলিয়ে মোট ১৯০০ গ্রাম, মফস্বল শহর ও অকৃষক মানুষজনের জন্য আধা রেশনিং, লেভির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত ধান চাল সংগ্রহ ও জেলা কর্ডনিং (তার আওতায় কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল) এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ।

নীতিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী/খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের কর্মসূচি আপত্তিকর কিছু ছিল না। কার্যত যা দাঁড়াল তা এক কথায় চরম বিপর্যয়। সরকারি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ টন ধান

ধানকল থেকে ৮ লক্ষ টন, ১১/২ লক্ষ টন গ্রামীণ সমবায় ও ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন পঞ্চায়েত ও সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার কথা। কিন্তু তা সম্ভব হল না যেহেতু গলদ। লেভির ধান সংগ্রহের সরকারি দর ছিল মণ প্রতি ১৫/১৭ টাকা, যেখানে বাজার দর ৩৫ টাকা। অতএব বিরাট ব্যবধান।

বসিরহাটের মহকুমা শাসক জানাচ্ছেন যে ২ একরের বেশি জমির মালিকরা লেভির আওতায় পড়ছে দেখে অল্প জমির মালিকরা হতাশ। বাজারে যেখানে এক বস্তা ধানের দাম ৪০ টাকা সেখানে সরকারের দাম ২১ টাকা। একে এসব অঞ্চলের ধান ভালো হয়নি, তার ওপর পোকার আক্রমণ আছে। নতুন ধানের মরশুমেই বসিরহাটে চালের কেজি ১.৪০ টাকা থেকে ১.৫০ টাকা। গোসাবায় যে চাল বিক্রি হয়েছে ২৬ টাকা মণ দরে তা বসিরহাটে বিক্রি হচ্ছে ৫৭ টাকা মন দরে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৯.১.৬৬)

তার অনিবার্য পরিণতি জোতদার মহাজন ও ধনীচাষীরা তাড়াতাড়ি ধান কেটে ট্রাক ও গরুর গাড়ি বোঝাই ধান বিহার আর পূর্ব পাকিস্তানে পাচার করতে থাকে। অথচ কর্ডনিং ও লেভি-চোরদের গ্রেপ্তার করার জন্য তিরিশ হাজার পুলিশ মোতায়েন। তাদের নাকের ডগা দিয়েই এসব ঘটতে থাকে।

সরকারি হিসেব ছিল লেভির ধান এবং তার সঙ্গে পি.এল ৪৮০-র গম মিলিয়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু রাখা সম্ভব হবে। নতুন লেভি ব্যবস্থায় বড় জোতদার আর মহাজনেরা লেভির সামান্য আঁচড় খেয়েই নিষ্কৃতি পেল। আর সরকার লেভির নামে কম দামে সাধারণ কৃষকের ধান প্রায় কেড়ে নিয়ে এবং অভাবজনিত বিক্রির কিছু ধান নামমাত্র দামে কিনে পাঁচ ছ'লাখ টনের বেশি যোগাড় করতে পারল না। সরকারি সূত্রে জানা যায়, ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি জেলা রেকর্ড করেছে; সবচেয়ে কম হাওড়া জেলা ২ টন আর সবচেয়ে বেশি বীরভূম ৫০ হাজার।

লেভির ধান আদায় ও কর্ডনিং ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে মাঝে মাঝে পুলিশকে বিপাকে পড়তে হয়। *আনন্দবাজারে*-এর সংবাদসূত্রে প্রকাশ: ৬ জানুয়ারি হাওড়ার বাগনান থানার নোয়াপাড়া চেক পোস্টের কাছে কর্ডনিং পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সংঘর্ষে এক এস.আই, এক কনস্টেবল ও এক হোমগার্ড আহত হয়। চালপাচারকারী সন্দেহে পুলিশ এক যুবককে আটক করলে দু'তিনশ লোক পুলিশকে আক্রমণ করে। উত্তেজিত জনতা আহত এস.আই-কে দিয়ে 'অপরাধ করেছি' বলে স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়।

আর একটি ঘটনা পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকায়। ৫ ফেব্রুয়ারি এক বাড়িতে লেভির ধান আনতে গেলে গৃহস্বামী দুইজন কনস্টেবলকে আটকে রাখেন। পরে পুলিশ গিয়ে দু জনকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে ২৪ পরগণার একটি এলাকায় রেশনের দাবিতে ৫০০ লোক অঞ্চলপ্রধানকে ঘেরাও করে। তারা যাবার আগে শাসিয়ে যায় যে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রেশনের ব্যবস্থা না হলে তারা অনশন শুরু করবে।

না, রেশন পাওয়া যাচ্ছে না। ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের রেশনের দোকানদারদের অভিযোগ : খাদ্য দপ্তর হপ্তায় তিন দিনের চাল গম পাঠায় না। যা পাওয়া যায় তাও অনিয়মিত। তার জন্য কালোবাজারিরা সুযোগ পাচ্ছে। বারুইপুর, ক্যানিং, জয়নগর, হালতু ইত্যাদি অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয়, কারণ এসব এলাকায় উৎপাদন খুব কম। আশংকা দু'এক মাসের মধ্যে অবস্থা

আরও খারাপ হবে। আংশিক রেশন ব্যবস্থা কার্যত ব্যর্থ হওয়ায় ঐসব এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন। ইতিমধ্যে বারুইপুরে চাল নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের হাঙ্গামাও কম-বেশি হয়েছে।

৫ জানুয়ারি বিধানসভায় ননী ভট্টাচার্য (আর.এস.পি) প্রমুখ কয়েকজন বিরোধী সদস্য অভিযোগ করেন: কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেকক্ষেত্রে আংশিক রেশনে চাল গম দেওয়া হচ্ছে না। কর্ডনিং-এর জন্য বাইরে থেকেও খোলা বাজারে চাল আমদানি প্রায় বন্ধ। ফলে প্রতি কেজি চালের দর দুই থেকে আড়াই টাকা। নতুন চাল ওঠা সত্ত্বেও মফস্বলে চালের কেজি ১.৫০ থেকে ২.০০ টাকা। কাশীকান্ত মৈত্র বলেন, নদীয়া জেলার অবস্থাও ঐরকম।

বাংলার পল্লীঅঞ্চলে খাদ্য সংকট যে চরমে উঠছে, তার চেহারা স্পষ্ট হয় খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই। ২৮ জানুয়ারি *আনন্দবাজার*-এর পাতায় ভেসে ওঠে তার কয়েকটি খণ্ডচিত্র।

রঘুনাথগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ) খাদ্য সংকট চরমে, এমন কি যাদের জমি আছে তারাও সংকটাপন্ন। রেশন তাদের জন্য বন্ধ। সরকারি কর্মচারীদের দাবি, ধান দিন তবে ধান চাল আনার পারমিট পাবেন। এখানে কোন মিল নেই, যেখানে নগদ দামে ধান বিক্রি করা যাবে। কড়াকড়ি সত্ত্বেও ধান চাল পাচার বন্ধ হয়নি।

ময়নাগুড়ির সংবাদদাতার খবর, এখানে এখনও আংশিক রেশন চা[illegible] হয়নি। অনেকে উপোস দিচ্ছেন অথবা আধপেটা খেয়ে রয়েছেন।

দীঘার সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, যেভাবে লেভি বসানো হয়েছে তা ভয়ানক। আউশ ধানের জমি থেকে বাগান, পুকুর, বাড়ি সব লেভিতে ধরা হয়েছে। চাষীরা বলছেন, প্র[illegible]ত উৎপাদনের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতি একরে ধার্য ধানের পরিমাণও বেশি।

সান্ধ্য দৈনিক *প্রতিদিন*-এর (৮.২.৬৬) সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, হাবড়ায় চালের কেজি ন'সিকেয় উঠেছে। যাঁদের চাল কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁরা চালের অভাব বাঁধাকপি আর আলু দিয়ে পূরণ করছেন। হাটে চাল উঠলেই পুলিশ ধরছে। শোনা যাচ্ছে, রক্ষকেরা আটক চালের অর্ধেকের ভক্ষক হচ্ছেন।

৯

অতএব পশ্চিমবঙ্গে চালের চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত। সরকারের খাদ্যনীতির অবধারিত ফল। লেভি ব্যবস্থার কঠোরতা—এমন কি মুড়ি চিঁড়ে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণাধীন। কলকাতা ও মফস্বলের মধ্যে এবং উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি জেলার মধ্যে লৌহদৃঢ় কর্ডনিং সবই রয়েছে। তবুও কালোবাজারের রমরমা এবং কতকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে। খবরের কাগজের পাতা থেকে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে এখানে :

১ জানু : একমাত্র বর্ধমান রেঞ্জে খাদ্যশস্য নিয়ে চোরাকারবারের অভিযোগে গত ডিসেম্বর মাসে ২৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক ছোট বড় জোতদার রয়েছে। মেদিনীপুর, বর্ধমান ও পুরুলিয়া থেকে ৭ জন কুখ্যাত চোরাই চালানদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দেখা যাচ্ছে ধরপাকড় সত্ত্বেও চালের চোরাচালান অব্যাহত।

৪ঠা জানু : বীরভূমের খয়রাশোল থানা এলাকা দিয়ে বিহারে ধান পাচারের সময় চোরাচালানদারদের সঙ্গে কর্ডনিং পুলিশদের মারপিট হয়।

এই ঘটনার পর সীমান্তে ধান চাল পাচারকারীদের উপর প্রয়োজনে গুলি করার সরকারি নির্দেশ এসেছে। পুরুলিয়া, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান ও বীরভূম থেকে বিহারে চাল পাচার হচ্ছে।

৯ই জানু : জনৈক সরকারি কর্মচারীর সহায়তায় বীরভূম থেকে বিহারে চাল পাচার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য ভক্তিভূষণ মণ্ডল এই অভিযোগ করলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অভিযোগে প্রকাশ, গত ২৮ ডিসেম্বর বীরভূমের খয়রাশোল, দুবরাজপুর ও রাজনগর ইত্যাদি সীমান্ত দিয়ে ১৫০টি চাল বোঝাই গরুরগাড়ি বিহারে যাচ্ছে। সংবাদ দেওয়া হলে কর্তৃপক্ষ ৩১টি গাড়ি আটক করেও ১১৯টি গাড়ি ছেড়ে দেন।

নতুন ধান ওঠার পর থেকে ফসলের দামের প্রকৃত নিয়ন্তা চোরাকারবারিরা। তাই ধানের দাম দিনে এক, রাতে আর-এক। দিনের ক্রেতা সরকার আর রাতের ক্রেতা চোরাকারবারি।

বীরভূম জেলার মুরাড়ই থানায় মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বিশোর, মদাশিবপুর, মিনপুর ইত্যাদি গ্রামে ও মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার মীরজাপুর, জামুয়ার অঞ্চলে ধানের দাম দিনে ১৫ টাকা, রাতে ২৭ টাকা। দিনে কেনাবেচা নেই বললেই চলে, কিন্তু রাত ১০টার পর আসল খদ্দেররা ঘোড়ায় চড়ে আসে। বেশি দামে কেনা ধান বেচা হয় কুট্রিম বা যারা ধান কাটে তাদের কাছে।

নদীয়ার করিমপুর থানার সর্বত্র ধান চালের দর হু হু করে বাড়ছে। বড় চাষী ও জোতদাররা ধান লুকিয়ে ফেলেছে লেভি দেবার ভয়ে। বলছে, ধান নেই। ৩৪ টাকা বস্তা দরে আগাম দাম রেখে এলে রাতে খদ্দের ধান পেয়ে যাচ্ছে।

স্থলপথে নয় শুধু, জলপথেও ধান চালের চোরাই চালান চলছে ব্যাপক হারে। হুগলী নদী দিয়ে, বিশেষ করে হলদিয়া থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত প্রতিদিন শত শত নৌকায় চোরাই চালান চলে। ২০ জানুয়ারি ডায়মণ্ডহারবারের কাছে পাটের নৌকায় ৩০ মণ ধান পাওয়া গেছে। ২৩ শে জানুয়ারি খড় বোঝাই নৌকো থেকে পাওয়া যায় ২৫ বস্তা ধান। ২৫ জানুয়ারি সুতাহাটা পুলিশ নদীতে একটি বোট থেকে উদ্ধার করে ৫ মণ ধান ও ৬ মণ চাল।

চোরাচালানের সহজতম মাধ্যম রেলপথ এবং রেলপথেই চলে চোরাই চালানের সিংহভাগ। শিয়ালদহ-বনগাঁও সেকশনে মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে বস্তা বস্তা চাল নামিয়ে দেয়া হয়। দমদমে প্রচুর পুলিশ থাকা সত্ত্বেও পাঁচশ গজ দুরে ঐ ঘটনা ঘটছে। উর্দিপরা কুলিরা এতে সাহায্য করে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখছেন, দলে দলে দুঃস্থ মেয়েরা চাল পাচারে নেমে পড়েছে। তারা ভোর রাতেই লেগে যায় কাজে। দিনে তাদের ৪০ থেকে ৭০ টাকা রোজগার। তাদের পিছনে আড়কাঠি এবং আরও পিছনে মারোয়াড়ি মহাজন। (*মার্জিনাল ম্যান*, পৃ. ৩৭২)

রেলের কামরায় মেয়েদের কোঁচড়ের ৪/৫ কেজি চাল নিয়ে পুলিশ ও হোমগার্ডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এখন দৈনন্দিন দৃশ্যে পর্যবসিত। মানসম্ভ্রম ও নারীত্ব আপাতত মূলতুবি। মা-র সঙ্গে বাচ্চারাও এই পেশা ধরেছে। ঘি ও সর্ষের তেলের ছোটো ছোটো টিনে চাল ভরে তারা লোকাল ট্রেনে দিনে চার-পাঁচবার যাতায়াত করে।

ট্রেনে চালপাচার সূত্রে মাঝে মাঝে পাচারকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়ে থাকে। সে রকম বড় একটি ঘটনা ৮ জানুয়ারি সকালে বেগমপুর স্টেশনে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ। হাওড়া—বর্ধমান কর্ডলাইনের বেগমপুর স্টেশনে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৩ রেল পুলিশ, ১ হোমগার্ড, ও সাধারণ জনতার ৮ জন আহত হন। পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার ও ১৫০ কিলো চাল উদ্ধার করে।

চাল বহন করার জন্য এক বিশেষ ধরণের জামা এখন এখানে-সেখানে দর্জির ঘরে পাওয়া যায়। দাম ৫ থেকে ৬ টাকা। ঐ জামা ৮ থেকে ১০ কিলো চাল বহন করতে পারে। ফতুয়ার মতো প্রথম চাল ভরা জামা পরে তার ওপর অন্য পোশাক পরা হয়। হুগলী পুলিশ সম্প্রতি চালের জামা-পরা এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৬.১.৬৬)

১৯৬৬ সালের শুরুতে পুলিশ বাহিনীর প্রধান কাজ ছিল কর্ডনিং কার্যকর করা ও চালের চোরাচালানকারীর মোকাবিলা। চালপাচারকারীরাই তখন প্রধান আইনভঙ্গকারী। লক্ষণীয় যে অস্বাভাবিক খাদ্য সংকটের পরিস্থিতিতে যা ঘটতে পারত সে ধরনের ব্যাপক লুঠতরাজ কিছু ঘটেনি। গুরুতর আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি তার ফলে। লুঠপাটের উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র দু'টি। ১ জানুয়ারি আসানসোল থেকে কয়েক মাইল দূরের শ্রীপুর কয়লাখনির কিছু শ্রমিক দুটি মুদির দোকান লুঠ করে। চালের খোঁজে গিয়ে চাল না পাওয়ার কারণেই দু'হাজার টাকার ছোলা, ঘি, মশলা নিয়ে তাঁরা চলে যান। পরে আটাশ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরের ঘটনাটি হাবড়ার ভবকুণ্ডায় ঘটে ৩০ জানুয়ারি। ধান ভাঙা কল থেকে চাল নিয়ে ফেরার সময় একজন চাষীর চাল লুঠ করে একদল লোক। তাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় তিন জন।

৯ জানুয়ারি (রবিবার) *আনন্দবাজার*-এর সংবাদ শিরোনাম—'রেশন আরও কমছে'। স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন, অতি শীঘ্র কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রেশনের পরিমাণ আরও কমবে। তবে সিদ্ধান্ত পাকা নয়। শনিবার রাজ্য মন্ত্রিসভা এক বিশেষ বৈঠকে একমত হন যে রেশন কমানো জরুরি। বর্তমানে পূর্ণ রেশনিং পরিমাণ চাল ও গম মিলিয়ে ১৯০০ গ্রাম, যা কমে দাঁড়াবে ১৮০০ গ্রামে।

পরের দিন এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রেশনের পরিমাণ রাজ্য সরকার আপাতত না কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিমাণে কমল না বটে, তবে রেশনে চালের দাম বাড়ল। ২২ জানুয়ারি সরকার এক প্রেস নোটে জানালেন,

(১) কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের বিধিবদ্ধ রেশনিং-এ বরাদ্দ চালের বর্ধিত দর (ক) সাধারণ ৮৪ পয়সা কিলো, (খ) মিহি : ৯৬ পয়সা (গ) অতি মিহি : ১.২০ পয়সা।

(২) পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও আসানসোল মহকুমা বাদে বর্ধমান জেলা—চাল : সাধারণ : কিলো ৭২ পয়সা, মিহি : ৭৬ পয়সা, অতি মিহি : ৮২ পয়সা কিলো।

(৩) উপরের ১, ২, এলাকা বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র—সাধারণ চাল: ৮২ পয়সা, মিহি : ৯৪ পয়সা, অতিমিহি : ১ টাকা কিলো।

সাধারণ মানুষজনকে এমনিতেই খোলাবাজার থেকে চড়া দামে চাল কিনতে হয় যেহেতু রেশনের বরাদ্দ দিনে একবেলা খেতেও কুলোয় না। অতএব রেশনে চালের দাম বাড়াতে তাদের উপর কতখানি চাপ বাড়ল তা বোঝা যায় তার আর্থিক সঙ্গতির দিকে তাকালে। এক

সমীক্ষায় (জুলাই ১৯৬১) প্রকাশ, : নিম্ন, মধ্য আর উচ্চ আয়ের লোকদের গড়ে মাসিক উপার্জন ছিল যথাক্রমে ৬০-৩৫০ টা., ৩৫০-৭০০ টা., আর ৭০০ টা.-এর বেশি। অপর দিকে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাতাসহ নিম্নতম বেতন মফস্বলে অন্তত ১০০ টাকা আর শহরে ১২৫ টাকা করার দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১ জুলাই '৯৩)

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে খোদ কংগ্রেসের মধ্যেও চাপা অসন্তোষ জমতে থাকে এবং তা প্রকাশ্যে ভেসে ওঠে ৫ ফেব্রুয়ারি সুভাষবাগে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের মঞ্চে। সেখানে সভাপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, লেভি ব্যবস্থার কিছু বদল অবিলম্বে দরকার। লেভির ধানের দাম বাড়ানো দরকার বলে জানান তিনি। শ্রী সতীশ সামন্ত, এম.পি. বলেন যে, যেভাবে লেভি কার্যকর হচ্ছে তাতে কংগ্রেস-সেবক হয়েও মানা যায় না সর্বক্ষেত্রে।

এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তী বলছেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠন তো জমিদার, জোতদার, চালকলের মালিক আর ব্যবসাদারদের নিয়ে তৈরি। সরকারের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান আর কর্ডনিং-এর ফলে এরা ক্ষতিগ্রস্ত। প্রফুল্লচন্দ্র সেন লেভি-চোরদের ধরবেন, তারা যে কোনো দলের হোক না কেন। অতএব গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ওপরই ধাক্কাটা বেশি গিয়ে পড়ল। এটাও লক্ষণীয় যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট আসনের শতকরা সাতাত্তর ভাগই গ্রামীণ। পশ্চিমবাংলায় খাদ্য সংকট যখন চরমে এবং তার বিরুদ্ধে বিরোধীরা আন্দোলনের জন্য কোমর বাঁধছে, তখন কংগ্রেস কার্যত দর্শকের ভূমিকায়। উপরন্তু প্রফুল্ল সেনের মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে কানাকানি চলতে থাকে। (*মার্জিনাল ম্যান*, পৃ. ৩৭২)

১০

সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে জমা হচ্ছিল পাহাড়প্রমাণ অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। প্রতিবাদ ও অবাধ্যতার কয়েকটি দৃষ্টান্তও ছিল এখানে ওখানে। ১ জানুয়ারি চিনাকুড়ি ও শীতলপুর খনির শ্রমিকরা খাদ্যশস্যের দাবিতে প্রতীক ধর্মঘট করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি মালদহে কয়েকশ মানুষ পুরনো মালদহের কর্ডনিং এলাকা থেকে চাল সংগ্রহে যায়। বাধাদানের সঙ্গে সঙ্গে জনতা ক্ষেপে যায়। পুলিশ আসে ও গুলি চলে। ফলে একজন নিহত ও দুজন আহত হন। ঘটনাস্থল চাচমারিগ্রাম এবং জনতার অধিকাংশ কালিয়াচকের বাসিন্দা। সেখানে এবার ধান হয়নি এবং চালের দর ২ টাকা কেজি। ৯ ফেব্রুয়ারি বারাসাত এলাকায় পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে স্থানীয় ছাত্ররা ধর্মঘট করে। কয়েকজন ছেলেমেয়ে মহকুমা শাসকের বাড়ির সামনে জমা হয়ে ধ্বনি দেয়।

খাদ্যের দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সহ দশটি বামপন্থীদল ২৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁদের কর্মসূচি ছিল ৫ মার্চ খাদ্যের দাবিতে কনভেনশন। সান্ধ্য দৈনিক *প্রতিদিন* ৪ ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রস্তাবিত আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হল।

সম্পাদকীয়

ডাক এসেছে

'ডাক এসেছে। সে ডাক আন্দোলনের, ঐক্যের আর সংগ্রামের।...

...খাদ্যের আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে কুখ্যাত ভারতরক্ষা আইন বাতিল ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন। খাদ্যের সংগ্রাম আর গণতন্ত্ররক্ষার সংগ্রাম এক ও অবিভাজ্য।

না, ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন তাঁদের ছক অনুযায়ী ঘটল না। ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হল সম্পূর্ণ অন্য খাতে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই শুরু হল খাদ্য সংকটের পাশাপাশি কেরোসিন সংকট। বাজার থেকে কেরোসিন উধাও। পশ্চিমবাংলার ৩৮ হাজার গ্রামে আলো নিভে গেল। একে তো বারাসাত, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জের মানুষ এক মাস চালের মুখ দেখেননি, তার উপর রাতের বেলায় প্রায় একমাস কেরোসিনের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ।

৯ ফেব্রুয়ারি একটি মার্কিন জাহাজ 'পি.এল. ৪৮০' গম নিয়ে কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছাল এবং তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল বসিরহাটে স্কুলের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা কেরোসিনের দাবিতে মিছিল করে আদালতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর সৃষ্টি হ'ল এক নয়া ইতিহাস।

রক্ত ও আগুনের মিতালিতে জন্ম নেয় এক নতুন দৃশ্যপট। তার বিশ্বস্ত বিবরণ উৎকলিত করা হচ্ছে সান্ধ্য দৈনিক *প্রতিদিন*-এর পাতা থেকে।

(১৭ ফেব্রুয়ারি) বৃহস্পতিবার

খাদ্যের মিছিলের উপর বসিরহাটে পুলিশের গুলি চালনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় বসিরহাট শহরে অধিক খাদ্যের দাবীর ওপর সহস্রাধিক ছাত্র ও কৃষক জনতার এক মিছিল হয়। এস.ডি.ও. কোর্টের সম্মুখে এই মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে একজন শিক্ষক সহ ছয়জন গুরুতর আহত হয় এবং কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে বসিরহাটে গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পুলিশ ১১ রাউণ্ড গুলি চালায় ও ১০৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সাবাস বসিরহাট!

বসিরহাটের ছাত্রদের অভিনন্দন। অভিনন্দন বসিরহাটের সংগ্রামী জনগণকে। পশ্চিমবাংলার মানুষকে তারা পথ দেখিয়েছে। পুলিশের লাঠি বা গুলি কোনও কিছুই তাদের বজ্রকঠিন সংকল্প, তাদের লৌহদৃঢ় একতাকে ভাঙতে সমর্থ হয়নি। তারা চেয়েছিল খাদ্য, পেয়েছে গুলি আর লাঠি কিন্তু তবু তারা ভয় পায়নি। এগিয়ে গেছে এবং আরও যাবে। তাদের সাথে হাত মেলাবে সারা

বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজ আর সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে, আজ আর কেউই তা নীরবে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজী নয়।

বসিরহাটে পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব, ওয়াক আউট।

বসিরহাটে ছাত্র, শিক্ষকসহ জনসাধরণের উপর পুলিশী অত্যাচার, লাঠি চালনা ও গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আজ মহানগরীর স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ ক্লাস বর্জন করে বেলা ১২টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক কেন্দ্রীয় ছাত্র সমাবেশে যোগদান করে।

বিধানসভায়ও এই বিক্ষোভের ঢেউ পৌছায়। বিরোধী সদস্যগণ দ্বিতীয়বার ওয়াক আউট করেন।

স্বরূপনগরে পুলিশ আজ বিক্ষোভকারীদের উপর ছয় রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করেছে। বসিরহাটে চারিদিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

(*প্রতিদিন* ১৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার)

বামপন্থী ফ্রন্ট কর্তৃক ২২ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদ দিবস পালনের আহ্বান।

আজ সকালে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের সভায় স্থির হয়েছে যে আগামী ২২ শে ফেব্রুয়ারি স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ নুরুল ইস্‌লামের স্মৃতিতে সারা বাংলায় শহীদ দিবস পালিত হবে। আজও বিভিন্ন স্কুল কলেজে ধর্মঘট এবং মধ্যাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা হয়।

শেষ সংবাদ

শহীদ নুরুল ইস্‌লামের শবদেহের আগমন প্রত্যাশায় বসিরহাট শহরের ইচ্ছামতী নদীর দুইপারে হাজার হাজার জনতা ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করছে। নৈহাটি ও শ্রীরামপুরে স্কুল-কলেজে সার্থক ধর্মঘট হয়েছে।

বসিরহাট থেকে যে বিক্ষোভ আন্দোলনের সূত্রপাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা ২৪ পরগণার ২৫০ বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্যারাকপুর নৈহাটি থেকে স্বরূপনগর হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত অন্তত দশটি জায়গায় ছোট বড় সংঘর্ষ ঘটে পুলিশের সঙ্গে। স্বরূপনগরে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপরে পুলিশের গুলি চালনার ফলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলামের মৃত্যু ঘটে। নিহত নুরুলকে ঘিরে শোকের ছায়া নামে বসিরহাট-বারাসাত-ব্যারাকপুর মহকুমার সর্বত্র। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার ছাত্র মহলে। বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বসিরহাটে এদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি হরতাল হয়। সেখানে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কারফিউ চলছে। হাবড়া, বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, ব্যারাকপুর, যাদবপুর, বেহালা, গড়িয়া ইত্যাদি এলাকায় খাদ্য ও কেরোসিনের দাবীতে মিছিল হয়। নৈহাটি স্টেশন এলাকায় হাঙ্গামা হয়। বনগাঁয় ছাত্রসহ একদল বিক্ষোভকারী এস.ডি.ও কে তাঁর অফিসে আটক রাখে ও মহকুমা খাদ্য অফিসে আগুন দেয়। টেলিফোনের তারও কাটা হয়। পুলিশ লাঠি চার্জ করে। বনগাঁর স্কুল ও কলেজে হরতাল হয়। বাদুড়িয়ায় কয়েক শত চাল ব্যবসায়ী, রিক্সা চালক, হাজার দুই ছাত্রের এক মিছিল থানার কাছে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠি চালায়।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও অফিসের সামনে পাঁচশ লোকের বিক্ষোভ সমাবেশ অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। ব্যারাকপুরে ছাত্ররা কেরোসিনের দাবিতে এস.ডি.ও. কে ঘেরাও করে। গড়িয়াতে ছাত্ররা বিডিও অফিসের বোর্ড খুলে নেয়। হাবড়াতেও বিডিও অফিস ঘেরাও হয়। নৈহাটিতে পুলিশ ১৫ রাউণ্ড কাঁদাতে গ্যাস ছোঁড়ে; বাঁকুড়াতেও বিক্ষোভকারীরা বিডিও অফিস তছনছ করে।

বসিরহাটে গুলি চলার ঘটনায় বিধানসভা তোলপাড় হয়। সোমনাথ লাহিড়ী নিহত ছাত্রের নাম উল্লেখ করে বলেন, সরকার খেতে দিতে পারে না, গুলি দিতে পারে। পরে বিরোধীরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের সময় কংগ্রেস সদস্য ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুকে যোগ দিতে দেখা যায়। শ্রী লাহিড়ী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই দাঁড়ানো ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সূচনা করে।

সম্পাদকীয়

সরকার কি চান?

অহিংসার নামাবলীর আড়ালে নেকড়ের হিংস্র থাবা আবার রক্ত ঝরিয়েছে। এক মুঠো ভাত চেয়ে বারো বছরের নুরুল ইসলাম পেয়েছে গুলির স্বাদ।

সরকারের নীতি যে খাদ্যনীতি নয়, দুর্ভিক্ষ নীতি আর দমনের নীতি— বসিরহাটের মানুষকে তা রক্তের বিনিময়ে বুঝতে হয়েছে। তবু মানুষ ভেঙ্গে পড়েনি। এক বসিরহাটের পর বিক্ষোভের ঝড় ছড়িয়েছে সারা মহকুমায়, দক্ষিণের ডায়মণ্ডহারবারেও, সেই ঝড়ঝাপটা আঘাত হানছে।

স্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখায় রূপ নিচ্ছে। স্পর্ধিত সরকার মাথা না নোয়ালে এ শিখা দাবানলের লেলিহান পাখায় দিক ছেয়ে দেবে—সরকার কি তাই চান?

(১৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার)

ব্যাপক সন্ত্রাসরাজ—হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি

যেখানে মানুষ ভাত চেয়েছিল, চব্বিশ পরগণার সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কংগ্রেসী সরকারের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী পুলিশ সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। বসিরহাট, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগরে যে সব ছাত্র কিশোরদের উপরে নির্ব্বিচারে গুলি চালানো হয়েছিল, তাদের কারুরই গুলি কোমরের নীচে নয়। বসিরহাট, স্বরূপনগর, বারাসাত, সোনাহরি সর্বত্র ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা, বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগদুটির সব সরকারি বিদ্যায়তন ২১-২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। মধ্যশিক্ষা পর্যদও এসব এলাকার সব বিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। বেসরকারি সব বিদ্যায়তনকে ঐ অনুরোধ করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ধর্মঘট মোকাবিলার জন্যই বলে মনে করা হচ্ছে। যাতে হাঙ্গামা না ছড়ায় তার জন্য সরকার উড়িষ্যা ও সীমান্ত বাহিনী থেকে সশস্ত্র পুলিশ আমদানি করছেন ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে বামপন্থী নেতাদের ডি. আই. রুলে আটক করেছেন।

ভারতরক্ষা বিধিতে আটক হয়েছেন বনগাঁর দঃ [দক্ষিণপন্থী] কমিউনিস্ট নেতা অজিত

গাঙ্গুলী, শান্তি ভট্টাচার্য্য, সুধীর রায়চৌধুরী, বারাসাতে ছাত্র নেতা পরিমল রায় ও দঃ কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন সদস্য। তাছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছেন হাবড়া থেকে পি.এস.পি. নেতা জিতেন চক্রবর্তী ও সন্তোষ দে, দঃ কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র নেতা সুভাষ দত্ত ও নারায়ণ দে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি সোমবার পর্যন্ত তিনজন এম. এল. এ সমেত হাজার জন গ্রেফতার। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা থেকে ধৃতদের মধ্যে ভারত রক্ষা বিধিতে গ্রেফতার ১০৫ জন। শুধু ২৪ পরগণাতেই গ্রেফতারের সংখ্যা সোমবার পর্যন্ত ৭৫০। সোমবার মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলীতেও ধরপাকড় হয়। হুগলীর সিঙ্গুর থেকে গ্রেফতার হন বিধানসভার দঃ [দক্ষিণপন্থী] কমিউনিষ্ট নেতা অজিত বসু। তাছাড়া ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন দঃ কমিউনিষ্ট নেতা গোপাল ব্যানার্জী, তিন কাউন্সিলার সমর রুদ্র, পরেশ ব্যানার্জী ও বিমান মিত্র। বসিরহাটে যে আটজনকে গ্রেফতার করা হয় তার মধ্যে তিনজন কংগ্রেস কর্মী। শান্তি রক্ষার জন্য মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে দু-ব্যাটেলিয়ান পুলিশ আনা হয়। হুগলীর আমনানের অঞ্চলপ্রধান ব্রজগোপাল নিয়োগী এবং প্রবীর সেন, অরবিন্দ গুহ প্রমুখ ৭জন গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সম্পাদক কমলেন্দু গাঙ্গুলী।

এদিন বসিরহাট বার লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে ৩০ জন গণ অনশন আরম্ভ করেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীমতী সবিতা ঘোষ। সাতদিন চলবে অনশন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির যুক্ত আহ্বায়ক যতীন চক্রবর্তী জানান বিনা প্ররোচনায় গ্রেফতারে তাঁরা মর্মাহত। অধ্যাপক হুমায়ূন কবীর এক নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দেন।

শহীদ নুরুল ইসলামের মৃতদেহ ২১ শে ফেব্রুয়ারী তেঁতুলিয়া স্কুলের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

প্রতিদিন (২৩.২.৬৬)-এর সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বারাসাত ও বনগাঁয় হরতাল সফল। আজ দোকানপাট, যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। এই অঞ্চলের সমস্ত বাসরুটে বাস চলাচলও বন্ধ। বারাসতে একটি সরকারি জীপ ভস্মীভূত হয়েছে।

২৪ পরগণায় বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে কলকাতার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মিলিত সংস্থা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ২২শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শহীদ দিবস পালন করেন। দুপুর ১টায় কলেজ স্কোয়ারে ছাত্ররা কালোব্যাজ ধারণ করে মিলিত হয়। সভাশেষে ছাত্রদের মিছিল বিধানসভার দিকে যায়। রাজভবনের দক্ষিণ ফটকে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে।

পরের দিন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগণার নানা স্থানে ট্রেন আটক, হরতাল, সরকারি বাসে অগ্নিসংযোগ, পটকা বিস্ফোরণ, যানবাহন চলাচলে বাধাদান, পুলিশের লাঠিচার্জ— পরিণামে প্রায় ২০০ জন গ্রেফতার। ঘটনাবহুল বুধবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) এভাবে কাটে। হাঙ্গামা মোটামুটি ২৪ পরগণাতে সীমাবদ্ধ থাকে। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় নানা স্থানে ট্রেন অবরোধের ফলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এদিন বনগাঁ ও বারাসত মহকুমার বেশির ভাগ স্থানে হরতাল হয়। দোকানপাট বন্ধ ছিল। বহু বেসরকারি বাস বন্ধ ছিল। গ্রেফতারের সংখ্যা আজ পর্যন্ত দু'হাজারের মতো। ১১ বছরের বালকেরাও গ্রেফতার এড়াতে পারেনি। বারাসত-মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের ধৃতদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ সেনগুপ্ত, ১১

গাঙ্গুলী, শান্তি ভট্টাচার্য্য, সুধীর রায়চৌধুরী, বারাসাতে ছাত্র নেতা পরিমল রায় ও দঃ কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন সদস্য। তাছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছেন হাবড়া থেকে পি.এস.পি. নেতা জিতেন চক্রবর্তী ও সন্তোষ দে, দঃ কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র নেতা সুভাষ দত্ত ও নারায়ণ দে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি সোমবার পর্যন্ত তিনজন এম. এল. এ সমেত হাজার জন গ্রেফতার। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা থেকে ধৃতদের মধ্যে ভারত রক্ষা বিধিতে গ্রেফতার ১০৫ জন। শুধু ২৪ পরগণাতেই গ্রেফতারের সংখ্যা সোমবার পর্যন্ত ৭৫০। সোমবার মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলীতেও ধরপাকড় হয়। হুগলীর সিঙ্গুর থেকে গ্রেফতার হন বিধানসভার দঃ [দক্ষিণপন্থী] কমিউনিষ্ট নেতা অজিত বসু। তাছাড়া ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন দঃ কমিউনিষ্ট নেতা গোপাল ব্যানার্জী, তিন কাউন্সিলার সমর রুদ্র, পরেশ ব্যানার্জী ও বিমান মিত্র। বসিরহাটে যে আটজনকে গ্রেফতার করা হয় তার মধ্যে তিনজন কংগ্রেস কর্মী। শান্তি রক্ষার জন্য মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে দু-ব্যাটেলিয়ান পুলিশ আনা হয়। হুগলীর আমনানের অঞ্চলপ্রধান ব্রজগোপাল নিয়োগী এবং প্রবীর সেন, অরবিন্দ গুহ প্রমুখ ৭জন গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সম্পাদক কমলেন্দু গাঙ্গুলী।

এদিন বসিরহাট বার লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে ৩০ জন গণ অনশন আরম্ভ করেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীমতী সবিতা ঘোষ। সাতদিন চলবে অনশন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির যুক্ত আহ্বায়ক যতীন চক্রবর্তী জানান বিনা প্ররোচনায় গ্রেফতারে তাঁরা মর্মাহত। অধ্যাপক হুমায়ূন কবীর এক নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দেন।

শহীদ নুরুল ইসলামের মৃতদেহ ২১ শে ফেব্রুয়ারী তেঁতুলিয়া স্কুলের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

প্রতিদিন (২৩.২.৬৬)-এর সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বারাসাত ও বনগাঁয় হরতাল সফল। আজ দোকানপাট, যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। এই অঞ্চলের সমস্ত বাসরুটে বাস চলাচলও বন্ধ। বারাসতে একটি সরকারি জীপ ভস্মীভূত হয়েছে।

২৪ পরগণায় বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে কলকাতার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মিলিত সংস্থা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ২২শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শহীদ দিবস পালন করেন। দুপুর ১টায় কলেজ স্কোয়ারে ছাত্ররা কালোব্যাজ ধারণ করে মিলিত হয়। সভাশেষে ছাত্রদের মিছিল বিধানসভার দিকে যায়। রাজভবনের দক্ষিণ ফটকে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে।

পরের দিন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২৪ পরগণার নানা স্থানে ট্রেন আটক, হরতাল, সরকারি বাসে অগ্নিসংযোগ, পটকা বিস্ফোরণ, যানবাহন চলাচলে বাধাদান, পুলিশের লাঠিচার্জ— পরিণামে প্রায় ২০০ জন গ্রেফতার। ঘটনাবহুল বুধবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) এভাবে কাটে। হাঙ্গামা মোটামুটি ২৪ পরগণাতে সীমাবদ্ধ থাকে। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় নানা স্থানে ট্রেন অবরোধের ফলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এদিন বনগাঁ ও বারাসত মহকুমার বেশির ভাগ স্থানে হরতাল হয়। দোকানপাট বন্ধ ছিল। বহু বেসরকারি বাস বন্ধ ছিল। গ্রেফতারের সংখ্যা আজ পর্যন্ত দু'হাজারের মতো। ১১ বছরের বালকেরাও গ্রেফতার এড়াতে পারেনি। বারাসত-মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের ধৃতদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ সেনগুপ্ত, ১১

বছরের ছাত্র অসীম সেনগুপ্ত, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী দিলীপ নন্দী ও নবম শ্রেণীর ছাত্র সমীর ঘোষ।

বসিরহাটে গণ-অনশন অব্যাহত। অনশনের দ্বিতীয় দিনে রঘুনাথপুর হাইস্কুলের শিক্ষক সুনীত কুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৫৬ জন সত্যাগ্রহী অনশনে যোগ দেন।

আগামী ১০ মার্চ 'বাংলা বন্ধ'। শুক্রবার ময়দানের বিপুল সমাবেশে এই ডাক দেওয়া হয়। সমাবেশ আয়োজিত হয় বামদলগুলির সংযুক্ত ফ্রন্ট, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও ছাত্র সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে। সরকারি খাদ্যনীতি ও পুলিশি গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সারা বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ দিবসের অঙ্গ হিসাবে মহানগরীতে এই জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজকুমার চক্রবর্তী এম. এল. সি। নানা দিক থেকে মিছিল আসে। সব থেকে বড় মিছিল আসে ডালহৌসি থেকে। সভার পর ময়দান থেকে এক দীর্ঘ, অন্তত দু'মাইল শোভাযাত্রা আজাদ হিন্দ বাগ পর্যন্ত যায়। মিছিলের ধ্বনি ছিল: 'ডি. আই. রুল পুড়িয়ে ফেলো', 'বাঁচার মত খাদ্য চাই', 'ছাত্রহত্যার জবাব চাই' ইত্যাদি।

২৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার *আনন্দবাজার*-এর সংবাদসূত্রে জানা যায়, রবিবার ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কর্মী সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, বসিরহাট ও অন্যত্র গুলি চালাবার নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। কুমার সিং হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বসিরহাটের ঘটনা উল্লেখ করে প্রস্তাবে বলা হয়: খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে সংগঠিত ছাত্রদের উপর গুলি চালনা এই সভা যৌক্তিক মনে করে না। বরং ধৈর্য ধরলে ঘটনা এতদূর গড়াতে পারত না। বসিরহাটে গতকাল ছাত্রদিবস উপলক্ষে ৭৮ জন ছাত্রছাত্রী অনশন করেন। বারাসতে পালিত হয় শিক্ষক দিবস এবং সেখানে অনশন করেন ৩৬ জন শিক্ষক। সোমবার মহিলা দিবস উপলক্ষে ১০০ জন মহিলা অনশনে যোগ দেন। মঙ্গলবার 'কৃষক দিবস'-এ গ্রামের চাষীরা অনশনে যোগ দেবেন। হাবড়া স্টেশনেও রবিবার একদল ছাত্র অনশন আরম্ভ করেন। হালিশহরেও ২ জন মহিলাসহ ১৬ জন আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য অনশনে বসেছেন।

১১

মার্চ মাসের গোড়া থেকে লক্ষণীয় খাদ্য আন্দোলনের বিস্ফোরক পরিণতি এবং নদীয়া, হুগলী ও কলকাতায় তার বিস্তার। কলকাতা ও মফস্বলে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, শহীদ-শবযাত্রার উপরে পুলিশের লাঠিচার্জ, পার্শ্ববর্তী রেলস্টেশন ভস্মীভূত, রেল লাইন উৎপাটিত, কৃষ্ণনগর শহরের অবস্থা কর্তৃপক্ষের আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাওয়ায় আজ সকালে শহরকে মিলিটারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কলকাতায় প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশন, সরকারি দপ্তর ইত্যাদিতে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে দেখা যায়। শহরে পুলিশ ও মিলিটারির সঙ্গে জনসাধারণের ইতস্তত সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে তিনজন পুলিশ নিহত হয়।

গতকাল পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদের শবযাত্রার উপরে পুলিশের লাঠি চালনাকে উপলক্ষ্য করে সংঘর্ষের উদ্ভব হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা শুধু কৃষ্ণনগর নয়; পার্শ্ববর্তী পায়রাডাঙ্গা, ও মদনপুর স্টেশনেও অগ্নিসংযোগ করে এবং রেল লাইন তুলে ফেলে।

কৃষ্ণনগরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্ভবত ভস্মীভূত; ফলে রাজ্য সরকারের সঙ্গেও শহরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

গতকালের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আজ কৃষ্ণনগরে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করা হয়।

এছাড়া নবদ্বীপ, রাণাঘাট, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদের নানা অঞ্চলে ইতস্তত সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায়। নৈহাটি থেকে কোনো ট্রেন আজ আর চলাচল করছে না এবং এইসব অঞ্চলে উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান।

বাসে আগুন, ট্রামে আগুন, কাঁদানে গ্যাস, কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি, স্কুল-কলেজ আবার বন্ধ। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫. ৩. ৬৬)

এদিন ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, কলকাতা ও হাওড়া সহ প্রেসিডেন্সি বিভাগে আবার সব স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদের দাবি ছিল বসিরহাট মহকুমায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত, সস্তাদরে চাল ও কেরোসিন চাই।

এ উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের নানা মিছিল বের হয়। তারপরই ঐ হাঙ্গামা। ২৪ পরগণা ও নদীয়ার গোলমালের পর কলকাতায় এই প্রথম হাঙ্গামার বিস্তৃতি। গোলমাল প্রধানত উত্তর ও মধ্য কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। বিবেকানন্দ রোডে একটি দোতলা বাস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। কলেজ স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে তিনটি ও শিয়ালদহে একটি বাস আগুনে এবং ইঁটপাটকেলে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাতিবাগানের মোড়ে একখানি ট্রামের প্রথম শ্রেণী আগুনে পোড়ে। এরই অল্প দূরে বিধান সরণির এক জায়গায় ট্রামলাইন উপড়ে ফেলা হয়। শিয়ালদহে বিক্ষোভকারী ও পুলিশে বহুক্ষণ প্রবল খণ্ডযুদ্ধ চলে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ বিকেল চারটে পর্যন্ত প্রায় ৮০ জনকে গ্রেফতার করে। তার মধ্যে ৩০ জন ছাত্র। নানা স্থানে জনতা-পুলিশে সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন আহত হন। তার মধ্যে জনা কুড়ি পুলিশ অফিসার ও কর্মী। বাকি সব ছাত্র ও সাধারণ মানুষ। একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাম প্রিয়তোষ দত্ত (২০)।

প্রতিদিন (৫. ৩. ৬৬)-এর প্রতিবেদন :

কৃষ্ণনগরে কারফ্যু, গুলি, ১জন নিহত

শুক্রবার কৃষ্ণনগর শহরে ছাত্র মিছিলের উদ্দেশ্যে পুলিশ গুলি চালালে আনন্দ হাইত (১৭) নামে এক তরুণ নিহত এবং অন্য তিনজন আহত হন। গুলির সঙ্গে সঙ্গে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে

গ্যাস চলে। গ্যাস ও লাঠির ঘায়ে আহতের সংখ্যা বহু। গুলির পরে শহরের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। সিভিল সাপ্লাই অফিস, জেলার কৃষি দপ্তর, জেলা স্কুল বোর্ড, ল্যাণ্ড কাস্টম্‌, নতুন কালেক্টারেট ভবন এবং আরও অনেক সরকারী অফিসে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

এদিন ধর্মঘটের পরে স্কুল কলেজের ছাত্ররা মিছিল বার করেন। বেলা এগারোটা নাগাদ ডাকঘরের মোড়ের কাছে মিছিল পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ লাঠি চার্জ ও কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। এই সময় কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। গুলি লাগার কিছু পরেই শ্রী হাইত মারা যান। আহত হন সুবোধ নন্দী ও প্রফুল্ল দত্ত। লাঠিচার্জেও বহু ছাত্র ও জনসাধারণ আহত হয়েছেন। গুলি চালানোর পর পুলিশকে বাড়ি বাড়ি ঢুকে গ্রেফতার করতে দেখা গেছে। মারপিটের অভিযোগও করা হয়েছে।

প্রতিদিন-এর সময়োচিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ :

এই রক্ত স্নানের জবাব দাও

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের প্রমত্ত সরকার আবার গুলি চালিয়েছে। কৃষ্ণনগরের রাজপথ স্নান হয়ে গেছে শহীদ আনন্দ হাইতের তাজা রক্তে।

বসিরহাটের পর বাদুড়িয়া। তারপর কৃষ্ণনগর। খুনি এই সরকার একের পর এক শহর ও গ্রামে সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে। জনগণের ভয়ে ভীত সরকার নির্বিচারে গুলি ও লাঠি চালিয়ে নিজেদের চামড়া বাঁচাতে চায়। তাই সারা কলকাতাকে তারা ১৪৪ ধারার নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে। বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্যদের একের পর এক সম্পূর্ণ বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক কায়দায় উৎখাত করা হচ্ছে। কিন্তু সরকার শুনে রাখুন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন শুনে রাখুন, তার এ হিংস্র, বেপরোয়া উলঙ্গ মূর্তি দেখেও জনগণ এতটুকু ভয় পাবে না, এতটুকুও পিছু হটবে না।

খাদ্য তাদের চাই, সে দাবী তারা আদায় করবেই। সারা বাংলাদেশ তৈরী হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে গ্রামের চাষী আর শহরের কলকারখানায় অফিসে আদালতে খেটে খাওয়া শ্রমিক আর কর্মচারীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দেশের ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়। ১০ই মার্চ তারিখে হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ এই বীভৎস দমননীতি আর রক্তের হোলিখেলার জবাব দেবে। মুখ্যমন্ত্রী ও তার শাকরেদরা সেদিনটির জন্য তৈরী হউন।......

কৃষ্ণনগরের আশেপাশে চারটি ট্রেনে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

বিরাটি ও মধ্যমগ্রাম স্টেশনে সিগন্যালরুমে আগুন লাগানো হয়। ১টার সময় ব্যারাকপুর থেকে এক ব্যাটেলিয়ান ফৌজ কৃষ্ণনগর অভিমুখে রওনা হয়েছে। ১২টার পর নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আর কোনও সংবাদ আসেনি।

দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র নদীয়া জেলা জুড়ে।

নদীয়ায় গুরুতর পরিস্থিতি

কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুরে সৈন্যদল তলব।

শনিবারও গুলি : অফিসের পর অফিসে আগুন, রেল-বগি ছাই, অন্ততঃ তিনটি প্রাণ বিনষ্ট।

পায়রাডাঙ্গা, মদনপুর এবং কৃষ্ণনগর স্টেশনও আক্রান্ত এবং এই তিনটি স্টেশনেই অগ্নি সংযোগ করা হয়। ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিপুরে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে কয়েকঘণ্টা ব্যাপী হাঙ্গামার দরুণ শান্তিপুরের ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া শাখা অফিস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরে সকাল ৬টা অবধি কারফ্যু ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে নদীয়া জেলার হাঙ্গামা বিক্ষুব্ধ কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, ও রাণাঘাট শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেনাবাহিনীর সাহায্য তলব করেছেন। বেলা ১২টার সময় কৃষ্ণনগর থেকে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার কলকাতায় মুখ্য সচিবের কাছে রেডিয়োগ্রামে খবর পাঠান; ''অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে।''

'কৃষ্ণনগরের সংবাদদাতা জানান আনন্দ হাইতের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করতে দেওয়া হবে কি হবে না এ সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বৈঠক হয়। আলোচনা ব্যর্থ হলে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই সময় পুলিশ কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে এবং হরি বিশ্বাস নিহত হয় বলে জনতা অভিযোগ করে। পুলিশের গুলিতে এইদিন সুকুমার বিশ্বাস, সত্যেন দাস, হারাণ বিশ্বাস, তুলসী সাঁতরা, অরুণ মজুমদার প্রভৃতি আহত হন। জনতার সঙ্গে পুলিশের নিদারুণ সংঘর্ষ হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শহরের সর্বত্র তাণ্ডব চলে। অবশেষে এগারোটা নাগাদ এস. ডি. ও (সাউথ) শ্রী. এ. কে. পাইনের সঙ্গে কয়েকজন প্রতিনিধির আলাপ আলোচনা চলার পর আনন্দ হাইতের মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে নিতে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে সব স্কুল কলেজ বন্ধ

সরকার এক আদেশ বলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে জানানো হয়, সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত স্কুল-কলেজ পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ১০ই মার্চের 'বাংলা বন্ধ' ব্যর্থ করার জন্য ব্যাপক ধর-পাকড় করা হয়। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৬. ৩. ৬৬)

গ্রেফতারের বেড়াজালে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ :

শনিবার গভীর রাতে পুলিশ কলিকাতা এবং আশেপাশে হানা দিয়ে সাতজন এম.এল.এ, তিনজন এম.এল.সি এবং তিনজন কাউন্সিলার সহ বহু সংখ্যক বামপন্থী নেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন: মোহিত মৈত্র, ডাঃ নারায়ণ রায়, মনোরঞ্জন রায়, সোমনাথ লাহিড়ী, যতীন চক্রবর্তী, হরিপদ চ্যাটার্জী, ডাঃ এ.এম ও গণি, শম্ভু ঘোষ, অপূর্ব মজুমদার, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, সুবোধ সেন, হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী, জনাব সামসুল হুদা, কানাই রায়, বিমল মজুমদার, কানাই ভট্টাচার্য্য। (*প্রতিদিন,* ৬.৩.৬৬)

১২

বৃহস্পতিবার (বিশেষ সংখ্যা) :

পুলিশের গুলিতে ১৪ জন নিহত: অসংখ্য আহত। মিলিটারী তলব। বাংলা বন্ধ। চর্তুদিকে বিস্ফোরণ (*প্রতিদিন*, ১০.৩.৬৬ প্রতিবেদন)

এককথায় অভূতপূর্ব। ১০ই মার্চ সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে ঘটল এক অসামান্য ঘটনা। অতীতের সমস্ত বন্ধ-হরতাল ম্লান ১০ই মার্চের বাংলা বন্ধের কাছে। বিদ্রোহ করেছে বাংলার মানুষ।

আজ খড়দহ, উত্তরপাড়া, রিষড়া, আসানসোল, শ্রীরামপুরে পুলিশের বর্বর গুলি বর্ষণে এ পর্যন্ত ১৪ জন নিহত এবং দেড় শতাধিক গুরুতর আহত হন। জনতা পুলিশ সংঘর্ষে একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের মৃত্যু ঘটে। কোন্নগর, হিন্দমোটর, রিষড়া, শেওড়াফুলি ও আর দুটি অন্য অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী তলব করা হচ্ছে। বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত সরকারী সূত্রে জানা যায় নিহতের সংখ্যা চৌদ্দ। তবে বেসরকারী মতে, এর চেয়ে অনেক বেশী। নিরস্ত্র মানুষ প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ। ইতস্ততঃ ব্যারিকেডের সংবাদ; খড়দহ স্টেশন সন্নিকটে পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে শরৎ বসু কলোনীর বারো বছরের বালক বাবলু দাস সহ তিনজন নিহত এবং ১৬ জন গুরুতর আহত। অন্য দুজন নিহতের মধ্যে আছেন শরৎ বসু কলোনীর মিন্টু দাশগুপ্ত (২০), অন্যজনের নাম জানা যায়নি। দুইজন শহীদের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। এই খুনের খবরে· সমস্ত ব্যারাকপুর অঞ্চলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। খড়দহ থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত রেললাইন উৎপাটিত দেখা যায়।

রিষড়া : আজ সকালে বারাউনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি রিষড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা আটক করে এবং যাত্রীদের নেমে আসতে বলায় তারা নেমে আসে। যাত্রীর সংখ্যা সামান্য। হঠাৎ পুলিশ জনতার ওপরে চড়াও হয়ে প্রথমে লাঠি তারপর বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করতে থাকায় রঞ্জন দত্ত (১৭), শ্রী আব্বাস এবং ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত এবং কয়েকজন ব্যক্তি গুরুতর আহত হন।

হিন্দমোটর: পুলিশের গুলি বর্ষণে শংকর দাস সহ বহু ব্যক্তি গুরুতর আহত হন।

কোন্নগর: নবগ্রাম কলোনীর স্বপন চ্যাটার্জী গুলিতে নিহত হন।

আসালসোল: পুলিশের গুলিতে দুই ব্যক্তি নিহত এবং বহু ব্যক্তি আহত। ঘটনার বিবরণে শোনা যায় বিক্ষুব্ধ জনতা ডিভিশনাল সুপারিনটেণ্ডেন্টের অফিসে চড়াও হয়। আই.এন.টি.ইউ. সির অফিস এবং খাদি প্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত।

উত্তরবঙ্গ: লতাগুড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেন প্রতিরোধ করে। দিনহাটায় পাঁচশ ছাত্র ট্রেন লাইনের ওপরে বসে আছে।

আলীপুরদুয়ার স্টেশনে আগুন

কাঁথি: ধর্মঘটের পর বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়।

উত্তরপাড়ায় পোষ্ট অফিসে জনতার বহ্নি। হিন্দমোটর স্টেশন অঞ্চলে জনতা পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ। কোন্নগর স্টেশনে দুটোয় মিলিটারী এসে পৌছেছে। ডানকুনি গ্রামাঞ্চল থেকে ১০

হাজার মানুষের মিছিল থানার দিকে এগোচ্ছে। শেষ সংবাদ জানা যায়, ঘটনাস্থলে ১২ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। এখন গুলি চলছে।

কলকাতা: আজ শ্যামবাজার অঞ্চলে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি-টিয়ারগ্যাস চালায়। বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা ও টালিগঞ্জ অঞ্চল থেকেও নানা সংঘর্ষের খবর আসে।

মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও

আজ হাওড়ায় দু'টি বিরাট মিছিল শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র সিংহের ও পুরানো কংগ্রেস নেতা শ্রী বিজয় ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ঘেরাও করে বহুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ করে।

উত্তরপাড়ায় কংগ্রেস অফিস ঘেরাও করে বিরাট জনতা পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

১০ই মার্চের আরও ঘটনা যুক্ত করা হল *আনন্দবাজার*-এর প্রতিবেদন থেকে।

হরতালের দিনে বাংলা উত্তাল: বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আগ্নেয় উদগীরণ: মহানগরীতেও মিলিটারী, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি : গ্যাস : মৃত্যু।

মহানগরী কলিকাতাতেও মিলিটারীর ডাক পড়েছে। শহরতলীর বেহালা, মেটিয়াবুরুজ এবং সমগ্র ব্যারাকপুরে ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে। এরমধ্যে দমদম, বরানগরও পড়ে; মেয়াদ সাতদিন রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন ভোর অবধি অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারফ্যু ললাট লিখন।

গুলিতে মৃত্যু

গুলি চলে শংকর ঘোষ লেনে, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ ও বিডন স্ট্রীটের মোড়ে। আরও ছড়িয়ে যতীন্দ্রমোহন এ্যাভিনিউ বরাবর গ্রে স্ট্রীটে ও শ্যামপুকুরের মোড়ে। উত্তরে কাশীপুর নর্থ সুবার্বন হাসপাতালের সামনে, দক্ষিণে গার্ডেনরিচের পাহাড়পুর রোডে এবং আরও কয়েক জায়গায়। নিহত আহতের পুরো হিসাব রাত তিনটে অবধি পাওয়া যায়নি। তবে মেডিকেল কলেজে দুজনের মৃতদেহ আনা হয় এবং ৯ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় আনা হয়। বেসরকারী সূত্রে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। কলেজ স্ট্রীট কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে নিহত অবস্থায় একজনকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অন্যত্র আরও একটি মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়।

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সারাদিন, সারা শহর মোটামুটি শান্ত ছিল। থমথমে কয়েকটি প্রহরের পর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই নানা এলাকায় কৃষ্ণছায়া নেমে আসে। ঠন্‌ঠনের শ্রীমানি বাজার, বিডন স্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ অঞ্চল ও কাশীপুরে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যায়। লাঠিচার্জ ও গ্যাস ছাড়াও পুলিশ কয়েক জায়গায় গুলি চালায়। ওদিকে দক্ষিণে যাদবপুর অঞ্চলে অবস্থা খারাপের দিকে যায়। সেও সন্ধ্যার দিকে । সেই পরিচিত দৃশ্য ও ধ্বনি সদর সড়ক থেকে অলিগলির ভিতর অবধি অস্থির পায়ের ছোটাছুটি; থেকে থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ— বুট, বোমা, গুলির।

রাত্রি ৯টা নাগাদ মিলিটারী টালিগঞ্জ অঞ্চলে পুলিশের সাহায্যে যায় এবং সাড়ে দশটা নাগাদ উত্তর কলকাতায় একটি কোম্পানী বেলেঘাটাতেও যায়।

শিল্পাঞ্চলে গুলি: অন্তত ১৭ জন নিহত

"হরতাল আরও হয়েছে, কিন্তু এবারের এই হরতাল বিক্ষোভের বিপুলতায় ঐতিহাসিক। দীর্ঘকাল পরে এই রাজ্যে এমন চেহারা আবার দেখা গেল।"

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে গুলিতে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু। হিন্দমোটরে-৬, রিষড়ায়-৩, কোন্নগরে-১, আসানসোলে-৬, বেসরকারিসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে খড়দহেও-১, এছাড়া পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরেরও মৃত্যু হয়েছে।

সৈন্যদল উত্তরপাড়া থেকে শ্যাওড়াফুলি পর্যন্ত রেলপথ বরাবর। ৬টি স্টেশন রক্ষার ভার সামরিক বাহিনীর হাতে। আসানসোলেও সৈন্য তলব করা হয়েছে। উত্তরপাড়া থেকে বাঁশবেড়িয়ায় ১১টি পৌর এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১১.৩.৬৬)

পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের দিনলিপি *প্রতিদিন*-এর পাতা থেকে সাজিয়ে দেওয়া হল।

১১.৩.৬৬—আজও ৫ জন নিহত: পথে পথে সংঘর্ষ

বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট-হরতাল

আজ কলকাতায় অক্রুর দত্ত লেন, বেহালা, যাদবপুর, গড়িয়া, শিবপুর, বেলঘড়িয়ায় পুলিশের বেপরোয়া গুলি বর্ষণের ফলে ৫ জন নিহত এবং বহু ব্যক্তি আহত।

গত দু'দিনে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ২০ জন। আর মোট খাদ্য আন্দোলনে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৩৮ জন।

আজ বেহালা, বেলঘরিয়া, পাণিহাটি, দমদম, যাদবপুর, ওয়েলিংটন স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানে পুলিশি অত্যাচারের ফলে জনতা পুলিশে সংঘর্ষ হয়েছে। দুপুর বেলা ১২ টার পর মিলিটারির জি.ও.সি (পূর্ব কম্যাণ্ড)-র সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এক বৈঠকের পর বেহালা মিলিটারির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বেহালায় সংঘর্ষ স্থানীয় থানার সামনে উদ্ভব হয়েছে। বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং ও শখের বাজারে আগুন জ্বলছে। বেহালায় পুলিশের গুলিতে একজন মারা গেছে, আরও কয়েকজন গুলিতে আহত।

আজ সকালে যাদবপুরেও গুলি চলে। গুলিতে একজন মারা গেছে।

শ্যামবাজার, বড়তলা প্রভৃতি অঞ্চলে টহলরত পুলিশের সঙ্গে রাইফেল খাড়া করে মিলিটারি ট্রাকগুলিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার এলাকায় পুলিশ ভীষণভাবে টিয়ার গ্যাস চালায়।

দমদমে বাসের গুমটি জনতার রোষবহ্নিতে ভস্মীভূত। এখানেও পুলিশ সাড়ে এগারোটা নাগাদ গুলি ছোঁড়ে।

পাণিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির কাছে ৪ খান' গাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

ব্যারাকপুর পুলিশ ক্যাম্প থেকে ট্রাক ভর্তি পুলিশের গাড়ি ডানলপ ব্রীজের কাছে জনতা আটক করে।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের কাছে বাসে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

শিবপুর ট্রামডিপোর সামনে গুলিতে ১ জন নিহত এবং ২ জন আহত হন। স্টেটবাস গুমটিতে আগুন, হাওড়া অঞ্চলে কারখানায় সর্বত্র ধর্মঘট।

চন্দননগরে গতকাল জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষ হয়। রেলস্টেশনে ও রেলওয়ে গুদামে আগুন জ্বলতে দেখা যায়, পরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হয়।

মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও

হাওড়ায় মন্ত্রী শৈল মুখার্জির বাড়ী জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

কংগ্রেস ভবনে কড়া পাহারা

আজ সকাল থেকে চৌরঙ্গী রোডস্থিত কংগ্রেস ভবনে কয়েক'শ সশস্ত্র পুলিশের পাহারা রাখা হয়েছে।

১২.৩.৬৬

মহানগরীতে আর একটি আলোড়িত দিন রাত্রি

শুক্রবার মধ্যরাত্রি। লালবাজার থেকে খবর এল, 'স্ট্যাণ্ড ডাউন' নির্দেশ জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ নগরীর অবস্থা আয়ত্তে। তার আগে শহরতলীসহ কলকাতায় আর একটি আলোড়িত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে।

সৈন্যদলের হাতে বেহালার ভার

সকালের দিকে বেহালার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আইন ও শৃঙ্খলার ভার সম্পূর্ণভাবে সৈন্যদলের হাতে ন্যস্ত হয়।

কলকাতায় মুখ্যতঃ পাঁচটি এলাকাতেই এদিন পুলিশ বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। বেশি গুলি বর্ষিত হয় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে টেলিগ্রাম গ্যারেজের সামনে, আনন্দ পালিত রোডে, বাগবাজার স্ট্রীটে ও বি. কে. পাল এ্যাভিনিউয়ে। নগরী ও শহরতলীতে অন্ততঃ ৯ জন নিহত হয়েছেন। অসমর্থিত সংবাদে ১৩ জন।

থানা, ডাকঘর প্রভৃতি সরকারী অফিস ও শহরতলীতে ইতস্তত আক্রান্ত বিক্ষোভের পরিচিত রূপ ছিল। বাস ছিল না; কিন্তু বাসের গুমটি রেহাই পায়নি, দু একটি দুগ্ধ বিতরণকেন্দ্রও উদ্বেলিত জনতার কোপে পড়েছে। এদিনের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ব্যাঙ্কও ছিল অন্ততঃ দু'টি।

বেহালায় সৈন্যদল

বেহালা থানার আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে। বেলা দেড়টা নাগাদ সামরিক বাহিনীর লোকেরা ঐ দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

বেহালার ঘটনার ক্ষতির হিসাব এরূপঃ— তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত, পৌরভবন, ট্রাম, বাস গুমটি প্রভৃতি স্থানও আগুনে ভস্মীভূত। এখানে পুলিশ প্রায় ১৫ রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলির আঘাতে মোট আহতের সংখ্যা ৫। একজনের মৃত্যু।

১৩.৩.৬৬

গুরুতর ঘটনার সংখ্যা যদি পরিস্থিতি বিচারের মাপকাঠি হয়, তবে বলতে হবে গত দু'দিনের অগ্ন্যুৎপাতের পর ক্লান্ত কলকাতা ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। সন্ধ্যার পর সবচেয়ে বড় ঘটনা কলকাতার শ্যামপুকুর থানা এলাকার গিরিশ এভিনিউ-এ রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ মিলিটারি ট্রাক থেকে সেখানে দু'রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়। তার আগে নাকি ঐ ট্রাকে পটকা পড়ে।

এদিকে গার্ডেনরিচ এলাকার বাঁধা বটতলাতেও এক রাউণ্ড গুলি চলে। রাত সোওয়া এগারোটার পর বিডন স্কোয়ারের কাছে গুলির খবর পাওয়া যায়। গ্রে স্ট্রীটে, বি. কে. পাল এভিনিউ অঞ্চলে, বেলেঘাটা মেন রোডে সরকার বাজারের কাছে ও দমদম রোডে গুলি চলছে বলে জানা যায়।

১৩.৩.৬৬

শোকগম্ভীর, প্রতিজ্ঞা দৃঢ় লক্ষ মানুষের যাত্রা

যাত্রাপথ থেকে পুলিশ মিলিটারী প্রত্যাহার।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ডাকে আজ শহীদ দিবসে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শহীদ-বেদীতে লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী এক মর্মস্পর্শী শোকগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানায়। কাতারে কাতারে অশ্রুসিক্ত মানুষ এসে দাঁড়ায় ঐ বেদীর সামনে; সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনে ৪৫ জন শহীদের বীরত্বের কথা স্মরণে নত করে শির, তারপর প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় আশ্চর্য ভাস্বর মুখগুলি জ্বলজ্বল করতে থাকে। সমস্ত স্কোয়ারটি যেন আজ এক তীর্থক্ষেত্র; স্কোয়ারের সমস্ত দিক ঝাঁপিয়ে উঁকি মারে মানুষ, দেখতে চায়, এগিয়ে যায় ঐ শহীদ বেদীর দিকে। ওরা এবার পুষ্প স্তবক আর মাল্যে আবৃত শ্বেত শুভ্র শহীদ বেদীটিকে কাঁধে তুলে নেয়। জোয়ানরা তারপর ধীর পদক্ষেপে এগোয় দেশবন্ধু পার্কের দিকে। কালো ব্যাজ পরিহিত এই শোকযাত্রায় রাজ্যের সকল বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, মজুর, কর্মচারী আজ একাকার হয়ে যায়। শোকযাত্রার দুপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ অশ্রুসিক্ত মানুষ। আজ কলকাতা, হাওড়া এবং শহরতলীতে পাড়ায় পাড়ায় শহীদ বেদী, শহীদ বেদীর সামনে শোক সন্তপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকাদের প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখ। বেদীর শীর্ষে কৃষ্ণপতাকা পথের মোড়ে মোড়ে।

ট্রাম লাইনের পথ রোধ করে শহীদ বেদী, মানুষ নত শিরে এসে দাঁড়ায়। পাড়ায় ছোট ছোট ছেলেরা কোথা থেকে ফুল জোগাড় করে এনে দেয় শ্রদ্ধার্ঘ্য। নিহত শহীদদের ফটো আজ ওদের কত প্রিয়। বীরের মত যারা পুলিশের আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, তাদের মুখ কত আপনার। ওরা একবার নত শিরে শ্রদ্ধা জানায়। আর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তায় দুশমনের শাস্তির দাবীতে থরথর কাঁপতে থাকে ওদের মুখ।

এই শোকযাত্রায় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের দলগুলি ছাড়াও ফ:ব:, পি.এস.পি. দলের নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

মিছিলে ছিলেন শ্রী ভূপেশ গুপ্ত, শ্রী নির্মল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী হেমন্ত বসু, ত্রিদিব চৌধুরী, সাধন গুপ্ত, ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জ্জী, শ্রীমতি রেণু চক্রবর্ত্তী, শ্রী জীবন দে, শ্রী সত্যজিৎ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, শোভা সেন প্রমুখ।

১৫.৩.৬৬

আবার পুলিশের গুলিবর্ষণ বহু ব্যক্তি আহত। নৈহাটিতে ব্যাপক মারধোর ধরপাকড় ১

আজ সকাল ১০টায় নৈহাটিতে পুলিশের গুলিবর্ষণে বহু ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। মারমুখী পুলিশ ঐ অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী ঢুকে ব্যাপক গ্রেফতার, মারপিট করছে বলে জানা যায়।

আজ সকালে নৈহাটি ওভারব্রীজে আগুন লাগে, পুলিশ ঐ স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর বেপরোয়া গুলি চালায়; কত ব্যক্তি হতাহত হয়েছে এখনও জানা যায়নি। ফলে ঐ লাইনে ট্রেন চলাচল ১১টা থেকে বন্ধ আছে।

কারা প্রাচীরের আড়ালে

সদ্যমুক্ত রাজবন্দী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা যায়:

গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী থেকে জনসাধারণের খাদ্যের দাবীকে দমন করার জন্য পঃ বঙ্গের পুলিশি সরকার সাত হাজারের বেশী মানুষকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রেখেছে। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ আরও ২ শতাধিক বন্দীসহ হাজার হাজার শ্রমিক, ছাত্র, নিরীহ পথচারী, কৃষক ও অন্যান্য মানুষ বন্দী রয়েছেন। প্রেসিডেন্সি জেলে যে দেড়শতাধিক বিচারাধীন বন্দী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের বয়স ১৬ বছরের নীচে। তারা প্রায় সবাই-ই সপ্তম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, চায়ের দোকানের বয় অথবা দোকান বাজার করতে বেরিয়ে ছিলেন এমন নির্দোষ পথচারী।

মুখ্যমন্ত্রীর কৈফিয়ৎ

কংগ্রেস সদস্য শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহতদের খতিয়ান দেন। তিনি বলেন যে, পুলিশের গুলি চালনায় ৩৪ জন ব্যক্তি নিহত হন। মাত্র ৮০ জন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। পক্ষান্তরে আহত পুলিশের সংখ্যা ২৩২ এবং নিহতের সংখ্যা একজন পুলিশ অফিসার সহ দু'জন বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি জানান, এই সময় ৬১টি সরকারী অফিস ভস্মীভূত, ৪০টি ট্রেন ট্র্যাক (স্টেশন সহ) ক্ষতিগ্রস্ত, এক শটি রেল-ওয়াগন ও কোচ ভস্মীভূত হয়।

১৭.৩.৬৬

শহীদ তহবিল

সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনে পুলিশ ও মিলিটারীর লাঠি ও গুলিতে নিহত শহীদদের পরিবারকে সাহায্যার্থে মিনার্ভা থিয়েটার কর্তৃপক্ষ 'কল্লোল' নাটকের একদিনের অভিনয়ের উপার্জিত সমস্ত অর্থ শহীদ তহবিলে দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

২০.৩.৬৬

২৭শে মার্চ সকালে গণ-সংগ্রহ

২০শে মার্চ সকাল ৯টায় টালিগঞ্জে টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে পঃ বাংলার চলচ্চিত্র ও মঞ্চের শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রমিকদের একটি সভায় আগামী ২৭শে মার্চ কলকাতায় খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের জন্য অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন শ্রী মধু বসু, সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জী, ভানু ব্যানার্জী, মৃণাল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজয় বসু, সুব্রত মিত্র, উৎপল দত্ত, তরুণ মজুমদার প্রমুখ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মধু বসু। সভার বক্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, বিকাশ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দোপাধ্যায়, দীলিপ মুখার্জি, অজয় গাঙ্গুলী, শোভা সেন, নীলিমা দাস, শেখর চট্টোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, দিলীপ রায়, অজিত লাহিড়ী, অনুপকুমার, সাধনা রায় চৌধুরী, সুখেন দাস প্রমুখ শিল্পী, কুশলী ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

সভায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রত্যেক শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রমিক কর্মচারী যথাসাধ্য অর্থদান করে একটি সাহায্য তহবিল গঠন করবেন। সভা থেকেই একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি : সত্যজিৎ রায়, সহ-সভাপতি উত্তমকুমার ও শ্রীমতি সরযূ দেবী।

কোষাধ্যক্ষ:— বিমল দে

যুগ্ম সম্পাদক:— অনুপকুমার ও সুনীল রায়।

২১.৩.৬৬

কারা প্রাচীরের অন্তরালে

দমদম জেল থেকে জনৈক সদ্যমুক্ত রাজবন্দীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে প্রায় চার-সাড়ে চার হাজার বন্দীর মধ্যে কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর থেকে ছোট দুধের বাচ্চা ধরে এনে আটক করা হয়েছে কয়েক'শ, যাদের সর্বাঙ্গে প্রচন্ড মারের দাগ ও রক্তাক্ত ক্ষত।

এইসব কিশোরদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ জেলের চৌহদ্দি সর্বদাই ভারী করে তুলতো। ওরা রাত্রের বেলা মা-ঠাকুমা, বাবা-কাকাদের নাম করে কেঁদে উঠতো।

২২.৩.৬৬

লোকের মুখে মুখে পল্লীতে পল্লীতে খুন জখম আর পুলিশি সন্ত্রাসের কাহিনী। সুপরিকল্পিত গণহত্যার উদ্দেশ্যে পুলিশের গুলি বর্ষণ।

বরাহনগর থেকে আগরপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলে, শ্রমিক বস্তিতে, আর মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত পল্লীতে পল্লীতে সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নিরীহ জনসাধারণের ওপর পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর যে বীভৎস অত্যাচার চলছে কদিন ধরে তার জ্বলন্ত সাক্ষ্যগুলি দেখে এসেছি এই অঞ্চল ঘুরে ঘুরে।

বরানগরের সচ্চাষীপাড়া লেনে শহীদ তপন দত্তের বাবা সুরেশচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন যে, প্রথমে তপনকে পায়ে গুলি করা হয়, পরে উর্দ্ধাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। শুধু তপন নয়; নিমাই ঘোষ, সন্তোষ দে, সুধীর চাকলাদার, সুশীল সেন, শান্তি ঘোষ, নারায়ণ দে ও অন্য যে সব শহীদের আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করেছি,সকলেই একবাক্যে এই অভিযোগই করেছেন যে, দেহের উর্দ্ধভাগ লক্ষ্য করে যেভাবে এদের গুলি করা হয়েছে, তাতে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকে না যে, হত্যার সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যেই এদের গুলি করা হয়েছে। ২৭০ নং গোপাল লাল ঠাকুর রোডের বাসিন্দা শহীদ শান্তি ঘোষের বাবা বলেছেন: শান্তির শবদেহ পাবার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষ আমাদের যে হয়রানী করিয়েছে তা সরকারী হৃদয়হীনতারই পরিচয় দেয়। তিনি আরও বলেছেন: মৃতদেহ পাবার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ নির্মম পরিহাসের সুরে বলেছে: 'পোড়াবার খরচ যদি আপনাদের না থাকে তো আমরা কিছু দিতে পারি। আমাদের ওপর সেরকম নির্দেশই আছে।' সচ্চাষীপাড়া লেনের অধিবাসীরা আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, সৈন্যবাহিনীর বেপরোয়া গুলি বর্ষণে নিরীহ ছাত্রী বিজয়া চক্রবর্তী, নিতাই রায় চৌধুরী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, সশস্ত্র পুলিশ নর্থ সুবার্বন হাসপাতালের ছাদের ওপর উঠে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে। আলমবাজারের শিল্প শ্রমিকদের জন্য সরকারী আবাসনের বাসিন্দা শহীদ নিমাই ঘোষের বাবা শ্রী শিবশঙ্কর ঘোষ এই অভিযোগ করেছেন যে, ছুটির পর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের পাইকপাড়া গ্যারেজ থেকে ফেরবার পথে তাঁর ছেলেকে সিঁথি কাঁটাকলের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বরাহনগরের সচ্চাষীপাড়া লেনের বাসিন্দারা আরও জানান যে, অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাজ পরে স্থানীয় কংগ্রেসের একটি দল পাড়ার নিরীহ ছেলেমেয়েদের জোর করে ধরে মারমুখী পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সক্ষোভে তারা প্রশ্ন করেছেন প্রতিরক্ষা আর অন্ধ রাজনৈতিক প্রতিশোধ কি এক বস্তু?

সৈন্যবাহিনীর বেয়োনেট চার্জে কামারহাটির ইণ্ডিয়া পটারীর শ্রমিক নন্দকিশোরের ডান হাতখানি গুরুতর জখম। এখন তাঁর পেট চলবে কি করে?

আগরপাড়া ইলিয়াম রোডের নিকটস্থ অমূল্যধনের বাগানবাড়ীতে একটি চালাঘরে কোনও রকমে দিন গুজরান করেন দীপ্তি হ্যারিকেনের শ্রমিক সন্তোষ দে। বি.টি. রোড থেকে ৭০/৮০ গজ দূরে অবস্থিত সন্তোষ দের চালাঘরের বাঁশের খুঁটিতে দেখলাম বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। আগরপাড়া মহাজাতিনগর কলোনীর ঘরে ঘরেও এই ক্ষতচিহ্ন দেখে এসেছি। নবম শ্রেণীর ছাত্র সুধীর চাকলাদারের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সৈন্যবাহিনীর বুলেট। ২৪ পরগণার এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলে পুলিশ আর সৈন্যবাহিনীর যে নারকীয় হত্যালীলা ও সন্ত্রাস ক'দিন ধরে নিরীহ জনসাধারণের সবটুকু শান্তি কেড়ে নিয়েছিল তার ক্ষতচিহ্ন কখনই সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে না। এই রক্তরাঙা ক্ষতচিহ্নই পোড়খাওয়া মানুষকে বৃহত্তর সংগ্রামের পথে চালিত করবে এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই সেদিন ফিরে এসেছি।

৩১.৩.৬৬ বৃহস্পতিবার

বন্দী ছাত্রদের মুক্তির দাবী

উপাচার্যকে ছাত্রদের চরমপত্র দান।

এগারোটি ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এক স্মারক লিপিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত রাজবন্দী ছাত্র, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুক্তির দাবী করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সংগঠনগুলির দাবী অনুযায়ী এখনও ১২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা জেলে আছেন ও ৩ জনকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ডাক : ৬ই এপ্রিল, বুধবার খাদ্য, বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও বন্দী মুক্তির দাবীতে সারা রাজ্য জুড়ে ২৪ ঘন্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করুন।

২.৪.৬৬

প্রতিরোধ বাহিনীতে লোক জুটেছে না।

কলকাতা, ২রা এপ্রিল— সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পুনরায় আহ্বান এবং জনসাধারণের রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাতক রাজ্য সরকার এবং শাসক কংগ্রেস দল আতঙ্কগ্রস্ত। তাই একদিকে যেমন তিনটি অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ন আনয়ন এবং উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার ও আর্মি অফিসারদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দান ও ব্যাপক গুন্ডামীর প্রস্তুতিতে তথাকথিত প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের চেষ্টা অন্যদিকে কংগ্রেস দলের ভাঙ্গনকে রোধ করার জন্য অজয় মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার চেষ্টায় ব্যস্ত শাসক দল।

খবরে জানা যায় যে গভীর রাত পর্যন্ত কংগ্রেস ভবনে নানা শলা-পরামর্শ চলে। সেখানে কলকাতা ও হাওড়া জেলার কিছু কুখ্যাত ব্যক্তিকে দেখা যায়।

খবরে প্রকাশ ঐ দিন রাত্রে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হাওড়া, হুগলী, কলকাতা ও ২৪ পরগণায় চারশত কংগ্রেস কর্মীর সভায় শ্রী অতুল্য ঘোষ প্রতিরোধ বাহিনীতে নাম লেখবার আবেদন জানান। নরেন সেন প্রমুখ কিছু নামী নেতা শ্রী ঘোষকে জানান যে, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাজের ফলে তাঁরা এত বিব্রত ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন যে কেউ প্রতিরোধ বাহিনীতে নাম লেখাতে সাহস পাচ্ছে না।

প্রকাশ শ্রী ঘোষ নাকি কংগ্রেস সদস্যদের গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানান।

আরও প্রকাশ যে অল্পসংখ্যক মানুষ নাম লেখাচ্ছেন, তাঁরা নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ করেছেন যে, তাদের নাম যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। প্রকাশ বসুর নেতৃত্বে কিছু লোক হন্যে হয়ে লোক সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। সেইসব লোকেরা কয়েকবার জেল হাজত খাটা নামী ব্যক্তি, পাঁচ থেকে দশ টাকা রোজ ইত্যাদির প্রলোভন। থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বড় বড় পুলিশ অফিসাররা ট্রেনিং দিচ্ছে কিভাবে ভদ্রলোক সেজে অফিসের দিকে যেতে হবে বা দোকানে খুলবার চেষ্টা করতে হবে। এত প্রলোভন সত্ত্বেও মানুষ এবার বেঁকে বসছে। ফলে উর্দ্ধতন কংগ্রেস নেতৃত্ব আতঙ্কগ্রস্ত।

শ্রী প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষের উস্কানিতে যে প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের চেষ্টা হচ্ছে, সেই খবরে শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষাবিদ মহলে বিক্ষোভ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। যদি গুন্ডারা হরতালের দিন হামলার চেষ্টা করে, তাহলে জনসাধারণই তাদের সাজা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর।

খবরে আরও জানা যায়, অজয় মুখোপাধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট মহল এই প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের বিপক্ষে কারণ এইভাবে শ্রী সেনকে সমর্থন করলে তাঁরাও জনতার রোষবহ্নির সামনে পড়বেন।

শ্রীমতি মৈত্রেয়ী বসু কয়েকদিন আগে শ্রী সেনকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করায় তাঁর

সংগঠনের সমালোচনার সামনে পড়েছেন। এখন আবার সুর বদলে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের পিছু নিচ্ছেন এবং শ্রীমতি বসু ও শ্রী মুখোপাধ্যায় বেগতিক দেখে শ্রী সেনের সমালোচনা করছেন।

৪.৪.৬৬

পর্দার আড়ালে

জানা গেল যে অজয় মুখোপাধ্যায়ের দলভুক্ত কংগ্রেসীরা শান্তিপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘটকে (৬ এপ্রিল) সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবছেন।

৫.৪.৬৬ (মঙ্গলবার)

সম্পাদকীয় ৬ই এপ্রিল

কাল ৬ই এপ্রিল। বারে বারে প্রবঞ্চিত মানুষের এ হোলো বাঁচার তাগিদে এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সার্বিক প্রতিবাদ।

এ হরতালকে ব্যর্থ করার জন্য কংগ্রেস ও সরকারকে কত চালবাজিরই না আশ্রয় নিতে হচ্ছে। একদিকে যেমন দন্তধারী 'অহিংস' মিছিল অবুঝ মানুষের রক্ত ভক্ষণ করে তাকে ধর্মঘটের অযৌক্তিকতা বোঝাতে রাস্তায় নেমেছে, অন্যদিকে তেমনই যারা ঘৃণাভরে জনসাধারণকে ডেকে একটি কথাও বলতো না, তারা আজ হরতাল কেন নয় মাঠে ময়দানে মানুষকে তা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে। কিন্তু এইসব ডন কুইকজটদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইতিহাস এগিয়ে যাবে অমোঘ গতিতে।

কাল সারা বাংলা অচল হবে; হিমালয়ের চা-বাগিচা থেকে বঙ্গোপসাগরের শস্যপ্রান্তর পর্যন্ত। মানুষের সংগ্রামী শপথ আর বজ্রদৃঢ় বাহু উৎকীর্ণ করবে নতুন ইতিহাসের অধ্যায়। কালকের যৌবন জলতরঙ্গকে রুখবার মতো হাস্যকর বালখিল্য প্রচেষ্টা সবই চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।

প্রায় বিনা রক্তপাতে ৬ এপ্রিল 'বাংলা বন্ধ' পুরোপুরি সফল। তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

হিমাচল থেকে সমতল

বাংলা বন্ধ

বুধবার 'বাংলা বন্ধ' এই দিনটি চিহ্নিত হয়ে গেল শুধু কর্মবিরতিতে নয়, শান্তিতে। হিমাচল থেকে মেদিনীপুরের সমুদ্রতট সর্বত্র সর্বাত্মক হরতালের আরও একটি নজির সৃষ্টি হল। ফলাফল এককথায় ভঙ্গ বঙ্গদেশ আরও একবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

কলকাতা ও শহরতলীতে সারাদিন এবং রাত্রেও অবস্থা মোটামুটি শান্ত থাকে। ট্রাম-বাস চলেনি; ট্রেন-বিমানও নয়। শহরের দোকান পাট, হাট-বাজার, সিনেমা থিয়েটার, যানবাহন, সব বন্ধ। সরকারী সূত্রে প্রকাশ শতকরা ষাটভাগ মিলও খোলা থাকে। কিন্তু উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি জানান, প্রায় সব শ্রমিকই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

হরতালের শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বামপন্থী নেতা শহর ও শহরতলীর নানা অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। তারা জনসাধারণকে হরতালে যোগ দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান এবং শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আবেদন করেন। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, সোমনাথ লাহিড়ী, সমর গুহ, যতীন চক্রবর্তী প্রমুখ।

কলকাতার গড়িয়াহাট মোড়ে সন্ধ্যার দিকে পুলিশ ভ্যানের উপর অ্যাসিড বাল্ব পড়ে, দুইজন আহত হন। এছাড়া কয়েকটি গাড়ীর উপরেও ইঁট পাটকেল পড়ে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৭.৩.৬৬)

৬ই এপ্রিলের পর আন্দোলনের গতিবেগ স্তিমিত হতে হতে একেবারে থেমে গেল। বরঞ্চ বলা যায় আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা হল, যেহেতু আর কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচি বিরোধীপক্ষের ছিল না। খাদ্যআন্দোলনে ধৃতরা ছাড়া পেয়েছেন এবং অন্যান্য রাজবন্দীরাও মুক্তি পেয়েছেন। সরকার অন্তত এই দীর্ঘ মেয়াদি আন্দোলনের অন্যতম মূল দাবি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এটা মেনে নিয়েছেন। আশু দাবি ছিল খাদ্য ও কেরোসিন, কিন্তু অস্থির রাজনৈতিক আবর্তে, সে মামুলি চাওয়াটুকুর কথা প্রায় হারিয়ে গেল। অন্ততঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে স্বরূপগঞ্জে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলামের মৃত্যুর পর।

ইলিয়া ইরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : কোনও একটা ঘটনায় মানুষের কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। কখনও কখনও একহাজার মানুষকে হত্যা করলেও লোকের মনে কোনো রেখাপাত করে না। আবার কখনও একজন মাত্র মানুষকে খুন করলে গোটা দুনিয়া কেঁপে ওঠে। (*মেময়ার্স,* ১৯২১-৪১, পৃ. ৮৩)

নুরুলের মৃত্যু তেমনই একটি ঘটনা যার পর থেকে গোটা পশ্চিমবাংলা বিক্ষোভে উত্তাল। সেই উত্তাল বাংলা ৬ই এপ্রিলের পর আবার স্বাভাবিক হয়ে এল ধীরে ধীরে। কল-কারখানা অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ যথারীতি চালু। মানুষ আবার ফিরে আসছে তার অভ্যস্ত দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে। কিন্তু সেই দামাল দিনগুলির রেশ যে অফুরান, তাই আলুনি দিনযাপনের ফাঁকে ফাঁকে প্রতীক্ষায় থাকে সে আর এক আরম্ভের জন্য।

১৩

নজিরবিহীন এই আন্দোলনের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন শিপ্রা সরকার ও প্রফুল্ল চক্রবর্তী। শিপ্রা সরকার লক্ষ্য করেছেন : নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, কাঁচড়াপাড়া, চাকদহের মত জায়গায় ছাত্র বা গণসংগ্রামের প্রচলিত ধারার বাইরে এই আন্দোলন একটা অদ্ভুত চেহারা নিল। সেখানে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল রেললাইন, স্টেশন, ট্রেন, ডাক-তার, টেলিফোন ব্যবস্থা, সাব-রেজিস্ট্রি, সেট্‌লমেন্ট বা আবগারি অফিস, পৌরভবনে সংরক্ষিত কাগজপত্র, ব্যাঙ্ক। এ সবই রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক এবং জনরোষও বাস্তব। এসব মেনে নিয়েও তাঁর প্রশ্ন: তখনকার খাদ্যনীতি যাদের স্বার্থহানি করেছিল, সেইসব সামাজিক গোষ্ঠীর কিছু ভূমিকা কি ছিল এই আন্দোলনে? (*আনন্দবাজার পত্রিকা* ২১ জুলাই, ১৯৯৩)

প্রফুল্ল চক্রবর্তী বাচ্চা ছেলেদের কাণ্ড দেখে হতবাক। এত বেশী সংখ্যায় বাচ্চা এর আগে বা পরে কোনও গণ-আন্দোলনে সামিল হয়েছে কি? পতঙ্গের মতো আন্দোলনের আগুনে ঝাঁপ

দিয়েছে এই বাচ্চারা। কী কলকাতায়, কী শহরতলিতে বা মফস্বল শহরে—সর্বত্র এই দশ থেকে পনেরো বছর বয়সী বাচ্চারা সমানে বড়দের পাশাপাশি লড়েছে। ঐতিহাসিক নজির একমাত্র ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লব।

দি স্টেট্‌সম্যান-এর বিশ্লেষক সাংবাদিক রাস্তার ছেলেদের এহেন লড়াকু ভূমিকা প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদনে (১১.৩.৬৬) প্রশ্ন তোলেন: বৈপ্লবিক উন্মাদনায় মাতার বয়স তো ১৬ থেকে ২৫। দশ-বারো বছরের বাচ্চারা এসব কাজে মেতে উঠল কেন? সমাজবিজ্ঞানী বা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কেউ তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি। অবশেষে তিনি নিজেই তার সম্ভাব্য উত্তর বার করেন। তাঁর মতে হয়তো চারদিকের আশাহীন পরিবেশ ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ মরিয়া করে তুলেছে এই বাচ্চাদের—যাদের কাছে মরা বাঁচা দুই-ই সমান। দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের এক উদ্বাস্তু পল্লীর দশ বছরের বাচ্চাকে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন: তুমি হরতালের দিন রাস্তায় ব্যারিকেড বানাতে গিয়েছিলে কেন?

বাচ্চাটির চটপট জবাব: আমাদের যে খাবার কিছু নেই। যা জোটে তাতে পেট ভরে না।

—কিন্তু তুমি কেন? তোমার বড়রা নয় কেন?

—কেন যাব না আমি! বাবাকে যে কাজে বেরুতে হয়। দাদা বাড়ীর কোনও কাজ করে না। আমাকেই রেশনের লাইনে দাঁড়াতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দুধ আনা, কেরোসিন ধরা, হাটবাজার সবই যে আমাকে করতে হয়। সন্ধ্যা হলেই খরচপত্র নিয়ে মা-বাবাতে নিত্য ঝগড়া। বাবা বলে যা দিনকাল পড়েছে, এরপর আমরা না খেয়ে মারা যাব।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখেছেন, ১৯৬৬-র শীতকালে এরকম হাজার হাজার দশ-বারো বছরের বাচ্চা অস্থির আবেগে রাস্তায় নামে। তারা ব্যারিকেড বানায়, ঢিল ছোঁড়ে, পটকা ছোঁড়ে, রেলের কামরায় আগুন লাগায়।

জন্মাবধি অভিশপ্ত তাদের অস্তিত্ব, ছিন্নভিন্ন তাদের শৈশব। তারা জন্মেছে ও বেড়ে উঠেছে সেসব ঝোপড়িতে যা রেলপথের দুধারে গজিয়ে উঠেছে। শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে ডায়মণ্ডহারবার-শিয়ালদহ থেকে বনগাঁও এবং হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি রেলপথের দুধারে চোখে পড়ে শতশত ঝোপড়ি আর চোখে পড়ে মশা-মাছির মতো থিকথিক করছে অস্নাত, অভুক্ত, নগ্ন, অর্ধনগ্ন বালকের দল। সারাদিন তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পাখিদের মতো দুটো ভাত বা এক টুকরো রুটি পেলে খুঁটে খুঁটে খায়। অধিকাংশ দিন কিছুই জোটে না তাদের। কেউ তাদের দুটো ভালো কথা বলেনি, তাদের জন্য কারো মায়া-মমতা-দরদের ছিটেফোঁটাও বরাদ্দ নেই। অন্যদের কথা দূরে থাকুক, এমনকি তাদের মা বাবারা তাদের খোঁজ রাখে না। তারা এই দেশের, এই সমাজের অথচ তারা খারিজ-বেওয়ারিশ অনাহূতের দল। দশ বছর বয়সেই তারা সাবালক, স্বাধীন। তাদের মতো সমবয়সীরা একজোট কারণ সবাই ক্ষুধার্ত। আর কিছু চায় না তারা— শুধু দুবেলা পেট ভরে খেতে চায়। তাই হরতালের দিন যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল, সেদিন তাদের রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এই শিশুভৈরবের দল মেতে উঠল ধ্বংসলীলায়। কারণ তাদের কাদামাখা, নোংরা ছোট্ট শরীর ছাড়া আর যে কিছুই হারবার নেই। তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে সেদিন চমকে উঠেছিল সবাই। কী সরকার , কী কমিউনিস্ট, কী বামপন্থী নেতারা তাদের উপস্থিতি ও আচরণে সকলেই বিমূঢ়। (*মার্জিনাল ম্যান*, পৃ. ৩৯৪-৯৫)

দি স্টেটসম্যান-এর ভূয়োদর্শী সাংবাদিকের মতে, এই আন্দোলনে পেশাদার গুণ্ডা আর উঠতি মস্তানদেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি মনে করেন, এদের বেশির ভাগই উদ্বাস্তু পল্লীর বাসিন্দা এবং আজকের পশ্চিমবাংলায় এরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক চরিত্রের; যেহেতু এদেশের মাটিতে এদের শিকড় চারায়নি। এরা ছিন্নমূল, অতএব বিশৃঙ্খল অরাজক পরিবেশই এদের কাম্য; যেখানে এরা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ধারণা, সি পি আই এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় এবং সি পি আই (এম) পরে আন্দোলন টেনে নিয়ে যায়। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই ধারণা ভিত্তিহীন। সি. পি. আই (এম) বুঝি ভেবে চিন্তে ছক মাফিক গোলযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এ ধরনের অন্তর্ঘাত যেন ভাবী গেরিলা যুদ্ধের মহড়া।

না তা নয়! এই আন্দোলন আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। আন্দোলনের এই ব্যাপ্তি ও রুদ্রমূর্তি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলির হিসেবের বাইরে—অকল্পনীয়। তাঁরা কেউ দাবি করতে পারেন না যে, এই আন্দোলন তাঁরা সংগঠিত করেছেন। গোড়াতে বসিরহাটে যখন হাঙ্গামা শুরু হয় এবং কংগ্রেস প্রভাবাধীন বারাসত ও হাবড়ায় হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে, সি পি আই (এম) তখন তার ধারে কাছেও ছিল না। আর কৃষ্ণনগরের ঘটনা প্রসঙ্গে নদীয়া জেলার সি পি এম এম্ এল এ ও পার্টির গুরুত্বপূর্ণ জেলানেতা গৌড় কুণ্ডু জানান যে, এরকম যে ঘটতে যাচ্ছে পার্টি তার কোনো আঁচ-ইঙ্গিত পায়নি। সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা যা করেছে সব নিজে থেকেই করেছে।

কিন্তু এই আন্দোলন সি পি এম-এর তৈরি না হলেও এই আন্দোলন থেকে সি পি এম যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। রাতারাতি এই পার্টি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যায়। যাবতীয় হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার জন্য সরকার সি পি এম কে দায়ী করে যত বিবৃতি দিতে থাকে, ততই লোক সমাজে পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ভাষায়, সি পি এম এই আন্দোলন থেকে নির্বাচনী ফায়দা তোলে। সি পি এম সংযুক্ত বামপন্থী মোর্চাকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের জের অব্যাহত রাখে এবং সচেষ্ট থাকে যাতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত আন্দোলনের লড়াকু মেজাজ বহাল থাকে।

শিপ্রা সরকার মনে করেন, সি পি এমের মূল নেতৃত্ব হিংসাশ্রয়ী ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও পার্টির একাংশ নিশ্চয় জড়িত ছিল। পার্টির অধিকাংশ নেতা তখন জেলে, কিন্তু ছাত্র ও তরুণ পার্টি সদস্যদের একাংশ নিশ্চয় এই আন্দোলনে আসন্ন বিপ্লবের সংকেত দেখতে পাচ্ছিলেন। শিপ্রা সরকারের ভাষায়, পার্টির গোপন কেন্দ্র এবং ছাত্র ফ্রন্টে চারু মজুমদার প্রমুখের বিপ্লব তত্ত্বের প্রভাবে 'মিলিট্যান্ট' সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়ে সচেতনভাবেই ছাত্র আন্দোলন এদিকে পরিচালনার চেষ্টা হয়েছিল। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২১ জুলাই ১৯৯৩)

এধরণের সিদ্ধান্তের তথ্যসূত্র কী তিনি অবশ্য তা জানাননি। এবং চারু মজুমদার পার্টি মহলে 'বিপ্লব তত্ত্বের' উদ্‌গতারূপে তখনও প্রতিষ্ঠিত হননি। অতএব কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়ার 'মিলিট্যান্ট' লড়াইয়ের পিছনে চারু মজুমদারের ছায়াপাত কল্পনা মাত্র। তিনি তখনও শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলা পার্টির নেতা, যেখানে ১৯৬৬ সালের আন্দোলন তেমন কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করেনি।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী মনে করেন, এই আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকের অংশগ্রহণ যৎসামান্য।

মধ্যবিত্তদের যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তারা রাস্তার লড়াই-এ অংশ নেননি।

তাহলে কারা ধ্বংসলীলায় মাতল, সরকারি সম্পত্তি পুড়িয়ে ছারখার করে দিল? তার উত্তরে তিনি জানান, যাবতীয় হিংসাশ্রয়ী ও ধ্বংসাত্মক কাজের ঘটনাস্থল উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত অঞ্চল। ব্যারাকপুর মহকুমা, রিষড়া-কোন্নগর-হিন্দমোটর, যাদবপুর, বেহালা, বরিষা, সরসুনা, সখের বাজার ও কলকাতার উপকণ্ঠ— এ সবই উদ্বাস্তু প্রধান অঞ্চল। আর নদীয়া জেলায় তো উদ্বাস্তুরাই সংখ্যাগুরু। অতএব রেললাইনের দুধারের ঝোপড়িবাসী উদ্বাস্তুদের সন্তান-সন্ততিরাই বেরিয়ে এসে এসব কাণ্ড ঘটায় এবং আবার ঝোপড়িতেই মিলিয়ে যায়।

প্রফুল্ল চক্রবর্তীর এই ঢালাও মন্তব্য মেনে নেওয়া মুস্কিল। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলের পাড়ার ছেলেরা এবং কলেজ স্ট্রীটের ছাত্ররা যে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে—সে তথ্য কি কারো অজানা?

প্রফুল্ল চক্রবর্তীও স্বীকার করেছেন, ১০ মার্চের বাংলা বন্ধের ডাকে শ্রমিক শ্রেণী পুরোপুরি সাড়া দিয়েছে। কিন্তু তারই সঙ্গে আসানসোল ও দুর্গাপুরে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছে। আসলে গোটা পশ্চিমবাংলা যে ৬৬ সালে উথাল-পাথাল এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কমবেশি আলোড়িত এই সত্য কি ভোলা যায়?

(ডায়েরির পাতা থেকে : আমি আবার ১৯৪৬-এর চেহারাকে দেখতে চেয়েছি। কিন্তু নেই সেই উন্মাদনা, নেই সেই আবেগোন্মত্ত সার্বজনীন অভ্যুত্থান। কেন নেই? তবে কি বিকল্প কিছুকে মানুষ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছে না? মানুষের প্রাণ তো আজ সুলভ। লুটিয়ে পড়ছে প্রাণহীন দেহ এখানে সেখানে। আবার অব্যাহতিও চাইছে লোকে। চাইছে অফিস করতে সিনেমায় যেতে, আড্ডা দিতে। ১০.৪.৬৬)

প্রবীর রায়চৌধুরীর মতে, স্বাধীনতার পরে যাবতীয় পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একসঙ্গে এবার ফেটে পড়ে। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ। মানুষ যে upsurge-এর মুখে দাঁড়িয়ে এটা বোঝা যায়নি। বৈপ্লবিক পার্টি ও তার প্রস্তুতি থাকলে এই আন্দোলনের অন্যরকম পরিণতি ঘটতে পারত। এককথায় Revolutionary content ছিল কিন্তু সংগঠন ছিল না। তবে এই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের দুর্গের ওপর বড়রকম আঘাত হানে। গ্রামের ওপর কংগ্রেসের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়।

সাধন গুপ্তের মতে, 'বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বলা মুস্কিল। সেটাতো National level-এ ধরতে হবে।

চিত্তব্রত মজুমদার মনে করেন, মানুষ যখন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে আসেন, তখনই বলা যায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ অন্য রাজ্যের মানুষের তুলনায় আগুয়ান ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা চাইছিল পরিবর্তন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে কোনো অকংগ্রেসী সরকার আসুক এটাই চাইছিল মানুষ।

অশোক মিত্রর মতে, ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের মূল চরিত্র স্বতঃস্ফূর্ততা। যদিও অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় ভরপুর কিন্তু বৈপ্লবিক চেতনাশূন্য। সে সময় দেখেছি মা মাসিরা পর্যন্ত সি পি এমের সভায় যাবার জন্য ব্যাকুল। একটানা ৪৮ ঘন্টা বাংলা বন্ধের সময় কুটোটি পর্যন্ত নড়েনি। মানুষের সার্বিক *আনন্দবাজার*-বিরোধিতা। অপরদিকে দেখুন পার্টির Main

components কারা! (১) প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী, (২) ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা, (৩) ছোট জমিদার থেকে ভাগচাষী পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষক সভার নেতা ও কর্মী, (৪) সরকারি ও সওদাগরি অফিসের কর্মচারী। বৈপ্লবিক চেতনার আধার কি এরা হতে পারে? খাদ্য আন্দোলনকে misread করার জন্য অথবা বাড়িয়ে দেবার ফলে সি পি এম এল-এর বিপর্যয়। তাদের মতে সি পি এমের নেতৃত্ব মানুষের বৈপ্লবিক শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

চারু মজুমদারের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম.....শীর্ষক ষষ্ঠ দলিলে বলা হয়েছে: সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনে জনতা যে রণকৌশল গ্রহণ করেছিল তা প্রাথমিক স্তরের 'পার্টিহীন সংগ্রাম' ছাড়া আর কিছুই নয়।

সলিল চট্টোপাধ্যায় কিন্তু মনে করেন, মানুষ তখন খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা শুরু করে। ১৯৪২ সালের মেজাজ যেন মানুষ ফিরে পেয়েছে। একদা যাদের দেশদ্রোহী বলা হয়েছে, সেদিন তারাই সাধারণ মানুষের চোখে বীর।

বন্যার জল একদিন সরে যায়; কিন্তু থেকে যায় পলিমাটি, যা উর্বরা করে ভূমি, শস্যশ্যামলা হয় মাঠ। নতুন চেতনায় দীক্ষিত হয় নবীন প্রজন্ম। খাদ্য আন্দোলনের রেশ যেন অফুরান। অসীম রায়ের অসংলগ্ন কাব্যে-এর নায়ক বলেছেন: যখন কলকাতার রাস্তায় চালের চড়া দাম নিয়ে পুলিশ জনতায় লড়াই চলল, তখন থেকেই আমাদের যৌবন রাজনীতির সঙ্গে মালাবদল করে নিয়েছিল।

রবীন্দ্র রায় লিখেছেন, খাদ্য আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনের প্রথাগত চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ছাত্ররা দলে দলে এই আন্দোলনে অংশ নেয় এবং তারই মাধ্যমে দীক্ষিত হয় বামপন্থী রাজনীতিতে। ছাত্র আন্দোলনের আঙ্গিনায় এরই ধারাপথ বেয়ে চলে আসে সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক তত্ত্ব। *(The Naxalities and their Ideology, p.* 132-337)

তৃতীয় পর্ব

তা'হলে জাগো তুমি, তা'হলে জ্বলে ওঠো
কবর থেকে দ্যাখো লেনিন মাথা তোলে—
কবর থেকে সেই মানুষ মাথা তোলে
পাহাড়ে, সাগরে ও তেরটি নদীকূলে।

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / ৭ নভেম্বর

১

সময়টা এমন যে যখন বিপ্লবের স্বপ্ন মোটেই বেমানান বা অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না। ১৯৬৪ সাল পুজোর ছুটির আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ আয়োজিত 'সমাজতন্ত্র বনাম সংসদীয় গণতন্ত্র' শীর্ষক সেমিনারে হরেকৃষ্ণ কোঙার ছিলেন অন্যতম প্রধান বক্তা। সেমিনার শুরুর আগে ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে শৈবাল মিত্রকে বলেন: শোন, বিপ্লব কিন্তু বেশি দূরে নয়।

কথাটা শৈবালের মতো যে কোনো অল্পবয়সী রাজনৈতিক কর্মীর বিশ্বাস করার মতো। কারণ সময়টা ছিল এমন যখন তরুণদের সহজে তেতে ওঠারই কথা। গোটা বিশ্ব অগ্নিগর্ভ। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব-ভিয়েতনাম-কাস্ত্রোর কিউবা-বলিভিয়ার জঙ্গলে চে গুয়েভায়ার নেতৃত্বে গেরিলাযুদ্ধের মহড়া, দেশের ভেতরে বামপন্থার অবিরাম প্রচার ও প্রসার।

কিন্তু এদেশের বুকে এই প্রায় অসম্ভব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। অসীম রায়ের *অসংলগ্ন কাব্য*-এর চরিত্র সোনার মতই অনেক অল্পবয়সীর সঙ্গেই মালাবদল ঘটেছে রাজনীতির। রাজনীতি বলতে কমিউনিস্ট অথবা বামপন্থী রাজনীতি যার ছোঁয়া লেগেছে এমনকি ভবানীপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ির সন্দীপ নামক কিশোর ছেলেটির মনেও। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবার সন্দীপের— যার বোনেরা কোনোদিন স্কুলে যায়নি। খাদ্য আন্দোলনের পর সে চলে আসে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি।

এমনকি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের কংগ্রেসী গন্ধবণিক পরিবারের বালক অমিতাভ চন্দ্রও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারছে সে হাওয়ায় একটা বড় রকমের কিছু ঘটতে চলেছে।

বালক-কিশোর-তরুণ-ছাত্র-শিক্ষক-মজুর-কর্মচারী সবাই চলে আসছে রাজনীতির আওতায়। র‍্যাডিক্যাল পত্র-পত্রিকা বেরোচ্ছে অজস্র ও নতুন নতুন। *দক্ষিণ দেশ, লালতারা, অনীক, নন্দন* এবং সমর সেন সম্পাদিত *নাউ* (পরবর্তী কালে *ফ্রন্টিয়ার*) কয়েকটি মাত্র নাম। জানার ও পড়ার আগ্রহ বেড়েছে। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে মার্কস, লেনিন, মাও-সে-তুং-এর রচনা পাঠ করার ঝোঁক লক্ষণীয়। রাজনৈতিক আলোচনা তর্ক বিতর্কের ঝাঁঝালো পরিবেশ কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউস, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিন, ফেভারিট কেবিন ও অন্যান্য ছুটকো চায়ের দোকানে। রাজনীতি ছাড়া যেন আড্ডা জমে না—রাজনীতি ছাড়া আর সব কিছুই যেন আলুনি।

তারই পাশাপাশি কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে চলে মিছিল। তারা লড়াই-লড়াই-লড়াই চায়। লড়াই করে তারা বাঁচতে চায়। তারা ঘুঁষি পাকিয়ে শ্লোগান ছুঁড়ে দেয়: তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম-ভিয়েতনাম। বিশ্বের যেখানেই মুক্তি সংগ্রাম চলুক না কেন সব মুক্তিযোদ্ধারাই তাদের ভাই। সব মুক্তিযুদ্ধেরই তারা শরিক। তারা বিশ্বাস করে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যা ঘটছে, এখানেও তা ঘটবে।

আর সেই উত্তাল সময়ের দিনগুলি ধরে রাখার জন্য ক্যামেরা নিয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মৃণাল সেন। ছবি তুলছেন সভা-শোভাযাত্রা, সংঘর্ষ, লাঠি-গুলির। সেই তুলে

রাখা বিচ্ছিন্ন রীলগুলি পরে তাঁর বিভিন্ন ছবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন তিনি। এমনকি *ভূবন সোম*-এও। ১৯৬৮ সালে তোলা ছবি। কারণ ছবি তো শুধু গল্প বলে না। কাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে সেখানেও পর্দার বুকে ফুটে ওঠে চলমান কলকাতার এক ঝলক দৃশ্য। *ইন্টারভিউ* ছবিতে ফুটে উঠল 'কলেনিয়াল লিগ্যাসি'র বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামে কলকাতা আর লাতিন আমেরিকা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আমাদের এখানে যা ঘটছে তা যে কোনো আফ্রো-এশিয় দেশে প্রযোজ্য।

রোজই সভা হচ্ছে সি. পি. আই অথবা সি. পি. আই (এম)-এর ডাকে। মাঠ ভরে যায় লোকে। মৃণাল সেনের মাঝে মাঝে মনে হয়, সব লোক যদি এক জায়গায় জড়ো হত! না! সে হবার নয়। মৃণাল সেনের ভাষায়, এটা সময়-সময়-সময়-বিশেষ এক সময়।

নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই নানা লক্ষণ থেকে স্পষ্ট যে কংগ্রেসের পালের হাওয়া বেশ কমজোরি। জুলাই' ৬৬, জনমত যাচাই করে Indian Institute of Public Opinion জানাচ্ছে যে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট পশ্চিমবাংলায় শতকরা ১৯ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। সংবাদপত্র সূত্রে (আগস্ট মাসে) আরও জানা গেল যে কংগ্রেসের টিকিটের চাহিদা এবারের নির্বাচনে যথেষ্ট কম।

যে মানুষ মিছিলের বাইরে সেও এবার টের পাচ্ছে একটা কিছু ঘটবে। বিপ্লব না হলেও বড় রকমের একটা ওলটপালট। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের এই ভাবনা। হাওয়ায় হাওয়ায় রটে যায়ঃ এবার কংগ্রেস যাচ্ছে। একে তো '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় শহরে কংগ্রেস একেবারে কোণঠাসা, তার উপর কংগ্রেস থেকে অজয় মুখার্জি বেরিয়ে আসার ফলে কংগ্রেসের গ্রামাঞ্চলের শক্ত ঘাঁটিও এখন বেশ নড়বড়ে। আগস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তী নায়ক মেদিনীপুরের শ্রদ্ধেয় নেতা রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মুখার্জির সঙ্গে সংগঠনের প্রকৃত নেতা অতুল্য ঘোষ ও তাঁর দলবলের বিরোধ চরমে উঠেছিল। কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতি, হিসাবের গোলমাল, ভূয়া সদস্য তালিকা ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবাদ জানালে, অজয় মুখার্জি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে ২৯৬-৪০ ভোটে বিতাড়িত হলেন (২০ জানুয়ারি ১৯৬৬)। সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়া, রজনী প্রামাণিক প্রমুখের সঙ্গে তিনি প্রথমে 'অনাচার নিরোধ সমিতি', পরে বাংলা কংগ্রেস গঠন করেন। ১০ই মার্চ ও ৬ই এপ্রিলের 'বাংলা বন্‌ধ্'কে সমর্থন জানান তিনি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৬ সালের গণ-অভ্যুত্থান কংগ্রেসের গণভিত্তি যতটা না দুর্বল করেছে তার চেয়েও মোক্ষম আঘাত হেনেছেন অজয় মুখার্জিরা। বাংলা কংগ্রেস বিরোধী বামদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে কংগ্রেস-বিরোধী পাল্লা এখন যথেষ্ট ভারী।

এই পটভূমিতে *প্রতিদিন*-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা ছিল 'কমিউনিস্ট ঐক্য—ইতিহাসের দাবী'। দুই কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেবার জন্য আকুল আবেদন জানানো হল।

সম্পাদকীয় ৪ মে ১৯৬৬ (বুধবার)

কমিউনিস্ট ঐক্য-ইতিহাসের দাবী

সারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আসন্ন ছায়া, দেশরক্ষার নামে সরকারী মহলে এখনও স্বৈরাচার বজায় রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা, ভারতের অর্থনীতিতে দেশী-বিদেশী বৃহৎ-ক্রমবর্ধমান কব্জা সাম্রাজ্যবাদী চাপে পররাষ্ট্রনীতির নিকট ক্রমিক আত্মসমর্পণ—বর্তমান ভারতের এই হচ্ছে

বাস্তব শোচনীয় চিত্র। পরিস্থিতির এই ভয়াবহ ক্রমাবনতির একটি মাত্র প্রতিকারের পথ জনগণের বিপুল শক্তিকে উদ্বোধিত করে প্রতিক্রিয়ার পাল্টা আক্রমণ—স্বাগত জানাই। তাঁরা যা বলেছেন, তার সব কিছুর সঙ্গে হয়ত আমরা একমত নাও হতে পারি, কিন্তু ইতিহাসের আজ অমোঘ নির্দেশ ঐক্য, কমিউনিস্ট ঐক্য ছাড়া পথ নেই। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও দুই পার্টিকে নির্বাচনে এক হয়ে দাঁড়াতেই হবে। (প্রতিদিন ৪ঠা মে ১৯৬৬)

কংগ্রেসকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য চাই সার্বিক বাম ঐক্য। পরিবর্তনকামী প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মনে সেদিন দানা বেঁধেছিল একটিমাত্র ইচ্ছা যার নমুনা এই ইস্তাহার।

সার্বিক বাম ঐক্যের ডাক

পশ্চিমবঙ্গের সকল স্তরের নির্দলীয় নাগরিকেরা সার্বিক বাম ঐক্যের জন্য ব্যাকুল। খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নীহার কুমার মুনসী, প্রখ্যাত শিল্পী তাপস সেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেন, ডঃ পি. সি. ঘোষ, মহামান্য শৈবাল গুপ্ত, অজিত দত্ত, প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাদেব রায় ইত্যাদি আরও বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ সংবাদপত্রের ও আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যের জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করে এসেছেন। শ্রমিক নেতা হীরেন গুহ রায়, ডাঃ রেবতী ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা এবং অনেক ছাত্রবন্ধুরা অনশন ও বিক্ষোভের মাধ্যমেও ঐক্যের জন্য কাতর আবেদন করে এসেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক পার্টির নেতারা এতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছেন না। বিশেষ করে বাম ও দক্ষিণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা পরস্পর কলহ করে মেহনতী জনতার একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। ঐ দুই পার্টির কলহের জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ নাগরিকরা কি দুঃখকষ্ট ভোগ করে যাব? আমাদের কি কিছুই করার নেই? তারাই কি আমাদের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা?

আমাদের মনে হয় ঐরূপ পৃথক পৃথকভাবে আবেদনে বা আন্দোলনে কিছুই হবে না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট বড় সকল আন্দোলনের ধারাকে একত্র করে একটিমাত্র প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে পার্টিগুলির উপর প্রবল চাপ দিতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে সার্বিক ঐক্যের পক্ষে ছোট বড় প্রত্যেকটি আন্দোলনকে আপনাদের সাহায্য ও পরামর্শে একত্রিত করে কাজ করবার জন্য আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে স্টুডেন্টস হলে (কলেজ স্কোয়ারে) আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

ঐ সভায় প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখার্জী ও আরও অনেকে উপস্থিত থাকবেন।

৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে স্টুডেন্টস হলে অকংগ্রেসী ভোটাররা দলে দলে যোগদান করুন।

বিনীত

বাংলা মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে মহাদেব রায়
বাম ঐক্য সহায়ক সংস্থার পক্ষে ডাঃ রেবতী ঘোষ
পঃ বঙ্গ হসপিটাল ইউনিয়ন পক্ষ হীরেন গুহ রায়
ঐক্য সংসদের পক্ষে ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
সাধারণ নাগরিকের পক্ষে অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেন।

২

কংগ্রেস-বিরোধী সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও সার্বিক ঐক্য হল না। তাপস সেনের ভাষায়, ঐক্যের আলোচনা ভেঙে যাওয়াতে সিনেমা ও নাট্য জগতের লোকজন বিষণ্ণ বোধ করেন। তৈরি হয় দুটি কংগ্রেস-বিরোধী জোট। শিপ্রা সরকারের মতে, ১৯৬৭ সালে, প্রধানত দুই কমিউনিস্ট পার্টির তিক্ত সম্পর্ক ও সি. পি. আই (এম)-এর অনমনীয় মনোভাবের জন্য লড়াই হয় প্রধানত বাংলা কংগ্রেস ও সি. পি. আই-এর প্রগতিবাদী সংযুক্ত বামফ্রন্ট আর সি. পি. আই (এম)-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বামফ্রন্টের মধ্যে। ভোটদাতারা এই ভেদাভেদ উপেক্ষা করে কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়ে দু'টি ফ্রন্টকে একত্রে সরকার গঠন করতে বাধ্য করল। এমন সচেতনভাবে ভোট দেওয়া সচরাচর চোখে পড়ে না। (*আনন্দবাজার পত্রিকা* ২১ জুলাই ১৯৯৩)

নির্বাচনে ২৮০টি আসনের মধ্যে ১২৭টি পেয়ে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে গেল। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জয়-পরাজয় ঘটল। আরামবাগ কেন্দ্রে অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে হেরে গেলেন প্রফুল্ল সেন। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় অখ্যাত জে. এম. বিশ্বাসের কাছে পরাজয় বরণ করলেন 'বঙ্গেশ্বর' অতুল্য ঘোষ। কলকাতার ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে সি. পি. আই (এম) প্রার্থী হরিদাস মালাকারকে পরাজিত করে জিতলেন সোমনাথ লাহিড়ী (প্রসঙ্গত, ময়দানের নির্বাচনী সভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত সোমনাথ লাহিড়ীর জমানত বাজেয়াপ্ত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পর বাঁধভাঙ্গা উল্লাস। যেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস। শৈবাল মিত্র লিখছেন, 'অতুল্য ঘোষ এবং প্রফুল্ল সেনের পরাজয়ের সুখবর যখন সন্ধ্যের দিকে প্রকাশিত হল, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরে, রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে-গলিতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ফেটে পড়েছিলেন। খাদ্য আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষকে প্রফুল্ল সেন কাঁচকলা খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। অতুল্য ঘোষের একটি চোখ দৃষ্টিহীন ছিল। এই দুই পরাজিতকে বিদ্রূপ করার জন্য শহরের নানা রাস্তায় কাঁচকলা আর কানা বেগুনের মালা ঝোলানো হয়েছিল। অসংখ্য মিছিল বের হল। অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের কুশ-পুত্তলিকা তাঁরা পোড়ান।' (*ষাটের ছাত্র আন্দোলন*, পৃ. ৩৮)

এমনকি ভোট গণনার সময় থেকেই মানুষের উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা লক্ষ্য করেছেন বরুণ সেনগুপ্ত। তিনি লিখছেন:

'সেদিন ২২ শে ফেব্রুয়ারী। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বেরনো শুরু হয়ে গিয়েছে। ..... কংগ্রেসের পরাজয়ের এক একটা খবর আসছে আর জনতার বিজয়োল্লাসে আমাদের অফিস বাড়ীটাই যেন ফেটে পড়ছে। পাগল হয়ে উঠেছে হাজার হাজার মানুষ। শুধু চীৎকার আর চীৎকার: খবর চাই আরও খবর চাই; প্রত্যেকটি কেন্দ্রের খবর চাই এবং সবচেয়ে মজার কংগ্রেসের পরাজয়ের খবর চাই। কোনও কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিজয়ের খবর ঘোষিত হওয়ামাত্র ধিক্কারধ্বনি—যেন ঘোষক ফলাফলটা জানিয়ে মহাপাপ করে ফেলেছে।'

'সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিরাট আশা-ভরসা, অনেকেই মনে করলেন, এবার বাংলা দেশের ভালো হবে। ধরে নিলেন এখন থেকে বড়লোকের কর্তৃত্ব কমবে, গরীবের মর্যাদা বাড়বে, দুর্নীতি বন্ধ হবে, জিনিষপত্রের দাম কমবে এবং সব মিলিয়ে বেশ একটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করা যাবে।

যাঁদের জনগণ বলা হয়, অর্থাৎ ট্রামে, বাসে, অফিসে-কাছারিতে যাঁরা গলা ফাটিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন, তাঁরা তো আহ্লাদে আটখানা। বীরদর্পে বলে বেড়াতে লাগলেন: এবার পাপ বিদায় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে স্বর্গরাজ্য কায়েম হল বলে।' (*পালা বদলের পালা,* পৃ. ১৬)

তারই পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমেছে কংগ্রেসী পাড়াতে। মধ্য কলকাতার সীতারাম স্ট্রীট-কলেজ রো পল্লীতে মানুষ যেন কথা বলতেও ভুলে গেছে। সেখানে উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। বড়ই নিরুৎসব পরিবেশ।

একজন পোড়খাওয়া কমিউনিস্টের চোখে দিনটা কেমন তাকে ধরার চেষ্টা করেছেন অসীম রায় তাঁর 'আরম্ভের রাত' গল্পে। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখছেন:

'১৯৬৮র সেপ্টেম্বরে অসীম রায় লিখেছিলেন 'আরম্ভের রাত', ১৯৬৭র ২৩ শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা নিয়ে। বিশ বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান ঘটেছে। পরপর ইন্দ্রপতন হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মেতে উঠেছে কলকাতার মানুষ। এরমধ্যে বসে দিনাজপুরের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ পানু চক্রবর্তী হঠাৎ "বাঁদিকের বুক দুহাত দিয়ে চেপে বেঞ্চিতে দুমড়ে বসে পড়ে... ব্যথায় ছটফট করে। মুখের পেশী কুঁচকে যায়, দাঁত চেপে থাকে। চোখের দুপাশ দিয়ে জলের ধারা নামে। পানুদা ফিসফিস করে বলে, বিজু, বিজু আমি দেখে যেতে চাই। আমি দেখতে চাই। ... আমি আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামব। আমি মরে যাইনি। আমি আছি, আমি এখনও বেঁচে আছি।"

পানুদাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে তার পুরনো ক্যাডার বিজু ফিরে আসে—ব্যাপারটা যেন প্রতীকের মতো হয়ে দাঁড়ায়। তার দু'বছর পরেই পশ্চিমবঙ্গের দায়বদ্ধ লেখকদের কাহিনীতে একটা বড় জায়গা করে নেয় হাসপাতাল। তারপর মর্গ, শ্মশান, গণ-কবরখানা অথবা পাগলাগারদ। পানুদা সেদিনই বলেছিল, "...এ কবিতা সে কবিতা নয়। কবিরা আগে কখনও ভেবেছে এত আশা ও আশাভঙ্গের কথা? এত নতুন করে কথা বলা আবার কথার মানে ফুরিয়ে যাওয়া?" দায়বদ্ধ লেখকেরা আগে কখনও ভেবেছিলেন, মৃত্যু তাঁদের গল্পে এমনভাবে জায়গা করে নেবে? আতঙ্ক হয়ে উঠবে তাঁদের কাহিনীর বিষয়বস্তু?'

('ঝড়, ঝরাপাতা, বাংলা কথাসাহিত্য', *নতুন পরিবেশ,* পৃ. ৩৫)

সে সব অবশ্যি আরও পরের কথা।

আপাতত মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা। কংগ্রেস যে নির্বাচনে পরাজিত—এটাই যথেষ্ট।

একনজরে নির্বাচনী ফলাফল:

মোট আসন : ২৮০

কংগ্রেস:— ১২৭, কম্যু : বাম : ৪৪

কম্যু : ডান: ১৬, ফ: ব্লক: ১৩

বাংলা কংগ্রেস : ৩৪, পি. এস. পি. : ৭

এস. এস. পি. : ৭, আর এস. পি. : ৬,

এস. ইউ. সি. : ৪, লোক সেবক সংঘ : ৫

গার্খা লীগ : ২, জনসংঘ : ১,

ওয়ার্কাস পার্টি: ২, স্বতন্ত্র : ১

ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট) : ১, নির্দল: ১০।

আনন্দবাজার-এর রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আরামবাগের ফল জানার সঙ্গে সঙ্গে ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন ফোনে রাজ্যপালকে জানান: ফলাফল চূড়ান্ত। বিজয়ী অজয় মুখার্জি। আমি পদত্যাগ করছি। ঐদিনই স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে এবার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হবার সম্ভাবনা নেই। অধীর আবেগ নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ কবে কায়েম হবে পশ্চিমবাংলার প্রথম অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। অথচ দেখা যাচ্ছে নেতারা বড় বেশি সময় নিচ্ছেন আলাপ-আলোচনায়। কিসের এত আলাপ-আলোচনা? কেন সকলে মিলে অবসান ঘটাচ্ছে না একটানা কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের? কবে শেষ হবে দুঃশাসনের রাজত্ব?

অতএব মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাপস সেন। তিনি বলেছেন: উভয়পক্ষের সভা বসবে। জেনে নিলাম সংযুক্ত সভা কোথায় হবে। সত্যজিৎ রায়কে জানালাম আমি সেখানে যাচ্ছি। মৃণাল সেনকে জানালাম। বৌবাজার স্ট্রীটে সি. পি. আই অফিসে সভা বসেছে। ট্যাক্সি ভাড়া করে সেখানে চলে গেলাম। অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জি, হেমন্ত বসু,–– সবাই দরজা বন্ধ করে আলোচনারত। বাইরে সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছে। আমায় আটকানোতে বললাম, আমার নাম তাপস সেন। নেতাদের কাছে আমার অত্যন্ত জরুরী বক্তব্য আছে। শেষ পর্যন্ত আমায় ঢুকতে দিল। বললাম, আমি এসেছি রাস্তার লোক হিসাবে। রাস্তাঘাটে লোকেরা কী বলে আপনারা কি তা শুনতে পান না?

জ্যোতিবাবু বললেন, আমাদের কাজ আছে। তার জবাবে বললাম, 'কংগ্রেসকে হারানোই এখন একমাত্র কাজ।'

৩

অবশেষে দুটো ফ্রন্ট যুক্ত হয়ে তৈরি হল যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীপদে জ্যোতি বসু। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কার্যভার নিলে *দ্য স্টেট্‌সম্যান* পত্রিকা লিখেছিল, কুড়ি বছর আগের স্বাধীনতা দিবসের কথা মনে করিয়ে দেয়, রাইটার্স বিল্ডিং-এর বাইরে জনতার অভিনন্দন দৃশ্য। প্রসঙ্গত বিধানসভার ফটকে সমবেত জনতার কলোচ্ছ্বাসের সামনে অভিভূত সদ্যোজাত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী ঘোষণা করেন, আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত।

'মুক্ত! কে মুক্ত করল পশ্চিমবাংলাকে? মুক্ত করার জন্য তো চাই একজন ফিদেল কাস্ত্রো। তাহলে কি বুঝতে হবে অজয় মুখার্জি একজন ফিদেল কাস্ত্রো?' কথাগুলি বলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত; তারই কয়েকদিন পরে সি. পি. আই (এম)-এর কলকাতা জেলার পার্টি সভ্যদের এক জেনারেল বডি-মিটিং-এ।

ঠিকই, সে অর্থে পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত নয়। কিন্তু জনমানসে কংগ্রেসী শাসনের অবসান এক বৈপ্লবিক উত্তরণ। শিপ্রা সরকার লিখছেন, নতুন মন্ত্রীদের সহজ আচরণে বোঝা গেল তাঁরা জনতার কাছের লোক। নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বিরাট খরচ বাঁচিয়ে চলাফেরা, ট্রাফিকের

নিয়ম মেনে ছোট গাড়িতে যাতায়াত, প্রয়োজনে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সিতে চড়া, অফিসঘর ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র খুলে ফেলা এবং প্রথমেই একটি আচরণবিধি গ্রহণ করায় এই মন্ত্রিসভার নতুনত্ব বোঝা গেল। বাগ্‌মারিতে শিখ সম্প্রদায় উত্তেজিত হয়ে উঠলে কয়েকজন মন্ত্রী ছুটে গেলেন দাঙ্গা থামাতে।

আঠারো দফা কর্মসূচিতে ধানচালের ব্যবসা অধিগ্রহণ, উদ্বাস্তু কলোনী বৈধ করা, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানের প্রতিশ্রুতি ছিল। বামফ্রন্ট নেতারা কয়েক জায়গায় জনগণের সাহায্যে চিনি ও খাদ্যশস্যের মজুত উদ্ধার করলেন।

দুর্বলতা দেখা গেল প্রথমত এই পাঁচমিশালি মৈত্রী শিবিরের খাদ্যনীতি স্থির করার প্রশ্নে। বিরোধী কংগ্রেস দল সমালোচনা করে বলল—১০০ মণ ধান-চাল নিজেদের হাতে রাখতে দিয়ে কর্ডন ও লেভি তুলে দিয়ে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কথা ভুলে, আট হাজার জোতদারের উপকার করা হয়েছে। এ সমালোচনা অমূলক ছিল না। এর পরেই চালকল ও জমির মালিকদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনার এবং ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধের চেষ্টা হয় (*আনন্দবাজার পত্রিকা* ২১.৭.৯৩)

তা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, শিক্ষক ও জনগণের জন্য মাত্র নয়মাসে সামান্য যা করতে পেরেছে তা থেকেই তার জনপ্রিয় চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন ২ লক্ষ ৩৮ হাজার একর ন্যস্ত জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেছে, ব্যাপকভাবে বর্গাদার ও ঠিকা প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ করতে পেরেছে। খরার জন্য ব্যাপক রিলিফের ব্যবস্থা করতে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। খাজনা ব্যাপকভাবে ছাড় দিয়েছে। একলক্ষ অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করেছে, রাজনৈতিক কারণে যাদের চাকরি গিয়েছিল, তাদের চাকরি দিয়েছে। ৬০০ পদচ্যুত পরিবহনকর্মীকে কাজে পুনর্নিয়োগ করেছে। বিলাতি ট্রাম কোম্পানির পরিচালনভার নিজেদের হাতে নিয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী, যুক্তফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সবটুকুই সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যবহার করেছে। ব্যর্থতাও রয়েছে। প্রধান ব্যর্থতা দুটিঃ প্রধানত, গোড়া থেকেই ডা. প্রফুল্ল ঘোষের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সজাগ হওয়া উচিত ছিল; দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবাংলার মানুষকে জমায়েত করে খাদ্য নিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের ব্ল্যাকমেলিং কৌশলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত ছিল।

এই দুই ব্যর্থতাই যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটাল। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতাহার পর্যালোচনার চেয়ে তার স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা যাচাই করাটাই শ্রেয়। মনে হয় মানুষ অন্ততপক্ষে পুলিশি রাজের চিরাচরিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে কিছুদিনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

৪

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্বের তালিকা হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের আন্দোলন ও সংগঠন নির্মাণে তার সহায়ক ভূমিকা প্রশ্নাতীত। তার প্রকৃত সার্থকতাও এখানে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের কাজে পুলিশকে ব্যবহার করা চলবে না এটাই ছিল যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত নীতি। জোতদারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর ভূমিকা নেবে না পুলিশ। ধর্মঘট ভাঙার কাজে পুলিশ যাবে না মালিকের ডাকে। ফলে যে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হল তারই ফল সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে নতুন জোয়ার। কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ

(১) প্রমোদ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেনঃ

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার নতুন বিকাশ লক্ষ্য করেছি। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি দুর্বল অঞ্চলগুলিতেও আন্দোলনের এবং পার্টি ও গণসংগঠনের অগ্রগতির বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে।

যেমন মুর্শিদাবাদ জেলা। এই জেলায় অতীতে কোনো বছরই ৫-৭ হাজারের বেশি কৃষক সভার সদস্য হত না। এ বছর কিন্তু ঐ জেলায় এখন পর্যন্ত ২৭ হাজারেরও বেশি কৃষক সমিতির সদস্য হয়েছেন। সভ্য সংখ্যার বেশিরভাগটাই হয়েছে গত সাধারণ নির্বাচনের পর। অনুরূপভাবেই বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মালদহ জেলায় নগণ্য সংখ্যা থেকে এবছর এখন পর্যন্ত কৃষক সভার সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৬ হাজার, ১৭ হাজার এবং ১৬ হাজার। রামপুরহাটে সাধারণ নির্বাচনে আমাদের পার্টি পরাজিত হল, সেখানেই আবার পৌরনির্বাচনে আমরা ১৩টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে জয়ী। শিল্পে অনগ্রসর এই জেলাগুলিতে অসংগঠিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিদিনই নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে। (*গণশক্তি*, ১৯.৫.৬৭)

(২) কৃষক আন্দোলনের প্রসার—

এ বছর (১৯৬৬-৬৭) পঃ বঃ প্রাদেশিক কৃষক সভার মোট সভ্য সংগৃহীত হয়েছে ৫,২১,৬৯৪।

১। ২৪ পরগণা	১,১৬,৫৫২
২। মেদিনীপুর	৬৬,৫৭৫
৩। বর্ধমান	৫৬,৪৭৮
৪। নদীয়া	৪৩,২৯৫
৫। হুগলী	৪০,২৮২
৬। হাওড়া	২৯,১২৭
৭। মালদহ	২৭,৬৬৬
৮। মুর্শিদাবাদ	২৭,৪০৩
৯। জলপাইগুড়ি	২৬,৪৬২
১০। বীরভূম	২১,১৪৭

১১। বাঁকুড়া	১৯,৯৪৬
১২। পঃ দিনাজপুর	১৯,৪৯৫
১৩। কোচবিহার	১৯,০০০
১৪। দার্জিলিং	৬,২৩৩
১৫। পুরুলিয়া	২,০৩৩
	৫,২১,৬৯৪

•*গণশক্তি*, ২৬.৭.৬৭)

তারই সঙ্গে শুরু কৃষক আন্দোলনের নতুন পর্যায়। ব্যাপ্তি ও গভীরতায় যা অভূতপূর্ব। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

মালদহে দখল রেখে চাষের আন্দোলন শুরু।

মালদহ ৩রা আগস্ট: মালদহ জেলার গাজোল, বমন গোলা, হাবিবপুর, মানিকচক প্রভৃতি থানায় কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি (মা:)র নেতৃত্বে দখল রেখে চাষের আন্দোলন শুরু হয়েছে।

...মালদহে কৃষক সমাজ দিকে দিকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে ও ভেস্ট জমি নিজেরা বিলি বন্টন করে দখল রেখে চাষের আন্দোলন করছে। (*গণশক্তি*, ৩.৮.৬৭)

২৪ পরগণায় সংগঠিত কৃষক ...আন্দোলন; চারটি কৃষক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ।

সারা ২৪ পরগণা জেলায় জমির জন্য কৃষকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বিশেষতঃ ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট এবং সদর মহকুমায় কৃষকদের এই সংগ্রাম অত্যন্ত ব্যাপক এবং তীব্র আকার ধারণ করেছে। আন্দোলন সংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য কৃষক সভা সমেত চারটি কেন্দ্রীয় কৃষক সংগঠন একত্রিত হয়ে এক যুক্ত কমিটি গঠন করেছে।

জয়নগর, কুলতলী, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, সাগর, মথুরাপুর, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, সোনারপুর, ভাঙড়, বিষ্ণুপুর, বজবজ এবং ফলতা থানা এলাকায় জোতদাররা ভাগচাষীদের উচ্ছেদের জন্য ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। (*গণশক্তি*, ৩.৮.৬৭)

এ প্রসঙ্গে *গণশক্তি*র ৫.৮.৬৭-র সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হল:

হুঁশিয়ার

বিভিন্ন জেলা এবং অঞ্চল থেকে কৃষক আন্দোলন ও কৃষক কর্মীদের উপর জোতদারদের সংগঠিত আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ২৪ পরগণা জেলায় বিশেষ করে জোতদারদের এই আক্রমণ সংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত রূপ ধারণ করেছে। খবর পাওয়া গেছে নকশালবাড়ী এলাকার জোতদারদের অনুকরণে ২৪ পরগণা জেলার জোতদাররাও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে। নকশালবাড়ীর মতো ২৪ পরগণা জেলাতে জোতদারদের প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে কংগ্রেস নেতারা। দুর্ভাগ্যক্রমে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পার্টির স্থানীয় নেতারাও অনেক অঞ্চলে তথাকথিত প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন।

... আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জোতদাররা বহু লক্ষ বিঘা জমি বেনামীতে নিজেদের নামে রেখে দিয়েছে। ২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির হিসেব অনুযায়ী এই জেলায় জোতদাররা অন্তত ১০ লক্ষ বিঘে জমি বেনামীতে নিজেদের দখলে রেখেছে। সোনারপুর, যাদবপুর, ভাঙর, জয়নগর মজিলপুর, ক্যানিং প্রভৃতি থানা অঞ্চলে হাজার হাজার বিঘে চাষের জমি গত

সেট্‌লমেন্টের সময় জোতদাররা ট্যাংক ফিশারি বলে রেকর্ড করিয়ে রেখেছে। এর সাথেই যুক্ত হয়েছে উচ্ছেদের হিড়িক। জেলা কৃষক সমিতির হিসেবে প্রকাশ, একমাত্র ২৪ পরগণা জেলাতেই অন্ততঃ ১০ লক্ষ বিঘে জমি থেকে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

কৃষকের ফসলের লড়াইয়ের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়। বি. পি. টি. ইউ. সি-র অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলিকে তিনি গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক জাঠা পাঠাতে বলেছেন। কোন্ কোন্ অঞ্চলে শ্রমিক জাঠা যাবে তা কৃষকসভার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে। (*গণশক্তি*, ৩০.১০.৬৭)

কৃষক সংগ্রামের পাশাপাশি চোখে পড়ে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার। শুধু কারখানার শ্রমিকই নয়, কলমপেশা কর্মচারীরাও সমানতালে প্রতিটি সংগ্রামের নামে একই সারিতে দাঁড়িয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণী সর্বস্তরের মেহনতী মানুষকে সংগ্রামের ময়দানে একত্রিত করতে পেরেছে। এখানে তুলে ধরা হল তার আংশিক ছবি *গণশক্তি*-র পাতা থেকে।

১. দুইলক্ষ ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকের অভূতপূর্ব প্রতীক সাধারণ ধর্মঘট, ছাঁটাই এবং লে-অফ বন্ধের দাবী।

জয়, হিন্দ মোটর, জেশপ, ব্রেথওয়েট, ব্রিটানীয়া, গেস্টকীন উইলিয়ামস প্রভৃতি বড় কারখানা এবং বেলিলিয়াস রোডে সব ছোট কারখানা, ফেডারেশন অব মেটাল অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ডাকে ধর্মঘট করেন। (*গণশক্তি*, ৫.৭.৬৭)

২. লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারীর ঐতিহাসিক সমাবেশ

ঐতিহাসিক ১২ই জুলাই প্রস্তুতি কমিটির ডাকে মনুমেন্ট ময়দানে লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রেল শ্রমিক নেতা শান্তি চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন।

সভার পূর্বে অফিস কারখানা ছুটির পর শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা বিরাট বিরাট মিছিল করে এই সমাবেশে যোগদান করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৬ সালে এই দিনটিতে শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষকদের ৮১টি সংগঠনের ১২ লক্ষাধিক মেহনতী মানুষ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে তোলেন। (*গণশক্তি*, ১৩.৭.৬৭)

৩. অভূতপূর্ব চটকল শ্রমিক ধর্মঘট

আজ পশ্চিমবাংলার ৭৪টি চটকলে ২ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিকের একদিনের সাধারণ ধর্মঘট অভূতপূর্বভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এ. আই. টি. ইউ. সি এবং আই. এন. টি. ইউ. সির যুক্ত উদ্যোগে এই ধর্মঘট ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। (*গণশক্তি*, ১৭.৭.৬৭)

৪. অশ্রুতপূর্ব সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল। ২৪ ঘন্টার জন্য পশ্চিমবাংলার প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার ও জনস্বার্থবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সংঘবদ্ধ গণ- প্রতিবাদ।

২৪ শে আগস্ট সারা পশ্চিমবাংলার প্রাণস্পন্দন ২৪ ঘন্টার জন্য স্তব্ধ হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের আহ্বানে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের মধ্য দিয়ে জনগণ মজুতদার ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযানকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে চেয়েছেন। (*গণশক্তি*, ২৫.৮.৬৭)

বঞ্চনার দিন শেষ, এবার হিসেব-নিকেশের পালা এই মনোভাব ফুটে উঠছে সাধারণ মানুষের আচার-আচরণে। সর্বত্র সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার আগ্রহ, এমনকি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অঞ্চলেও।

২৪ মে *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-এ বলা হল, দুর্বার গণ আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিরোধী যাবতীয় চক্রান্ত পর্যুদস্ত করা হবে।

ঠিক সেদিনই ঘটল নকশালবাড়িতে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী কৃষকদের এক রক্তাক্ত সংঘর্ষ। এবং তারই সঙ্গে এক 'বৈপ্লবিক' ইতিবৃত্তের জন্ম, আরোপিত ব্যঞ্জনা নিয়ে। অখ্যাত জায়গাটি উঠে এল ইতিহাসের পাতায় এবং 'নকশাল' কথাটি রাজনীতির পরিভাষায় ঠাঁই করে নিল, বিদ্রোহ ও আরক্ত প্রতিবাদের অনুষঙ্গ জড়িয়ে। কোনো ব্যক্তির নামাঙ্কিত নয়, একটি জায়গার অভিধাযুক্ত কোনো বিশিষ্ট মত ও পথ যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আওতায় সৃষ্টি হতে পারে এতকাল তাও ছিল অকল্পনীয়।

২৪ মে, ১৯৬৭ দৃশ্যত যেটা ছিল জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ— তার মধ্যে যাঁরা আলাদা বৈপ্লবিক তাৎপর্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদেরই একজন এ. কে. রায়। তিনি লিখছেন ·

'আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ভারতের আকাশে তরাই অঞ্চলে এক মাস তারা দেখা দিয়েছিল। ... তারপর বই-এর পাতা থেকে গৃহযুদ্ধ নেমে এল বাস্তবের জমিতে। বিহারের লাঠিধারী পুলিশের হাতে এল রাইফেল আর পশ্চিমবাংলার ট্র্যাফিক কনস্টেবলের কোমরে রিভলবার। অবাক হয়ে লোকে তাকিয়ে রয়েছে সি. আর. পি. জওয়ানদের অদ্ভুতাকৃতি শিরস্ত্রাণের দিকে। 'কুম্বিং' আর 'এনকাউন্টার' অশ্রুতপূর্ব শব্দ দু'টির সাথে ঘটল দৈনন্দিন পরিচয়। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী আর কেন্দ্রবিন্দু নয়। নকশালবাড়ি, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, মুশাহারি, খেরি, শ্রীকাকুলাম, লখিমপুর অখ্যাত ও অশ্রুতপূর্ব সব জায়গার নাম রাজনৈতিক মানচিত্রে রক্তবিন্দুর মতো ফুটে উঠল।

চলমান অভ্যস্ত রাজনীতির পাশাপাশি উঠে এল আর-এক রাজনীতি। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারই শুধু নয়, তাকে তৈরি করাও চাই। তারপর রক্তঝরা এক বিয়োগান্ত কাহিনী।' (*দ্য স্টেট্‌সম্যান*, ৪.১১.৯২)

সে আরও পরের কথা। গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

গণশক্তি, ৩ মে, '৬৭, প্রথম পাতার সংবাদে রয়েছে নকশালবাড়ির কৃষকরা উচ্ছেদ বন্ধের জন্য জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। বুদ্ধিমান তিরকি নামে একজন জোতদার তার অধীন ঠিকা প্রজা বিগল কিষাণকে ভাগচাষী বলে উচ্ছেদ করেন। বিগল কিষাণ তার বিরুদ্ধে মুন্সেফ আদালতে মামলা করে জেতেন এবং ডিক্রী নিয়ে ১৩ এপ্রিল তাঁর জমিতে চাষ করতে যান। জোতদার তার লোকজন নিয়ে বিগল কিষাণের ওপর হামলা করে এবং তার মাথা ফাটায়। পঁচিশ বছর পর সেদিন নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে বিগল স্মরণ করলেন সেদিনের কথা: 'জোতদারের গুণ্ডাদের লাঠির ঘায়ে মাঠে পড়ে গেলাম। খবর রটে গেল, জঙ্গলের নেতৃত্বে শ'য়ে শ'য়ে চাষী লাঠি হাতে রে রে করে এল। জোতদারের গুণ্ডারা ভয়ে পালাল। জঙ্গল আমাকে লাঠির দাগ কেটে জমির দখল দিয়ে গেল। তখন জঙ্গলের নাম শুনলেই জোতদারদের

হার্ট অ্যাটাক হত। ঠিক হল জোতদারদের গ্রামে থাকতে দেব না। কোটিয়া, লালজি, ছোটমণিরাম ঢাকনা প্রসাদজোত— চারদিকেই জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে লাগল। আওয়াজ উঠল: 'লাঙ্গল যার জমি তার।' বিগল কিষাণ একটু দম নিয়ে বললেন, '২৪ মে সকালে খবর পেলাম হাতিঘিষার বড় ঝড়ুজোতে পুলিশ এসেছে। চারদিক থেকে মাঠের পর মাঠ দৌড়ে পেরিয়ে হাজার হাজার চাষী পৌঁছোল হাতিঘিষায়। জোতদারদের স্বার্থে পুলিশ এসেছে চাষীদের ধরতে! পুলিশকে আমরা গ্রামেই ঢুকতে দেব না। প্রত্যেক চাষীর হাতে হয় লাঠি, নয় তীর-ধনুক। টুকুরিয়া চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। খবর পেয়ে তাঁরাও হাতিঘিষায় জড়ো হয়ে চাষীদের পাশে লাঠি হাতে দাঁড়ালেন। চাষীরা ঘিরে ফেলল পুলিশকে, হাজার হাজার চাষী-শ্রমিক, লাঠি আর তীর দেখে পুলিশরা বন্দুক ফেলে পালাল। ইন্সপেক্টর সোমাম ওয়াংদি ও নকশালবাড়ি থানার একজন অফিসারের বুকে তীর বিঁধল। সোমাম ওয়াংদি মারা গেল। (*আজকাল*, ২৪ মে ১৯৯২)

প্রথম পাতায় স্থান পায় এই ঘটনাটি কলকাতার যাবতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে। *আনন্দবাজার* (২৫ মে ১৯৬৭) লিখছে: 'নকশালবাড়ীতে সশস্ত্র জনতার আক্রমণ / ৪ জন পুলিশ অফিসার আহত।'

তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি কমিশনার ও উত্তরাঞ্চলের ডি আই. জি আরও পুলিশ নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান।

ঠিক পরের দিন পুলিশ বদলা নিল। খবরের কাগজের ভাষায়, ২৫ মে সকালে বিক্ষুব্ধ এক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ নকশালবাড়ির প্রসাদজোতে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায়।

পি. টি. আই সংবাদে প্রকাশ, পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নারী ও আটমাসের এক শিশু নিহত হয়। মোট একশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে আছেন বিশিষ্ট বাম কম্যুনিস্ট কর্মী শ্রী পঞ্চানন সরকার। নকশালবাড়ির বিস্তৃত এলাকায় ইতিপূর্বে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। (*আনন্দবাজার পত্রিকা* ২৬ মে ১৯৬৭)

পরের দিন কাগজে আবার বলা হয় মৃতের সংখ্যা ন'জন। আসলে পুলিশের গুলিতে মোট এগারোজন মারা গিয়েছিলেন।

বিগল কিষাণ বলছেন, '২৫ মে প্রসাদজোতে মহিলা সমাবেশ ডাকা হয়েছিল আন্দোলনের কথা বলার জন্য। সেই সমাবেশের নেতা বেভাইজোতের প্রহ্লাদ সিং। এখানে পুলিশ হঠাৎ গুলি চালায়। ১১ জন নিহত হন। তার মধ্যে ৭ জন মহিলা ও ২টি শিশু। একটি শিশু ছিল প্রহ্লাদ সিংয়ের স্ত্রীর পিঠে বাঁধা অবস্থায়। রাইফেলের গুলি প্রহ্লাদের স্ত্রী ধলেশ্বরী দেবীর বুক ভেদ করে পিঠের বাচ্চাটিকেও খুন করে।' (*আজকাল*, ২৪ মে ১৯৯২)

২৫ মে-র গুলি চালনার ঘটনা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, কেউ অন্যায় করলে তিনি আইনমাফিক সাজা পাবেন। পার্টি-বিচারে কারও জন্য আলাদা ব্যবস্থা হবে না। ২৭ মে সান্ধ্য দৈনিক *গণশক্তি*-তে সরোজ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় লিখলেন : পুলিশের এই গুলি চালনার আমরা তীব্র নিন্দা করি। ৩০ মে সি. পি. এম.-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বিবৃতি দিলেন : নকশালবাড়ির সব ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই এবং পুলিশের গুলিতে নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নকশালবাড়ির সমস্যা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। সমস্যা হল সরকারি (খাস) জমি বণ্টনের। গণ-আন্দোলনের

অগ্রগতির পথে জনগণ এখানে সেখানে কিছু ভুল করতে পারেন। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১ জুন বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করলেন। ৬ জুন কৃষকসভার সভাপতি আবদুল্লাহ্ রসুল বললেন :

'নকশালবাড়ির ঘটনাবলীর পিছনে রয়েছে কৃষক বিক্ষোভের অতি ন্যায়সঙ্গত গুরুতর অভিযোগ এবং তাই হল এর মূল শক্তি। কৃষকদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়ার সময় কিছু বাড়াবাড়ি হয়তো হয়েছে ... এত বড় শক্তিশালী ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে যে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল তা হয়তো ছিল না এবং তারই পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তকারীরা।

... আমরা প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সম্বন্ধে সমস্ত কৃষক ও জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের আমরা অবহিত হতে অনুরোধ করছি যে কৃষক আন্দোলনের পিছনে রয়েছে বল্গাহীন জোতদারী জুলুমের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। তাকে আইনশৃঙ্খলার নাম করে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করা যায় না। এতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি খুশি হবে কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কবর রচিত হবে।'

২৮ মে কৃষক রমণী হত্যার প্রতিবাদ জানান জ্যোতি দেবী (কাকিমা), নন্দরানী দল, মাধুরী দাশগুপ্ত, কনক মুখোপাধ্যায় নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, কণিকা গাঙ্গুলি প্রমুখ মহিলা নেত্রীবৃন্দ, ৪ জুন *পিপলস ডেমোক্রেসি*-র প্রথম পাতায় বি. টি. রণদিভে সম্পাদকীয় লিখলেন: 'নকশালবাড়িতে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সেনানী ছিলেন। তাঁরা শহীদ হয়েছেন।'

গুলি চালিয়ে কৃষক খুন করার প্রতিবাদে ২৭ মে ধর্মঘট করলেন তরাইয়ের লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের চা-শ্রমিকরা। শিলিগুড়িতে রেল ও রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বার করেন। কলকাতায় পোস্টার পড়ল 'কাকদ্বীপের পর নকশালবাড়ির অহল্যাদের স্মরণে—আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করো।'

৬

এ পর্যন্ত সি. পি. এম নেতৃত্ব নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে চলেছে, তার পরিচালনা গত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও। অচিরে কিন্তু এই আন্দোলন এক ভিন্নতর মাত্রা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা হল। 'রুখে দাঁড়ান' শিরোনামা দিয়ে *গণশক্তি*-র (১৫.৬.৬৭) সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হল : কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা শুরু করেছে। উপলক্ষ্য নকশালবাড়ি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের প্রস্তাব অনুযায়ী চ্যবন নকশালবাড়িতে সংসদীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে চেয়েছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে জানান, এর প্রতিবাদ করতে হবে, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের এই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করে দেবার জন্য পশ্চিমবাংলার জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে।

পার্টি নেতৃত্বের তারই সঙ্গে এই ধারণাও বদ্ধমূল হয়েছে যে এই নতুন বিপদ সৃষ্টির মূলে

নকশালবাড়ি আন্দোলনের হঠকারী নেতৃত্ব। এবং ১৯ জুন 'নকশালবাড়ী' শিরোনামায় লিখিত *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয়তে সেই ধারণা ব্যক্ত হয়। বলা হয় : 'নকশালবাড়ী : এলাকার কৃষক সংগ্রামের সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। ...জটিলতর করার জন্য মূলতঃ দায়ী জোতদার কর্তৃক কৃষকের উপর আক্রমণ এবং সরকার কর্তৃক গ্রামের অভ্যন্তরে পুলিশ বাহিনী প্রেরণ।

এই মূল সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে আন্দোলনের নেতৃত্বের একাংশের ভ্রান্ত ও অত্যুগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।'

২১ জুন রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষিত হল আন্দোলন ও সংগঠনের সিদ্ধান্ত। তাতে বলা হয় : রাজ্য কমিটি লক্ষ্য করেছে যে পার্টির কর্মসূচির বিরোধিতা করে কিছু সংখ্যক পার্টি সদস্য যে উগ্র রাজনৈতিক ঝোঁক প্রদর্শন করছিলেন তাঁরা এখন হঠকারী লাইন ও কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের জন্য পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। পার্টির প্রস্তাব ও নির্দেশ অমান্য করে এই কার্যকলাপকে আর শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঝোঁক হিসেবে দেখলে চলবে না। পার্টি-বিরোধী গ্রুপগুলির মধ্যে প্ররোচনাদানকারীরাও ঢুকে পড়েছে একথা মনে করারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পার্টি-বিরোধী গ্রুপগুলির কার্যকলাপ পার্টির উপর আক্রমণ ত্বরান্বিত করার জন্য শত্রুপক্ষের কাজকেই সাহায্য করছে বলে রাজ্য কমিটির অভিমত।

পার্টি সংগঠন ও গণআন্দোলনের স্বার্থকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অবিরাম পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অভিযান পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় পার্টি-বিরোধী সদস্যের বিরুদ্ধে রাজ্যকমিটি শাস্তিমূলক বিধান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লক্ষণীয় যে সি. পি. এম. নেতৃত্ব এই প্রথম পার্টির মধ্যে হঠকারী ঝোঁক ও পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন এবং নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের পরিণতির সূত্রে তাদের চিহ্নিত ও উৎখাত করতে প্রয়াসী হলেন। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে পার্টিসভ্যদের একাংশের মধ্যে যখন অতিবামপন্থী প্রবণতা মাথা চাড়া দেয় তখন তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আজ তা গুরুত্ব পাচ্ছে, কারণ অতিবামপন্থার রাজনীতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। পার্টির মধ্যে বিভিন্ন হঠকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শৈবাল মিত্র লিখছেন:

কমিউন, চিন্তা, আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটি, সূর্যসেন গোষ্ঠী, এরকম নানা বিক্ষুব্ধ গ্রুপ মার্ক্সবাদী পার্টির মধ্যে তখন গোপনে কাজ করছিল। পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে এই গ্রুপগুলোর যথেষ্ট ক্ষোভ, সন্দেহ এবং অনুকম্পা ছিল। মার্ক্সবাদী পার্টি যে সংশোধনবাদী, কোনওদিনই যে তারা বিপ্লব করবে না, এ বিষয়ে প্রায় প্রতিটা গ্রুপ নিঃসন্দেহ হয়েছিল।' (*বামপন্থার আত্মদর্শন*, পৃ. ৩৯)

৭

উল্লিখিত বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলির অন্যতম একটির নেতা অবশ্যই নকশালবাড়ি কৃষক বিদ্রোহের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার।

১৯৬৬-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে চারু মজুমদারের সঙ্গে শৈবাল মিত্রের প্রথম আলাপ। ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হয়ে অসুস্থ অবস্থায় তাঁরা পাশাপাশি দুটি কেবিনে পুলিশ পাহারায় কিছুদিন ছিলেন। শৈবাল মিত্র লিখছেন: পার্টির সঙ্গে মত বিরোধ সত্ত্বেও আমরা ছাত্রকর্মীরা কোনও গ্রুপে নেই শুনে চারুবাবু বলেছিলেন, বাইরে গিয়ে তোমার প্রথম কাজ, শরীরটা সারানো, সুস্থ হয়ে ওঠা। তারপর বন্ধুদের নিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লাগাও, সশস্ত্র বিপ্লব মুক্তির পথ। মনে রেখ সশস্ত্র শব্দটা যেন বাদ না পড়ে।

চারুবাবুকে বলেছিলাম, জেলে ঢোকার আগেই গোপনে এইসব পোস্টার আমরা সাঁটতে শুরু করেছি। (*বামপন্থার আত্মদর্শন*, পৃ. ৩৯)

পার্টির মধ্যে এ ধরণের রাজনৈতিক চিন্তাধারার অস্তিত্ব এবং বিশেষ করে চারু মজুমদারের রাজনৈতিক মতবাদ পার্টি নেতৃত্বের নিশ্চয় অজানা ছিল না। যতদিন সেটা নিছক তাত্ত্বিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাস্তবে বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, ততদিন তাকে প্রধান বিপদ বলে তাঁরা গণ্য করেননি। এবার তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। *গণশক্তি*-র পাতায় নকশালবাড়ির উগ্রপন্থী হঠকারী নেতৃত্বের কার্যকলাপ সম্পর্কে একের পর এক রিপোর্ট বেরোতে থাকে। ১ জুলাই 'নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের কয়েকটি সমস্যা' শিরোনামায় বিশেষ প্রতিনিধি লিখছেন: যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পরে স্বভাবতই কৃষকদের উৎসাহ আস্থা বেড়েছে। তাঁদের বিক্ষোভ প্রবলবেগে ফেটে পড়েছে। নকশালবাড়ির ঘটনাবলীর পেছনে রয়েছে কৃষকদের পুঞ্জীভূত ব্যথা ও বেদনার কাহিনী।

... দুঃখের কথা, কৃষকদের এই আন্দোলনকে সঠিকপথে চালানোর পরিবর্তে নকশালবাড়ি অঞ্চলের স্থানীয় কৃষক নেতৃত্ব একে হঠকারী ও আত্মহত্যার পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হল তা এই নেতৃত্ব আদৌ কাজে লাগালেন না।

...নকশালবাড়ির ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে এবং তাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানান প্রচারের চক্রান্তমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে পুনরায় শাসনক্ষমতায় যাবার প্রস্তুতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা। এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীলরা নকশালবাড়ির ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত এবং অসত্য তথ্যাদি ফলাও করে প্রচার করছে। আশ্চর্যের কথা হল, স্থানীয় হঠকারী কৃষক নেতৃত্বও কিন্তু আওয়াজ উঠিয়েছেন জগাখিচুড়ি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ধ্বংস হোক।

একই কথার প্রতিধ্বনি ৯ জুলাই প্রকাশিত শিলিগুড়ি এস. ও. সি. সম্পাদক বীরেন বসুর বিবৃতিতে। তিনি বলছেন: হঠকারীদের তথাকথিত মুক্ত এলাকা গঠনের আওয়াজ কৃষক আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার পক্ষে কংগ্রেসের কাজকেই শক্তিশালী করা হচ্ছে। অপরপক্ষে আইন শৃঙ্খলার নামে তথাকথিত অরাজকতা দমনের জন্য এবং আত্মরক্ষার নামে কায়েমী স্বার্থের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপও রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করার চক্রান্তকে শক্তিশালী করছে। এদের উভয়ের কাজই পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের সংগ্রাম ও তার সংগঠন গড়ে তোলার সম্মুখে এক বিপদস্বরূপ উপস্থিত হয়েছে। বিপ্লবের নামে হঠকারীরা বিপ্লবের সর্বনাশ করছে।

.... প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে তাদের মুখোশ খুলে ধরার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে।

অবশেষে ২ জুলাই *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে মুজফফর আহ্‌মেদ-এর স্বাক্ষরিত নিবন্ধ, 'কমিউনিস্ট পার্টির পথ হঠকারিতার পথ নয়' প্রকাশিত হল। তিনি লিখছেন:

'কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে হঠকারী উপদলের অভ্যুদয় হয়েছে। এই উপদলের লোকেরা যদি আত্মসমালোচনার ভিতর দিয়ে নিজেদের বিচ্যুতির হাত হতে না বাঁচান তবে কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁদের স্থান নেই।

...অতীতে আমরা হঠকারিতার জন্য অনেক মূল্য দিয়েছি। আর সেই পথে নয়। যত দুঃখ হোক, যত কষ্ট হোক, যত কাঁটা বিছানোই হোক না কেন আমাদের পথে—আমরা বিপ্লবের পথ ধরেই চলব। হঠকারীরা আর যাই কিছু হোক না কেন, তাঁরা বিপ্লব বিরোধী।

আমাদের ভিতরে হঠকারীদের স্থান নেই। তাঁদের ভিতরে আমাদের পার্টির অনেকেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা থাকতে পারেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুললে চলবে না যে বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়।'

হরেকৃষ্ণ কোঙার তুলে ধরলেন নকশালবাড়ির বিকল্প সোনারপুরের পথ। ১৬ জুলাই এক বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করলেন, সোনারপুরের কৃষক আন্দোলন বাংলার কৃষক আন্দোলনকে নতুন পথ দেখাবে। সোনারপুরের কৃষকেরা সমস্ত বেনামী জমি দখল রেখে চাষ করার যে দুর্বার আন্দোলন শুরু করেছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার সে আন্দোলনকে সমর্থন করে। আমি বিশ্বাস করি, সংগ্রামী সোনারপুরের এই কৃষক আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনকে এক নতুন পথ দেখাবে। আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ যে, নির্ভুল নেতৃত্বে পরিচালিত এখানকার আন্দোলন পদ্ধতিগত দিক দিয়েও নির্ভুল। এই আন্দোলনের সাফল্য অনিবার্য।

তিনি নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেন : নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন আমাদের গৌরবের—দুঃখেরও। সেখানকার কৃষকদের ভুল নেতৃত্ব আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিচ্ছেন।

সভার শুরুতেই নকশালবাড়ির কৃষক শহীদদের স্মরণে এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হয়। (*গণশক্তি*, ১৭ জুলাই '৬৭)

সি. পি. এম পার্টির পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি এলাকায় পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়, এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কৃষক সম্মেলন থেকে নকশালবাড়ি কৃষকদের প্রতি সহমর্মিতা জানানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৮ জুন হুগলী জেলার আকমা আঞ্চলিক কৃষক সম্মেলন, ৪ জুলাই দিনহাটা কৃষক সম্মেলন ও নদীয়া জেলার পায়ড়াডাঙ্গা আঞ্চলিক কৃষক সম্মেলন।

তারই পাশাপাশি শুরু দফায় দফায় পার্টি থেকে বহিষ্কার : রাজ্য কমিটির ২০ জুনের সভায় গৃহীত বহিষ্কৃতদের তালিকা :

(১) সুশীতল রায়চৌধুরী (রাজ্য কমিটির সভ্য)
(২) পরিমল দাশগুপ্ত (কলকাতা জেলা কমিটির সভ্য)
(৩) তারক দাস (পার্টি সভ্য, কলকাতা)
(৪) শান্তি রায় (পার্টি সভ্য, কলকাতা)
(৫) অবনী রায় (ঐ)

(৬) অসিত সিনহা (ঐ)
(৭) নির্মল ব্রহ্মচারী (ছাত্র)
(৮) অঞ্জলি সুররায় (ঐ)
(৯) বীরেশ ভট্টাচার্য (ঐ)
(১০) দিলীপ পাইন (ঐ)
(১১) মলিন ঘোষ (চণ্ডীতলা, হুগলী)
(১২) কল্যাণ মুখার্জি (চণ্ডীতলা, হুগলী)
(১৩) শিবপ্রসাদ ঘোষমণ্ডল (ঐ)
(১৪) পরেশ মুখার্জি (ঐ)
(১৫) বিকাশ দত্ত (ঐ)
(১৬) রহম বক্স (ঐ)
(১৭) গোপাল পাল (ঐ)
(১৮) পশুপতি হাজরা (ঐ)
(১৯) তারাপদ ব্যানার্জি (ঐ)

দ্বিতীয় দফায়, পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ৭ সেপ্টেম্বর '৬৭ তারিখে বহিষ্কার করা হয় :

(১) পি. কে. ভরদ্বাজ (দার্জিলিং জেলার সদস্য)
(২) চারু মজুমদার (ঐ)
(৩) সৌরেন বসু (ঐ)
(৪) দিলীপ বাগচী (মুর্শিদাবাদ জেলার সদস্য)
(৫) মহাদেব মুখার্জি (আসানসোল জেলার সদস্য)

৮ই সেপ্টেম্বর উৎপল দত্ত সম্পর্কে এক পার্টি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়:

বিখ্যাত নাট্যশিল্পী উৎপল দত্ত কখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, এখনও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সভ্য নন। অতীতে তাঁর শিল্পকর্মের মারফতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এবং পার্টি বিভক্ত হওয়ার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে তিনি প্রচার করেছেন। তাতে পার্টির লাভ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর নিজের ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। আজ উৎপল দত্ত হঠকারীদের দলে ভিড়ে গিয়ে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন। তিনি নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। আমাদের পার্টির সভ্য তিনি নন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা আমরা নেব।

আমাদের পার্টির সভ্য ও বন্ধুগণের নিকট আমরা অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন শিল্পী উৎপল দত্ত ও তাঁর দলের সঙ্গে কোনও সংশ্রব না রাখেন— কোনো সভাসমিতি ও অভিনয়ে তাঁদের যেন নিমন্ত্রণ না করেন।

সম্পাদকমণ্ডলী
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

কেন্দ্রীয় কমিটি (২৮ অক্টোবর-২ নভেম্বর)-র সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিবকুমার মিশ্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তারই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটি কর্তৃক নারায়ণ তেওয়ারীকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও অনুমোদন করা হয়।

১১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে জানালেন: অধ্যক্ষ অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী পার্টি সদস্য নন— অতীতেও ছিলেন না কখনও, পার্টির বন্ধু ছিলেন তিনি। এখন তিনি বন্ধুও নন।

হাওড়া জেলা কমিটি জানাচ্ছে যে হাওড়া জেলার কদমতলার পার্টিসদস্য বনবিহারী চক্রবর্তীকে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

১২ জুলাই, ১৯৬৮, এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য দেবব্রত (দেবু) ঘোষালকে ১০ জুলাই '৬৮ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

৮

পার্টি বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য কলম ধরলেন বাসবপুন্নাইয়া।

বিদ্রোহীদের প্রকৃত চেহারা

... পার্টি শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গ্রহণের পরেরদিন যেতে না যেতেই এই 'বন্ধুগণ' তাঁদের মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে পার্টিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার এবং পার্টি ও তার কর্মসূচি, রাজনৈতিক কৌশলগত লাইন, সংগঠন এবং পার্টির সমস্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার রাস্তায় নামলেন।

২৮ শে জুন তাঁরা রাজ্য কমিটির সাপ্তাহিক *দেশহিতৈষী* দখলের জন্য ব্যর্থ 'ক্যু দেতা' (Coupd'etat) সংগঠিত করলেন। ...এই অভিযান চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করার পর এঁরা নিজেদের পত্রিকা এবং আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে আলাদা রাজনৈতিক মঞ্চ দাঁড় করাতে একমুহূর্তও দেরি করলেন না। ... এদের প্রকাশ্য লেখাগুলির রাজনীতিগত আদর্শগত বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বিগত একবছর ধরে পার্টির কোনো কোনো মহলে যে সমস্ত গোপন বুলেটিন, সার্কুলার এবং দলিল প্রচার করা হচ্ছিল সেগুলির এবং প্রকাশ্য দলিলগুলির বিষয়বস্তু একই।

অন্যকথায়, এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি সংগঠিতভাবে পার্টির ভেতরে পার্টি হিসেবে কাজ করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গৃহীত পার্টি কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক লাইনকে উলটিয়ে দিয়ে পার্টির বিকল্প অতিবিপ্লবী লাইন চাপিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয়ত, এটা যথেষ্ট পরিষ্কার যে তাঁদের এই খেলা প্রকাশ হয়ে পড়লেই পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যে তৎপরতার সাথে নিজেদের সাপ্তাহিক পত্রিকা এরা প্রকাশ করলেন এবং এদের মুখপত্রে আলাদা পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন তার থেকেই আমাদের এই বক্তব্য প্রমাণিত হচ্ছে।

... এরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এবং প্রকাশ্যে প্রচার করেন যে, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সকলেই নয়া সংশোধনবাদীতে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের সাথে ডাঙ্গের ব্যক্তিগত ঝগড়া ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। ...বস্তুত

এঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করার জন্য অভিযোগ আসা উচিত নয়। পার্টিতে দীর্ঘদিন এদের সহ্য করা হয়েছে এবং এঁরা যে ভেতর থেকে পার্টিকে ভাঙার কাজ করতে সচেষ্ট এটা সময় মতো উপলব্ধি না করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসা উচিত।

••• ••• •••

বিদ্রোহীদের দাবি হল—কলকাতার দেওয়ালে কয়েকখানা পোস্টার লাগানো অথবা কিছু শ্রোতাকে নিয়ে দু'একটি জনসভা করার মাধ্যমে তাঁরাই একমাত্র নকশালবাড়ির কৃষকদের জন্য সমর্থন জমায়েত করছেন। এর চেয়ে হাস্যকর দাবি আর কিছু হতে পারে না। হঠকারীগণ কর্তৃক মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে অত্যধিক কথাবার্তা এবং এই চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে তাঁরা পার্টি একতা ভাঙার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার জন্যই পার্টি আরও বেশি কিছু করতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের ক: পা: (মা:) নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামের বিরোধী নয়। পার্টিকে খোলাখুলি অমান্য করে এবং দেশের বাস্তব ও আত্মবাদী উপাদানের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা দেখিয়ে কতিপয় নেতা সংগ্রামের উপর যে বামপন্থী হঠকারী লাইন চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন আমাদের পার্টি তার দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে। হঠকারী নেতৃত্বের লাইন হচ্ছে পেটি বুর্জোয়া কল্পনাবিলাসী লাইন। হঠকারীদের মতে তাঁদের লাইন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটি সামনের দিকে ঠেলে দিতে এবং কৃষকদের জমির জন্য সংগ্রামকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে সক্ষম। এটা হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদারদের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে তীর-ধনুক ব্যবহারের মাধ্যমে নকশালবাড়ির কৃষকদের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টার শিশুসুলভ বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী লাইন। আমরা অবশ্যই দেশের কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়া চক্রের সুবিধা করে দেবার বিরোধী। এই প্রতিক্রিয়া চক্র নকশালবাড়িকে ভারতভূমিতে 'ইয়েনান' অথবা 'ভিয়েতনাম' বলে চিত্রিত করেছে কৃষকদের সংগ্রামকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়াই হল প্রতিক্রিয়ার চক্রের ঘোষিত ইচ্ছা।

••• ••• •••

পার্টির সমস্ত সৎ দরদী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাঁদের বিদ্রোহীরা বিভ্রান্ত করতে এবং বোকা বানাতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের এই শয়তানী পরিকল্পনা সম্পর্কে সজাগ হতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। পার্টির যে সমস্ত সৎ এবং জঙ্গী কর্মী পার্টির উপর বামপন্থী হঠকারীদের কাপুরুষোচিত আক্রমণে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন, তাঁদের পার্টির ঐক্য রক্ষায়, পার্টির কর্মসূচি ও রাজনৈতিক লাইনের সমর্থনে এবং এই শিশুসুলভ কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। (*গণশক্তি*, ১৭-১৯ জুলাই '৬৭)

যে আন্দোলনকে বিপথগামী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং যাঁদের হঠকারী বলে পার্টি থেকে বিতাড়ন করা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে চীনের বেতার ও সংবাদ-মাধ্যম তাকে পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছে।

টোকিও ২৮ জুন : ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দার্জিলিং জেলায় এক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে—খবর নিউ চায়না নিউজ এজেন্সির। খবরটি আজ বেতারে প্রচার করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবর উল্লেখ করে চীনা সংবাদ সংস্থা বলছে, সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি গ্রামে—নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া। উত্তরবঙ্গের এই পার্বত্য এলাকার আয়তন ৪৩৫ কিলোমিটারের বেশি, জনসংখ্যা ৮০ হাজার।

ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঁরা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, কৃষক সমিতি গঠন করেছেন।

মাওয়ের পথ

গৌহাটি ২৮ জুন : আজ রাতে পিকিং বেতার থেকে প্রচারিত 'দার্জিলিং-এ কৃষক বিদ্রোহের' এক রিপোর্টে বলা হয়, চেয়ারম্যানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের জনসাধারণ যে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে, নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ তারই প্রমাণ।

শহরগুলিকে প্রথমে ঘিরে ফেলে পরে দখল করে নেবার জন্য গ্রামাঞ্চলে সব শক্তি কেন্দ্রীভূত করাই মাওয়ের রণকৌশল। সেই কৌশল অনুযায়ী 'বিপ্লবী কমিউনিস্টরা' গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

ভারতকে একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ হিসাবে অভিহিত করে পিকিং বেতার আরও বলেছে : নকশালবাড়ির ঘটনাবলী ভারতের এক বিপ্লবী আন্দোলন সূচনা করছে যার মূল শ্লোগান সশস্ত্র লড়াই।

পিকিং বেতারের মতে : নকশালবাড়ির আন্দোলনকে বিশ্বের বিপ্লবীদের স্বাগত জানানো উচিত। কারণ দার্জিলিং কৃষক বিদ্রোহের ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সারা দেশে আগুন জ্বালাবে।

উপসংহারে পিকিং বেতার বলেছে, কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতি হল সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ আর নির্মমভাবে সব বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করাই হল স্বরাষ্ট্রনীতি। সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ আজ সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করেছেন। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৯ জুন ১৯৬৭)

৫ই জুলাই ১৯৬৭ *পীপলস ডেইলি-তে* প্রকাশিত হল "ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ" নিবন্ধটি। তাতে বলা হয়, '...নকশালবাড়িতে সমস্তপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা, স্থানীয় অত্যাচারী শোষক ও বদমাস ভূস্বামী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনী ও পুলিশ —এরা সব বিপ্লবী কৃষকদের দৃষ্টিতে নেহাতই নগণ্য এবং এদেরকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে তারা বদ্ধপরিকর।...'

২৭ জুন পিকিং বেতারে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসলে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রীড়নক, তাকে বসানো হয়েছে জঙ্গীতাকে বোকা বানানো ও সাধারণ মানুষের জঙ্গী-পনাকে ভোঁতা করার জন্য। দুদিন পর বেতারে আবার বলা হয়, দলত্যাগীচক্রের প্রশংসাধন্য ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রীড়নক 'অকংগ্রেসী জনতার সরকার' কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবিপ্লবী হুকুম তামিল করে চলেছে। ভারত সরকার দার্জিলিং-এর বিপ্লবী আগুন নেভাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কাজে লাগাচ্ছে।

এটা লক্ষণীয় যে গোড়ায় নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন করার সূত্রে সরাসরি সি. পি. এম-কে চীনা পার্টি আক্রমণ করেননি, তাদের আক্রমণ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত ছিল। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন চাপের মুখে সি. পি. এম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসবে। সি. পি. এমের পক্ষ থেকে এরকম কোনো লক্ষণ না দেখে চীনা পার্টি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তাদের আক্রমণের পরিধি আরো বিস্তৃত করলেন। এবার তাঁরা বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সি. পি. এমের কয়েকজন সংশোধনবাদী নেতা সশস্ত্র সংগ্রামের বৈপ্লবিক লাইনের বিরোধী এবং

তারা শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সংশোধনবাদী লাইন অনুসরণ করে চলেছে। এবার আক্রমণ আরও নির্দিষ্টভাবে কেন্দ্রীভূত।' এবার বলা হল : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সেসব সংশোধনবাদী নেতা যারা রাজ্য সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিত্বের পদে আসীন তারা প্রথমে ভূমিসংস্কারের ধাপ্পা দিয়েছে এবং তাতে যখন কাজ হল না, তারা তখন কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে এবং বিপ্লবীদের উগ্রবামপন্থী বলে দূরে ঠেলে দিয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির হয়তো ধারণা ছিল সি পি এম-এর বেশির ভাগ পার্টিসদস্যকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল করা যাবে। তাই তাঁরা বারে বারে বলতে থাকেন, মুষ্টিমেয় সংশোধনবাদী নেতা যারা পার্টির মধ্যে বিপ্লবীদের নিপীড়ন করছে, প্রতারিত করছে ও তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে—তেমনি তারা বিপ্লবকেও বানচাল করছে এবং কৃষক আন্দোলনের উপরও দমনপীড়ন চালাচ্ছে। এই সংশোধনবাদীরা কোনও অংশেই 'দলত্যাগী ডাঙ্গে চক্রে'র চেয়ে ভাল কিছু না।

চীনা পার্টির মতে, নকশালবাড়ির লড়াই মিছিল শুধু জমি দখলের জন্য নয়। এটা 'রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই।' এর নেতৃত্ব করছেন মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত সি পি আই (এম)-এর কৃষি বিপ্লবের কর্মীগণ।

পরিশেষে অতীতের ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানা লড়াই থেকে শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান জানানো হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী জনগণকে। তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা অবশ্যই রাজনীতিগতভাবে, মতাদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে সংশোধনবাদী লাইন খারিজ করবেন এবং সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্রের নেতৃত্বাধীন আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিচল থাকবেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ নিশ্চয়ই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং চিন্তাধারা-সমৃদ্ধ সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ার জন্য লড়াই চালাবে। (*পিকিং রিভিউ*, ১১ আগস্ট ১৯৬৭)

অবশেষে সি পি এম-এর ভেতরে এবং বাইরের বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ হয়ে একটি মাওবাদী পার্টি গড়ার আহ্বান জানাল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

জলি কল বলছেন : ১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্ম একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কেউ ভাবিনি যে কংগ্রেস হেরে যাবে। ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস হেরে গেল। সেদিন কমিউনিস্টদের মূল ধারণা ছিল—বুর্জোয়া কাঠামোয় গঠিত এই সরকার বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। তাকে টিঁকে থাকতে দেবে না এদেশের শাসক শ্রেণী। অতএব, অল্পদিনের মধ্যে যা পার, করো। অল্পদিনের মধ্যে এই সুযোগে পার্টিকে শক্তিশালী করো। জলি কলের মতে, Creative development of Marxism ও পুরনো understanding -এর contradiction resolve করার কোনো চেষ্টাই হয়নি। অতএব যা অনিবার্য ছিল তাই হল: প্রথমে অরাজকতা ও পরে পতন।

শিপ্রা সরকার লিখছেন, মধ্যপন্থীদের তথাকথিত দুর্বলতা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করলে বামপন্থীদেরও দায়িত্ব এসে যায় সংযতভাবে চলার। দেখা গেল সি পি আই (এম)-এর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। জমি নিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারের বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হল প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতাদের যুক্তফ্রন্টের ভিতরে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব। অনেক ক্ষেত্রে সি. পি. আই (এম)-এর ভিতরে চরমপন্থীদের প্রভাব থাকাতে বেনামী ও খাস জমি দখলে নানারকম বাড়াবাড়ি হতে লাগল (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১.৭.৯৩)

দেখা যাচ্ছে, জলি কল ও শিপ্রা সরকার উভয়েই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য মূলত দায়ী করেছেন কমিউনিস্টদের, বিশেষ করে সি. পি. আই (এম)-এর রাজনৈতিক মতান্ধতা ও সংকীর্ণতাবাদী চিন্তাধারাকে। দেখা দরকার বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের অভিযোগ কতটা টেঁকসই। একথা অনস্বীকার্য যে কমিউনিস্ট মাত্রেরই মনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় গোড়া থেকেই ছিল। কারণ তাদের সামনে রয়েছে ১৯৫৯ সালে কেরলের কমিউনিস্ট সরকার বরখাস্ত করার নজির। অতএব নব পর্যায়ে এরাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে (যেখানে কমিউনিস্ট মন্ত্রীরা রয়েছেন) কেন্দ্র কতদিন বরদাস্ত করবে এই অনিশ্চয়তা বরাবরই ছিল। তাছাড়া ছিল খাদ্য নিয়ে ব্ল্যাকমেল এবং নতুন রাজ্যপাল ধরমবীরের পৃষ্ঠপোষকতায় নানাবিধ চক্রান্ত ও দল ভাঙাভাঙির খেলা। কোনো সরকারই পুরোপুরি নিরপেক্ষ হতে পারে না। জমিদার বনাম কৃষক অথবা মালিক বনাম শ্রমিকের মধ্যে তাকে একটি পক্ষ বেছে নিতে হবে। কমিউনিস্টদের কাছ থেকে (মধ্যপন্থীদের মুখ চেয়ে) অপার সহিষ্ণুতা দাবি করার অর্থ তাদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিতে বলা। তাতেও সরকার বাঁচত কিনা বলা কঠিন, তবে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন চড়ায় গিয়ে ঠেকত।

৯
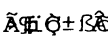
দেখা যাচ্ছে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যকালে গোড়া থেকে তার আয়ুষ্কাল যে নেহাত সীমিত তার আভাস ফুটে উঠছে গণশক্তি-র পাতায় প্রতিদিন প্রায় ধারাবাহিকভাবে।

প্রসঙ্গ ঘেরাও :

গভীর চক্রান্ত

পশ্চিমবাংলায় ঘটনাবলী অতিদ্রুত এগিয়ে চলেছে। ১৯৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে ধরণের কুৎসামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল, সেই একই ধরণের অভিযান পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যৎ হস্তক্ষেপের জমি প্রস্তুত করার জন্য কেরালার মতো একই কায়দা ব্যবহার করা হচ্ছে।

মালিক ও পুঁজিপতি-গোষ্ঠী তথাকথিত 'অনিশ্চিত আবহাওয়া নিয়ে' তারস্বরে চীৎকার শুরু করেছে। হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই ও লে-অফ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের পক্ষে প্রদত্ত ট্রাইব্যুনালের রায় মালিকেরা মানছে না।

... শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ঘেরাও এবং অন্যান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশিব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকার করেছে—এটাই হচ্ছে দেশী-বিদেশী বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অভিযোগ। তাঁরা তাই 'ঘেরাও'কে 'জঙ্গল-আইন' আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ [illegible] (*গণশক্তি*, ১৩.৫.৬৭)

ঠিক তার দশদিন পর আবার বলা হচ্ছে 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ

শুরু হয়েছে' এবং তারই সঙ্গে ঘোষণা করা হচ্ছে : জনগণ রয়েছে এই সরকারের সাথে এবং তাদের সাথী করে সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে এবং যদি এই সরকারের পতন ঘটায় কেন্দ্রের রাষ্ট্রশক্তি, তাহলে পশ্চিমবাংলায় এমন প্রচণ্ড ব্যাপক ও তীব্র গণসংগ্রাম দেখা দেবে যা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। (ঐ, ২৪.৫.৬৭)

তিন সপ্তাহ পর আবার সাবধানবাণী উচ্চারিত। এবার নকশালাবাড়ি। বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা শুরু করেছে। উপলক্ষ্য নকশালবাড়ি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের প্রস্তাব অনুযায়ী চ্যবন নকশালবাড়িতে সংসদীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে চেয়েছেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে জানান, এর প্রতিবাদ করতে হবে, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের এই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করে দেবার জন্য পশ্চিমবাংলার জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে। (*গণশক্তি* ১৫.৬.৬৭)

আর এক সপ্তাহ পরে আহ্বান জানানো হচ্ছে 'প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকুন।' কারণ কংগ্রেসের মুখপত্র গতকাল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছে—'দেশকে বর্তমান অরাজকতা হইতে বাঁচাইতে হইলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংযত হইতে হইবে। না হইলে দেশে প্রেসিডেন্টের শাসন অনিবার্য।'

রাষ্ট্রপতির শাসন আসন্ন ধরে নিয়ে ডাক দেওয়া হচ্ছে :

রাষ্ট্রপতি শাসন যদি সত্যই প্রবর্তিত হয়, তাহলে সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী পার্টি গুলি এবং শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-ছাত্র-নারীদের গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের আহ্বান আসবে। বৃহৎ ধনিক জমিদার রাষ্ট্রের এই আঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী পশ্চিমবাংলা প্রত্যাঘাত হানবে। আজ থেকে এর জন্য প্রস্তুত থাকুন। (ঐ, ২৪.৬.৬৭)

রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসনের যে চক্রান্ত চলছে আসলে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী কে?

সম্পাদকীয়

বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী কে?

গত ছ'মাসে যে কয়েকটি গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী কে? কংগ্রেস দল সংবাদপত্র এবং এমনকি যুক্তফ্রন্টভুক্ত কোনো কোনো দল ও নেতা এজন্য সংগঠিত শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের উপর দোষারোপ করেছেন। সেইটাই কি বাস্তব? ঘটনা আদৌ তা নয়।

২৪ পরগণা জেলায় মিনাখাঁয়ে কৃষকের ঘরবাড়ি ভেঙ্গেছে কারা? তাঁদের জমির ফসল কেটেছে কারা? নকশালবাড়ির কৃষক হত্যা করেছে কারা? জমির দাবিতে সংগ্রামরত এই কৃষকদের উপর জোর জুলুম চালিয়েছে কারা? জেলায় জেলায় গরীব ক্ষেত মজুর ও চাষীদের ওপর লাঠিয়াল-গুণ্ডা লাগিয়ে খুন জখম করেছে কারা? কৃষকদের উপর এই বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের শোষক শ্রেণী জমিদার-জোতদারের দল।

আসানসোল মহকুমার শ্রমিক এলাকায়, বিশেষতঃ কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের উপর অবিরাম আক্রমণ, শ্রমিক হত্যা কারা করেছে? দমদমের কারখানায় কে শ্রমিক হত্যা করেছে? যাদবপুরের শ্রমিক নেতা রামদত্তকে খুন করেছে কে? বেলেঘাটার শ্রমিক নেতা সুনীলকে কে

হত্যা করল? ব্যারাকপুর শ্রমিক অঞ্চলে বিশেষতঃ টিটাগড়, নোয়াপাড়া শ্যামনগর-হাজিনগর এলাকায় সংগঠিত শ্রমিকদের ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে কারা? বজবজ, হাওড়া ও হুগলীর শ্রমিক এলাকায় যেসব লাঠিয়ালরা মারপিট করে বেড়াচ্ছে তারা কাদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা? কারখানার মালিকশ্রেণীর পরিকল্পনা অনুসারে এইসকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনা যে ঘটছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন? এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কংগ্রেসের নিছক রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং সেই চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রাণাঘাট, আসানসোল, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও হাওড়ার হিংস্র গুণ্ডা ও পুলিশের তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে। এইসব ঘটনায় চোরাকারবারী ও মুনাফা শিকারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রামাণ্য সাক্ষ্য বর্তমান। (*গণশক্তি*, ২১.৯.৬৭)

৪ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির বৈঠক থেকে অল্পসময়ের নোটিশে শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মেহনতী মানুষকে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। কারণ, অন্তরালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রখর সতর্কতা ও গণপ্রতিরোধের ডাক দিলেন সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটি :

••• ••• •••

পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্র বিধ্বংসী চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণের প্রখর সতর্কতা ও গণ-প্রতিরোধ চাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির প্রস্তাব (৭ অক্টোবর ১৯৬৭) (নিজস্ব প্রতিনিধি)

‘আচম্বিতে সরকারের পতন ঘটিয়ে যে রাজনৈতিক ক্রূর চক্রান্ত সম্পূর্ণ করা হয়েছিল তা আপাততঃ ব্যর্থ হলেও রাজ্যের গণতান্ত্রিক জনগণকে আসন্ন ভবিষ্যতে পুনরায় এই ধরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একথা পরিষ্কার যে, একমাত্র ব্যাপক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ সংগঠিত করা ব্যতিরেকে এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করা যাবে না।

...১৮ দফা কর্মসূচি ও মূলনীতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ আপোস সহ্য করবে না। এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির ওপর আক্রমণ চালাতে দেবে না। এই চক্রান্তজাল জনসমক্ষে উদঘাটিত হবার পর পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। এখন প্রয়োজন জাগ্রত জনগণের প্রখর সতর্কতা, সচেতন সংগঠন এবং ব্যাপক প্রতিরোধ প্রস্তুতি।

প্রস্তাবে আরও ছিল অবিলম্বে ফৌজ ও সশস্ত্র-পুলিশ প্রত্যাহার, গভর্নরের অপসারণ, অসত্য-বিকৃত রিপোর্ট তৈরি করে যেসকল উচ্চপদস্ত আমলারা এই চক্রান্তে সাহায্য করার জন্য দায়ী তাদের উচ্চপদ থেকে অপসারণের দাবি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই জঘন্য কার্যকলাপের তীব্র নিন্দাবাদ।

১৮ই অক্টোবর পলিটব্যুরোর এক বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয় : কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) অথবা তার একাংশ চীনের আধিপত্য কায়েম অথবা চীনের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট—এহেন প্রচারে অজয় মুখোপাধ্যায় প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। পুলিশের বিকৃত রিপোর্টে বিশ্বাস করে তিনি ভারত সরকার ও অন্যান্য শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। তাই অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি চক্রী ও চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

১৯ অক্টোবর এক বিবৃতিতে হুমায়ুন কবীর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাষ্ট্রপতির শাসন-এর দাবি

জানালেন। তিনি বলেন: আগে আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর পরিশ্রম করেছি নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের জন্য, কিন্তু এখন প্রয়োজন হলে কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে ইতস্তত করব না।

এবার প্রচার ও শ্লোগান :
দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন

- যুক্তফ্রন্ট সরকারের উৎখানের জন্য কংগ্রেস ও কয়েমী স্বার্থের বেপরোয়া চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।
- পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও জোতদার মজুতদারদের গভীর চক্রান্ত প্রতিরোধ করুন।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ও গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলুন।
- কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল আমলাচক্রের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে।
- অনিশ্চিত অবস্থার সমাধান মধ্যবর্তী নির্বাচন। (*গণশক্তি*, ১৯.১০.৬৭)

১০

অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের অনেক কাজ অপছন্দ করতেন, পদত্যাগের কথা ভেবেছেন একাধিকবার। কিন্তু ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব স্বীকার করা তখন কোনো দলের পক্ষে সহজ ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জাহাঙ্গীর কবীর প্রমুখ ১৯ জন সদস্যের দলত্যাগের ফলে এবং বাংলা কংগ্রেসে ভাঙনের পরেও যুক্তফ্রন্ট কিন্তু অটুট রইল। কংগ্রেসের ইঙ্গিতে রাজ্যপাল ধরমবীরের ক্রমাগত চাপ অগ্রাহ্য করে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা করতে অস্বীকার করলেন।

১৯ নভেম্বর রবিবার বিকালে কলকাতা ময়দানে কংগ্রেসের এক বিশাল জনসভায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন দাবি জানান: আগামী ২৩ নভেম্বর-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে হবে। তা যদি না হয় এই রাজ্যে লঘিষ্ঠ সরকারকে বরখাস্তের জন্য রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করতে কংগ্রেস সারা বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু করবে। প্রদেশ কংগ্রেসের আয়োজনে কলকাতায় সাম্প্রতিককালের মধ্যে এটি এক বৃহত্তম সমাবেশ। নানা জেলা থেকে এলেও সবচেয়ে বড় মিছিল আসে হাওড়া থেকে। আর মিছিলে নানা প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেসী হাজির ছিলেন। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০.১১.৬৭)

অপরদিকে বিশ্বাসঘাতক এম এল এ-দের সাহায্যে কংগ্রেস সরকারকে গদিতে ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প ঘোষিত হল। *গণশক্তি*-তে (৫.১১.৬৭) প্রকাশিত হল বিশ্বাসঘাতকদের তালিকা। (কোন্ তারিখে রাজ্যপালকে পত্র লিখেছেন তা বন্ধনীর মধ্যে)।

(১) খগেন ব্যানার্জি (নির্দলীয়, ৩১ আগস্ট)
(২) যজ্ঞেশ্বর রায় (বাংলা কংগ্রেস, ঐ)
(৩) হাজি সজ্জাদ হোসেন (পি এস পি, ঐ)

(৪) মহম্মদ সলিমুদ্দিন (ঐ, ১ সেপ্টেম্বর)
(৫) জগদানন্দ রায় (ঐ, ৮ সেপ্টেম্বর)
(৬) হৃষিকেশ হালদার (বাংলা কংগ্রেস, ১৪ সেপ্টেম্বর)
(৭) আবদুল হক (আর. এস. পি. সমর্থক, ২৮ সেপ্টেম্বর)
(৮) রাধাকৃষ্ণ সিংহ (নির্দল, ৩০ সেপ্টেম্বর)
(৯) রাজেন্দ্র সিং সিংহী (স্বতন্ত্র পার্টি, ৩০ সেপ্টেম্বর)
(১০) জয়তী প্রসন্ন মুখার্জি (বাংলা কংগ্রেস, ৩০ অক্টোবর)
(১১) জয়নাল আবেদীন (ঐ)
(১২) চণ্ডী মিত্র (ঐ)
(১৩) গঙ্গাধর প্রামাণিক (ঐ)
(১৪) হরেন মজুমদার (ঐ)
(১৫) আমির আলি মোল্লা (ঐ)
(১৬) দাশরথি তা (পি এস পি, ৪ নভেম্বর)
(১৭) নলিনাক্ষ সান্যাল (বাংলা কংগ্রেস, ঐ)
এবং (১৮) প্রফুল্ল ঘোষ।

সেদিনই এক বিবৃতিতে সি পি আই (এম), সি পি আই, আর এস পি, ইউ সি আই, এস এস পি ও বিভিন্ন গণসংগঠন জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন : সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ সংগঠিত করুন।

রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী সংগঠনকে ধর্মঘট ও হরতালের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। (*গণশক্তি*, ৫.১১.৬৭)

৬ নভেম্বর, ব্রিগেড ময়দানে সি পি আই (এম)-আহূত বৃহত্তম জনসমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গে আজ যা ঘটছে তা নিছক মন্ত্রিত্ব বদলের চক্রান্ত নয়। এই চক্রান্ত গণতন্ত্রকে হত্যার চক্রান্ত। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী এবং মেহনতী মানুষের রুজি রুটির আন্দোলনকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় আবার কংগ্রেসী শাসনের, পুঁজিপতি জমিদারদের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত।

সি. পি. আই (এম) নেতৃবৃন্দ উপসংহারে বলেন : আর যদি আপনাদের নিকট বলার সময় না পাই তাই আজই বলছি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। দিকে দিকে মানুষকে জানিয়ে দিন। বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে মানুষদের ঘৃণা জাগ্রত করুন। বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি জোর করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করে তাহলে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের মাধ্যমে সব কিছু স্তব্ধ করে দিন।

গোটা পশ্চিমবঙ্গ স্পষ্টতই লড়াই-এর ময়দান। গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই-এর ময়দান। গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই-এ আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সামিল। *গণশক্তি-র* সংবাদদাতা (৬.১১.৬৭) জানাচ্ছেন : এই ঐতিহাসিক সমাবেশে যোগ দিতে আসা মানুষগুলির মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় এরা ভিন্নতর মানুষ। গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের সৈনিক এরা। যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পকালীন অস্তিত্বের বোধহয় মহত্তম অবদান : সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন মানুষে পরিণত করা ।

১১ নভেম্বর বি পি টি ইউ সি ঘোষণা করল : চক্রান্ত প্রতিরোধে শ্রমিকশ্রেণীকে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর তিনটি মূল আওয়াজ :

১. যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে এবং তাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।
২. কারখানা বন্ধ, লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে।
৩. চাষীদের ধানের ন্যায্য অংশ পাওয়ার সমর্থনে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের ফসল সংগ্রহ কার্যক্রমকে সফল করার জন্য।

আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ। ঝড় উঠবে—আন্দোলনের ঝড়। যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎখাত করার সঙ্গে সঙ্গে। তারই প্রস্তুতিতে ১৫ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সংগঠিত হবে জেলায় জেলায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ।

যুক্তফন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সম্পূর্ণ। নানা আভাস ইঙ্গিতে স্পষ্ট যে জনগণের বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ আসন্ন। যুক্তফ্রন্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির নেতৃবৃন্দ স্থির করেছেন, যদি রাজ্যপাল সরকারকে গদিচ্যুত করে দেন, সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বত্র মিছিল হবে এবং পরের দিন হবে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল। *গণশক্তি*-র (১৫.১১.৬৭) সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঘোষণা করা হল : সারা রাজ্যে আজ একটি মাত্র আওয়াজ— এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও। পুলিশ মিলিটারির নিপীড়নের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও। ইতিহাস এই অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতকদের ছাড়পত্র দেবে না।

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর শ্রমিক কর্মচারীর এক ঐতিহাসিক মিছিল রাজপথ কাঁপিয়ে চলতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র স্ট্রাইক ও হরতালের ডাক দিয়ে মিছিলটি পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে হেঁটেছিল লক্ষাধিক মানুষ। *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে শনিবার বিকালে এক বিশাল মিছিলে প্রতিবাদ জানানো হয়। মিছিলের ফলে চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলেজ স্ট্রীটে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকাল তিনটায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল বেরুবার কথা ছিল। তার বহু আগে থেকেই শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ শোভাযাত্রা করে ঐ পার্কে আসতে থাকে। বিকাল ৩-২০ তে মিছিল পথে নামে ও চৌরঙ্গী, কার্জন পার্ক, বউবাজার, কলেজ স্ট্রীট, শ্যামবাজার হয়ে ৬-৩০ নাগাদ দেশবন্ধু পার্কে মিছিল শেষ হয়। পার্কের সামনে রাজ্যপাল ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। মিছিলে ধ্বনি ছিল রাষ্ট্রপতি শাসন নয়, মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙলে পরে বাংলাদেশে ''জ্বলবে আগুন।'' বাঙলার 'আরেক নাম ভিয়েৎনাম।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা* ১৯.১১.৬৭)

ঠিক তার আটচল্লিশ ঘন্টা পরে বাতিল ঘোষিত হল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত ৮ টায় রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুযায়ী ঐ আদেশ জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গে শপথ নিয়েছে এক নতুন মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আপাতত আর দুই জন মন্ত্রী শ্রী হরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ডঃ আমীর আলি মোল্লা। কংগ্রেস এই মন্ত্রিসভাকে লিখিত সমর্থন জানিয়েছে। পরে কংগ্রেসও কোয়ালিশনে যোগ দিতে পারে, তখন গঠিত হবে পূর্ণ মন্ত্রিসভা। বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছে ২৯ নভেম্বর। আপাতত মহানগরীতে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা।

২২ নভেম্বর ব্রিগেড ময়দানে বিকেল সাড়ে চারটায় যুক্তফ্রন্ট জনসভা আহ্বান করেছে। বক্তা অজয় মুখোপাধ্যায়, মহামায়া প্রসাদ সিংহ, জ্যোতি বসু, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সোমনাথ লাহিড়ী, হেমন্ত বসু প্রমুখ।

এই চরম সন্ধিক্ষণে *গণশক্তি*-র (২২.১১.৬৭) সংবাদ শিরোনামে ছাপা হোলো : বেনামী কংগ্রেস শাসন শুরু : ব্যক্তি স্বাধীনতা খতম।

মুখ্যমন্ত্রী পদে চরম বিশ্বাসঘাতক ডঃ ঘোষ, আজ গণ-প্রতিবাদে সব কিছু স্তব্ধ ও কাল সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান।

যুক্তফ্রন্ট সরকার খারিজের প্রতিবাদের পরের দিন (২২.১১.৬৭) রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ-হরতাল পালিত হয়। কলকাতা শহরের নানা জায়গায় হাঙ্গামা বাধে ও লাঠি গ্যাস নির্বিবাদে ব্যবহৃত হয়। গুলি চলে অন্তত পাঁচ জায়গায়। *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন (২৩.১১.৬৭) : কলকাতায় বিকেলের দিকে পরিস্থিতি গুরুতর আকার নেয়। লাঠি, গ্যাস, গুলি সেই পরিচিত দৃশ্য। গুলিতে আহত ১৯ জন। পুলিশের বাধায় ব্রিগেড ময়দানে ঘোষিত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ব্যাপক ধরপাকড় হয়, সংখ্যা সারা রাজ্যে প্রায় ৫০০ জন। ধৃতদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, গুরুতর আহত অবস্থায় অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং আহত লোকসেবক সংঘের নেতা অরুণ ঘোষ।

প্রতিবাদ দমনে সেনাবাহিনীর দরকার না হলেও রাজ্যের নানা জায়গায় ফৌজ টহল দিয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নেতারা প্রতিরোধের সংকল্পে অটল। আজও পূর্ণ হরতালের ডাক। লোকাল ট্রেন চলেনি, এদিন শহরে ছোট ও বড় মিলে ঘটনার সংখ্যা শতাধিক। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে প্রথম পুলিশ গুলি চালানোর পর নানা জায়গায় মোট ২৩ রাউন্ড গুলি চলে।

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হন নকশাল নেতা চারু মজুমদার।

লক্ষণীয় যে কাল পর্যন্ত যাদের সেলাম জানিয়েছে পুলিশ, আজ তাদের নিঃসঙ্কোচে লাঠিপেটা করছে। ব্রিগেড ময়দানে পুলিশের লাঠি অমর চক্রবর্তী ও অরুণ ঘোষের রক্ত ঝরিয়েছে। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পুলিশকে বেইমান বলে অভিসম্পাত জানান। রাতারাতি পুলিশের চেহারা বদলে গিয়েছে। তারা মার মার করে মানুষকে তাড়া করছে, অথচ বিগত সাত আট মাস তার ছিল অন্য চেহারা। এই চণ্ডমূর্তিতে পুলিশের আত্মপ্রকাশ সাধারণ মানুষের কাছে যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। পুলিশ যে আসলে দমন নিপীড়নের যন্ত্র এবং তার আসল চেহারা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পমেয়াদি অস্তিত্বে তা ঢাকা পড়ে ছিল।

১১

উগ্রবামপন্থার সমর্থক মহলে চালু ধারণা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কখনও বাতিল করা হবে না। কারণ তারাও কায়েমি স্বার্থের রক্ষক। সরকাব থাকা না-থাকা নিয়ে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে তখনও তাঁরা নির্বিকার। তাপস সেন বলছেন, 'উৎপল দত্ত বলল, এটা

সাজানো ব্যাপার। এই সরকারকে কখনও কেন্দ্রীয় সরকার ফেলবে না'। নকশালবাড়ির ঘটনার পর উৎপল দত্ত ক্রমশ ওদিকে ঝুঁকছেন। মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হল *তীর*, নকশালবাড়ির ঘটনা তার পটভূমি। যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে অনেক তীব্র বক্রোক্তি ছিল তাতে, তাপস সেন বলেছেন, *তীর* নাটকটি চলবে কি চলবে না এই যখন প্রশ্ন— ট্যাক্সি করে আসতে আসতে ঢাকুরিয়ার কাছে দেখি মানুষের জটলা, শুনি যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দিয়েছে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা আর উত্তেজিত আলোচনা। যে পদ্ধতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল, কট্টর কংগ্রেসী ছাড়া আর কেউ তাতে খুশি নয়। ধিক্কার আর ক্ষোভ সর্বত্র। বিধানসভায় ভোটাভুটি ছাড়া যে একটি সরকার রাতের অন্ধকারে অপসারিত হয় এবং আর একটি গদিয়ান হয় এই অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে প্রথম। যদিও কেরলের নজির রয়েছে, তার পটভূমি তো ভিন্ন। প্রথমত সেটা ছিল কমিউনিস্ট সরকার, দ্বিতীয়ত, সরকারের বিরুদ্ধে সেখানে গণবিদ্রোহের বাতাবরণ তৈরি হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার তো কমিউনিস্ট সরকার নয়—বহুদলীয় সরকার, তার মধ্যে রয়েছে বাংলা কংগ্রেস, লোকসেবক সংঘ; গোর্খালীগ, পি এস পি প্রমুখ মধ্যপন্থীদল। অজয় মুখার্জি তো কিছু দিনের মধ্যেই বিধানসভার অধিবেশন ডাকতেন। তখন তো যাচাই করা যেত সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিনা। তাছাড়া দল ভাঙাভাঙির খেলায় সাধারণ মানুষের সামনে ফুটে উঠেছে এক কুটিল ষড়যন্ত্রের ছবি। কলঙ্কিত হয়েছে তাতে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক রাজনীতির ঐতিহ্য, পদদলিত হয়েছে চতুর্থ সাধারণ জনগণের রায়। অতএব যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। তারপর একটানা এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল গোটা পশ্চিমবাংলায়। ঢেউয়ের পর ঢেউ আর রচিত হল নতুন দৃশ্যপট। আবার যেন ছেষট্টির ঝোড়ো সময় ফিরে এসেছে। তখন মানুষের লড়াই ছিল এক মুঠো চালের জন্য। আজ মানুষ গণতন্ত্রের লড়াইয়ে সামিল। আরও বেশি সচেতন এবং আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ আজকের মানুষ। কংগ্রেসবিরোধী ঐক্যের মঞ্চ যুক্তফ্রন্ট প্রতিবাদী মানুষকে এক জায়গায় আনতে পেরেছে সফলভাবে। কাতারে কাতারে মানুষ এগিয়ে আসছে প্রতিবাদ জানাতে। যুক্তফ্রন্টের শিকড় চারিয়ে গিয়েছে জনসমাজের অনেক গভীরে।

২৩ নভেম্বরের সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল তারই অকাট্য প্রমাণ। এ ধরণের সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতাল একান্তই বিরল। প্রচণ্ড দমননীতির তোয়াক্কা না করে মানুষের মুখর প্রতিবাদ এক নতুন অধ্যায় রচনা করল সংগ্রামী বাংলার ইতিহাসে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-আন্দোলন তারপর থেকে দৈনন্দিন ঘটনায় পর্যবসিত। অন্তত এক সপ্তাহের জন্য। রোজনামচা আকারে এখানে তার খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হল—এক ঝলকে যাতে গোটা পশ্চিমবাংলাকে চেনা যায়।

(২৩.১১.৬৭ বৃহস্পতিবার)

বেআইনী সরকার খারিজের দাবীতে আজ সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ বন্ধ। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বে-আইনী খারিজ করার মুহূর্ত থেকে আজ (২৩ শে নভেম্বর) পর্যন্ত এই বন্ধের কোনও ব্যতিক্রমের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কলকাতা মহানগরী থেকে শুরু করে সুদূর উত্তরবঙ্গ, ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহ সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এই বন্ধ আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া— সফল বন্ধ আন্দোলন। পুলিশি হামলারও কোনও বিরাম নেই। ব্যাপক হারে লাঠি চার্জ, গ্রেপ্তার এবং মারধোরের সংবাদ আসছে।

হাওড়া

সফল ধর্মঘট চলছে। ডোমজুড়, জগদীশপুর, সালকিয়া, বালি, শিবপুর, বেলুড়, বাগনান।

হুগলী

বেলা ১০টা নাগাদ সংবাদে জানা যায়, উত্তরপাড়া, কোতরং, শ্রীরামপুর, রিষড়া, হিন্দ মোটর সর্বাত্মক ধর্মঘট।

দমদম

ছোট বড় সব কলকারখানা বন্ধ। রণজিৎ মিত্র ও সুনীল রায় কাল ব্রিগেডের সভায় গিয়ে আজও ফেরেনি।

বর্ধমান

দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে ধর্মঘট ও হরতাল।

খিদিরপুর

সফল ধর্মঘট। হাইড রোডে একটি শ্রমিক মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে। গার্ডেনরীচেও সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হচ্ছে।

ঘোষ সরকারের রেকর্ড

নিহত—১২ জন (কয়েকজন কিশোর)

আহত—তিন শতাধিক।

গ্রেপ্তার—৪০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

টিয়ারগ্যাস—১৫০ রাউণ্ডের বেশি।

লাঠি চার্জ—দুই শতাধিক ক্ষেত্রে।

অগণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করে পুনরায় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করার জন্য আহ্বান জানানো হল *গণশক্তি*-র (২৮.১১.৬৭) সম্পাদকীয় নিবন্ধে :

লাগাতর সংগ্রাম

...শ্রমিক কর্মচারীর বাঁচার দাবীর লড়াই, কৃষকের ফসল রক্ষার লড়াই—আজ সব লড়াই বাঁধা পড়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার বে-আইনী নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে। শ্রমিক-কৃষকের যে কোনও অর্থনৈতিক লড়াই তাই আজ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এ সংগ্রাম চলবে একসঙ্গে। এ সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী, ব্যাপক-বিস্তৃত, সম্মিলিত— ঐক্যবদ্ধ। লাগাতার সংগ্রামের আঘাতে বে-আইনী বিশ্বাসঘাতক সরকারকে বাতিল না করতে পারলে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও এগোতে পারবে না। তাই দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন : বে-আইনী ঘোষ সরকারকে অবিলম্বে হঠাও, রাজ্যপালকে হঠাও, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চলবে না। অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান কর। এই রণধ্বনি দিয়ে সারারাজ্যে সরকারী দপ্তরের কাজকর্ম অচল করে দেবার সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে।

৩০।১১।৬৭ (বৃহস্পতিবার)

আজ সারা রাজ্যে সফল ধর্মঘট ও হরতাল

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর— কলকাতা, শহরতলী ও সমস্ত মফঃস্বল জেলায় আজ সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।

২৯ শে নভেম্বরের দুর্বার সংগ্রাম

ঐ দিন পশ্চিমবাংলার সর্বত্র সরকারি দপ্তর সমূহের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সোনারপুর—বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিশ নির্মম ও বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে।

বর্ধমান—বর্ধমান জেলার সর্বত্র সরকারি দপ্তরের সামনে শত শত মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কোর্ট ঘেরাওয়ের সময় পুলিশ ১ জন মহিলা সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে।

দুর্গাপুর—বিধানসভার বে-আইনী অধিবেশনের নির্দিষ্ট সময় ছিল বেলা ১টা। ঠিক ঐ সময়ে দুর্গাপুর স্টীলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা তাঁদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে রাস্তায় নেমে আসেন।

হাওড়ায় লাঠি চার্জ—বারাসত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিক্ষোভ— বনগাঁয় ৪৫ জন গ্রেপ্তার— খড়গপুরে গ্রেপ্তার।

১২

শিপ্রা সরকার মনে করেন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ পর্যন্ত প্রবীণ নির্দল নেতা প্রফুল্ল ঘোষ প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (পি. ডি. এফ) সরকারের (জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস্ এতে যোগ দিয়ে ছিল) নেতৃত্ব দিলেও দেখা গেল সেটা অবাস্তব প্রচেষ্টা। যুক্তফ্রন্টের সমর্থন তখনও অনেক বেশি। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২১.৭.৯৩)

ঘোষ সরকারের পিছনে একে তো জনসমর্থন নেই, তার উপর স্পীকার বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুলিং সরকারকে অচল করে দিল। ড. ঘোষের মন্ত্রিসভাকে ২৯ নভেম্বর বিধানসভায় বে-আইনী ঘোষণা করে তিনি যে ঐতিহাসিক রুলিং দেন তার জন্য ব্যাপক জনগণ তাঁকে অভিনন্দিত করে। ৩০ নভেম্বর বিজয়বাবুর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে মালা পরাতে যায় পাঁচ হাজার লোকের এক মিছিল।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু ছাত্রদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম। ২১ নভেম্বর রাত থেকে যে সংগ্রাম শুরু, ছাত্রদের অংশগ্রহণে তা ডিসেম্বর মাস থেকেই দুর্বার হয়ে ওঠে।

সারা বাংলা স্কুল কলেজ ছাত্র সমাবেশ থেকে 'বে-আইনী' সরকারকে ধিক্কার জানানো হয়। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

ড. ঘোষ ঘোষণা করেন, ছাত্ররা নব্য ব্রাহ্মণ নয়। অতএব দরকার হলে পুলিশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকবে। যেমন কথা তেমনই কাজ। ৪ ডিসেম্বর পুলিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাসে ঢুকে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠিতে শতাধিক আহত ও চুয়াত্তর জন গ্রেপ্তার।

১৬ ডিসেম্বর উত্তরপাড়া রাজা পিয়ারীমোহন কলেজের মধ্যে পুলিশ জোর করে ঢুকে লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাস চালায়। পুলিশের উন্মত্ত তাণ্ডবের ফলে শতাধিক ছাত্র ছাড়া প্রায় সমস্ত অধ্যাপকই অল্পবিস্তর আহত হয়। ছাত্রদের মধ্যে ৯০ জন এবং ৫ জন অধ্যাপক গুরুতর আহত। ক্যান্টিনের দপ্তরি গোপালকে মারতে মারতে দোতলা থেকে জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়।

পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ১৮ ডিসেম্বর কোতরং, উত্তরপাড়ায় হরতাল ও গোটা হুগলী জেলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের ডাকে ঘোষ সরকারের অপসারণের দাবিতে ১৮ই ডিসেম্বর থেকে গণ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা।

প্রথম দিন (১৮.১২.৬৭) এসপ্ল্যানেড ইস্টে দু'সহস্রাধিক কর্মী ও নেতা গ্রেফতার বরণ করেন।

দ্বিতীয় দিন (১১.১২.৬৭) সাতশত মহিলাসহ এগারো শতাধিক গ্রেফতার।

এ ভাবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাত্র যুব কেরানী শ্রমিক আদিবাসীসহ পনের হাজারেরও বেশি মানুষ পুলিশের পৈশাচিক হিংস্রতা উপেক্ষা করে আইন অমান্য করে। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে গণসংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় বিপুল সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। ৫ই জানুয়ারি '৬৮ যুক্তফ্রন্ট ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ থেকে গণসংগ্রামের তৃতীয় পর্যায় শুরু করার কথা ঘোষণা করে। তার জন্যে ৪০ সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসৈনিক প্রস্তুত।

২১ জানুয়ারি '৬৮ পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক হরেকৃষ্ণ কোঙার গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে দলে দলে এগিয়ে আসার জন্য কৃষক সমাজকে আহ্বান জানান :

হাজারে হাজারে ভলান্টিয়ার হয়ে আইন অমান্যে যোগ দিন। সমস্ত স্তরের সরকারি অফিসে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিন। বে-আইনী সরকারের সব আইন, সব কাজ অচল হয়ে যাক।

সঙ্গে সঙ্গে ফসল, জমি, ঋণ, খাদ্য, মজুরি প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের দাবির জন্য সংগ্রাম করুন। অন্যান্য দাবিকে জোরদার করুন।

বে-আইনী সরকারের কোন কিছু আদায়ের অধিকার নাই। তাই গ্রামে গ্রামে এমন অবস্থা সৃষ্টি করুন যাতে খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ প্রভৃতি বন্ধের আন্দোলন সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২৭ জানুয়ারি '৬৮ তৃতীয় পর্যায়ের সংগ্রামের উদ্বোধনী দিবসে কলকাতায় লক্ষ জনের সমাবেশে আইন অমান্য করেন ১১৯ জন। সারা রাজ্যে আইন অমান্যকারীর সংখ্যা ১০৫৮ জন।

২৯ জানুয়ারি '৬৮ ২৪ পরগণা জেলা দিবসে কলকাতায় পুলিশ কর্ডন ভেদ করে আইন অমান্য করেন ৩ জন মহিলাসহ ২২৭ জন স্বেচ্ছা সৈনিক।

৩০ জানুয়ারি হাওড়া জেলা দিবস। হাওড়া জেলার ১৬৫ স্বেচ্ছা সৈন্য কলকাতায় আইন অমান্য করেন।

১ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ দিবসে হুগলী জেলার ১২৪ জন গুণ্ডাদের বোমাবাজি ও পুলিশের লাঠি ও টিয়ারগ্যাসের বাতাবরণে গ্রেপ্তার হন।

৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা দিবসে গ্রেপ্তার হন ১০৫ জন ও সারা বাংলায় ১১১৪ জন। বালিতে

চলে ৭ রাউণ্ড গুলি, টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ এবং মৃত্যু বরণ করেন স্বেচ্ছাসৈনিক বীরেন দাস।

৬ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া দিবসে কলকাতায় আইন অমান্য করেন ২২৫ জন পুরুলিয়াবাসী। সারা বাংলায় ১০০৬ জন।

১২ ফেব্রুয়ারি সোনারপুরের ২৭২ জন কলকাতায় আইন অমান্য করেন এবং সারা বাংলায় ১৩৯৮ জন।

১৩ ফেব্রুয়ারি বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে মহিলারা আইন অমান্য করেন। কলকাতায় ৪০১ জন সহ পশ্চিমবাংলায় মোট ১৩১০ জন মহিলা গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙে কলকাতায় ১৬৫ জন ও সারা বাংলায় ৪৮০ জন শ্রমিক আইন অমান্য করেন। বহু অবাঙালী শ্রমিক গ্রেপ্তার বরণ করেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি চলছে কৃষকের ফসলের লড়াই ও শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার লড়াই। লক্ষণীয় যে পুলিশের লাঠি-গুলি, গুণ্ডাদের হামলা সত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়েছে কৃষকের দুর্বার লড়াই ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে। ভাঙড়ে ৭০০ বিঘা জমির ধান, কালিপুরে ৩০০ বিঘা ও সোনারপুরে কয়েকশো বিঘা জমির ধান কৃষক ঘরে তুলেছে। (*গণশক্তি*, ১৪.১২.৬৭)

সরকারি কর্মচারীরাও পিছিয়ে নেই। রাইটার্সের ক্যান্টিনের হলে ও ভারত মহাসভা হলে যথাক্রমে ১৭ জানুয়ারি ও ১৮ই জানুয়ারি '৬৮ সরকারি কর্মচারীদের দুটি সভা থেকে বিশিষ্ট ইউনিয়ন কর্মী দাশু রায়ের ছাঁটাই এবং সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার এবং অন্যায় জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। দুটি সভাতেই ঘোষণা করা হয়েছে : ঐক্যবদ্ধ সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের শক্তিতে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রুখতে হবে।

আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রমিকের প্রতীকী অংশগ্রহণ ছাড়াও শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দাবি দাওয়ার সংগ্রাম অব্যাহত। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৬ ফেব্রুয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘট যাতে পুলিশ-মালিক-দালালের প্ররোচনা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। লক আউট, ছাঁটাই, লে-অফ-এর প্রতিবাদে এই ধর্মঘট। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শ্রমিকের স্বার্থে যে দুটি আইন পাশ হয়েছিল সে আইন চালু করার দাবিতে একদিনের এই প্রতীক ধর্মঘট।

জনসমর্থন নেই, শুধু দমননীতি নির্ভর এ হেন সরকার আর কতদিন টিকে থাকতে পারে? নীতিহীন ভাগ্যান্বেষীদের জোটে আবার ভাঙন ধরালেন যে ব্যক্তিটি তিনিই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার পাণ্ডা।

১১ ফেব্রুয়ারি আশুতোষ ঘোষের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের ১২ জন, পি ডি এফ-এর ৪ জন এবং মনোনীত দু'জন সদস্যসহ মোট ১৮ জন এম এল এ কোয়ালিশন সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন। প্রসঙ্গত শিপ্রা সরকার মনে করেন, আশু ঘোষের এই আচরণ আসলে অতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহ (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১.৭.৯৩)

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে ১১ ফেব্রুয়ারির পর কোয়ালিশন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে।

আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহত। ২১ নভেম্বর '৬৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি '৬৮ পর্যন্ত অর্ধলক্ষের বেশি মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করেন। অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ঘোষ-কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং রাষ্ট্রপতির শাসন জারি।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন। স্বভাবতই মালিক শ্রেণী উৎফুল্ল এবং নতুন করে তারা আক্রমণ শানাচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীর জীবন ও জীবিকার বিরুদ্ধে। সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তাদের অনুকূলে এবং পুলিশের ঢালাও সহায়তার আশ্বাস তারা পেয়েছে। অতএব মালিকের আক্রমণ ও শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতিরোধ সংগ্রাম সৃষ্টি হল শ্রমিক আন্দোলনের নতুন প্রবাহ। এক নজরে শ্রমিক আন্দোলন :

২৮ ফেব্রুয়ারি '৬৮ : সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিলের প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালিত।

৬ মার্চ : সমস্ত সওদাগরী অফিসের কর্মচারীরা অফিসে অফিসে ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনর্বহাল, লক্-আউট, লে-অফ, অটোমেশন চালু করার বিরুদ্ধে ও বকেয়া বেতনের দাবিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। ১৪০টি সওদাগরি অফিসের ১ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর ঐতিহাসিক ধর্মঘটকে সমর্থন জানান অন্যান্য শিল্পের আরও হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী। ডালহৌসি পাড়ার সমস্ত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান আজ স্তব্ধ।

৭ মার্চ : লক্ষাধিক চটকল শ্রমিকের দাবি ব্যাজ পরিধান। গঙ্গার দু'পারে ৬২টি চটকলের আড়াই লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে লক্ষাধিক শ্রমিক দাবি ব্যাজ পরিধান করে কাজে গিয়েছেন। ব্যাজে উল্লিখিত দাবির মধ্যে রয়েছে সর্বনিম্ন বেতন ২০৮ টাকা, ন্যায্য বোনাস, রাত্রে কাজের জন্য বিশেষ ভাতা এবং শতকরা ১০০ জন শ্রমিকের স্থায়ী কাজ।

২৩ মার্চ : বেলঘরিয়া বিড়লার টেক্সম্যাকো কারখানায় দশহাজার শ্রমিক কর্মচারী লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে সাড়ে তিনহাজার শ্রমিক কর্মচারীকে লে-অফ এবং দেড় হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে ছাঁটাই ও বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট।

৩ এপ্রিল : *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় 'এখন নীরব কেন?' শিরোনামযুক্ত নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়: পাঁচদিন ধরে কলকাতা বন্দর ধর্মঘট চলছে। কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় সিনেমা হলগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বার্ন বন্ধ, টেক্সম্যাকোতে স্ট্রাইক হতে যাচ্ছে, জীবনবীমা কর্মীরা স্ট্রাইক করবেন। রেলকর্মীরা বেতন ধর্মঘট করেছেন। চটকল ও সূতাকল ছাড়াও স্যাকস্‌বি, ন্যাশনাল রবার প্রভৃতি অসংখ্য কারখানা ধর্মঘটের মুখে। পরোক্ষ কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিমবাংলার অসংখ্য কলকারখানার জীবনস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

মালিক-শ্রমিক বিরোধ যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ফলে শ্রমিক কর্মচারী ও মেহনতী জনসাধারণের জীবননির্বাহ দুরূহ হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার এই সংকটজনক মুহূর্তে দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলি কিন্তু একেবারেই নীরব। অথচ এরাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দু'চারটা ঘেরাও আর সামান্য দু'একটা জায়গায় স্ট্রাইক হলেই কী শোরগোলই না তুলতেন!

১৫ এপ্রিল : চটকল ও সূতাকলের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের হুঁশিয়ারি ধর্মঘট।

১ মের মধ্যে শ্রমিকের দাবি না মানলে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক ৫২ হাজার সূতাকল শ্রমিক রাজ্যব্যাপী লাগাতার ধর্মঘটের পথে যাবেন। ময়দানে শ্রমিক সমাবেশে এবং রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়ে বি পি টি ইউ সি এই ঘোষণা জানিয়েছেন।

১৫ এপ্রিল : টেক্সম্যাকোতে দশহাজার শ্রমিকের লাগাতার ধর্মঘট শুরু।

৭ মে : লক্ষ মানুষের মিছিলে রাইটার্স বিল্ডিং ঘেরাও। সরকারি কর্মচারীর সমর্থনে শ্রমিক কর্মচারীর অভিযান।

গণশক্তি-র প্রতিবেদন : (৮.৫.৬৮)

কলকাতা ৮ই মে—সংগ্রামের আর এক নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করলাম গতকাল ডালহৌসীর রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে। ৫টার অনেক আগেই কয়েক হাজার হেলমেটধারী পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও লোহার জাল নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর চারপাশকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ৫টা বাজতে না বাজতেই অফিস আদালত ও কারখানার কর্মচারী এবং শ্রমিকেরা নিজ ট্রেড ইউনিয়নের ফেস্টুন নিয়ে মিছিলে মিছিলে এগিয়ে এলেন। রেল, ট্রাম, স্টেটবাসের পাশে ব্যাঙ্ক, এল. আই. সি, ও বহু সওদাগরী দপ্তরের কর্মচারীরা এলেন আর এলেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা। মুখে মুখে তারা শ্লোগান দিলেন। অবস্থানের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন ছিনিয়ে নিতে দেব না। প্রসঙ্গত শান্তিপূর্ণ গণঅবস্থানের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়-সঙ্গত অভাব-অভিযোগ প্রকাশের অধিকার রাজ্যপাল কর্তৃক বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

২৭ এপ্রিল পুলিশ সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান করার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছিল। ৭ মে সরকারি বেসরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক এক হয়ে সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। এই ডাক এসেছিল ময়দানের মে দিবসের সমাবেশ থেকে। লক্ষ মানুষের মিছিল পুলিশ বাহিনীসহ সমগ্র রাইটার্স ঘিরে ফেললেন, এক ঘন্টা ধরে মিছিলের পর মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং পরিক্রমা করল।

১৬ মে : পশ্চিমবঙ্গে সফল সরকারি কর্মচারী ধর্মঘট।

কলকাতা, ১৬ মে : পশ্চিমবঙ্গের পৌনে ২ লক্ষ সরকারী কর্মচারী সমস্ত ফ্যাসিস্ট হুমকিকে অগ্রাহ্য করে আজ ১৬ই মে ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে প্রতীক ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন স্থান থেকে সাদা পোষাকের পুলিশ এ পর্যন্ত ৫৪ জন সরকারি কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

১৭ মে, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে বিড়লার ২০টি কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিরা টেক্সম্যাকো ও ইউনিভার্সাল ইলেক্ট্রিকের সমর্থনে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মহম্মদ ইসমাইল। সিদ্ধান্ত (১) শ্রমিক কর্মচারীগণ নিজ নিজ কারখানার কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্ষোভ প্রদর্শন। (২) ২৯ শে মে ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেসে বিড়লার হেড অফিসে বিড়লার যাবতীয় শিল্পের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা বিক্ষোভ দেখাবেন। (৩) ধর্মঘটী শ্রমিকদের [illegible]...

জুন মাসে শুরু হবে সাতলক্ষ শ্রমিকের ঐতিহাসিক লড়াই। ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট প্রতিরোধে, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ও বকেয়া ৩৮১ টাকা মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদানে মালিকপক্ষকে বাধ্য করার জন্য পঃ বাংলায় ৪ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক, সূতাকলের ৫০ হাজার, এবং চটকলের আড়াই লক্ষ-মোট ৭ লক্ষ শ্রমিক জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাগাতর ধর্মঘট করতে যাচ্ছেন।

গত বুধবার বি. পি. টি. ই. সির পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করেন ডাঃ রণেন সেন ও মনোরঞ্জন রায়।

... এক প্রশ্নের উত্তরে নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে প্রায় একই সময়ে লাগাতার দীর্ঘকালীন ধর্মঘটের নজির আমাদের দেশে নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকেরা একদিনের ধর্মঘট দু'বার করেছেন, কিন্তু শিল্পভিত্তিক লাগাতর ধর্মঘট আগে করেননি। চটকলে ৩০ বছর আগে লাগাতর ধর্মঘট হয়েছে, ইদানীংকালে একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে বেশি এগোনো যায়নি। সূতাকল শিল্পভিত্তিক ধর্মঘট বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও কানপুরে আগে হয়েছে—বাংলায় এই প্রথম।

তিনটি শিল্পের দাবী যাতে মালিক ও সরকার মেনে নিতে বাধ্য হন, তার জন্য পরবর্তীস্তরে পশ্চিমবাংলার ২৬ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী এবং মেহনতী মানুষ একাধিক দিন সাধারণ ধর্মঘট করে বাংলা বন্ধ করবেন। (*গণশক্তি*, ৩১.৫.৬৮)

••• ••• •••

১৯ শে জুলাই : অটোমেশন প্রতিরোধ সংগ্রামের অর্থ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই। এল আই সি-র হিন্দুস্তান বিল্ডিং-এর সামনে অনুষ্ঠিত কয়েক হাজার লোকের সভায় জ্যোতি বসু এল আই সি-র কর্মীদের সমর্থনে বলেন : কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত পুঁজিবাদী নীতির ফলে আজ সংকট। সংকটের বোঝা সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপাবার জন্যই এই অটোমেশন।

••• ••• •••

২৩ শে জুলাই : টেক্সম্যাকো, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ও বঙ্গশ্রী কটন মিলের সংগ্রামরত শ্রমিক কর্মচারীদের সমর্থনে বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ, পানিহাটি ও উত্তর দমদমের সমগ্র অঞ্চলে ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়।

এক মজার রাষ্ট্রপতি শাসন

রাজ্যপালের শাসনাধীন পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন শিল্পে লক-আউটের ফলে প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিক কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছেন। সরকারী তথ্যেই স্বীকার করা হয়েছে, এই রাজ্যে ৩৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে হয় ক্লোজার বা লক-আউট, নয়তো ধর্মঘট চলছে। সরকারী পরিসংখ্যানের বাইরেই রয়েছে বহু লক-আউটের ঘটনা। (*গণশক্তি*, ১৮.৯.৬৮)

••• ••• •••

আবার দুর্গাপুর। দুর্গাপুর আবার লড়াই-এর প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। দুর্গাপুরে কমপিউটার যন্ত্র বসিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই-এর চক্রান্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে লাগাতর সংগ্রাম শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হিন্দুস্তান স্টীল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন বিভিন্ন গণসংগঠনের সহযোগিতায় প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন দিনরাত। চক্রান্ত ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

গণশক্তি-র (৯.১১.৬৮) সংবাদসূত্রে জানা যায়, শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করবার জন্য সমগ্র দুর্গাপুর পুলিশ শিবিরে পরিণত। বর্তমানে সেখানে এক ব্যাটেলিয়ন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ (সি. আর. পি.), ফিফ্‌থ (পঞ্চম) বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন ও কয়েক ব্যাটেলিয়ন সশস্ত্র কনস্টেবল বাহিনী মোতায়েন।

বজবজেও পুলিশ শিবির। বিদেশী তেল কোম্পানিগুলির কর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট ভাঙার জন্য প্রায় পাঁচশ সশস্ত্র পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বার্মা শেল কর্মীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাচ্ছে।

১২ নভেম্বর *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে : পশ্চিমবঙ্গের চটকল, রবার ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসংস্থাগুলিতে অচিরেই মোট কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে দু'লক্ষ পাঁচ হাজার। মন্দার ফলে আরও বিভিন্ন কলকারখানার কর্মচ্যুতির সংখ্যা যোগ দিলে, বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় গত কয়েক বছরে যাঁরা ছাঁটাই হয়েছেন বা কিছুদিনের মধ্যে ছাঁটাই হতে চলেছেন তাঁদের মোট সংখ্যা আড়াই লক্ষ।

গ্রামাঞ্চলেও পুলিশের তাণ্ডব অব্যাহত। ১৩ নভেম্বর সন্দেশখালি থানার বিভিন্ন এলাকায় জোতদারের রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করার সূত্রে পুলিশ একুশ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করেছে। এরা বিভিন্ন গ্রামে ১৪৪ ও ১৪৫ ধারা জারি করেছে। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনী পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে জোতদারের পাশে।

১৪

ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের হোতা মার্কিন যুদ্ধবাজ রবার্ট ম্যাকনামারা তখন বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি। ২০ নভেম্বর '৬৮ তিনি কলকাতায় আসছেন। সেদিন বিভিন্ন গণসংগঠন কলকাতা মহানগরীতে ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে।

গণশক্তি-র পাতা থেকে তার বিবরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

যুদ্ধবাজ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে উত্তাল বিক্ষোভ

পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ : শতাধিক গ্রেপ্তার। (নিজস্ব প্রতিনিধি)

কলকাতা, ২১ নভেম্বর—যুদ্ধবাজ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত ছাত্র ও জনগণের উপর আজ মধ্য কলকাতায় সকাল ১০টা থেকেই পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে আরম্ভ করে।

গতকাল (২০.১১) দমদম বিমানবন্দর এবং কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন রাজপথ ছাত্র যুবক সহ বিভিন্ন স্তরের সংগ্রামী মানুষের বিক্ষোভে ছিল উত্তাল। ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তার, পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস কোনও কিছুই বিক্ষোভকে দমন করতে পারেনি। .... শেষ পর্যন্ত ম্যাকনামারা হেলিকপ্টারে রাজভবনে পৌঁছতে বাধ্য হ'ন।

২২.১১.৬৮ (শুক্রবার)

ম্যাকনামারা বিরোধী বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিবস। কলকাতায় অভূতপূর্ব ছাত্রসমাবেশ ও মিছিল। সারাদিন বিভিন্ন স্থানে লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গ্রেপ্তার। (নিজস্ব প্রতিনিধি)

কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ম্যাকনামারা বিরোধী বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে কলকাতায় বর্তমানকালের একটি ঐতিহাসিক বিশাল ছাত্র মিছিলে ভিয়েতনামে মার্কিন দানবীয়তার বিরুদ্ধে

ধিক্কার জানানো হয়।

গতকাল (২১.১১) আবার মার্কিনী প্রচার দপ্তরের সামনে নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর বিরাট পুলিশ-বাহিনী আক্রমণ করে। পাঁচটি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগঠনের আহ্বানে ম্যাকনামারা-বিরোধী বিক্ষোভে কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার সর্বত্র ছাত্রধর্মঘট অভূতপূর্বভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

এই দিন বেলা ১২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্ররা মিছিল করে আসতে থাকে। এই ছাত্র মিছিল গত এক দশকের মধ্যে বৃহত্তম মিছিল বলা যায়। ১৫ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই অভিযানে শামিল হন। বেলা একটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় লনে তিল ধারণের আর জায়গা ছিল না।

প্রচার দপ্তরের সামনে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এখানে সংঘর্ষ বাধে পুলিশের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আর বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম আজ একই স্রোতে লীন। তৈরি হল উভয়ের মধ্যে এক ঐতিহাসিক রাখীবন্ধন। যুদ্ধবাজ ম্যাকনামারা সেদিন দমদম থেকে রাজপথ ধরে রাজভবনে যেতে পারেনি—তাকে হেলিকপ্টারে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়।

চতুর্থ পর্ব

রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে
নিষ্ঠুর সময়
সারা পৃথিবীকে টানছে
রসাতলে
এখনও আকাশচুম্বী ভয়।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায় / হাত বাড়ালে

১

একদিকে শ্রমজীবী মানুষের লাগাতার আন্দোলন এবং অপরদিকে তার বিরুদ্ধে শহর-গ্রাম-শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাস এই পটভূমিতে হতে চলেছে পরবর্তী নির্বাচন। পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের ঠিক এক বছরের মাথায়।

নির্বাচনী অঙিনায় নানা দল ও গ্রুপের উপস্থিতি সত্ত্বেও মূল লড়াই যে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট -এর শরিক দলগুলির মধ্যে এটা প্রায় অবধারিত বলা চলে। তেমনি আবার ভোট বয়কটের আহ্বানও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম শোনা গেল। আহ্বান জানিয়েছেন চারু মজুমদার প্রমুখ 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা'।

তার কারণ ব্যাখ্যা করে চারু মজুমদার লিখছেন, যখন বিশ্ববিপ্লব এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে—সেই যুগে সংসদীয় পথে পা বাড়ানোর অর্থ বিশ্ববিপ্লবের এই অগ্রগতিকে রোধ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সংসদীয় পথ বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। বিশ্ববিপ্লবের এই নতুন যুগে যখন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে, তখন বিশ্বব্যাপী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের একটি কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হল, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা। তাই সমগ্র যুগ ধরে বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের আওয়াজ হবে 'নির্বাচন বয়কট করো' এবং 'গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা বানাও'। সংসদীয় পথে চলে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা বহু রক্তের ঋণ জমা করেছেন। আজ দিন এসেছে সেই ঋণ শোধ করার। (''নির্বাচন বয়কট—সারা নিপীড়িত দুনিয়ার বিপ্লবী জনতার শ্লোগান'')

মধ্যবর্তী নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সংসদীয় পথ বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে পরপর কয়েকটি রচনা সাপ্তাহিক *দেশব্রতী*-তে প্রকাশিত হয়। *দেশব্রতী*-র ২৮ মার্চ '৬৮ সংখ্যায় বেরয় 'সংসদীয় পথ নয়—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের দুর্গ ভাঙ্গার জন্য চাই দুর্বার গণ-সংগ্রাম' শীষক নিবন্ধ। ২৩ শে মের সংখ্যায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বান: নির্বাচন বয়কট করুন, শ্রেণী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হোন। এবং একই সংখ্যায় সম্পাদকীয় শিরোনাম: 'সংসদীয় পথ বর্জন করুন, বর্জন করুন।' আবার ৩০ শে মে সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম : 'নির্বাচন বয়কট করুন, শ্রেণী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হোন।' ৬ জুনের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হচ্ছে, 'শ্রমিক শ্রেণীকে নির্বাচন বয়কট করে শ্রেণী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হবে।'

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু চারুবাবুর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। সারকথা হল, সংসদীয় পথ বিপ্লবের পথের কাঁটা। চারু মজুমদার-পরিকল্পিত বিপ্লবের ছকের বাইরে সংসদীয় নির্বাচন।

অতএব মধ্যবর্তী নির্বাচন যখন আসন্ন এ ধরণের চিন্তাধারা খণ্ডন করা অপরিহার্য। বিশেষ করে সি. পি. এম এর কর্মীদের সংসদীয় নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সংশয়মুক্ত

করা চাই। তাই ২৪ জুলাই '৬৯ *গণশক্তি*-র পাতায় উগ্রপন্থী অপপ্রচার প্রসঙ্গে রাহুল চৌধুরী লিখছেন:

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসীদের স্বার্থে হঠকারীদের বাগাড়ম্বর

হঠকারীরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব ও বিষয়গত দিকের সঠিক মূল্যায়ন না করে বিপ্লব-বিপ্লব খেলায় যে মশগুল হয়েছেন—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, হঠকারীদের বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র *দেশব্রতীর* বিগত কয়েক মাসের কয়েকটি সংখ্যা।

এই সব প্রবন্ধ মিলিয়ে পাঠ করলে মনে হবে নির্বাচন, গণ সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি বিপ্লবী পরিস্থিতি ও বিপ্লবের পটভূমি তৈরির বিভিন্ন পথগুলিকে এই মুহূর্তে বর্জন করে একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব এখনই শুরু করে দিতে হবে।

হঠকারীদের চিন্তা, চেতনায় ও দৃষ্টিতে বিপ্লব সমাধা করে সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের লক্ষ্যে পৌছতে হলে একটি মাত্র সরল সোজা রাস্তাই ভারতের মত দেশে খোলা আছে—সেটি হল সশস্ত্র বিপ্লব।

—সমগ্র পরিস্থিতির পটভূমিকায় বলা যায়, হঠকারীরা... অতিবিপ্লবী আওয়াজের দ্বারা যা করেছেন তাতে মেহনতী জনগণের শত্রু কংগ্রেসের কোন ক্ষতিই হবে না। বরং হঠকারীদের ঐ আওয়াজের তাৎপর্য দাঁড়ায় নির্বাচন বয়কট করে শ্রেণী শত্রু কংগ্রেসীদের শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে রাখো। জনগণের উপর শোষণ নিপীড়নকে আরও বল্গাহীন হতে দাও। নির্বাচনী সংগ্রামের আঘাতে শাসক গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আরও ব্যাপক না করে এবং গণ সংগ্রাম ও নির্বাচনী সংগ্রামের উপর্যুপরি আঘাতে বুর্জোয়া জমিদার ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিভূ কংগ্রেসীদের শক্তিকে দুর্বল না করে যেমনি আছে তেমনি থাকতে দাও।

তাছাড়া নিজেদের সহায়শক্তি সংগঠনের শক্তিকে বিচার না করেই কোন্ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করা যায় এবং নির্বাচন বয়কটের আহ্বান দেওয়া যায় তার বিচারশক্তিকে হারিয়ে হঠকারীরা বাগাড়ম্বর শুরু করেছেন। এটা কংগ্রেসীদের স্বার্থই ষোল আনা রক্ষা করছে।

কোন্ প্রেক্ষিত থেকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার ২রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া কেন্দ্রে উদ্বোধনী সভায়। তিনি বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে গণসংগ্রাম অবরোধ তুলতে হবে। ...নির্বাচনে মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্ককে উচ্ছেদ করতে হবে। অর্থনীতি থেকে একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি উৎখাত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হবে। সেই মূল লক্ষ্যের দিকে এগোতে গিয়ে যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে অতিক্রান্তিকালীন পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে ব্রতী হবে। সংগ্রাম সমস্ত মানুষকে ময়দানে এনে ফেলেছে। অর্থনৈতিক আক্রমণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ স্লোগান দিচ্ছে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে খতম করো। ঠিক সেই সময় হঠকারীরা বিকাশের গতি অস্বীকার করে এই মুহূর্তে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান দিচ্ছে, নির্বাচন বয়কটের আওয়াজ দিচ্ছে। সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ মাত্রেই এর প্রতিবিপ্লবী চরিত্র বুঝতে পারবে।

নির্বাচন বয়কটের অর্থ হল কংগ্রেসের জয়ের পথ নিরঙ্কুশ করা। তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করে বলেন— এই তথাকথিত বিপ্লবীরা দেয়ালে বন্দুক এঁকে কর্তব্য সারছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে এরা লম্ফঝম্ফ করছিল। কিন্তু পি ডি এফ এবং রাজ্যপালের আমলে এদের বিপ্লব স্থগিত।

নির্বাচনী অভিযানে আক্রমণের মূল লক্ষ্য অবশ্যই কংগ্রেস। কিন্তু 'হঠকারী'দের ভোট বর্জনের ডাককেও উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। কারণ এটা একটি মতাদর্শগত প্রশ্ন যে ব্যাপারে পার্টির ক্যাডারদের সংশয়মুক্ত করা দরকার। তাদের বোঝানো দরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ মোটেই অবৈপ্লবিক কাজ নয়। ৬ জানুয়ারি '৬৯ *গণশক্তি*-র পাতায় ছাপা হয় কলকাতার তালতলা কেন্দ্রে প্রমোদ দাশগুপ্তের ভাষণ।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, অতুল্য ঘোষ মধ্যবর্তী নির্বাচন চাইছিল না। হঠকারীরাও নির্বাচন বয়কট করতে বলছে। এ মিল কি আকস্মিক? হঠকারীরা স্লোগান দিচ্ছে— মন্ত্রী বদলে 'শোষণ' শেষ হয় না। হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু এমন কথা কোন্ মার্কসবাদী বলেন শোষণের শেষ হবে না বলে খণ্ড খণ্ড সংগ্রামের প্রয়োজন নেই? প্রতিবাদেও তো শোষণের শেষ হবে না। তাই বলে কি প্রতিবাদ করব না? প্রতিবাদ আর খণ্ড খণ্ড সংগ্রামই তো মানুষকে বিপ্লবী চেতনার অধিকারী করে তোলে। এরা মাও সে তুং এর নামে জয়ধ্বনি করে, আমি বলব তাদের চীনের '৬৪ সালের ১৪ই জুনের চিঠি পড়তে। দেখবেন বৈধ ও অবৈধ দুইরকম সংগ্রামেরই কথা তাঁরা বলছেন। বৈধ সংগ্রামের সুযোগ নেব না— একথা মূর্খরা বলে।

তিনি বলেন : প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচন বিপ্লবের লক্ষ্যে কি সংসদীয় নির্বাচনই যেতে সাহায্য করবে? নির্বাচনে আমরা এই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না মন্ত্রী হব বলে। সংসদীয় মোহ থেকে জনগণকে মুক্ত করবে। নির্বাচনী বিজয়ই কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতকে তীব্রতর করবে। জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যখন আইন প্রণীত হবে, বাধা দেবে আমাদের মন্ত্রীরা, দিল্লীতে ধর্না দেবে না। চা, পাট বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিম বাংলার সমস্যাপূরণে অগ্রসর হবে। তখন কেন্দ্রের বাধা আসবে। জনগণ বুঝবে সংসদীয় পথ নয়, বিপ্লবই তার জীবনের সমস্যা মেটাতে পারবে। আসলে হঠকারীরা বিপ্লবের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিপ্লব-বিরোধিতা করছে।

তিনি হঠকারীদের কৃষি বিপ্লবের শ্লোগানের ব্যাখ্যা করে বলেন, কৃষি বিপ্লব হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। অত্যাচারের যন্ত্রকে তারা বিকল করে দিয়ে কৃষককে বলবে— তুমি জমি দখলের সংগ্রামে এগিয়ে যাও। অত্যাচারের যন্ত্র আমি বিকল করে দিচ্ছি। সেই দিনই বিপ্লবের সূর্য উদিত হতে পারে। কৃষি বিপ্লব ছাঁটাই শ্রমিক গ্রামে গেলে হবে না।

সংসদীয় নির্বাচন সবক্ষেত্রে বিপ্লবের পরিপন্থী নয়। এই সার সত্য ব্যাখ্যা করে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ১২ জানুয়ারি বেলেঘাটার নির্বাচনী সভায় বলেন: আমাদের মন্ত্রিসভাও সংগ্রামের হাতিয়ার। আমরা মুখ্যমন্ত্রী অথবা এম এল এর পদকে কোনো বিপ্লবী কর্মীর পদ থেকে বড় বলে ভাবি না। যাঁরা শ্রমিক, কৃষক অথবা সংগ্রামী মানুষের মধ্যে থেকে সংগ্রাম করেন, যাঁরা কারারুদ্ধ অথবা আত্মগোপনকারী তাঁরা যে সংগ্রাম করছেন, মন্ত্রিসভায় থেকে আমরাও সেই সংগ্রাম করছি।

প্রসঙ্গত, ভোট বয়কটের ডাক প্রথম ঘোষিত হয় পশ্চিমবঙ্গে নয়, কেরলে। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে কেরলের নানা জায়গায় 'কেরল রেড্‌গার্ডে-এর' নামে পোস্টার পড়ে। সেখানে বলা হয়: ই এম এস একজন বুর্জোয়ার দালাল ও পয়লা নম্বর

সংশোধনবাদী, যে নাকি সি পি আই সংশোধনবাদীদের সঙ্গে একজোট এবং ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে কমিউনিজম আসার খোয়াব দেখছে। প্রাচীরপত্রে সি পি এম থেকে সদ্য বিতাড়িত জে. যোশেফ ও কুনিকল নারায়ণকে সাচ্চা কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়, সাম্যবাদ অর্জনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব অনিবার্য ও জনসাধারণ যেন তার জন্য প্রস্তুত থাকে। (*The Naxalites and their Ideology*. p. 93)

২

জানুয়ারি '৬৯ এর মাঝামাঝি নাগাদ দেখা গেল লড়াই জমে উঠেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের লড়াই এবং লড়াই মূলত যুক্তফ্রন্ট বনাম কংগ্রেস-এর। তার মাঝামাঝি যাদের অবস্থান—জাহাঙ্গীর কবীরের জাতীয় দল, হুমায়ুন কবীরের লোকদল বা আশুতোষ ঘোষ মশায়ের আই এম ডি—এই লড়াই-এ তারা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। নির্বাচকমণ্ডলীর চোখে তাদের অস্তিত্ব যেন যুক্তফ্রন্টের ভোট ভাঙিয়ে কংগ্রেসকে জেতাবার জন্য। শহর গাঁয়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনা-উত্তেজনা এই ভোটকে ঘিরে লোকের চোখে মুখে, তাতে ভোটবর্জনকারীদের বক্তব্য যে তাদের মনে আদৌ দাগ কাটেনি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সভা, মিছিল, পোস্টার, ফেস্টুন, পথ-নাটিকা—সব মিলিয়ে জমজমাট আসর'। উত্তাপ বাড়ছে এবং এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের খবর আসছে। কলকাতা শহরের মানুষ মূলত নিরুত্তর ও চুপচাপ। কলকাতার বাইরে আর-এক ছবি। জেলা শহর গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলের মানুষ যুক্তফ্রন্টের সপক্ষে সোচ্চার। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থনের পাল্লা যে ভারী, যত দিন যাচ্ছে সেটা ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। এবং তার ছবি ফুটে উঠেছে *গণশক্তি*-র পাতায়।

১৬ই জানুয়ারি *গণশক্তি*-র নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন:

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের লোহিত মাটিতে শুধু উড়বে রক্ত পতাকা।

কয়লাকুঠির দেশ, রানীগঞ্জ থেকে ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর— সর্বত্র আওয়াজ উঠেছে—যুক্তফ্রন্ট এগিয়ে চলো, শ্রমিক তোমার সঙ্গে আছে।

২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চল পরিক্রমান্তে ২১ জানুয়ারি ৬৯ *গণশক্তি*-র আর একজন প্রতিবেদক জানাচ্ছেন: সর্বত্র দেখা যাচ্ছে লাল পতাকা। শোনা যাচ্ছে ঘরে ঘরে কংগ্রেসের নিশ্চিত পরাজয়বার্তা। ২৪ পরগণা যে কংগ্রেসের কবরখানা হবে সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

গোটা গ্রাম বাংলা যেন জ্বরোরুগীর মতো। নির্বাচনী জ্বরের তারসে কাঁপছে। ইতিপূর্বে কোনোও নির্বাচন এভাবে গ্রাম বাংলার সর্বস্তরের মেহনতী মানুষকে নাড়া দেয়নি। ২৩ জানুয়ারি আর এক প্রতিবেদক জানাচ্ছেন: জনসভা, বৈঠক, মিছিল চলছে সকাল থেকে বহুরাত পর্যন্ত। চা-এর দোকান, যাত্রা বা হরিসংকীর্তনের আসর বা বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ—সর্বত্র নির্বাচনী জটলা। দুজন মুখোমুখি হলেই অবধারিতভাবেই ভোটের আলোচনা। শেষ পর্যন্ত একটাই কথা, কংগ্রেসকে কিছুতেই নয়, যুক্তফ্রন্টকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

নদীয়া জেলার সংবাদদাতা ২৪ জানুয়ারি জানাচ্ছেন: কংগ্রেস চোদ্দটি আসনের মধ্যে বর্তমান চারটি আসনও ধরে রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ।

২৯ জানুয়ারি *গণশক্তি*-র পাতায় ফুটে উঠল গ্রাম বাংলার নির্বাচনী চিত্রের সামগ্রিক চেহারা:

গ্রামে গ্রামে ঘুরে কী দেখলাম

কংগ্রেসকে আর কিছুতেই ভোট দেওয়া চলবে না। এবার ভোট দিতে হবে যুক্তফ্রন্টকে এই মনোভাব আজ সারা পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করছে।

যুক্তফ্রন্টের সময় চালের দর খুব চড়ে গিয়েছিল, অতএব তাকে আর ভোট দেওয়া উচিত নয়— কংগ্রেসী এই প্রচারের জবাবে বীরভূমের খেত মজুররা বলেছিল, চড়া দরে চাল কিনে খেতে আমাদের কষ্ট হয়েছে, তবু আমরা যুক্তফ্রন্টকেই ভোট দেব, বড়লোকদের কংগ্রেসকে দেব না।

অন্য এক জেলায় এক প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীকে তার এলাকার নির্বাচকর বলেন, আপনি ভোট নিয়ে কি করবেন? এবার তো মন্ত্রী হতে পারবেন না, যুক্তফ্রন্টই জিত ব। তিনি উত্তর দেন, যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, আমি জিতলে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে ুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় যোগ দেব।

ভয় দেখিয়ে মুসলিম ভোটারদের দলে টানার চেষ্টাও এবার ব্যর্থ। যু ফ্রন্ট সরকার একবার যে গঠিত হয়েছে, তাতেই তাদের ভয় অনেক কেটে গেছে, ভরসা অনেক বেড়েছে। তাছাড়া এই সংখ্যালঘুদের বহু আইনগত অধিকার থেকে কংগ্রেস সরকার যে নানাভাবে বঞ্চিত করেছিল এবং যুক্তফ্রন্ট যে অল্পকালের শাসনের মধ্যেও তাদের কোনো কোনো অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল, আরো দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, একথা মুসলমানদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারাও কংগ্রেস ছেড়ে যুক্তফ্রন্টের দিকে চলে আসছে। বিভিন্ন জেলায় এবং বিশেষ করে হুগলীতে তার পরিচয় ভালোভাবে পেয়েছি।

তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের বিক্ষোভ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বভাবতই খুব বেশি। কারণ কংগ্রেসের জমিদার, মহাজন, পুঁজিদার-কালোবাজারীদের জনস্বার্থবিরোধী শ্রেণী-নীতি ও তার অনুকুল শাসনব্যবস্থা তাদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। তাদের ন্যায্য দাবির আন্দোলনকে সর্বত্র দমন করতে চেষ্টা করছে। তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। উচ্ছেদ, জমি, কাজ, মজুরি, শিক্ষা, চিকিৎসা কোনো বিষয়েই কংগ্রেস তাদের সাহায্য করেনি। অথচ যুক্তফ্রন্ট অল্প সময়ের মধ্যে কিছু করেছে। তাই যুক্তফ্রন্টের জয়ের পক্ষে সর্বত্রই তাদের মধ্যে উৎসাহ বেশি।

৯ ফেব্রুয়ারি '৬৯ পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত। গত সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেন শতকরা ৬২.৮ জন, এবার শতকরা ৭০ জন। ১০ই ফেব্রুয়ারি *আনন্দবাজার*-এর রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : তেমন বড় কোনো হাঙ্গামা হয়নি, এত ভোটদাতা এবং উত্তেজনা সত্ত্বেও ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণ। রাজনৈতিক নেতারাও বলেন এমন শান্তিতে ভোট ১৯৫২ সালের পর হয়নি। ইতস্তত যেসব হাঙ্গামা হয়, তার একটাতে সামান্য আহত হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ড: প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। নকশালবাড়িতে ভোট দিয়েছেন শতকরা ৮০

জন ভোটদাতা। এই দেখে একজন বাম কমিউনিস্ট নেতা মন্তব্য করেন যে ওদের দৌড় বোঝা গেছে। খবর আরামবাগ, বরানগর, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, শ্যামপুকুর, শিয়ালদহে প্রচুর ভোট পড়ে। গাড়িঘোড়া যা ছুটছে তাতে টাকার অভাব মনে হয়নি। জয় বিষয়ে প্রতি কেন্দ্রে দু'পক্ষ একরকম নিশ্চিত। বেড়েছে মহিলা ভোট। প্রমোদবাবুর দাবি, মুসলমানরা যুক্তফ্রন্টকে বেশি ভোট দেন। প্রোগ্রেসিভ মুসলমান লীগের দাবি, মুসলমান ও তপশীলিরা প্রধানত তাদেরই ভোট দেন। কলকাতা ও শহরতলীতে ১৪৪ ধারা বজায় থাকায় ভোটের পর কোনও মিছিল হয়নি।

১২ (বুধবার) ফেব্রুয়ারি *আনন্দবাজার*-এর সংবাদ শিরোনামে দেখা যাচ্ছে :

বাংলায় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরে আসার পথে

ভোটে কংগ্রেসের ভাগ্যবিপর্যয়

রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ফলাফলে অস্পষ্টতা এখন অল্পই। যুক্তফ্রন্ট বিরাট ভাবে জিতে চলেছে। কংগ্রেস শোচনীয় পরাজয়ের পথে। যুক্তফ্রন্টের নেতারা আরও উদ্বেল, আশান্বিত; এখন তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা দু'শোর বেশি আসন পাবেন। এখনও পর্যন্ত প্রথম দল বাম কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস তার পরে—বেশ পরে।

সোমবার যেকটি কেন্দ্রের ফল ঘোষণা হয় তা ফ্রন্টের পক্ষে যায়। তারপর শুধু জয়, জয় আর কংগ্রেসের হার। ফলের গতি দেখে কংগ্রেস নেতাদেরও কোনো সংশয় নেই। তাঁরা ঝুলছেন, তাঁরা শোচনীয়ভাবে হারছেন। হারছেন অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের চেয়ে কম আসন পাচ্ছেন। মঙ্গলবার কংগ্রেস ভবনে সরকারিভাবে কেউ কিছু বলেননি। তবে স্বীকার করেছেন তাঁরা হারছেন।

শুধু যে কংগ্রেস আসনে হারছেন তা নয়, হারছেন তাঁদের নেতারাও। হেরেছেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, মেয়র গোবিন্দ দে, প্রাক্তন মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্ত, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, বীজেশ সেন, আভা মাইতি, আবদুস সাত্তার, নলিনাক্ষ সান্যাল ও ফজলুর রহমান।

কংগ্রেসের শোচনীয় হার কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে। ফল ভালো হয় মালদহ, জলপাইগুড়ি ও নদীয়ায়। ফ্রন্ট বাদে অন্যদলগুলিরও একই অবস্থা। ফ্রন্টনেতারাও ফল দেখে অবাক। কংগ্রেস আপাতত কিছু বলেনি। তবে হুমায়ুন কবীর বলেছেন, কয়েকজন কংগ্রেস নেতার জন্যই ফ্রন্টের এই বিরাট জয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হল নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল। মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছে ২১৮ টি এবং কংগ্রেস ৫৫।

দলগত অবস্থা :
সি. পি. এম — ৮০ + ৩ (সমর্থিত)
সি. পি. আই — ৩০
বাংলা কংগ্রেস — ৩৩
ফরওয়ার্ড ব্লক — ২১
আর এস পি — ১২
এস এস পি — ৯
এস ইউ সি — ৭
আর সি পি আই — ২ + ১ (সমর্থিত)

ওয়ার্কার্স পার্টি — ২
মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক — ১
গোর্খা লীগ — ৪
লোকসেবক সংঘ — ৪
ফ্রন্ট সমর্থিত পি এস পি — ৪
ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল — ১
মোট ২১৮
কংগ্রেস — ৫৫
প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ — ৩
আই. এল. ডি. এফ — ১
জাতীয় দল — X
লোকদল — X
জনসংঘ — X
স্বতন্ত্র — X
নির্দল — ৩

কলকাতার রাস্তার আলো সব লাল। লোকেরা বাল্বের গায়ে লাল কাগজ পরিয়ে দিয়েছে। কার্জন পার্কের গুম্‌টি লাল আলোয় সজ্জিত। ট্রামে ব্যান্ড বাজছে। অঘোষিত উৎসব—যদিও উচ্ছ্বাস অপেক্ষাকৃত কম। মানুষের চোখে মুখে স্বস্তির ছাপ। কংগ্রেস এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত যে দল ভাঙাভাঙির খেলাও আর জমবে না। গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট ফিরে এসেছে।

আনন্দবাজার-এর 'কলকাতার কড়চা'য় (১লা মার্চ ১৯৬৯) জনৈক পাঠকের জবানিতে লেখা হয়:

'যাদের এ ঘর ভাড়া দিলাম পাঁচ বছরের তরে,
গদীর লোভে তারা যদি গদাযুদ্ধ করে,
ফের তাড়িয়ে দিতে পারি, দিয়ে কালির ছাপ,
জনগণের রায় মেনে আজ রাজ্য চালাও বাপ!

শিপ্রা সরকার বলছেন, এই স্বভাবকবি যুক্তফ্রন্টের খুব বড় সমর্থক মনে হয় না, কিন্তু জনচেতনার একটা দিক ফুটেছে এই ঠাট্টার মধ্যে।

৩

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনোত্তর বৈঠকে দাবি জানান হল: পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হাতে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশসহ সমগ্র স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব চাই। এবং *গণশক্তি*-র (১৯.২.৬৯) সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হল : নির্বাচনের ফলাফলে পরিষ্কার যে পশ্চিমবাংলার জনগণ কংগ্রেসের পরিবর্তে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত

যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁরা কংগ্রেসের পরিবর্তে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার চাননি। .....মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্য সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে হলে তাঁদের হাতে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার দেওয়া যে অতীব জরুরী তা কে না জানে?

ঠিক একইভাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত জনসভাগুলিতে যেসব ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি 'শ্রমিক-মেহনতী মানুষের সংগ্রাম এগিয়ে নিতে পশ্চিমবাংলায় বিপ্লবী সংগঠন' গড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। আরও বলছেন, ভারতকে একদিন চীন-ভিয়েতনামের পথে পা বাড়াতে হবে এবং সেদিকে যে সে পা বাড়াবে পশ্চিমবাংলার মানুষই তার নির্দেশ দিচ্ছে। (*গণশক্তি*, ২০.২.৬৯)

পশ্চিমবাংলার মানুষ কিন্তু তখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে যুক্তফ্রন্ট সরকার ফের ক্ষমতায় বসবে।

তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই যাবতীয় গোলমাল মিটে গিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে যুক্তফ্রন্টের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অজয় মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসু যথাক্রমে নেতা ও সহকারী নেতা রূপে নির্বাচিত হলেন। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের হাতে থাকবে : অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিভাগ। সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে থাকবে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ দপ্তর।

তার দুই সপ্তাহ পর, কালনার বিজয়োৎসব মঞ্চ থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন : সংগ্রামের আর একটি ঘাঁটি দখল করা হয়েছে মাত্র। রাইটার্স বিল্ডিং দখল করে আনন্দ আসতে পারে কিন্তু আনন্দের বন্যায় গা ভাসানো চলবে না। কেন্দ্র থেকে বাধা আসবে, রুখবে বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষ। টাটা বিড়লা প্রভৃতি ধনিক গোষ্ঠী থেকে বাধা আসবে, রুখবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র থেকে বাধা আসবে—রুখবে সরকারী কর্মচারী। এইভাবেই এগিয়ে যাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে সংগ্রামের জয়যাত্রা। (*গণশক্তি*, ৩.৩.৬৯)

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন ২৫ ফেব্রুয়ারি। বরুণ সেনগুপ্ত লিখছেন, কেউ কেউ মনে করেছিলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের ঝগড়াঝাটির ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ইতিমধ্যেই কিছুটা কমে গিয়েছে। মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার দিন কিন্তু দেখা গেল যে, আশংকা অমূলক। হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলেন রাজভবন আর রাইটার্স বিল্ডিং-এর চতুর্দিকে। এত ভীড় যে শপথ নিয়ে রাজভবন থেকে রাইটার্স পৌঁছতেই মন্ত্রীদের প্রাণ বেরিয়ে গেল। (*পালা বদলের পালা*, পৃ. ১২৫)

আনন্দবাজার-এর পাতায় (২৪.২.৬৯) ফুটে উঠল কল্লোলিত কলকাতার এক ঝলমলে ছবি। ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার যুক্তফ্রন্টের বিজয় উৎসবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড জনসমুদ্র। বিজয়োৎসবের বিশাল প্রাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে নতুন বাংলা গড়ার শপথ নিয়েছেন যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু সহ ষোলোজন নেতা একের পর এক বলেন, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় জনতার জয়। কলকাতায় সাম্প্রতিককালে এতবড় সমাবেশ হয়নি। গানবাজনা ও বাজির আলোয় গোটা মাঠ ছিল উদ্বেল। নেতারা বলেন, ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। ২২ নভেম্বর এখানেই সভা হওয়ার

কথা ছিল যা পুলিশ অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি। তাই আজকের সভা ঐতিহাসিক, সভা শুরু হয় বিকাল পাঁচটায়, শেষ হয় রাত সাড়ে আটটায়। লোক ফিরে যেতে যেতে মাঝরাত হয়ে যায়।

জ্যোতি বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যেভাবে কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছে তা অকল্পনীয়। যুক্তফ্রন্টের জয় হবে তাঁরা জানতেন কিন্তু এতবড় জয় হবে ভাবতে পারেন নি।

ভাষণের সূচনায় অজয় মুখোপাধ্যায় জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নির্বাচনে এই জয় জনতার। কেন্দ্রের গা-জোয়ারিতে ফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত হলে তারা জনতার রায় চান। জনতা তার প্রতিকার করেছেন। তাঁরা দাম্ভিক কংগ্রেসকে কবরে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল : সত্যিই কি কংগ্রেস কবরে গিয়েছে ? ভোটের হিসাব তো তা বলে না। সাম্প্রতিক নির্বাচনে, মোটপ্রদত্ত ভোট : ১৩৬, ৫৪, ৫৮০

যুক্তফ্রন্ট : ৬৮, ২৪, ৩৩৬

কংগ্রেস : ৫৫, ১৮, ৭৯১।

অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোটের ব্যবধান মাত্র ১৩ লক্ষ। শতকরা হিসাবে যুক্তফ্রন্ট : ৪৯.৯% এবং কংগ্রেস ৪০.৪%।

কয়েকটি জেলায় আবার কংগ্রেস এগিয়ে। পুরুলিয়ায় যুক্তফ্রন্ট ৪৮.৭ আর কংগ্রেস ৫১.৩ শতাংশ। জলপাইগুড়িতে যুক্তফ্রন্ট ৪১.২ আর কংগ্রেস ৫৩.২ শতাংশ। কোচবিহার জেলায় যুক্তফ্রন্ট ৪৪.০ আর কংগ্রেস পেয়েছে ৫১.২ শতাংশ ভোট। (*গণশক্তি*, ১.৩.৬৯)

কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন, এই আত্মতুষ্টি থেকে সৃষ্টি অনতিকাল পরের শরিকী সংঘর্ষের ঘটনাপুঞ্জ। আসল শত্রু যখন নিপাত তখন দলীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য অতএব একহাত লড়ে নেওয়া যাক। যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের বীজ জন্মলগ্নেই রোপণ করা হল। কিন্তু সেসব পরের ভাবনা। আপাতত কল্লোলিত কলকাতার দৃশ্যপট।

মুগ্ধ মৃণাল সেনের চোখে এ নিছক কোনো নির্বাচনী বিজয়োৎসব নয়। লাল পতাকার এত সমারোহ আর লক্ষ লক্ষ উদ্ভাসিত মুখ। এর ব্যঞ্জনা যে সুগভীর। তাঁর মনে হচ্ছিল, আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আজ যা ঘটছে কাল এখানেও তা ঘটবে। এক কাহিনীচিত্রের প্রেরণায় আপ্লুত মৃণাল সেন। জন্ম নিল *কলকাতা* ৭১। সময়সীমায় গাঁথা ১৯৩৩, ১৯৪৩, ১৯৫৩ ও ১৯৭০। প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর গল্প নিয়ে তোলা ছবি। সময়ের তালে তালে মানুষের চেতনার অগ্রগতি। একটা সময় ছিল দারিদ্র্যের কাছে বশ্যতা স্বীকারই ছিল মানুষের নিয়তি। আর ছিল নিজেদের মধ্যে মারামারি। প্রতিবাদহীনতা আর ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ। ১৯৫৩ সালে অঙ্কুরিত হল প্রতিবাদ আর ১৯৭০ সালে প্রতিবাদ চারদিকে ফেটে পড়ছে।

অচিরেই প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়। বঞ্চনা আর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দেশজুড়ে দাপিয়ে বেড়াল শ্রমিক, কৃষক ও খেটে-খাওয়া মানুষ। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। যার সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব।

চিত্তব্রত মজুমদারের মতে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান মানুষের সংগ্রামকে উৎসাহিত করা। ব্যাপক সংগ্রাম হয়েছে শহরে ও গ্রামে। মানুষ তখন ভয়ভাবনা-মুক্ত, কারণ সরকার তার সপক্ষে। কার্যভার গ্রহণের শুরুতেই সরকার গণ-আন্দোলনের আটশতাধিক মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে নকশালবাড়ির বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ছাড়া পেয়েছেন কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল ও খোকন মজুমদার। শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ দুমাসের মধ্যে অন্তত ৪৩টি ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিটিয়েছেন। তার মধ্যে ২৫টিতে চলছিল স্ট্রাইক আর বাকিগুলিতে হয় ক্লোজার নয়তো লক আউট।

তার চেয়েও বড়কথা: শ্রমিক শ্রেণী দাবি আদায় করেছে নিজের জোরে, আন্দোলনের জোরে। আর শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহায়ক ভূমিকা আগাগোড়া অব্যাহত। মালিকপক্ষও বসে নেই। তারা করেছে একের পর এক চক্রান্ত। মালিকপক্ষের চক্রান্ত আর প্ররোচনা ব্যর্থ করেই শ্রমিক আন্দোলন এগিয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সূচনাতেই চক্রান্ত। ৭ মার্চ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে জনগণের কাছে আবেদন জানান হল : কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত পরাস্ত করুন, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

কায়েমি স্বার্থের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য যুক্তফ্রন্টভুক্ত বিভিন্ন দল, বিশেষত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী ও সভ্যদের এবং শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনসাধারণের প্রতি সতর্ক প্রহরার আবেদন জানিয়ে এবং সমস্ত জেলায়, বিশেষত মিল-অঞ্চলের স্বেচ্ছাসৈন্যদের শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতি দিয়েছেন।

সবেমাত্র যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার কাজে হাত দিতে না দিতেই শুরু হয়েছে কংগ্রেসি চক্রান্ত। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার শিল্পাঞ্চলে, বিশেষ করে মিশ্র এলাকাগুলিতে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিষবাষ্প ছড়াতে আরম্ভ করেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ভেদ-বিভেদের প্ররোচনা দান করার জন্য মিল-মালিকের দালালরা, কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক দলগুলির স্থানীয় কর্মীরা গত কয়েকদিন ধরে উঠে পড়ে লেগেছে। ফলে হুগলী ও ২৪ পরগণার কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘর্ষ, অগ্নি সংযোগ, লুঠপাট, নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (*গণশক্তি,* ৭.৩.৬৯)

দাঙ্গার উস্কানির সঙ্গে যুক্ত আরো নানা প্ররোচনামূলক ঘটনা, যার অন্যতম দৃষ্টান্ত দুর্গাপুর।

২৪ মার্চ দুপুরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ৫ শতাধিক রক্ষীবাহিনীর সদস্য বিভিন্ন দাবিতে একটি মিছিল করে যায়। মিছিলটি প্রশাসন ভবনের কাছে পৌঁছালে উত্তরপ্রদেশ সশস্ত্র পুলিশ আচমকা মিছিলকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে ও গুলি চালায়। ফলে শতাধিক ব্যক্তি আহত ও তার মধ্যে পাঁচজন গুলিবিদ্ধ এবং তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনার জন্য দায়ী চীফ সিকিউরিটি অফিসার এন সি পাল সহ চারজনকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা

হয়। পরের দিন থেকে রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসন ভবনের দায়িত্ব নেয়।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৮ এপ্রিল '৬৯ কাশীপুর গান এ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরিতে। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালিয়ে আটজন শ্রমিককে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১০ এপ্রিল পালিত হয় রাজ্যব্যাপী সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল। *গণশক্তি*-র সংবাদদাতা (১১.৪.৬৯) জানাচ্ছেন: হিমালয় থেকে সুন্দরবন খেতখামার কলকারখানার সমস্ত কর্মচঞ্চলতা আজ স্তব্ধ। হরতালের দিন নেই একটি অভ্যস্ত চিত্র। ধর্মঘটী মানুষের মোকাবিলায় পথে পথে নেই সশস্ত্র পুলিশ। এবারকার সাধারণ ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য সংযোজন : ইছাপুরের দুটি অর্ডিনান্স কারখানাই গতকাল রাত থেকে স্তব্ধ। সেখানকার সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

আটজন শ্রমিকের মৃত্যুতে গোটা বাংলা শোকস্তব্ধ। শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে গোটা দেশ নিশ্চল। এদেশে বিভিন্ন ইস্যুতে হরতাল হয়েছে বহুবার। স্বাধীনতার পর শ্রমিকহত্যার প্রতিবাদে এর আগে হয়নি এরকম সর্বাত্মক হরতাল ধর্মঘট। তার সমর্থনে এগিয়ে আসেনি দেশের সরকার। এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শ্রমিক আর একা নন, সঙ্গে আছেন দেশের মানুষ ও যুক্তফ্রন্ট সরকার। অতএব আশ্বস্ত ও উদ্দীপিত শ্রমিকশ্রেণী মালিকের অনিচ্ছুক হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইল তার ন্যায্য দাবি। যুক্তফ্রন্ট সরকার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু শ্রমিক আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিস্তার।

২০ এপ্রিল '৬৯, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করল জেসপ্ কারখানার কর্তৃপক্ষ। পাঁচজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে চার্জশীট ও তিনজনের কর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহৃত হল।

১৩ মে '৬৯, এল আই সি কর্মীদের আন্দোলন অর্জন করল এক উল্লেখযোগ্য জয়। এল আই সি কর্তৃপক্ষ কলকাতা অফিসে যে কম্পিউটার মেশিন বসাতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সে-মেশিন কলকাতা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এল আই সি-র চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠিতে সে কথা জানিয়েছেন।

১২ জুন '৬৯। ফেডারেশন অফ মার্কেনটাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের আহ্বানে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের এক বিরাট মিছিল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক দাবিসনদ পেশ করে। মহাকরণের সম্মুখের পথ-সভায় অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন।

ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফ, ক্লোজার ও ক্রমবর্ধমান বেকারির বিরুদ্ধে মিছিলটি অয়োজিত হয়েছিল।

২৯ জুন '৬৯। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের ৩১তম সম্মেলন মঞ্চ থেকে চটকল শ্রমিকদের সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। ৭৫ টি চটকলের দু লক্ষ শ্রমিক তাঁদের বাঁচার মতো মজুরির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৪ আগস্ট '৬৯। আজ সকাল থেকে দু লক্ষ চটকল শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছেন। কর্তৃপক্ষের (আই জে এম এ) অনমনীয় এবং অনড় মনোভাবের ফলে আপোস আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। গতকাল রাত্রি থেকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক গঙ্গার দুধারে চটকলগুলির গেটে পাহারারত। গেটে গেটে চারটি ট্রেড ইউনিয়ন মিলিতভাবে একই ক্যাম্পের নীচে নিজ নিজ পতাকা নিয়ে অবস্থান শুরু করেছেন। ব্যারাকপুর অঞ্চলের এক লক্ষ, হুগলীর তিরিশ হাজার,

হাওড়ার চব্বিশ হাজার এবং বজবজের চটকল শ্রমিকের কেউ কাজে যোগ দেননি।

পরের দিন, ৫ আগস্ট শ্রীরামপুর টাউন হলে পাটচাষী ও চটকল মজুরদের যুক্ত কনভেনশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিশ সহস্র নরনারীর সমাবেশে হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন: বিড়লাপুর থেকে কাঁচরাপাড়া ভারতের চটশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। গতকাল থেকে একটা চাকাও ঘোরেনি, এক গাঁট পাটও পেষাই হয়নি। সাইরেন বেজেছে যথারীতি, কিন্তু একজন শ্রমিকও কাজে যোগ দেননি।

১০ আগস্ট '৬৯। দিল্লীতে দুদিন ব্যাপী ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার শেষে চটকল শ্রমিকদের নদিনব্যাপী ধর্মঘটের অবসান ঘটে। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে আর একটি ঐতিহাসিক জয়। ১১ আগস্ট, মনুমেন্ট ময়দানে প্রবল বর্ষণের মধ্যেও লক্ষাধিক চটকল শ্রমিক বিজয়-সমাবেশে যোগদান করেন। চটকল ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল চটকল শ্রমিক ও পাটচাষীদের স্বার্থে কাঁচাপাট থেকে শুরু করে মাল উৎপাদন ও তার বহির্বাণিজ্যিক ব্যবস্থা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়াকে এক চুলচেরা তদন্তের আওতায় আনতে হবে। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, চাষী ও জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে গৃহীত সুপারিশগুলি দ্রুত রূপায়িত করতে হবে।

১৮ ডিসেম্বর '৬৯। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে চটকল শিল্পে তদন্ত কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চারজন সদস্যের তদন্ত কমিশনের সভাপতি নির্মলকুমার সেনগুপ্ত এবং অপর তিনজন সদস্য হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ড. এ এন বসু ও এন সি রায়। রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তটিকে ঐতিহাসিক জয় বলে স্বাগত জানিয়েছেন। কমল সরকার (বি পি টি ইউ সি), কালী মুখোপাধ্যায় (আই এন টি ইউ সি), যতীন চক্রবর্তী (ইউ টি উ সি) ও ফণী ঘোষ (এইচ এম এস) এক বিবৃতিতে বলেছেন, আশা করব এই তদন্ত দ্রুত শেষ হবে। শ্রমিক-কৃষক স্বার্থের অনুকূলে সুপারিশসমূহ দ্রুত কার্যকর করা হবে। (*গণশক্তি*, ২০.১২.৬৯)

১৪ আগস্ট '৬৯। শুরু হয়েছে ভলটাস-এর সাত হাজার কর্মচারীর লাগাতার ধর্মঘট। ভারতের সমস্ত অফিসের সমস্ত কর্মচারী এই ধর্মঘটে সামিল।

ধর্মঘট আর ধর্মঘট। হাওড়ার রেমিংটনে ধর্মঘট চলছে গত ছমাস ধরে। বিনান ও বেঙ্গল পটারিতেও ধর্মঘট চলছে বেশ কিছুকাল।

২৩ আগস্ট '৬৯। বি পি টি ইউ সি-র অন্যতম সম্পাদক কমল সরকার পশ্চিমবাংলার সমস্ত শিল্পের শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের প্রতি এই ধর্মঘটীদের পাশে দাঁড়াবার জন্য আবেদন জানান।

পুজোর ঠিক আগে জানা গেল, শ্রমিকদের মধ্যে কিছু অংশ কিছু বাড়তি টাকা পাচ্ছেন। কলকাতা কর্পোরেশনের সতেরো হাজার শ্রমিক-কর্মচারী পূজা রিলিফ পাচ্ছেন।

স্মরণাতীত কালের মধ্যে এ ধরণের নজির নেই যা ঘটল ২৬ সেপ্টেম্বর '৬৯। মহাকরণে সেদিন মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার ফলে লাভবান হয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত আড়াই লক্ষ শ্রমিক। এই চুক্তি কার্যকর হবে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে। তাছাড়া একত্রিশ দিনের সফল ধর্মঘটে জয়ী হয়েছেন ভলটাস-এর শ্রমিক-কর্মচারী। মালিকপক্ষ তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। ৮ অক্টোবর '৬৯। শ্রমমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় সূতাকল শ্রমিকদের ৩৮ দিনের ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। ১৩টি সূতাকলের ৫৫ হাজার মজুরের অন্তর্বর্তীকালীন মাইনে বাড়বে মাসে কুড়ি টাকা। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাত মাসের কার্যকালের মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। (*গণশক্তি* ৯.১০.৬৯)

চটকল, সূতাকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাস পুরনো এবং সংগঠনও অপেক্ষাকৃত মজবুত। এবারে আন্দোলনে নতুন জোয়ার এল চা-বাগান ও কয়লাখনির শ্রমিকদের মধ্যে। কলকাতার বড়বাজারে-পোস্তায় দিনমজুরদের মতো অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যেও জোট বাঁধার তাগিদ দেখা যায়।

১০ এপ্রিল '৬৯। দার্জিলিং জেলা চা শ্রমিকদের সংগঠন চিয়াকামান মজদুর ইউনিয়নের অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয়: শুধু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন নয়। চা-শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামে সামিল হতে হবে। সম্মেলনের আহ্বান: আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই — নেপালী ভাষার উপযুক্ত মর্যাদা চাই — চা-শিল্পের জাতীয়করণ চাই।

জেলার প্রতিটি মহকুমা থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিরা তিনদিন আলোচনা করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে সভাপতি রতনলাল ব্রাহ্মণ বলেন: শ্রমিকের বাঁচা-মরার সমস্যার সমাধান সমাজতন্ত্র ছাড়া অসম্ভব। সম্পাদক আনন্দপ্রসাদ পাঠকের আহ্বান: গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই তার দিকে এগোতে হবে।

১৮ আগস্ট '৬৯। *গণশক্তি*-র সংবাদ সূত্রে জানা যায়, আজ থেকে দশদফা দাবিতে তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিং-এর চা বাগিচার ২ লক্ষাধিক শ্রমিক সকাল ছটা থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। ২১ আগস্ট চা-শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে শিলিগুড়ি মহকুমায় হরতাল পালিত হবে।

তার এক সপ্তাহ পরের খবর, এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ উদ্বেলিত। ছাত্র, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী—এক কথায় সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে এসেছেন এই ধর্মঘটের সমর্থনে। প্রতিদিনই মিছিল—হাজার হাজার মানুষের মিছিল।

৩ সেপ্টেম্বর '৬৯। চা-শ্রমিক ধর্মঘট জয়যুক্ত। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী মালিক পক্ষ মেনে নিয়েছেন: নতুন করে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস করা হবে না, দৈনিক মজুরি ২০ পয়সা করে বাড়বে এবং প্রত্যেককে এককালীন ১০ টাকা করে দেওয়া হবে।

জমি ও শ্রমিকের আনুপাতিক হার ২৫০ একর জমি পর্যন্ত ২০ জন, ২৫১ থেকে ৫০০ একর জমি পর্যন্ত ২৫ জন, ৫০১ থেকে ১০০০ একরের বেশি পরিমাণ জমিতে ৫৫ জন করে শ্রমিক নিয়োগ করা হবে। ফলে ৮৫৭০ জন নতুন শ্রমিক কাজ পাবেন। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন মনোরঞ্জন রায়, যতীন চক্রবর্তী ও কালী মুখোপাধ্যায়।

এটি নিঃসন্দেহে শ্রমিকশ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য জয়।

শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন রণাঙ্গন রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল। চল্লিশ হাজার কয়লা শ্রমিক আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। *গণশক্তি*-র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন (১৪ জুন '৬৯): সম্প্রতি রাণীগঞ্জের ৪৭টি কয়লাখনির শ্রমিক-প্রতিনিধিরা একটি সভায় মিলিত হয়ে একটি দাবিসনদ তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দাবি সনদে রয়েছে: ১ টাকা ৪৭ পয়সা দৈনিক মহার্ঘ ভাতা, ১২ দিন কাজে একদিনের সবেতন ছুটি, গ্র্যাচিউটি, ছাঁটাই শ্রমিকদের পুর্নবহাল ও বোনাসের কাঠামো সংশোধন। আন্দোলনের কর্মসূচির প্রথম দফায় থাকবে ১৫ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত দাবি সপ্তাহ পালন এবং দ্বিতীয় দফায় ২৩ জুন থেকে বিভিন্ন কয়লাখনি ম্যানেজারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

৩০ জুন '৬৯। ২৫ হাজার কয়লা শ্রমিকের মিছিল তিন মাইল পথ পরিক্রমা করে

আসানসোলের কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তর, রিজিওন্যাল লেবার কমিশনের দপ্তরে দাবি-সনদ পেশ করেন। মিছিলের বৈশিষ্ট্য : আড়াই হাজারের বেশি নারী-শ্রমিকের অংশগ্রহণ।

কয়লাখনি শ্রমিকের নবজাগরণে, মালিকপক্ষ আতঙ্কে বিহ্বল। তারা শ্রমিকদের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও খুনখারাপির রাস্তা নিয়েছে। ৪ঠা আগস্ট '৬৯ অণ্ডাল খনির অন্তর্গত হরিপুর কয়লাখনির শ্রমিক নেতা রামমিলনকে মালিকের গুণ্ডারা খুন করল। গুণ্ডাদের হামলায় গুরুতর আহত হলেন কয়লা শ্রমিক সন্ন্যাসী পৈরী ও জেঠুরাম। শ্রমিক ও গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের ফলে পুলিশ ম্যানেজারসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

১৫ আগস্ট রাণীগঞ্জে শ্রমিক নেতা রামমিলন কোহরের হত্যার প্রতিবাদ জানায় দশ হাজার শ্রমিকের এক বিশাল সমাবেশ। এই সমাবেশে মিলিত হয় বিভিন্ন খনি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল।

'কয়লাখনি অঞ্চলে নব জাগরণ', লিখছেন *গণশক্তি*-র সংবাদদাতা তাঁর বিশেষ প্রতিবেদনে। কয়লা শ্রমিকরা গড়ছেন সংগ্রামী সংগঠন। রাণীগঞ্জে বিশাল সমাবেশে জ্যোতি বসুর ভাষণ:

রাণীগঞ্জ (৭.১০.৬৯) — কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী আজ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ। মাটির নীচ থেকে যারা সম্পদ আহরণ করে—সে সাহসী কয়লা শ্রমিক, মালিকের মুনাফার পাহাড় শোষণের ইমারতকে আর বাড়াতে দেবে না।

আসানসোল, রাণীগঞ্জে জ্যোতি বসুর সফর এবং বিভিন্ন সমাবেশে ভাষণ — এই অঞ্চলের বাঙালি অবাঙালি জনগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই উপলক্ষ্যে রাণীগঞ্জে কোলিয়ারী মজদুর সভার নেতৃত্বে কয়েক হাজার সুসংগঠিত স্বেচ্ছাবাহিনীর সমাবেশ — তাদের হাতে রক্ত সমারোহ। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে এই স্বেচ্ছাবাহিনী হবে মজবুত সংগঠিত শক্তি।

বিকালের সমাবেশে কয়লাখনির শ্রমিক ছাড়াও, অন্যান্য কারখানার শ্রমিক, রেল ও গ্রামাঞ্চলের কৃষক দলে দলে যোগদান করে। অন্তত অর্ধলক্ষ লোকের এই সমাবেশ।

কয়লাখনি শ্রমিক আন্দোলনের উর্ধ্বগতি অব্যাহত। ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে আসানসোল ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলের আশি হাজার শ্রমিক ১৭ নভেম্বর ধর্মঘট করবেন।

কয়লা শ্রমিক আন্দোলন নতুন বছরেও অব্যাহত। ৫ ফেব্রুয়ারি '৭০ হাজারে হাজারে শ্রমিক রাণীগঞ্জের কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক শ্রম কমিশনারের অফিসের সামনে গণ-ডেপুটেশন দেন। দাবি না মানলে এবার তাঁরা শুরু করবেন লাগাতার ধর্মঘট।

কিন্তু মালিকপক্ষ অনড় এবং তারা গুণ্ডাবাজীর রাস্তা নিয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি '৭০ পাটমোহনা কোলিয়ারির মালিকের গুণ্ডারা ২৫০ জন শ্রমিকের একটি দল যখন কাজের দাবি জানাতে যায়, তাদের উপর চড়াও হয়ে চারজন শ্রমিককে খুন করে। গুণ্ডাদের আক্রমণে কৃষ্ণলাল, বিশ্বনাথ, ভোলা, বাসদেও গোয়ালা নিহত এবং আর পাঁচজন গুরুতর আহত।

প্রমোদ দাশগুপ্তের মতে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের দৌলতে সাধারণ মানুষের আর্থিক লাভালাভ টাই বড় কথা নয়। গণসংগ্রামের প্রতি সরকারের দরদী ও সহায়ক নীতিই যুক্তফ্রন্টের মৌলিক অবদান। ৭ ফেব্রুয়ারি '৭০ বর্ধমানের টাউন হল্ ময়দানের জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, তার ফলে পশ্চিমবাংলার অবদমিত মানুষ জাগছে। এতদিনকার অবদমিত মেহনতী মানুষ নতুন সংগ্রামী চেতনায় সঞ্জীবিত হয়েছে।

তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত পোস্তার দিনমজুরদের লড়াই। এতদিন যাঁরা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় 'দিন আনি দিন খাই' অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরাও আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

পোস্তার প্রায় পনেরো হাজার কুলি ও দিনমজুর মালিকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংগ্রাম শুরু করেছেন। *গণশক্তি*-র সংবাদদাতা (১৯.১১.৬৯) জানাচ্ছেন, ১৭ নভেম্বর স্ট্র্যান্ড রোডের উপর পাঁচ সহস্র দিনমজুরের সমাবেশ অনুষ্ঠিত। দিন মজুরের বোনাসের দাবিতে সংগ্রামের সমর্থনে এই সভায় ক্যারিয়ার ট্রান্সপোর্ট, হোসিয়ারী ও কাঠগোলার শ্রমিকরাও মিছিল করে আসেন।

৫

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক দুসপ্তাহ পর ৯ মার্চ '৬৯ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত যে ভাষণটি দেন সেটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তার গুরুত্ব যতটা না সাধারণ শ্রোতাদের কাছে, তার আসল তাৎপর্য কিন্তু পার্টি র‍্যাংকের কাছে। বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু এমনি গুরুভার যে যেন তিনি পার্টির রাজনৈতিক ক্লাশে বক্তব্য রাখছেন। তার সারংশটি উদ্ধৃতিযোগ্য: কংগ্রেসের পরাজয়ে আত্মসন্তুষ্টি নয়, এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে আগামী দিনের আরো বৃহত্তম লড়াই-এ কার কী ভূমিকা। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হবার পরও কংগ্রেস এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার উস্কানি দিচ্ছে। বিভেদের শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তার উপর রয়েছে সাধারণ মেহনতী মানুষের উপর কংগ্রেসের চাপানো ২০ বছরের শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসনের সংকট। যুক্তফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে এই সংকট সমাধান করতে পারবে না। দরকার এক উত্তাল শ্রেণী-সংগ্রাম। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের ফলে যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকা তৈরি হয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নতুন কায়দায় গ্রামে গঞ্জে, কলে কারখানায় শ্রেণী-সংগ্রাম। এই শ্রেণী-সংগ্রামের লক্ষ্য হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।

যুক্তফ্রন্টের বিপুল জয় হয়েছে। কিন্তু এই জয়ে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। কংগ্রেসের শক্তি কমেছে ঠিকই, তবুও কংগ্রেস শতকরা ৪০ ভাগ ভোট পেয়েছে। এই ৪০ ভাগ মানুষ একচেটিয়া পুঁজিপতি, জমিদার-জোতদার-চোরাকারবারি নয়, সাধারণ মানুষ। এই মানুষ এখনও কংগ্রেসের প্রচারে বিভ্রান্ত।

সংশোধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদ মেহনতী মানুষের সমান শত্রু। সংশোধনবাদ সংগ্রামকে ভোঁতা করে দেয় — সংকীর্ণতাবাদ বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে আগেভাগেই সব কিছু ভণ্ডুল করে দেয়।

প্রমোদ দাশগুপ্ত তুলে ধরেছেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর পার্টির রাজনৈতিক লাইন। লক্ষ্য নিছক রাজ্যশাসনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতালাভ নয়—আসল লক্ষ্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাই ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায় উত্তাল শ্রেণী-সংগ্রাম সৃষ্টিই হবে তার প্রস্তুতি। অর্থাৎ সরকারে এসে পার্টি বিপ্লবের কথা ভোলেনি। কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যায় : সংবিধানসম্মত সরকারে থাকা ও উত্তাল শ্রেণী-সংগ্রামের সমন্বয় আদৌ সম্ভব কি?

মজুর কৃষকের আন্দোলন ও সংগঠনের বিস্তৃতি অবশ্যই ঘটেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়সীমার মধ্যে শ্রমিক অন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আগের অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামের কথায় পরে আসছি। কৃষক-আন্দোলনের জোয়ার নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। প্রশ্ন ওঠে: এসবই কি আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতি?

প্রসঙ্গত, বিপ্লবের আর দেরি কত —- এ প্রশ্নটি এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিটি বাঁকে বারেবারে উঠেছে। সি পি আই থেকে সি পি আই (এম)-এর জন্ম এবং তা থেকে এক অংশের ফের বেরিয়ে যাওয়া—দুবারই চীনের দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে এবং ক্যাডাররা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করেছেন: কেন ভারতে বিপ্লব আজও পর্যন্ত সফল হয়নি? রবীন্দ্র রায়ের মতে, তা থেকেই উদ্ভব সি পি আই-এর বিরুদ্ধে সি পি আই এম-এর সংশোধনবাদের অভিযোগ এবং নিজ পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সি পি এম-এর র‍্যাডিকাল অংশের একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি।

তাঁর মতে, চারু মজুমদারের ৮টি দলিলের সারমর্ম (যার কথায় পরে আসছি): ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারকথা, কমিউনিস্ট ক্যাডারদের বিরামহীন বৈপ্লবিক প্রয়াস আর সাশোধনবাদী নেতৃত্বের লাগাতার বেইমানি। (প্রাগুক্ত, ৮৪)

সি পি এম নেতৃত্ব ও বিরোধীদের মধ্যে মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু হল বিপ্লবের সময় হয়েছে কি হয়নি। বিরোধীরা মনে করে, বিপ্লবের সময় হয়েছে, কীভাবে হবে সেটা পরের কথা। এখানে উভয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা যেতে পারে। চীনের পার্টির সঙ্গে এই প্রশ্ন নিয়েও সি পি এম-এর দূরত্ব বেড়েই চলেছে, যেহেতু চীনের পার্টির মতে নকশালবাড়ির পথই বিপ্লবের পথ। পার্টির বিক্ষুব্ধ অংশও নকশালবাড়ির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দাবি করেন যে বিপ্লবের সময় হয়েছে। চারু মজুমদারের উত্থানের এটাই ভিত্তি, যেহেতু একমাত্র তিনিই মানুষের বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাসের সারসত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

সময়টা ১৯৬৯ সাল। চারিদিকে অবাধ্যতার ঢেউ! অশোক মিত্রর ভাষায়, অবিনয়ী ঔদ্ধত্যের ঋতু সমাগত। তিনি লিখেছেন:

‘রোজ কাগজ খুলে আপাতত আমাদের বিঘ্নিত শান্তির খবর পড়তে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে দামাল অশান্তি, কল-কারখানায় ঘেরাও-ধর্মঘট, ছাত্র মহলে উচ্চগ্রাম অবিনয়ী প্রতিবাদ, সদাগরি পাড়ায় কেরাণীদের শক্তির আস্ফালন। অবিকল নৈরাজ্য নয়, কিছু কিছু অসুবিধা ঘটলেও, অধিকাংশ শ্রেণীর লোকই এখন পর্যন্ত মোটামুটি খাচ্ছে দাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি অর্ধস্বচ্ছ অনুভাবনা যে আর খুব বেশিদিন এভাবে চলতে পারে না, বিস্ফোরণ ঘটবেই।...

... গ্রাম চেতনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতর কারণ অবশ্য রাজনৈতিক। ভাগচাষী, মজুরচাষী বহুদিন মুখ বুজেই পড়েছিল ... কিন্তু ইদানীং প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে।

মাথা পিছু ভোট, কিছু কিছু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, কিছু কিছু সংহত আন্দোলন, সব

মিলিয়ে পল্লী অঞ্চলের হাভাতেরা নিজেদের মধ্যে একটি অন্যশক্তি আবিষ্কার করতে পারছে। সংগঠন, প্রায় অমোঘ নিয়মেই, জোরালো হচ্ছে, দাবির প্রকাশ ক্রমশঃই রূঢ় থেকে রূঢ়তর।

... যুক্তফ্রন্টের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্ব উপস্থিত চরমে উঠেছে। এতকাল ধরে বড়লোকদের অপশাসন মানা গ্রাম ছোটলোকদের দখলে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু সংকটের লক্ষণগুলি আরো নানা বিভঙ্গে পরিব্যাপ্ত। যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ কল-কোলাহল, পল্লীতে পল্লীতে দামাল রক্তবন্যা, কারখানায় হিংস্র উন্মত্ততা, ডালহৌসীতে বিস্ফোটিত উদ্ধৃতি, শিক্ষায়তনে অহরহ হামলা-হাঙ্গামা, খেলার মাঠে, বাসের ভীড়ে সামান্যতম সূত্র ধরে চরম পরিস্থিতির উদ্ভব, সমাজে সর্বত্র নিয়মনিয়ন্ত্রণের পরিকল্পিত অবাধ্যতা সব কিছুই ক্রান্তি-মুহূর্তের নিহিত অস্থিরতাকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছে।

প্রত্যহ হত্যা, প্রত্যহ ষড়যন্ত্র, প্রত্যহ ঘেরাও-আস্ফালন-আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ।

পিছনে কি ছিল ক্রমশ ভুলে আসছি, সামনের দিকে তাকালে চোখের ঘোর লাগে, থমথম অবস্থানে আমরাঃ ক্রান্তি, শ্রেণী স্খলন, দ্বন্দ্বের বিদীর্ণ যন্ত্রণাঃ ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশের এরকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা।' (*কবিতা থেকে মিছিলে*, ১৯৬৯)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল, এই কারণেই যে, এই পটভূমিতে চারু মজুমদারের বিপ্লব তত্ত্ব অবশ্যই আসর জমাতে পারে। এই প্রসঙ্গে সৌরেন বসু লিখছেন : সেই ১৯৬৫ সালেই চারুদা বুঝেছিলেন চারটে বিষয়ে সি পি এম থেকে আলাদা হবার উদ্যোগ নিলে তবেই বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠতে পারে। এক, বর্তমান যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল মাও-সে-তুং চিন্তাধারা। দুই, ভারতের সর্বত্র বিপ্লবী অবস্থা আছে এই বিশ্বাস। তিন, এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলই ভারতীয় বিপ্লবের এগোবার মাধ্যম, নির্বাচন নয়। চার, কেবলমাত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই বিপ্লবের বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব। ভারতবর্ষ একটা ডিনামাইটে পরিণত হয়েছে। চারুদার কথায়, আমরা শুরু করলে বুঝতে পারব কি তার বিস্ফোরণের ক্ষমতা। (*অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার*, পৃ. ৩৭)

এই কথাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারু মজুমদারের আটটি দলিলে (রচনাকাল : ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৫ থেকে এপ্রিল ১৯৬৭) যার মূল বক্তব্য হচ্ছে :

১) বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত করতে হবে পার্টি সংগঠনকে। ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে কৃষি বিপ্লব। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হবে—কৃষি বিপ্লব সফল কর। (প্রথম দলিল, ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৫)

২) এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের পথই প্রকৃত লেনিনবাদী পথ। কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা দখলের চিন্তা যে ভুল তাই নয়, এই চিন্তাধারা কমিউনিস্ট পার্টিকে সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত করে। অস্ত্রহীনভাবে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করা, স্বপ্নবিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগামী সংগ্রামের যুগে বে-আইনী যন্ত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই প্রতিটি পার্টি সভ্যকেই এখন থেকে বে-আইনী কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। (দ্বিতীয় দলিল, এপ্রিল ১৯৬৫)

৩) আসুন কমরেডস, শ্রমিকের নেতৃত্বে কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে সমস্ত মেহনতী মানুষ মিলে এই সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হই। অন্যদিকে কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্ত কৃষক এলাকা গঠন করে নতুন জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের গোড়াপত্তন করি।

(তৃতীয় দলিল, ৯ এপ্রিল, ১৯৬৫)

৪) আমাদের যুগের বর্তমান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে সরকার প্রতিটি আন্দোলনের মোকাবিলা করছে হিংস্র আক্রমণের মাধ্যমে। কাজেই জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের। তাই আজ গণআন্দোলনের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণী, সংগ্রামী কৃষকশ্রেণী ও প্রত্যেকটি সংগ্রামী জনসাধারণকে আহ্বান জানাতে হবে : (১) সশস্ত্র হও, (২) সংঘর্ষের জন্য সশস্ত্র ইউনিট তৈরী কর, (৩) প্রত্যেকটি সশস্ত্র ইউনিটকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত কর। আর সেই সশস্ত্র ইউনিটগুলোই ভবিষ্যতে গেরিলা বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। এই সশস্ত্র ইউনিটগুলোকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের জন্য দৃঢ় জায়গা (Base area) গড়ে তুলতে পারবে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আমরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারব। (পঞ্চম দলিল, তারিখ নেই)

৫) লেনিনের পর কমরেড মাও-সে-তুং আজ লেনিনের স্থান দখল করেছেন। চীনের পার্টির বিরোধিতা করে ভারতের পার্টি নেতৃত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবীপথ পরিত্যাগ করেছেন। শোধনবাদকে নতুন বোতলে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং পার্টিসদস্যদের আজ একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে—শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই পার্টির নেতৃত্ব আমাদের সহকর্মী তো ননই, আমাদের সহযোগীও নন। প্রদেশব্যাপী লাগাতার ধর্মঘট, মধ্যবিত্তসুলভ উগ্রবামপন্থী আওয়াজ, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রশ্নে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐক্য করার আকুল আকাঙ্ক্ষা যার অর্থ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড় হয়ে চলা।

সুতরাং এই পার্টি নেতৃত্ব ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন ... মুখে বিপ্লব, কাজে লেজুড়বৃত্তি করার পথ নিচ্ছেন। তাই বর্তমানে পার্টি ব্যবস্থা ও তার গণতান্ত্রিক কাঠামোর ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়েই একমাত্র বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠতে পারে। কাজেই এই পার্টির তথাকথিত 'ফর্ম' বা 'গণতান্ত্রিক কাঠামো' মেনে চলার অর্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলা এবং সংশোধনবাদের নেতৃত্বের সাথে সহযোগিতা করা। (ষষ্ঠ দলিল, আগস্ট ১৯৬৬)

৬) কৃষি বিপ্লব আজকের এই মুহূর্তের কাজ। কিন্তু কৃষি বিপ্লব করার আগে চাই রাষ্ট্র শক্তির ধ্বংসসাধন। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করে কৃষিবিপ্লব করতে যাওয়ার মানে সোজা সংশোধনবাদ। তাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজ আজ কৃষক আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কাজ।

সংগ্রামের একটি স্তরে একটিমাত্র কাজ থাকে। সেই কাজটি না করলে সংগ্রাম উন্নত স্তরে যাবে না। সেই বিশেষ কাজ আজকের যুগে, সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ও বন্দুকসংগ্রহ অভিযান।

শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশকে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। এই কাজ শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান কাজ। অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের ঘাঁটি তৈয়ার করা—এরই নাম শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। ট্রেড ইউনিয়নে সমস্ত শ্রমিককে সংগঠিত কর—এ আওয়াজ শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা বাড়ায় না। এর অর্থ অবশ্যই এরকম নয় যে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করবো না। এর অর্থ পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের আমরা নিশ্চয়ই ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আটকিয়ে রাখব না, তাদের কাজ হবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন চালানো অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ও বন্দুক সংগ্রহ অভিযান চালানোর রাজনীতি প্রচার করা এবং পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর মধ্যেও আমাদের রাজনৈতিক প্রচার চালানোই প্রধান কাজ এবং কৃষক সংগ্রামের তাৎপর্য প্রচার করা। অর্থাৎ পার্টির সব ফ্রন্টেরই দায়িত্ব হচ্ছে কৃষক সংগ্রামের গুরুত্ব বুঝানো এবং সেই সংগ্রামের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। (এপ্রিল ১৯৬৭)

আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ-বর্জিত শিথিল রচনার নিদর্শন চারু মজুমদারের লেখাগুলি। পাঠান্তে মনে হয় স্পষ্টতই তিনি দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: এক চীনের পথই ভারতের পথ। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের আগে স্থানীয় আঞ্চলিক কর্তৃত্ব কায়েম ও সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী গঠন যে একক বৈশিষ্ট্য চীন বিপ্লবকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে—এ দেশে তিনি তার হুবহু প্রয়োগে বিশ্বাসী।

দুই, তিনি সি পি এম-কে বিপ্লবী পার্টি বলে মনে করেন না। প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হবে। তাই পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা ও পার্টি নেতৃত্বকে অমান্য করার জন্য তিনি পার্টি র‍্যাংককে খোলাখুলি আহ্বান জানাচ্ছেন।

চারু মজুমদার তাঁর বক্তব্য পার্টি র‍্যাংকের কাছে উপস্থিত করার জন্য পার্টি নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব করেন। সহজবোধ্য কারণেই পার্টি নেতৃত্ব এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। প্রমোদ দাশগুপ্ত নাকি চারুবাবুকে বলেন, আপনি, মশাই, বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে চারিদিকে কেবল বিপ্লব দেখেন।

যাই হোক, চারু মজুমদার নিজের উদ্যোগে পার্টি ফর্মের তোয়াক্কা না করে তাঁর আটটি দলিল অন্তত কিছু কমরেডের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

৬

রবীন্দ্র রায়ের মতে, সর্বাত্মক কংগ্রেস-বিরোধিতা ছিল, সি পি এম-এ যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাদের ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তি এবং সি পি এম-এর জন্মলগ্নে রণনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রশ্ন নিয়ে যাবতীয় আলোচনা মুলতুবি রাখা হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬)

চারু মজুমদার তো তাঁর পঞ্চম দলিলে সি পি এম-কে বিপ্লবী পার্টি বলে মানতেই চাননি। চারুবাবু ও তাঁর অনুগামীরা ছাড়া সি পি এম-এর মধ্যে অন্যান্য বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। যেমন পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আন্তঃপার্টি শোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম কমিটি। মূলত তাঁদেরই উদ্যোগে ১৪ জুন ১৯৬৭ গঠিত হয় 'নকশালবাড়ী ও কৃষকসংগ্রাম সহায়ক কমিটি'। এই প্রতিষ্ঠানটি আপাতত বিক্ষুব্ধদের মঞ্চ।

নকশালবাড়ির ঘটনার পর সি পি এম-এর মধ্যে শুরু হয় প্রবল আলোড়ন এবং শুরু হয় দলত্যাগ ও বহিষ্কারের হিড়িক।

১৯৬৮ সালের জুন মাসে সি পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়া সি পি এম থেকে দলত্যাগী সদস্যদের একটি তালিকা দেন।

রাজ্য	সি পি এম সদস্যপদ	দলত্যাগীর সংখ্যা
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬,০০০	৮,০০০
মহারাষ্ট্র	২,৩০০	১০০
পাঞ্জাব	৬,০০০	১০০
দিল্লী	৪০০	১৫০
উত্তরপ্রদেশ	৩,৬০০	১,৮০০
বিহার	২,৬০০	৩০০
পশ্চিমবঙ্গ	১৬,৩০০	৫০০
কেরালা	১৬,০০০	১,৬০০
জম্মু ও কাশ্মীর	৮০০	৮০০
		মোট ১৩,৩৫০

(*নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা*)

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন যখন আসন্ন, ঠিক সেই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠে সি পি এম-এর দলত্যাগীদের নিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাঁদের নিয়ে, যাঁরা বিপ্লবের 'নকশালবাড়ি মডেল'-এ বিশ্বাসী। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারু মজুমদার, সি পি এম-এর যুক্তপ্রদেশ রাজ্যনেতা শিবকুমার মিশ্র, এস তেওয়ারী ও বিহারের সত্যনারায়ণ সিংহ প্রমুখ। ভবিষ্যতে পার্টি গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এই কমিটি গড়া হয়।

নকশালবাড়ির ঘটনা চারু মজুমদারকে এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এবং চারু মজুমদারের মতে, ১৯৬৭, নভেম্বরে নকশালবাড়ির গরীব ও ভূমিহীন কৃষক জমির জন্য নয়, লড়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য।

রবীন্দ্র রায়ের ভাষায়, আসলে সবটাই এক কল্পকাহিনী (myth)। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)

এই 'মীথ' অবলম্বনেই চারু মজুমদার হয়ে পড়েন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অবিসংবাদী নেতা, ভক্তদের চোখে ভারতের মাও-সে-তুং। এবং এই 'মীথ' থেকেই সৃষ্টি হয় এক পুরোদস্তুর বিপ্লবতত্ত্ব, যা অল্পকথায় অরবিন্দ পোদ্দার চমৎকার ব্যক্ত করেছেন :

ভারতের জনগণের প্রধান শত্রু হল (ক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, (খ) সোভিয়েত শোধনবাদ, (গ) জমিদার শ্রেণী এবং (ঘ) মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণী। "এরা হচ্ছে চারটি পাহাড় যা আমাদের মেহনতী জনগণের পিঠের উপর গুরুভার হয়ে চেপে আছে।" এই চারটি শত্রুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উচ্ছেদের উপর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভরশীল। সেইজন্যে, বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষক শ্রেণীকে বিপ্লবী 'ঘাঁটি' হিসাবে প্রস্তুত করে, দীর্ঘকাল লড়াই চালিয়ে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করতে করতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে, এবং পরিশেষে, সেগুলো দখল করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে।

সংগ্রামের এই কাঠামো চীন বিপ্লবের কাঠামো অনুসরণ করে, চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা অবলম্বন করে রচিত হয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে যেহেতু বিপ্লবের একমাত্র সঠিক পথ বলে ঘোষণা করা হয় সেইহেতু সংসদীয় নির্বাচন বয়কট করারও আহ্বান জানানো হয়। দেশে সক্রিয় অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হল : হয় তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, নয়তো সোভিয়েত শোধনবাদ, নয়তো দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগী, সেজন্য তারা সকলেই বিপ্লবের শত্রু

(*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮ শে জুলাই '৯৩)

চারু মজুমদার তখনই পার্টি গড়তে চাইলেন কেন? কারণ বিপ্লবী পার্টি গড়ে না তুললে শৃঙ্খলা হবে শিথিল এবং চরম ত্যাগস্বীকারের মনোবল আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে না। পার্টি ছাড়া বাধার প্রাচীর ভেদ করে জয়ের দিকে যেতে পারব না। (*লিবারেশন*, মার্চ ১৯৬৯)

রবীন্দ্র রায় মনে করেন, পার্টি তৈরির কাজ সারা হয়েছে চুপিসাড়ে। এম এল রাজনীতির এটাই মৌল চরিত্র। গোপনে তৈরি হল পার্টি ২২ এপ্রিল ১৯৬৯ লেনিনের জন্মদিনে এবং তার ঘোষণা ঐতিহাসিক মে দিবসের সমাবেশে সদ্যোমুক্ত কানু সান্যালের দ্বারা। সমাবেশে যিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন সেই অসিত সেনই জানতেন না এরকম ঘোষণা হবে, আর পার্টি তৈরির কথা তো নয়ই। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬)

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়েরও একই কথা। এম এল পার্টি তৈরি হয়েছে অন্ধকারে বসে। কানু সান্যাল পার্টি তৈরির কথা ঘোষণা করলেন বলেই আমরা মেনে নিয়েছি।

১ মে, ১৯৬৯। ঘোষিত হল তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্মবার্তা। তুমুল সংঘর্ষ, ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ও কাঁদানে গ্যাস : এই ছিল দৃশ্যপট। *আনন্দবাজার*-এর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন (২ মে '৬৯) : মনুমেন্ট ময়দানে নকশালপন্থীদের আয়োজিত বিরাট সমাবেশের কাছাকাছি দুইদলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। একদিকে যুক্তফ্রন্ট সমর্থক, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও অন্যদিকে নকশালপন্থী কর্মীদের মধ্যে ওই সংঘর্ষকালে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফাটে ও ইঁট পড়ে। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ ৫০ রাউণ্ডের বেশি কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। চৌরঙ্গী পাড়ার কয়েক জায়গাতে দু দলের সংঘর্ষ হয়।

চৌরঙ্গী-সুরেন ব্যানার্জি রোডের সঙ্গমস্থলে ঝামেলার সূত্রপাত। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের বক্তব্য : সাড়ে চারটা-পাঁচটা নাগাদ সুরেন ব্যানার্জি রোড ও চৌরঙ্গীর মোড় বরাবর দুটি মিছিল মুখোমুখি হলেই সংঘর্ষ বাধে। অন্যসূত্রে অভিযোগ : চৌরঙ্গীতে একটি মিছিলে পটকা পড়াতেই সংঘর্ষের সূত্রপাত।

তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম

নবগঠিত পার্টির নাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এই ঘোষণা করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা কানু সান্যাল। সভা আরম্ভ হবার কথা ছিল বিকাল পাঁচটায়, তার আগেই ময়দান ভরে যায়। কিন্তু পরে হাঙ্গামা বাঁধলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। পরে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি ছিলেন অসিত সেন। মঞ্চে ছিল মাও-এর প্রতিকৃতি। ছিল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন ও কয়েকজন নকশাল নেতার ছবি।

আনন্দবাজার-এর সাংবাদিক জানাচ্ছেন, বক্তব্য রাখার সময় কানু সান্যালের হাতে ছিল *রেড বুক*। কেন তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভারতে কোন সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না এতদিন। পার্টির একাংশ বারবার বিপ্লব করতে চাইলেও অপর অংশ তার বিরোধিতা করে। কিন্তু আজ সে অংশের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, মাও নির্দেশিত চীনের পথেই আজ বিপ্লব সম্ভব। চারু মজুমদার এই পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে অতুল্য ঘোষের ফেলে দেওয়া জুতো পায়ে প্রমোদবাবু রক্তাক্ত বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছেন। প্রকৃত বিপ্লবের দায় আজ তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির। নকশালবাড়ির লাল আগুন আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এই সংগ্রামকে আজ নতুন স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

এক উত্তপ্ত পরিবেশে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল, যার নাম

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)।

দলের মূল লক্ষ্য, অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র কৃষকবাহিনী গড়ে তোলা। যে বিপ্লবের জোয়ার সারা পৃথিবীতে এসেছে সেই বিপ্লব ভারতেও পরিচালনা করা।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, পার্টি তৈবির ঘটনাটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির আওতায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে নতুন করে বিভেদ সৃষ্টির কারণ ঘটায়। কো-অর্ডিনেশন কমিটির বহু সক্রিয় কর্মী ও সমর্থকদের মতে পার্টি তৈরির সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেওয়া হয়েছে। কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিটের মত যাচাই করা হয়নি। অসিত সেন, যিনি সমাবেশের সভাপতি, তাঁকেই এই বিষয়ে অন্ধকারে রাখা হয়। অসিত সেন মনে করেন, যেহেতু সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়েছে, তার মানে এ নয় যে, পার্টি গঠনের যাবতীয় পূর্বশর্ত বর্তমান। তিনি বলছেন, যে শ্রেণী বিপ্লবী পার্টির প্রধান অংশ, সেই শ্রমিক শ্রেণীই তো বর্তমান সশস্ত্র সংগ্রামের সম্পর্কবর্জিত। (*In the Wake of Naxalbari*, p. 172)

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা-ভারত সমন্বয় কমিটি লুপ্ত হয়ে একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হল। লক্ষণীয়, এই নতুন দলে অন্ধ্রপ্রদেশ বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটিসহ আরও কয়েকটি রাজ্যের সি পি এম-এর বামপন্থী বিদ্রোহী অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। (*নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা*, পৃ. ১৩)

মে দিবসের ঘটনার ভিন্নতর ব্যাখ্যার দিকে নজর দেওয়া যাক।

উগ্রপন্থীদের তাণ্ডব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কলকাতা ২রা মে [১৯৬৯]—রাজনৈতিক পরিবেশে নয়, সমাজবিরোধীদের প্রবল তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে উগ্রপন্থীরা গতকাল একটি নতুন পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

এদের হাত থেকে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার—এমন কি মহিলারাও নিস্তার পাননি। এই উদ্দেশ্যে উগ্রপন্থীরা যথেচ্ছভাবে লাঠি, হাত বোমা ব্যবহার করেছে।

পি. আর. সি থেকে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, হঠকারীদের আক্রমণে আহত ১৫৭ জনকে তারা প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দিয়েছেন। এদের মধ্যে ১৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ৪টা ৫৫মি. নাগাদ যখন একটি বিরাট মিছিল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি বোমা মিছিলের সামনে এসে পড়ে। মুহুর্মুহু বোমা পড়তে থাকে মিছিলের উপর। ঘটনার আকস্মিকতায় মিছিলের শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকদের বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে উগ্রপন্থীরা মিছিলকারীদের উপর নির্মম আক্রমণ চালাতে থাকে। তাদের সঙ্গে জনগণের প্রতিরোধ চলতে থাকে। এই সময় পুলিশের তরফ থেকে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয় বেশ কয়েক রাউণ্ড। (*গণশক্তি*, ২.৫.৬৯)

নতুন পার্টি জন্মের আগে থেকেই চরম তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে সি পি এম-এর সঙ্গে নকশালপন্থীদের। কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে। নিহত হয়েছেন সি পি এম-এর যুব কর্মী কৃষ্ণ রায়। ছুরিকাঘাতে আহত নদীয়া জেলার সি পি এম নেতা অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমোদ দাশগুপ্ত আহ্বান জানাচ্ছেন : সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করুন।

নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক অমৃতেন্দু মুখার্জি এম. এল. একে গত ৯ই এপ্রিল কৃষ্ণনগরে

ছুরিকাহত করা হয়। আমরা নিশ্চিত খবর পেয়েছি যে দুষ্কৃতিকারী এই ছুরি চালিয়েছে তার পিছনে ছিল কতিপয় নকশাল উগ্রপন্থী। তাদের হঠকারী রাজনৈতিক মত দিন দিন দেউলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় এই উগ্রপন্থীরা এখন সমাজবিরোধীর স্তরে নেমে গেছে এবং লিপ্ত হয়েছে সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যকলাপে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে তাদের প্রধান শত্রু হল যুক্তফ্রন্ট এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণের নিকট আমাদের আবেদন, এই তথাকথিত উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করুন এবং বাধা দিন এদের যাতে এরা আর কোন ক্ষতি করতে না পারে। (*গণশক্তি*, ১২.৪.৬৯)

নকশালপন্থী বা উগ্রপন্থী বলে যাদের চিহ্নিত করা হত একদা, এরপর থেকে তাদের সরাসরি সমাজবিরোধী বলেই আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। রাজনৈতিক পরিভাষা তাদের ক্ষেত্রে অবান্তর। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এতদিন শোধনবাদই ছিল নিন্দাত্মক পরিভাষা, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল নয়া-শোধনবাদ। নকশালপন্থী বা এম এল-দের চোখে সি পি এম হল নয়া শোধনবাদী দল—বিপ্লবের শত্রু। একদা যারা কমরেড—তাদের মধ্যে গড়ে উঠল চরম তিক্ততার সম্পর্ক। চলমান রাজনীতিতে এক নতুন আবর্ত সৃষ্টি হতে যাচ্ছে যার ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

আনন্দবাজার-এর রাজনৈতিক সংবাদদাতা (৮ মে '৬৯) জানাচ্ছেন : নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কানু সান্যাল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে বলেছেন: সংশোধনবাদীদের জেনে রাখা ভাল উদ্দেশ্য আমাদের গায়ে হাত দিলে আমরা ছেড়ে কথা কইব না। সমুচিত শিক্ষা দেব। আমরা গান্ধীবাদী নই, মার্কসবাদী। আমরা হিংসার জবাব হিংসা দিয়ে দেব। আক্রমণ হলে পাল্টা আক্রমণ করবই।

দলের মুখপত্রের চলতি সংখ্যায় তাঁর বক্তব্যের শিরোনামা: **হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেব। জ্যোতি বসুর জবাবে কানু সান্যাল।**

ভবিষ্যতের অশুভ ইঙ্গিত। যার পরিণাম লাল পতাকা বনাম লাল পতাকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এবং সবই বিপ্লবের নামে।

৭

কৃষি বিপ্লব নয়। প্রকৃতপক্ষে যা শুরু হয়েছে, তা হল কৃষক আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিস্তার। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে জেলা থেকে জেলায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দীর্ঘলালিত জমির স্বপ্ন কৃষকের। খাস ও বেনামী জমি উদ্ধারের আন্দোলন। উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন। নিজের চাষ করা জমির ফসল ঘরে তোলার আন্দোলন। লক্ষ লক্ষ কৃষক আন্দোলনে সামিল। এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকের সংগ্রামের সাথী। জোতদারের স্বার্থ রক্ষায় যাবে না পুলিশ। অবশ্যি আইন আদালত রয়েছে। জোতদার তার দ্বারস্থ হচ্ছে এবং জোতদারের পক্ষে ইঞ্জাংশনও জারি হচ্ছে। সত্যব্রত সেন বলছেন, জনসভায় হরেকৃষ্ণ কোঙার বলতেন : আমি মন্ত্রী। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা আমাকে মানতে হয়। তোমরা তো মন্ত্রী নও। তোমরা কেন নিষেধাজ্ঞা মানতে যাবে?

কৃষকদের সংগ্রামী মনোবল তাতে দশগুণ বেড়ে যায়। জোতদারের আক্রমণ রুখে দেবার মতো সংগঠন গড়ে ওঠে। জোতদারের বন্দুকের জবাবে কৃষক ধরে লাঠি। লাঠি, সড়কি, বল্লম হাতে কৃষক-মিছিল পশ্চিমবাংলায় এক নতুন অভিজ্ঞতা। ব্রিগেড ও মনুমেন্ট ময়দানের জনসভাগুলি ভরে যায় কৃষকের মিছিলে এবং অভিনব ঘটনা হচ্ছে কৃষক এসেছে হাতিয়ার নিয়ে। খটকা লাগে যদিও মধ্যবিত্ত চোখে, ক্রমশ তা-ও গা-সওয়া হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সলিল চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'গ্রামাঞ্চলের চেহারা বদলে যাচ্ছে। শহরে কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্তদের মধ্যে একই সময়ে ঘটছে।'

জোতদারের দাপট আর মুখ বুজে মেনে নিতে রাজি নয় কৃষক।

কৃষক আন্দোলনের বিস্তার যে কেবল গ্রামীণ জীবনের চেহারা বদলে দিয়েছে তা নয়, তার প্রভাব গোটা রাজ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রেও উপেক্ষণীয় নয়। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময়ই কংগ্রেসের গ্রামাঞ্চলের গণভিত শিথিল প্রমাণিত হয়। কংগ্রেস-সমর্থক জোতদার, ধনীচাষী ও গ্রামীণ মাতব্বরকুল বিমুখ হয় কংগ্রেসের প্রতি। তারই ফল বাংলা কংগ্রেসের উত্থান। এবারে আরও জোরালো ধাক্কা, যার ফলে কংগ্রেস নয়, বাংলা কংগ্রেসের ভিত-ও টলোমলো। জমি দখল ও ফসল কাটারই অনুষঙ্গ গ্রামাঞ্চলে যুক্তফ্রন্ট শিবিরভুক্ত পার্টিতে পার্টিতে সংঘাত—শরিকী বিরোধ বলে যা অভিহিত। ঝাণ্ডার রং লাল—কিন্তু পার্টির নাম আলাদা। কৃষক সভা এক ও অবিভক্ত। তবুও কৃষকদের মধ্যে সি পি এম ও সি পি আই দলীয় প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ এবং ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তপাত। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে তাই কৃষক আন্দোলন রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

গ্রামাঞ্চলে মানুষের নবজাগরণকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে তার অনুষঙ্গকে বড় করে দেখালে যা দাঁড়ায় তারই দৃষ্টান্ত শিপ্রা সরকারের মন্তব্যটি। তিনি লিখছেন : এসবের চেয়ে কিন্তু অনেক বড় হয়ে দাঁড়াল আবার জমি দখল, মেছোভেড়িদখল নিয়ে ফ্রন্টের ভিতরে শরিকদের 'গদাযুদ্ধ'। সুশৃঙ্খলভাবে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের জমি দেবার কিছু চেষ্টা বাস্তবিক হয়েছিল। আবার মাছ লুট ও সম্পত্তি নষ্ট করার মত সমাজবিরোধী কাজও হতে থাকে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা* ২১ জুলাই ১৯৯৩)

কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট-বর্জিত এ হেন বর্ণনা নানা কারণে অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্রের ভাষায়। অবাঞ্ছিত ঘটনা যে আদৌ ঘটেনি তা নয়, কিন্তু সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া নিছক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শহরের মধ্যবিত্ত মানুষকে ত্রস্ত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। গেল গেল রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল এক বিশেষ মতলব। যার নাম শ্রেণীস্বার্থ। ধনিক, বণিক, জমিদারকুলের বিপন্ন শ্রেণীস্বার্থ। কৃষক আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতিতে সেদিন পশ্চিমবাংলার সমগ্র জন-জীবন আলোড়িত। তাকে বাদ দিয়ে সেদিনের পশ্চিমবাংলার দৃশ্যপট অকল্পনীয়। এখানে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে দেওয়া হচ্ছে *গণশক্তি*-র পাতা থেকে।

৭ এপ্রিল '৬৯। সংবাদ শিরোনাম: 'নতুন পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যমে/গ্রামে গ্রামে কৃষকদের জমির লড়াই।'

সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের জমির লড়াই নতুন উদ্দীপনায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২৪ পরগণা, মালদহ, পুরুলিয়া, বর্ধমানের ভূমিহীন কৃষকেরা সংঘবদ্ধভাবে বেনামী ও খাস জমি দখল করে চলেছেন। ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রীর বর্গাদার উচ্ছেদ বিরোধী

ও বন্যাপীড়িত ও খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে খাজনা মকুবের নির্দেশাবলী এই আন্দোলনের গতি সঞ্চার করেছে।

২১ এপ্রিল '৬৯ হরেকৃষ্ণ কোঙার কালনার এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন, জমির লড়াই-এ যুগ-যুগান্তরে পাকা জমিচোরদের মুখোশ খুলেছে। কোঙার বলেছেন : কৃষকরা তাদের হারানো জমি উদ্ধার করার সংগ্রামে নেমেছেন। সরকারের খাস জমি দখল নিচ্ছেন, পতিত জমি, বেনামি জমি উদ্ধার করছেন—যুগযুগান্তের পাকাপোক্ত জমিচোরদের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন—কেননা এটাই নিয়ম। এটাই হওয়া উচিত। এতদিন ধরে যা হয়েছে ন্যায্য কারণেই এখন তার উল্টোটা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারও এটাই চান। কৃষকের এই জমি উদ্ধারের লড়াই-এ পুলিশ যাবে না। এই আন্দোলনকে যুক্তফ্রন্ট সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জমির লড়াই-এর পাশাপাশি পতিত জমি উদ্ধারের কাজও এগিয়ে চলেছে। ১৮ এপ্রিল, হাওড়ার জগাছা থানা অঞ্চলের ৫৬০ বিঘা পতিত জমি কৃষক সমিতি উদ্ধার করেছে এবং এই জমি স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকদের ২ বিঘা করে বিলি করা হচ্ছে।

কৃষক আন্দোলনের বর্শাফলক কিন্তু জমিচোরদের বিরুদ্ধে উঁচিয়ে। জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে বেনামি জমি খুঁজে বার করে তাতে ঝাণ্ডা পুঁতে দখল করাতে মেতে ওঠে হাজার হাজার কৃষক। একজন ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আর একজন দখল করা জমিতে চাষ দিচ্ছে। এই দৃশ্য প্রায় সর্বত্র। জোতদার ও তার ঠ্যাঙাড়ের বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য কৃষক মিছিলের সঙ্গে চলেছে কোথাও ছাত্রযুব, আবার কোথাও বা শ্রমিক। চলেছে তারা শ-এ শ-এ, হাজারে হাজারে। কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী, কৃষক-অকৃষক মৈত্রী আর কেতাবি বুলি নয়। না, দিন বদলাচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। অন্নদাতা কৃষক উপোসি থাকলে বাকীদের জীবনযাত্রাও যে সুখের হবে না এই উপলব্ধি ক্রমশ দানা বাঁধছে।

বেনামি জমি দখলের সংবাদ আসছে নানা জায়গা থেকে।

গণশক্তি-র (২১.৩.৬৯) নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন : শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর জোরে সোনারপুরে প্রায় ৫০০ বিঘা বেনাম জমি দখল।

সোনারপুর, ২১ শে মার্চ—গড়িয়া রেল স্টেশন থেকে যাদবপুর যেতে ডানদিকে তাকান, দেখবেন ধূ ধূ সবুজ ঘাসের মাঠ—মাঠে উড়ছে লাল পতাকা।

শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষের একটি মিছিল বেনাম জমি দখল কর—দখল রেখে চাষ কর—এই স্লোগান দিতে দিতে গত রবিবার এই বেনাম জমি (৫০০ বিঘা) দখল করে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন।

মাইলের পর মাইল এই জমির বে-আইনী মালিকানা রয়েছে মাত্র চারটি জোতদার পরিবারের হাতে।

... ...

সোনারপুরে একহাজার বিঘা বেনাম জমি দখল।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সোনারপুর, ২৭ শে মার্চ—সোনারপুর থানার প্রতাপনগর অঞ্চলের সামুখপোতার রাস্তায় শত শত কৃষক মিছিল করে চলেছে গত সোমবার। হাতে তাদের লালঝাণ্ডা ও ফেস্টুন। মুখে তাদের আওয়াজ 'মন্মথ নস্করের বেনাম জমি দখল কর', 'লাল ঝাণ্ডা কি জয়', 'কৃষক সমিতি

জিন্দাবাদ'। ঐদিন সকাল ১০টা নাগাদ প্রায় দুহাজার চাষী এক হাজার বিঘা জমি দখল করে এবং ৪০০ জন ভূমিহীন কৃষককে বিলি করে।

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে বেনামী ও খাস জমি দখল। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

কলকাতা, ১২ই এপ্রিল—মালদহ, বীরভূম, শিলিগুড়ি, হুগলী এবং মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, ভূমিহীন কৃষক এবং খেত মজুরেরা বেনাম জমি উদ্ধার ও দখল করে চলেছেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন কৃষক সমিতি এবং কৃষকের লড়াইয়ে স্বেচ্ছাবাহিনী হয়ে এগিয়ে এসেছেন ছাত্র এবং যুব ফেডারেশনের অসংখ্য কর্মী। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী এবং শিক্ষকেরা এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন।

... ...

আউসগ্রাম থানায় দুশত একর বেনামী জমি উদ্ধার

আউসগ্রাম (বর্ধমান), ২২ শে এপ্রিল—আউস গ্রাম থানার পুবার, জামতাড়া, গুসকরা, এড়াল অঞ্চলে বড় বড় জোতদারদের বেনামী জমি স্থানীয় কৃষকরা কৃষক সমিতি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সম্প্রতি উদ্ধার করেছেন এবং দুশতাধিক পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে সংঘবদ্ধভাবে চাষ আবাদ করেছেন।

... ...

কৃষক সমিতির উদ্যোগে যাদবপুর থানায় আড়াই হাজার বিঘা বেনাম জমি উদ্ধার
(*গণশক্তি*, ২০.৫.৬৯)

সমিতির নেতৃবৃন্দ এই জমি ১২০০ স্থানীয় ভাগচাষী, গরীব কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করার পরিকল্পনা করেছেন।

... ...

বেনাম জমি উদ্ধার।
বিগত এপ্রিল মাস পর্যন্ত।
২০০, ৭০৮, ৭৯ একর অতিরিক্ত জমি সরকারের হাতে এসেছে।

জলপাইগুড়ি	—	৪,১৮৫,৭৭
মালদহ	—	৩৪৬৮.৪২
পঃ দিনাজপুর	—	৩৭২৭.৭৯
বর্ধমান	—	১০,৯১২.৪৯
বাঁকুড়া	—	১১,০২৭.০৪
২৪ পরগণা	—	৫৬,০০৪.৩৪
মেদিনীপুর	—	৯,৬৭৮.০০
মুর্শিদাবাদ	—	৫,৩১৯.৯২
বীরভূম	—	৪,৫০৮.৫৯
হাওড়া	—	২,৭৮১.৭০
হুগলী	—	২,৮৮১.৭২
নদীয়া	—	৮,৪৮৮.০৪
কোচবিহার	—	৪,৬১৭.১২

দার্জিলিং	—	৮৭৪.১১
পুরুলিয়া	—	(?) ৭২,২৩৩.৭৪
সর্বমোট		২,০০,৭০৮.৭৯

(*গণশক্তি*, ২৪.৫.৬৯)

কাকদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে চার সহস্রাধিক জমি উদ্ধার

কাকদ্বীপ, ২৮ শে জুন—একমাস ধরে কাকদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে জমি উদ্ধারের লড়াই এগিয়ে চলেছে। জমি উদ্ধারের সংগ্রাম ভাঙবার জন্য স্থানীয় বনবিভাগের পাহারাদাররা বিভিন্ন অঞ্চলে রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে এবং জোতদাররা সমাজবিরোধীদের সহায়তায় গরীব কৃষকদের উপর হামলা সংগঠিত করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে। ক: প: মা:-র নেতৃত্বে কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাবাহিনী এই আক্রমণ প্রতিহত করে বেনামী জমি উদ্ধার করে চলেছে।

... ...

পশ্চিম দিনাজপুরের ৭টি থানায় জোতদারদের লুকিয়ে রাখা ১৬০০০ বিঘা খাস জমি উদ্ধার।

দুরন্ত শ্রেণী সংগ্রামে কৃষক সমিতির জয়যাত্রা অব্যাহত।

বালুরঘাট, ৪ঠা জুলাই ['৬৯]–পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিপ্রধান জেলা পঃ দিনাজপুরের দিকে দিকে চলেছে জমি উদ্ধারের পালা। জেলার বুভুক্ষু ক্ষেতমজুর, কৃষক আর মেহনতী মানুষ কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় গত ৫ মাসে মাত্র ৭টি থানায় ১৬০০০ বিঘা সরকার ন্যস্ত জমি, বেনাম জমি উদ্ধার করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিপুল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুগযুগ ধরে মার খাওয়া ভূমিহীন কৃষক। জোতদারের আঘাত এসেছে। আহত হয়েছে ৩ জন কৃষক। জোতদার আর কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে কৃষকের জঙ্গী স্বেচ্ছাবাহিনী শত শত লাঙল নিয়ে নেমে পড়েছে মাঠে। আউস আর আমলের সোনালী ফসল এবার তারা ঘরে তুলবেই। (*গণশক্তি*, ৪.৭.৬৯)

... ...

যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিরাজস্ব দপ্তরের সূত্রে জানা যায় :

বেনাম জমি উদ্ধার

১৯৬৭ অগাস্ট—১৯৬৯ মে

যুক্তফ্রন্ট সরকার মোট ২,১৫,৩৮৯,৪৫ একর জমি উদ্ধার করেছেন।

দার্জিলিং	—	৯০৩.৩৮
মালদহ	—	৪,২৮৮.১৮
পুরুলিয়া	—	(?) ৭৬,৩৮৯.৮২
পঃ. দিনাজপুর	—	৪,৫৭০.৩০
বর্ধমান	—	১২,১২৯.৭৫
বাঁকুড়া	—	১১,৯২১.২৩
২৪ পরগণা	—	৫৭,৬৪৮.০১

মেদিনীপুর	—	১০,১২৪.৩৭
মুর্শিদাবাদ	—	৫,৬০৭.৮৫
বীরভূম	—	৪,৭১৫.৮৬
হাওড়া	—	২,৭৮১.৭০
হুগলী	—	২,৮৮১.৭২
নদীয়া	—	৮,৬০৯.৪২
কোচবিহার	—	৮.৭৪৫.১২
জলপাইগুড়ি	—	৪,৩৭২.৭৪

(*গণশক্তি*, ৮.৮.৬৯)

মিছিল সহকারে জমি উদ্ধার, বাগনান,—৭ই আগস্ট, কয়েকদিন পূর্ব্বে বাগনান আঞ্চলিক কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ২২৫ বিঘা জমি উদ্ধার করা হয়। একটি সভা হয়। পরদিন ঐ জমি ৩৫০ জন কৃষকের মধ্যে বিলি করা হয়। (*গণশক্তি*, ৮.৮.৬৯)

গণশক্তি-র পাতায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জমি দখল অভিযান :

নবদ্বীপ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ঘাস ও বেনামি জমি উদ্ধার অভিযান।

স্বরূপগঞ্জ শাখা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে খাস ও বেনাম জমি উদ্ধারের অভিমানে নেমেছেন। তারা ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন তন্তুবায় শ্রমিক ইউনিয়ন, যুব ফেডারেশন, গণনাট্য সংঘ ও বিভিন্ন এলাকার নাগরিক সমিতির কর্মীদের নিয়ে ভূমিহীন কৃষক ও বাস্তুহীনদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

এই সমস্ত জমির অধিকাংশই নদীয়া জেলার মহেশগঞ্জের প্রাক্তন জমিদার ও সংসদ সদস্য ইলা পাল চৌধুরীর দেবর রঞ্জিৎ ও ভাসুর জ্যোতিষ পাল চৌধুরীদের স্বনামে বেনামে ছিল।

চাষের জমিকে ভেড়ির জমিতে পরিণত করার অপকৌশল ব্যর্থ করা হয় বসিরহাট অঞ্চলে। ২৬ মে '৬৯ স্থানীয় সংবাদসূত্রে জানা যায় খাসবান্দা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কৃষকেরা জোতদারদের লাঠিয়ালদের পাল্টা মার দিয়ে পনেরশ বিঘা জমি উদ্ধার করে। এর মধ্যে ছয়শত বিঘা সরকারী খাস জমি এবং বাকীটা ভেড়ি।

ভাঙ্গর থানার কৃষক সমিতি ২৬ মে প্রায় এক হাজার কৃষক জমায়েত করে নজিব ভেড়ি ও শেখের ভেড়ির মোট ২২০০ বিঘা জমি উদ্ধার করেন। স্থানীয় ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করা হয়। ঐ সমস্ত জমিতে বরাবরই ধান চাষ হচ্ছিল—যদিও ভেড়ি বলে রেকর্ড করা হয়। দুটি ভেরির মালিক প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী অর্ধেন্দু নস্কর ও তার পরিবার। (*গণশক্তি*, ৩১.১২.৬৯)

জমি দখলের পাশাপাশি শুরু হয়েছে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে।

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নীতি ঘোষিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি (মা.) ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এই সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব এমনকি মহিলারাও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া এবং জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন চলছে। (*গণশক্তি*, ৫.৬.৬৯)

সন্দেশখালি থানার বিভিন্নস্থানে উচ্ছেদ প্রতিরোধ সংগ্রাম : জোতদারের আক্রমণ প্রতিহত।

সন্দেশখালি, ২৭ শে আগস্ট—সন্দেশখালির বিভিন্নস্থানে উচ্ছেদ প্রতিরোধ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি চরভরাটির জমি উদ্ধার করতে গিয়ে কৃষক সমিতির লোকেরা জোতদারের দ্বারা আক্রান্ত হন। কঃ পঃ (মাঃ) এবং কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাবাহিনী এই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং বন্দুকসহ চারজন জোতদারকে থানায় প্রেরণ করে। (*গণশক্তি*, ২৭.৮.৬৯)

দিনহাটায় কৃষকের জমি থেকে ফসল কাটার চেষ্টা স্বেচ্ছাবাহিনীর প্রতিরোধ।

দিনহাটা, ১৫ই সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি দিনহাটার আদাবাড়ি অঞ্চলে জোতদারের লোকেরা কৃষকের জমি থেকে কাঁচা ফসল কেটে নেবার চেষ্টা করে। জোতদারের ত্রিশ চল্লিশজন লেঠেল আঠিয়ার হোসেন আলী মিঞাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে।

সাত-আটশ কৃষকের লাল ঝাণ্ডা হাতে স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে পরাস্ত হয়ে জোতদারের লোকেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। জোতদারের পক্ষে ফরোয়ার্ড ব্লকের কয়েকজনকেও দেখা যায়।

কৃষক সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। তবে বিনা রক্তপাতে নয়। জোতদারের সহস্র হামলার মোকাবিলা করতে হচ্ছে কৃষককে। রক্তের বিনিময়ে পেতে হচ্ছে জমির দখল। এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।

সোনারপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড— কৃষক নেতা আশুতোষ মণ্ডলের মৃতদেহ মাটির তলা থেকে উদ্ধার। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

সোনারপুর, ১৫ই জুন— সোনারপুর থানা কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মী আশুতোষ মণ্ডলকে শুক্রবার রাত্রে জোতদারদের লোকেরা খুন করেছে। গতকাল স্থানীয় কলকারখানা ধর্মঘট ও স্থানীয় হাটবাজার, দোকানপাট, যানবাহন বন্ধ থাকে। আজ বিকেলে শোক মিছিল। (*গণশক্তি*, ১৫.৬.৬৯)

বর্ধমান জেলার সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে চৈতন্যপুরের জোতদারদের নৃশংস আক্রমণ— দুইজন নিহত, কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্ধমান, ২৪ শে জুন— মঙ্গলকোট থানার চৈতন্যপুরে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে আজ বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি শহরে ও মেমরি-গুসকরা প্রভৃতি গঞ্জে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে। সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হাসপাতালে আজ বনমালী মারা গেছেন। আরো কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পাঁচকড়ি মাঝি ও বনমালী শহীদ হয়ে সারা জেলায় কৃষকদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছেন। আততায়ীদের মধ্যে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সারা জেলায় জোতদার বিরোধী সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলার জন্য প্রতিটি সভায় শপথ গ্রহণ করা হচ্ছে। (*গণশক্তি*, ২৪.৬.৬৯)

জোতদারের গুলিতে গতকাল সি. পি. আই (এম) কর্মী আসমত মোল্লা খুন—ক্যানিং লোকাল কমিটির সদস্য সুধাংশু চক্রবর্তী সহ ছয়জন গুরুতর আহত। (*গণশক্তি*, ২৭.৬.৬৯)

খড়িবেড়িয়াতে স্বেচ্ছাবাহিনীর মিছিলের উপর জোতদারের গুলি চালনা, জোতদার গ্রেপ্তার ও বন্দুক আটক।

বারাসত, ২৬ শে আগস্ট—২৫ শে আগস্ট সকালে খড়িবেড়িয়ার ভবনপুর ভেড়িতে চাষীদের সমর্থনে যখন স্বেচ্ছাবাহিনীর মিছিলটি বিশ্বাসের ভেড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন স্থানীয় একজন জোতদার এবং তার দলবল অতর্কিতে মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ এবং লাঠি, বল্লম নিয়ে আক্রমণ করে। (*গণশক্তি*, ২৭.৮.৬৯)

পশ্চিম দিনাজপুর

কৃষকদের উপর গুলি চালনা : দুটি বন্দুক সীজ।

বালুরঘাট, ১২ই অক্টোবর-বটুন অঞ্চলের ভাকলা গ্রামে বড় জোতদার ও তাদের সহযোগীরা গত সোমবার গরীব কৃষকদের উপর পাঁচ রাউণ্ড গুলি চালালে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কৃষক গোটা গ্রাম ঘিরে রাখে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পুলিশ ৬ জন জোতদারকে গ্রেপ্তার ও দুটি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করলে অবস্থা শান্ত হয়। ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে গত ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় হাটফেরত ৭জন কৃষককর্মীকে জোতদাররা আটক করে। মারধোর করার পর নানা ধরণের অভিযোগে। থানায় চালান দেওয়ার ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করার সময় কয়েকজন গিয়ে গ্রামে খবর দিলে আশেপাশের গ্রামে মাদল বেজে ওঠে। শত শত কৃষক, বটুন অঞ্চলের ভাকলা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। সেই সময় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য জোতদাররা, জনগণকে লক্ষ্য করে ৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে।

সম্প্রতি উক্ত অঞ্চলে গরীব, ভূমিহীন কৃষক ও ভাগচাষীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে প্রায় ২৪০ একর বেনাম জমি দখল করা হয়। এরপর থেকে জোতদাররা ক্রমাগত নানারকম প্ররোচনা সৃষ্টি করতে থাকে। (*গণশক্তি*, ১৩.১০.৬৯)

পুলিশের গুলিতে চারজন কৃষক নিহত

রায়গঞ্জ থেকে এক সংবাদে জানা গেল : গতকাল পুলিশের গুলিতে ৪জন কৃষক নিহত হয়েছেন। আরো অনেকে আহত। স্থানীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা পীযূষ দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের শান্ত করেন। (*গণশক্তি*, ২৯.১.৭০)

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার আইনের দৌলতে ৬০ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবার খাজনামুক্ত। তার ফলে সরকারের যে আড়াই লাখ টাকা রাজস্ব কম পড়বে তা তিন একরের বেশী জমির মালিকদের উপর বেশী কর ধার্য করে পূরণ করা হবে।

যে চাষ করেছে সেই ফসল তুলবে, যুক্তফ্রন্ট প্রতিনিধিদের সভায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের সার্কুলার সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের এক বিশেষ বৈঠকে আসন্ন মরশুমের ধানকাটা সম্পর্কীয় নির্দেশ সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, প্রভাস রায়, রাম চট্টোপাধ্যায়, শান্তিময় ঘোষ, অনন্ত মাঝি, নীহার মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পাঠক। সারকুলারে বলা হয়েছেঃ যে কৃষক যে মাঠে চাষ করেছে সে-ই ফসল তুলবে। সরকার এ ব্যাপারে কৃষককে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। দরকার হলে জোতদারের বন্দুক সীজ করা হবে। শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে।

কৃষক সংগ্রামের ঢেউ গ্রামবাংলার মেহনতী মানুষের অন্যান্য অংশকে অধিকার সচেতন করে তুলেছে।

রাজ্যের দশহাজার মৎসজীবীর মহাকরণ অভিযান।

কলকাতা, ২১ শে আগস্ট — রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে দশহাজার মৎস্যজীবী মিছিল নিয়ে এসে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার কাছে ১১ হাজার মৎস্যজীবীর স্বাক্ষর সমন্বিত ১৪ দফা দাবিপত্র পেশ করেছেন। (*গণশক্তি*, ২২.৮.৬৯ ও ৩০.১০.৬৯)

জোতদার গুণ্ডাদের হামলার বিরুদ্ধে ফসল তোলার সংগ্রামে যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকদের পাশে থাকবে।

কলকাতা ২৯ শে অক্টোবর — গত সোমবার চব্বিশ পরগণা জেলা খেতমজুর সমিতির নেতৃত্বে প্রায় ৮ হাজার খেতমজুর মহাকরণ অভিযান করেন। খেতমজুরের জন্য সারাবছর কাজ, বাঁচার মত ন্যূনতম মজুরী, গরীবের জন্যে উপযুক্ত রিলিফ প্রভৃতির দাবীতে খেত-মজুরদের এই অভিযান।

হরেকৃষ্ণ কোঙার, প্রভাস রায় এবং আবদুর রেজ্জা খাঁ ভাষণ দিয়ে দাবী সমর্থন করেছেন। কোঙার বলেছেন, আমনধান কাটা এবং ঘরে তোলার সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন।

রাজ্যব্যাপী কৃষক সংগ্রামের পটভূমিতে রাজ্য কৃষক সভার কাঁথি অধিবেশন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন রাজনীতির উত্তপ্ত বাতাবরণে এই সম্মেলন।

ত্রয়ী শোষণের শৃঙ্খলা ভাঙতে হবে। শুধু অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নয়, রাজনৈতিক সমাধানের পথ, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথেই কৃষকের মুক্তি: কাঁথি ঐতিহাসিক সমাবেশে নেতৃবৃন্দের ভাষণ।

৮ই জুন অনুষ্ঠিত বিংশতি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে— প্রমোদ দাশগুপ্ত উগ্রপন্থীদের কৃষি বিপ্লবের হাস্যকর তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে মন্তব্য করেন, 'এরা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের পঞ্চমবাহিনী।

হতাশা ও অবক্ষয় সঞ্জাত সামাজিক অবস্থায় উগ্রপন্থীদের বুলির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে না। এর সমাধান করতে হলে নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে ঐক্য, গড়ে তুলতে হবে সংগঠন। তিনি যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন, শক্তি বৃদ্ধির মোহে সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেবেন না। ৩২ দফা কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রবল গণ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণ করুন আপনারা জনগণের বন্ধু। প্রশ্ন এই নয়, কোন্ জমিতে কার পতাকা উড়বে। প্রশ্ন আজ সমস্ত দলের সামনে একটিই। তা হল — কৃষক শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন কিনা? শত্রুর অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিন। নতুবা শত্রুই যুক্তফ্রন্টের অন্তর্কলহকে ব্যবহার করবে। (*গণশক্তি*, ৯.৬.৬৯)

ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন:
সিমলাপালে কৃষক কর্মী সম্মেলনের ডাক

সিমলাপাল (বাঁকুড়া) ২৭ শে জানুয়ারি'৭০— মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার যুক্ত কৃষক কর্মীসম্মেলন। সারা সিমলাপাল লাল মিছিলে ভরে যায়। আনুমানিক পঁচিশ হাজার লোক। ৪০/৫০ মাইল দূর থেকেও অনেকে গাড়ীতে এবং পায়ে হেঁটে মিছিল সহকারে — দামামার তালে তালে তীরধনুক, বর্শাহাতে, লাঠি ও টাঙ্গি, কাঁধে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে স্লোগানে সোচ্চার হয়ে সমাবেশে যোগদান করেন। আদিবাসী কৃষক - রমণীদের দলে দলে যোগদান ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সম্মেলনে হরেকৃষ্ণ কোঙারের বক্তৃতা কৃষক আন্দোলনের পরিবর্তিত অবস্থায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন: আজ আবার আমাদের সম্মুখে এসেছে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এ সুযোগ একদিকে যেমন সম্ভাবনাময়, অন্যদিকে তেমনি বিপদসঙ্কুল। যদি আমরা আজ কোনো ভুল করি তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

জমিচোর জোতদারদের কাছ থেকে কৃষকরা তিনলক্ষ একর জমি উদ্ধার করেছেন এবং এই বছর সেই জমির ফসল ঘরে তুলেছেন। এটা কম কথা নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার কারো চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারেনি — এটা সত্য, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সাধারণ মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করেছে, তাদের মনুষ্যত্ববোধ ফিরিয়ে দিয়েছে। এটাই যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় অবদান।

সাধারণ মানুষ লাঠি হাতে বেরুলে গর্বে আমার বুক ফুলে যায়, কিন্তু শত্রুরা আতঙ্কিত হয়। বর্ষা ও তীরধনুক নিয়ে মানুষ বনের জানোয়ার মারে তাতে কেউ তো দুঃখিত হয় না। সমাজের জানোয়ার মারলেই বা দুঃখিত হবেন কেন? (*গণশক্তি*, ২৮.১.৭০)

ইংরাজি নতুন বছরের সূচনায় ১৯৭০ সাল কৃষক সংগ্রামের সুফল কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিণত। এবার ফসল কাটার পালা। কৃষক নিজের খামারে রক্তে বোনা ধান তুলছে। *গণশক্তি*-র (৫.১.৭০) সংবাদদাতা জানাচ্ছেন:

দিকে দিকে ফসল তোলার অভিযান শুরু
গ্রামে গ্রামে গরীব কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অভূতপূর্ব দৃশ্য: মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্বেচ্ছাবাহিনীর বলিষ্ঠ ভূমিকা

বর্ধমান, ২৪ পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় শুরু হয়েছে কৃষকের রক্তে বোনা ফসল জোতদারের হাত থেকে রক্ষা করার আপোসহীন সংগ্রাম। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্বেচ্ছাবাহিনী এগিয়ে এসেছে সংগ্রামের সাথী হিসাবে। এগিয়ে এসেছে কলকারখানার শ্রমিক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক ও মহিলারা।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া, পোলবা, ধনিয়াখালি, হরিপাল, বলাগড়, মগরা, তারকেশ্বর থানার গরীব কৃষক অধ্যুষিত অঞ্চলে — পুরনো বেআইনী দখলকার জোতদাররা গুন্ডা ও বন্দুকের

জোরে ফসল কেটে নেবার জন্য ভীতি প্রদর্শন ও ষড়যন্ত্র করছে। সেইসব এলাকায় ৫০০ ভলান্টিয়ার ২১ শে নভেম্বর থেকে ২৩ শে নভেম্বর ৩ দিন প্রচার অভিযান চালান।

তিনদিনে ৪টি স্বেচ্ছাবাহিনী প্রায় দুশো মাইল পথ শ্লোগান এবং গণসঙ্গীতে ৭টি থানার লক্ষাধিক মানুষের কাছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকল স্তরের মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক ঐক্যের সংগ্রামের কথা পৌঁছে দেয়।

চৈতন্যপুরের গরীব কৃষকেরা শহীদের রক্তঋণ শোধ করছে।

সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কৃষকদের ঘরে উঠলো

বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর — চৈতন্যপুরের শহীদ পাঁচকড়ি মাঝি এবং বনমালী কুমমেটের রক্তঋণ শোধ করার কাজে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক সমিতির কর্মীরা সংগঠিত কৃষকদের নিয়ে দলে দলে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমির সোনালী ফসল কৃষকদের ঘরে তুলেছেন। চৈতন্যপুরের কৃষকরা রক্ত ঝরিয়ে যে ধান বুনেছিলেন তাঁরা নির্বিবাদে তা নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছেন। (*গণশক্তি*, ১৩.১২.৬৯)

গোপীবল্লভপুরের কৃষক আন্দোলনের ছবি ভিন্নতর, যা পরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন পড়বে। অজস্র ঘটনার মধ্যে কয়েকটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করা হল।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে গোপীবল্লভপুরে মিছিল

গোপীবল্লভপুরের ১নং সাতমা ও ২নং সাসড়া অঞ্চলের জঙ্গলখণ্ডের আদিবাসী ও মাল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মাঃ কঃ পাঃ-র নেতৃত্বে খাস জমি দখল, বেনাম জমি উদ্ধার, উচ্ছেদ বিরোধী কৃষক সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য মিছিল সহকারে আবেদন জানায়। এই উপদ্রুত এলাকায় পরপর কয়েকটি মিছিল হওয়ায় এবং পার্টির স্বেচ্ছাসেবকেরা সাধারণ মানুষ, খেতমজুর ও গরীব কৃষকদের মধ্যে পার্টির বক্তব্য রাখায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। গোপীবল্লভপুর ২নং ব্লকে ইতিমধ্যেই মাঃ কঃ পাঃ সফলভাবেই হঠকারীদের বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে গোপীবল্লভপুরে বিশাল সমাবেশ ও মিছিল

গত বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুরে আট হাজার লোকের এক সমাবেশ হয় তার মধ্যে সহস্রাধিক মহিলা। লুঠতরাজ ও দাঙ্গা দমন করতে গিয়ে পুলিশ কিছু কিছু নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে। কোন কোন স্থানে গরীব কৃষকের বাড়ির মুরগী ছাগল ধরে নিয়ে গিয়েছে। এসব অভিযোগ শিথিলভাবে পেশ করা হয়। মিছিলে মিছিলে সারা গোপীবল্লভপুর কেঁপে ওঠে। আওয়াজ ওঠে দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, নির্দোষ ব্যক্তির মুক্তি চাই। সন্ত্রাসবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ নিপাত যাক। শত শত ক্ষেতমজুর ও গরীব অভিযোগ করেন যে, পুলিশ জোতদারদের গরীবের উপর হামলাবাজির কোন প্রতিকার করছে না।

... থানার বড় বড় জোতদারেরা শান্তিসেনা গঠন করে বিভিন্ন গ্রামে গরীব কৃষকের উপর হামলা করছে। গরীব কৃষকদের ডায়েরীও অনেক সময় থানায় নেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ে এই সমাবেশ ও মিছিলে।

মুখ্যত গোপীবল্লভপুরের ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সর্বদলীয় ইস্তাহার প্রচারিত হয় যাতে জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরও যুক্ত। ইস্তাহারখানির বয়ান :

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা মেদিনীপুর জেলার জনগণের নিকট এই মর্মে আবেদন করছি যে চলতি ধান কাটার মরশুমে তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণভাবে ধানকাটায় সহায়তা করেন। আমরা আশা করি যে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করলে ধানকাটার মরশুমে শান্তি বজায় থাকবে।

(ক) যাঁরা যে জমিতে এ বৎসর ধান্য উৎপাদন করেছেন তাঁরা ঐ জমির ফসল কাটবেন। এই নীতি সরকারী খাসজমি সম্পর্কে প্রযোজ্য! কোনস্থানে কে উৎপাদনকারী এ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিলে, স্থানীয় ক্যাম্পের ম্যাজিস্ট্রেট, বি. ডি. ও, জে. এল. আর. ও বা পুলিশকে জানাতে হবে। স্থানীয় কৃষক সংস্থা সমূহ এ ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

(খ) জমির বর্গাদার জমির উৎপন্ন ফসল কাটবেন এবং দেয় ভাগ জমির মালিককে দেবেন।

বর্গাচাষ কে করেছে এই নিয়ে মতবিরোধ ঘটলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। স্থানীয় কৃষক সংস্থাসমূহ এই ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

(গ) কোন অবস্থায়ই কেহ আইন নিজের হাতে নেবেন না। প্রচলিত আইন অনুসারে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) উপরিউক্ত নীতি অনুসরণকালে কোন জমি সম্পর্কে আদালতের কোন নির্দেশ থাকলে তাহা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

স্বাক্ষর :— বি. আর. চক্রবর্ত্তী, জেলাশাসক, মেদিনীপুর, আর. এন. ভট্টাচার্য্য, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, এস. সি. চট্টোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক, বনবিহারী দাস, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, কাঁথি, সৌমেন্দ্রনাথ বসু, এস. ইউ. সি, রাজারাম সিং, এস. এস. পি., অশ্বিনীকুমার মল্লিক, কংগ্রেস, সুকুমার সেনগুপ্ত, সি. পি. এম, কানাই ভৌমিক, এম. এল. এ, সি. পি. আই, অহীন্দ্রকুমার মিশ্র, এম. এল. এ, বাংলা কংগ্রেস, সুধাংশু কুমার মুখোপাধ্যায়, ফরোয়ার্ড ব্লক, বিবেক বসু, আর. এস. পি, দেবেন দাস, এম. এল. এ., সি. পি. আই।

তাং—১০.১০.৬৯ (*গণশক্তি*, ১৩.১.৭০)

৯

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন, গ্রামের গরীবদের মেজাজ এখন সপ্তমে চড়েছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার জমি দখলের মদত যোগান যাতে নতুন কোন নকশালবাড়ি না ঘটে। সি পি এম সহ সমস্ত বামপন্থীদল একাজে নেমে পড়েছে। গরীব ও ভূমিহীন কৃষককে উদ্বৃত্ত জমি দখল করার আহ্বান জানাচ্ছে তারা। শহরের বুকে লাঠি, রামদা, বল্লম হাতে সশস্ত্র কৃষকের মিছিল এক নিত্য ঘটনা।

এরকম একটা সশস্ত্র মিছিল দেখে চারু মজুমদার আনন্দে আত্মহারা। হতচকিত অনুগামীদের তিনি বললেন, হোক না কেন সি পি এম-এর মিছিল, একবার যখন কৃষক হাতিয়ার ধরেছে কেউ আর তাকে নিরস্ত্র করতে পারবে না। (In the Wake of Naxalbari, p. 178)

চারুবাবুর এই উদ্বেল মুহূর্ত কিন্তু নিতান্তই তাৎক্ষণিক—কার্যক্রমে তা প্রতিফলিত হয়নি। নিরস্ত্র অথবা সশস্ত্র কৃষক জমায়েতের পথ তাঁদের পথ নয়। তাঁদের পথ অ্যাকশনের পথ। এবং

সেই 'অ্যাকশনের' জন্য শয়ে শয়ে বা হাজারে হাজারে জমায়েতের দরকার হয় না। তিনজন বা সাতজনের গেরিলা স্কোয়াডই যথেষ্ট। তিনি মনে করেন, জমির জন্য নয়, এ লড়াই ক্ষমতা দখলের জন্য! 'এ কৃষকের সশস্ত্র লড়াই নয়, যা আকছার হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে এবং অনেক বড় আকারে হচ্ছে। এ লড়াইয়ের জাত আলাদা। এ বিপ্লবী লড়াই, এ ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং ক্ষমতার আস্বাদ পশ্চিমবাংলার কৃষকেরা ইতিমধ্যে পেয়েছে।' (*দেশব্রতী,* ১.১.৭০)

অতএব জোতদারের কাটা মুণ্ডু যদি মাটিতে গড়াগড়ি না গেল তো কিসের লড়াই, কিসের কৃষক আন্দোলন? তারই একটি প্রাঞ্জল বর্ণনা :

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ কেশপুরে পাকুড়িয়া গ্রামের অত্যাচারী জোতদার হরেকৃষ্ণ ঘোরোইকে সি. পি. আই (এম. এল) এর নেতৃত্বে একটি ছোট কৃষক গেরিলাদল অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তার বাসগৃহের ভিতরই খতম করেন।

... মাঝে এই ঘৃণিত শ্রেণীশত্রুটি এলাকা ছেড়ে ভয়ে শহরে পালিয়ে গেছিল। স্থানীয় মেলায় সর্দারী করবার জন্য বাড়ী ফিরে এসেছিল এই শকুনটি। এই খবর পেয়ে বীর কৃষক গেরিলারা শ্রেণী ঘৃণায় উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রীকাকুলামের অমর শহীদদের বদলা নেবার জন্য উপস্থিত হলেন তার বাড়ীতে। ঐ শ্রেণীশত্রুটি ছাড়াও আর তিনচারজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। এমন সময় ঐ লোকগুলি স্থান ত্যাগ করতেই ঐ শকুনটি তার ছেলেকে বন্দুক আনবার জন্য ঘরে পাঠায়।

সাথে সাথে বীর গেরিলারা ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শ্রেণীশত্রুর মাথাটিকে কয়েকটি টাঙ্গির আঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং মুণ্ডুটিকে লাথি মারতে মারতে বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দেন। (*দেশব্রতী,* ২৬.২.৭০)

ডেবরা সাংগঠনিক কমিটির (সি পি আই এম এল) ইস্তাহারে বলা হচ্ছে : 'নকশালবাড়ীর গ্রামে এমনি করে জোতদারের মুণ্ডু কেটে গড়াগড়ি যেতে দেখে বুক কেঁপে উঠেছিল জোতদার ও তার দালালদের এবং জোতদারের মুণ্ডু কাটার পথই বাঁচার পথ—একথা ভারতের বিপ্লবী জনতা বুঝতে পেরেছে।'

উক্ত ইস্তাহারে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে : আমাদের এ লড়াই সামান্য এক টুকরো জমির জন্য নয়, দুটো টাকার জন্য নয়। এ লড়াই গরীব মানুষের হাতে শাসন ক্ষমতা আনার লড়াই। (*দেশব্রতী,* ১১.১২.৬৯)

সরোজ দত্ত (শশাঙ্ক) বলছেন, কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে দুই লাইনের লড়াই প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠেছে।

'পত্রিকার দুনিয়ায়' স্তম্ভে তিনি লিখছেন :

'জমি দখল, না ক্ষমতা দখল? জোতদারদের ধান কেটে নিয়ে আসা, না তার গলা কেটে ফেলে দেওয়া? ভূমিহীন গরীব কৃষককে জমি পাইয়ে দেওয়া, ধান পাইয়ে দেওয়া, না তাকে তার এলাকার জোতদার, মহাজন খতম করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করা?

লক্ষ্য করুন আজ আর কেউ বা কোন পার্টি, তা সে যতই রক্ষণশীল ও দক্ষিণপন্থী হোক না কেন, জোতদার মহাজনের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে না—সবাই ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষকের দারুণ বন্ধু হয়ে উঠেছে, সবাই রাতারাতি এক আমূল ভূমি সংস্কারের ভীষণ পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। সবাই ভূমিহীন দরিদ্র কৃষককে জমি পাইয়ে দিতে চায়, এখানে ইণ্ডিকেট, সিণ্ডিকেটের বিরোধ নেই, এখানে পি. এস. পি, সি. পি. এম-এর পার্থক্য নেই, এখানে স্বতন্ত্র জনসংঘ পর্যন্ত

এসে জুটেছে। সবাই কৃষকের হয়ে জমি ধরার আন্দোলন সুরু করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি দ্রুতগতিতে রুদ্ররূপ ধারণ করছে কৃষকের ক্ষমতা দখলের লড়াই, কৃষকের বিপ্লবী লড়াই, সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম, গোপন গেরিলা কৌশলে গ্রামাঞ্চলে জোতদার-জমিদারদের খতম করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, আঞ্চলিকভাবে কৃষকরাজ স্থাপনের সংগ্রাম। (*দেশব্রতী*, ৮.১.৭০)

বিপ্লবী হিংসার পথ ধরেই কৃষক সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের প্রতি চারু মজুমদারের আহ্বান : 'চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন প্রতিবিপ্লবী হিংসার একমাত্র জবাব বিপ্লবী হিংসা। ওদের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা আক্রমণ করতে হবে, তবেই আমরা পারব ওদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে।'

'বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের তাই আরও দৃঢ়ভাবে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে চেয়ারম্যানের শিক্ষা, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়।" ওরা আমাদের হত্যা করতে চায়। হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু। ওদের নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে বিপ্লবী হিংসার পথ গ্রহণ করুন। বিশ্বাস রাখুন চেয়ারম্যানের শিক্ষায়, "যেখানেই দমন, সেখানেই প্রতিরোধ।" চেয়ারম্যানের এই শিক্ষার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে, সংগ্রামী কৃষকগণ, আপনাদের পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে, এবং যত দৃঢ়ভাবে আপনারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করবেন, তত প্রতিক্রিয়াশীলদের শিবিরে ধরবে ফাটল, ততই জনতার মধ্যে আসবে ব্যাপক সংগ্রামী উৎসাহ, ততই সংগ্রাম ঢেউ এর মত ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশব্যাপী।

'তাই আজকের দিনের প্রত্যেকটি বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীর কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র আহ্বান—প্রতিটি আক্রমণের বদলা নিন এবং ঢেউ এর মত সংগ্রাম ছড়িয়ে দিন। আত্মরক্ষার এই একমাত্র পথ, একমাত্র পরীক্ষিত পথ, অন্য কোন পথ নেই। এই পথেই কৃষকের বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠবে। কারণ কখনো ভুলবেন না, ভারতবর্ষে আজ আপনারাই একমাত্র বিপ্লবের শক্তি এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। জয় আমাদের হবে।' (*দেশব্রতী*, ১১.১২.৬৯)

অতএব বিপ্লবী হিংসার পথ বেয়ে নকশাল আন্দোলনের আবর্তন। শ্রেণীশত্রু খতমই কৃষি বিপ্লবের মূল কর্মসূচি, একমাত্র কাজ না হলেও। শ্রেণীশত্রু কারা? খতম করার জন্য কাদের বাছাই করা হল?

দেখা যাচ্ছে ৭ সেপ্টেম্বর '৬৯ দিনাজপুরের চোপড়া থানার অন্তর্গত কাজিগঞ্জে যে মানুষটি কৃষক গেরিলাদের হাতে খুন হল, সেই জোতদারটি ছিল কয়েক হাজার বিঘার মালিক। (*দেশব্রতী*, ১১.৯.৬৯)

আবার ৭ নভেম্বর '৬৯ ডেবরার রাধাকান্তপুর গ্রামে যে মানুষটিকে খতম করা হল সেই মদন ভুঞ্যা পেশায় স্থানীয় সর্বতোমুখী স্কুলের শিক্ষক। কেন্দ্রীয় গেরিলা দলের একটি ছোট ইউনিট সিদ্ধান্ত করে যে উক্ত মদন ভুঞ্যাকে খতম করতে হবে। কারণ এই দালাল পুলিশকে সাহায্য করে গেরিলাদের ধরিয়ে দেবার জন্য নানা চক্রান্ত করেছিল। ... পেশায় শিক্ষক হলে কি হবে, কিন্তু সে ছিল শ্রেণীশত্রু, কাজেই গেরিলারা সিদ্ধান্ত নেয় এই শ্রেণী শত্রুকে খতম করে দিতেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত হল, অতি নিঁখুত তদন্ত। রাত্রি ১টায় মদন ভুঞ্যা গেরিলাদের হাতে খতম হল। তার ভাই ক্ষুদিরাম ভুঞ্যা গেরিলাদের উপর আক্রমণ করতে আসে। তখন

সেও গেরিলাদের হাতে খতম হয়। কৃষক গেরিলারাও টাঙ্গীর দ্বারা শ্রেণীশত্রুদের খতম করে এবং মদন ভুঞ্যার মুণ্ডুটি কেটে রাধাকান্তপুর গ্রামে পুলিশি ক্যাম্প বসানর ষড়যন্ত্র যারা করেছিল তাদের দেখাবার জন্য রাস্তায় সাজিয়ে রেখে দেয়। (*দেশব্রতী*, ১৩.১১.৬৯)

আর একটি শ্রেণীশত্রু গোপীবল্লভপুরের সারিয়া গ্রামের মন্মথ সাউ। জনগণের শত্রু এই ঘৃণ্য দালালটি ব্যক্তিগত জীবনে ছিল স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্থানীয় পোস্ট মাস্টার। তার অপরাধের তালিকা অতিশয় দীর্ঘ।

(১) অধিকাংশ দিনই সে স্কুলে যেত না।

(২) স্কুলে না গিয়ে সে স্থানীয় জোতদার বড়বাবু এবং পুলিশ অফিসারদের সাথে বন্ধুত্ব ও জনগণের শত্রুতা করে বেড়াত।

(৩) পোস্টমাস্টারির কাজটিকেও সে গরীব জনগণকে শোষণের কাজে ব্যবহার করে। গরীব আদিবাসীদের কাছ থেকে চিঠি পিছু ৫ পয়সা এবং মনি অর্ডার পিছু একটি মুরগী জোর করে আদায় করত।

(৪) নিরীহ গ্রামবাসীদের সে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত, যে কেউ দিতে অস্বীকার করতো বা অসমর্থ হত তাদের নামে মিথ্যা রিপোর্ট করে সে পুলিশে ধরিয়ে দিত।

(৫) সি. পি. এম. এল. এর নেতৃস্থানীয় কমরেডদের ধরিয়ে দেবার জন্য সে স্থানীয় জোতদারদের কাছ থেকে ৮০০ টাকা নেয় এবং পুলিশকে নিয়ে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় কমরেডদের বাড়ী চিনিয়ে দিতে থাকে।

অতএব স্থানীয় গরীব জনগণের তার উপর ঘৃণা ও রাগ চরম হয়ে ওঠে। বারবার স্থানীয় গরীব জনগণ পার্টিকে জিজ্ঞাসা করত এই ঘৃণ্য শয়তানটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কেন? তখন এই শয়তান জীবটিকে খতম করে রাষ্ট্রযন্ত্রের আর একটি চোখকে কানা করে দেবার সিদ্ধান্ত স্থানীয় গেরিলাবাহিনী গ্রহণ করেন। বিগত ৭ই নভেম্বর বেলা ১১টায় বীরকৃষক গেরিলাদের ৭ জনের একটি দল ঘৃণ্য দালাল মন্মথ সাউকে চাঁদনাশোলের ইস্কুলে বর্শাবিদ্ধ করে প্রকাশ্য দিবালোকে তিনটে পুলিশ ক্যাম্পের মাঝে খতম করে।

আর একজন শ্রেণীশত্রু ডেবরার ১নং অঞ্চলের কুখ্যাত জোতদার ও পুলিশের দালাল ডাক্তার অমূল্য পাত্র। এই শ্রেণীশত্রুটি স্থানীয় খেতমজুরদের উপর দারুণ শোষণ চালাত। ১ মণ ধান ধার দিয়ে তার বদলে ২ মণ ধান আদায় করত। সামান্য ওষুধ দিয়ে স্থানীয় ক্ষেত মজুরদের সারা বছরের দাস করে রাখতো। আদিবাসী মেয়েদের প্রতি বর্বর ব্যবহার করতো। তার অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সালে স্থানীয় এলাকায় সমস্ত ক্ষেতমজুর ওর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। কেউ ওর বাড়িতে বা ওর ক্ষেতে কাজ করতে যেত না। তখন ঐ জোতদার পুঙ্গবটি কমরেড ভবদেব মণ্ডলের কাছে কাতর প্রার্থনা করে মীমাংসা চাইলে স্থানীয় স্কুলে ক্ষেতমজুর জমায়েতের কাছে করজোড় ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। ভবিষ্যতে ঐরূপ ব্যবহার করবে না প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তখনকার মত স্থানীয় ক্ষেতমজুর ও কৃষকেরা ওকে ক্ষমাপূর্বক ছেড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বাঘ কখনো বৈষ্ণব হয় না। ঐ ভণ্ড শয়তান যথারীতি বিশ্বাসঘাতকতা করল কৃষকদের প্রতি। কমরেড ভবদেব মণ্ডলকে আটক আইনে গ্রেপ্তার করার জন্য তদানীন্তন জেলা শাসকের কাছে জোতদারদের একটি ডেপুটেশান যায়। সেই ডেপুটেশানের নেতৃত্বে ছিল ওই জোতদার

পুঙ্গবটি। সে সরাসরি প্রচার করে ঘোষণা করে যে, ভবদেব মণ্ডল বা গুণধর মুর্মুকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে তাকে দুই বিঘা জমি পুরস্কার দেবে বিনা পয়সায়।

বাড়ীর চারপাশে সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টনী রচনা করে ঘরের মধ্যেই বসে থাকতো। একবারও কৃষক গেরিলাদের ভয়ে বাইরে আসতো না; এমন কি এই অর্থপিশাচ জীবনের ভয়ে বাইরে রোগী দেখতে আসতেও সাহস করত না। অথচ বাড়ীতে বসে হুঙ্কার দিয়ে বলত—'ভবদেব মণ্ডলের গায়ের ছাল তুলে নেবো—তবেই আমার নাম অমূল্য পাত্র। কই আমার মাথা নেওয়ার জন্য গেরিলাদের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না কেন?' তার দম্ভের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য ১লা জানুয়ারী, ১৯৭০, প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা ৯ ঘটিকায় পুলিশ বেষ্টিত তার বাড়ীর অভ্যন্তরে মাত্র ২ জন সশস্ত্র গেরিলা রোগী হিসাবে উপস্থিত হয়। এই ডাক্তার জোতদারটি ডাক্তারখানায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা দুজন দুটি গুলি করে প্রচণ্ড রকম আঘাত হানেন ঐ চশমখোর জোতদারটির উপর। পেটে ও জানুদেশে গুলি লাগায় গুরুতর জখম অবস্থায় শ্রেণীশত্রুটি মেদিনীপুর হাসপাতালে বর্তমানে মৃত্যুর দিন গুনছে। (*দেশব্রতী*, ৮.১.৭০)

কাহিনীগুলি অবশ্যই চিত্তাকর্ষক— আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূরণের বিবরণও বটে। গেরিলা স্কোয়াড যেন গরীব কৃষকের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার। দিনাজপুরের চোপড়া থানার ঘটনাটি তার অন্যতম উদাহরণ। কুখ্যাত জোতদারটিকে গেরিলা স্কোয়াড খতম করাতে গরীব গ্রামবাসী উল্লাসিত হয়। কারণ, তার অত্যাচার এমন পর্যায়ে উঠেছিল ছিল যে, গ্রামবাসীরা তাকে প্রয়োজন হলে, লোক লাগিয়ে খতম করার চিন্তা করছিল। (*দেশব্রতী*, ১৮.৯.৬৯)

না, তাদের আর লোক ভাড়া করতে হয়নি। গেরিলা স্কোয়াড এসে তাদের শত্রু নিপাত ঘটায়। শুধু তাই নয়, গেরিলারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষকদের সরাসরি উপকারও করে। কতকটা দরিদ্রনারায়ণ সেবার মতো। যেমন, 'বিগত ২৩ শে আগস্ট, '৬৯ নামখানা থানা অঞ্চলে বিপ্লবী কৃষকদের একটি গেরিলাবাহিনী ঐ অঞ্চলের একটি বদস্বভাবের জোতদার মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করে তাকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং তার ধনসম্পত্তি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে এবং কয়েক বস্তা ধান ও চাল দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। গেরিলাদের এই কাজে একদিকে যেমন গরীব ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা যায় তেমনি সংশোধনবাদী মহলে প্রচুর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।' (*দেশব্রতী*, ১৮.৯.৬৯)

১০

পশ্চিমবঙ্গে মাওপন্থী কৃষক গেরিলারা নরককুণ্ড সৃষ্টি করেছে—বোম্বাই-এর *কারেন্ট* পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম। ৬ নভেম্বর '৬৯ শিরোনাম সহ রিপোর্টটি *দেশব্রতী*-তে প্রকাশিত হয়। তার মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল :

'পশ্চিমবাংলায় কৃষক গেরিলাদের মাওপন্থী ধাঁচের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছে বলে সি. পি. আই (এম. এল) তার সাপ্তাহিক মুখপত্র *দেশব্রতী*-তে দাবী করেছে।

এই দাবী একেবারে অমূলক মনে হয় না। পার্টি বলছে সেপ্টেম্বর, অক্টোবরে গেরিলারা পাঁচটি শ্রেণীশত্রুকে খতম করেছে এবং অন্তত দুটি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেছে, এবং যারা খতম হয়েছে এবং যাদের বন্দুক ধরা হয়েছে তারা হয় জোতদার, না হয় মহাজন।

সি. পি. আই (এম. এল) এর এই অন্ধ উন্মাদদের সরকার রোমান্টিক বিপ্লবী বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এরা মেদিনীপুর জেলার দুটি এলাকায় গোপীবল্লভপুরে ও ডেবরায়, তাদের কার্যকলাপকে সংহত করেছে। মনে হয় এই এলাকাটিকে তারা বেছে নিয়েছে তিনটি কারণে :

প্রথমত, আদিবাসীদের সংখ্যাই এখানে বেশী।

দ্বিতীয়ত, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে এই এলাকাটির একটি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে যা জঙ্গলে ঢাকা।

তৃতীয়ত, এই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল।

১লা অক্টোবর মেদিনীপুরের ডেবরা থানার কানাইলাল কাকুতের বাড়িতে প্রায় ২০০০ কৃষকের এক জনতা হানা দেয়। জোতদারটি পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু তার বন্দুকটি ও প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি কৃষকেরা হস্তগত করে। তার মজুত চাল ও ধান তারা কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেয়।

এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সমস্ত ক্ষেত্রেই একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খাদ্যশস্য গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু গহনাপত্র ও নগদ টাকা ওরা নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। আর একটা কাজ তারা সব ক্ষেত্রেই করছে, জমিদারদের জমিজমা সংক্রান্ত এবং মহাজনী ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত দলিলপত্র তারা নষ্ট করে ফেলেছে।

মেদিনীপুরের ঘটনাবলীর পরে পুলিশ নির্দ্দিষ্ট অভিযোগে প্রায় ৪০০ লোককে গ্রেপ্তার করেছে।

যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন একজন কলকাতার তরুণী শ্রীমতী জয়শ্রী রাণা। ইনি নাকি একটি স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত থেকে দুমাইল দূরে বিহারের একটি গ্রামে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর স্বামী মিঃ সন্তোষ রাণা এবং দেবর মিঃ মিহির রাণা— যারা আক্রমণগুলি পরিচালনা করেছেন তাঁরা এখনও ফেরার। মিসেস রাণা তার স্বামীর সঙ্গে মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র, তিনি পড়াশুনা ছেড়ে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য গোপীবল্লভপুরে যান।

স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ীর ঘটনার অব্যবহিত পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু ছাত্র গোপীবল্লভপুরে যায় এবং আদিবাসী জনতার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। তখন থেকে তারা চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষকদের নিয়ে সশস্ত্র দল গড়ার এবং তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের মাওপন্থী কৌশলে শিক্ষিত করে তোলার।

বহুপুরুষ ধরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্ম দিয়ে আসছে। প্রতিবছর মাধ্যমিক স্কুল থেকে পাশ করে বেরুনো ছাত্রছাত্রীদের যারা একেবারে সেরা, তারা আরও পড়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে যায়। ১৯৬৭ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কমিউনিস্টরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে বলত ''বুর্জোয়া শিক্ষার দুর্গ।'' আজ এই দুর্গ দখল করা হয়েছে এবং এখন এই প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিস্ট কার্যকলাপের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। মেধাবী ছাত্ররা সেখানে নকশালপন্থী ছাত্র সংগঠনের মর্মকেন্দ্র।

সি পি আই (এম এল)-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র গর্বভরে বলেছে যে, গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিয়েই মূলত গেরিলা ইউনিটগুলি গঠিত এবং তারা মধ্য কৃষকদের সহযোগিতায় শ্রেণীশত্রুকে খতম করছে, যা ক্ষমতা দখলের জন্য গেরিলাযুদ্ধের প্রথম স্তর। তার আগে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা মাও সে তুং চিন্তাধারা ও তার জনযুদ্ধের দর্শন প্রচার করে কৃষকদের মনকে উদ্বুদ্ধ করে নেয়।

পিকিং বেতারে ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতবর্ষে কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়াও পিকিং বেতারে মাঝে মাঝে পশ্চিমবঙ্গে, অন্ধ্রে ও বিহারে সি পি আই. (এম এল)-এর কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রচার করা হয়ে থাকে।

পিকিং বেতার-এ বারেবারে প্রচারিত হয় যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র সি পি আই (এম এল) কেই ভারতের সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি বলে মনে করে। (*কারেন্ট,* ৬.১১.৬৯)

১১

ডেবরা গোপীবল্লভপুর কৃষকদের সামনে বিপ্লবী কৃষকদের পরিকল্পনাকে কর্মসূচির আকারে রাখা হয়: (১) অত্যাচারী জমিদার, জোতদারদের খতম করা হবে এবং তাদের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। (২) জোতদারদের জমির ফসল, ধান বাজেয়াপ্ত করা হবে। (৩) শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া হবে। (৪) শ্রেণীশত্রুর রক্ষাকারী ঘৃণ্য পুলিশদলকে খতম করা হবে। (৫) জনযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য গেরিলাবাহিনী ও গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করা হবে।

এই শ্লোগানগুলির মধ্যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবটিই দেখা যাচ্ছে কৃষক-জনতার মনের মতো। খতম বা খুন করার চেয়ে ফসল ও তৈজসপত্র এমনকি জোতদারের বাড়ির রান্না-করা ভাত তরকারি সবই বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারেই একজন কৃষক বেশি উৎসাহী। অতএব মেদিনীপুর জেলার বাইরেও এধরণের ঘটনা ঘটতে থাকে এবং দলে দলে গরীব কৃষক জোতদারদের বাড়ির উপর হামলা চালায়। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) গোসাবা (২৫ শে সেপ্টেম্বর '৬৯) : পুঁইজাল, আমতলি, কুমারমারী, মোল্লাখালি প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষক জনতা সংগঠিত হতে থাকেন। তাঁরা সংখ্যায় ৫ থেকে ৭ হাজার হয়ে জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করতে যান। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের স্থানীয় শরিকদল আর এস পি ও এস ইউ সির নেতারা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত কৃষক জনতাকে মিছিলের মধ্যেই আটকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে কৃষক জনতা জোতদারের বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েন, সামনে যা পান ভাঙেন, গোলা থেকে ধান নেন, বাক্স প্যাটরা ভেঙে সোনাদানা, টাকাকড়ি, ঘড়ি, রেডিও নিয়ে নেন, অভুক্ত জনতা রান্নাভাত খেয়ে নেন, জামা কাপড়, শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে নেন। তারা পরপর তিনটে বাড়িতে এই কাজ করেন।

(২) ডেবরা (২৭ শে সেপ্টেম্বর '৬৯): শালডহরী গ্রামের এক কুখ্যাত জোতদারের বাড়ি কৃষক গেরিলা ও কৃষক জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। একই দিনে গোপীবল্লভপুর সংলগ্ন বিহারের

সিংভূম জেলার সুরমুহী গ্রামে এক অত্যাচারী জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করে কৃষক জনতা। এই দুই ক্ষেত্রে জোতদাররা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারলেও তাদের যাবতীয় ধনসম্পত্তি কৃষক জনতা বাজেয়াপ্ত করেছে।

(৩) সুন্দরবন অঞ্চলের দুজন শ্রেণীশত্রুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (*দেশব্রতী*, ৯ই অক্টোবর '৬৯) ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

গত ২৬ শে ভাদ্র সন্দেশখালি থানা অঞ্চলের একজন অত্যাচারী কুখ্যাত শোষক তারক সর্দার তার বর্গাদার কান্ত সর্দারকে হত্যা করে ও তার স্ত্রীকে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কৃষকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জনতার এই ক্রোধকে প্রশমিত করে জোতদারকে রক্ষার জন্য সি পি আই (এম) হাঠখোলায় এক 'তীব্র প্রতিবাদ'' সভা আহ্বান করে। সি. পি. আই (এম) এর এম. এল. এ ও জিলা নেতারা বক্তৃতা করে তাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করতে বলে। কিন্তু সি. পি. আই. (এম এল) এর কৃষককর্মীরা ''প্রতিবাদ নয় প্রতিশোধ'' এবং শ্রেণীশত্রুকে উৎখাত করে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে সশস্ত্র কৃষক জনতাকে নিয়ে তারক সর্দারের বাড়ী চড়াও করে। কিন্তু ঐ সভার কথা আগে জানতে পেরেই ঐ কুখ্যাত ব্যক্তিটি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়, ফলে সশস্ত্র কৃষক জনতা তার বাড়ী আক্রমণ করলেও তাকে ধরতে পারে না। তবে সংগঠিত সশস্ত্র কৃষকগণ তার বাড়ীঘর ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। তার হাল, ৫টি গরু ও ২টি মহিষ, পুকুরের মাছ, এমন কি বাড়ির দরজা জানলা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনায় একদিকে যেমন জোতদার মহাজন ও শ্রেণীশত্রুরা আতঙ্কিত হয়েছে—তেমনি উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। এই জোতদার পরিবারটি গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।

দ্বিতীয় বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাটি ঘটে গোসাবা থানার একটি গ্রামে। এই গ্রামের গেরিলা ইউনিটটি এই গ্রামেরই একজন শয়তান জোতদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে ও তাকে উৎখাত করার সঙ্কল্প নিয়ে তার বাড়ির উপর চড়াও হয়। এই গেরিলা ইউনিটের পেছনে দেখতে দেখতে প্রচুর গরীব ও ভূমিহীন কৃষকও জমায়েত হয়।

১২

১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে চলে এল 'শ্রেণীশত্রু' খতমের রাজনীতি। চারু মজুমদারের মতে, 'খতম' করাটাই প্রকৃত বৈপ্লবিক কাজও; সে কাজের জন্য 'কৃষক জনতা'র সমাবেশের চেয়ে 'গেরিলা স্কোয়াডে'-এর উপযোগিতাই বেশি।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০। চারু মজুমদার-এর 'A Few Words about Guerrilla Actions' প্রবন্ধটি *লিবারেশন* পত্রিকায় ছাপা হল। (রবীন্দ্র রায়ের মতে প্রবন্ধটি 'মার্ডার ম্যানুয়াল' নামে কুখ্যাত) তাতে বলা হচ্ছে, প্রথমে প্রচার, তারপর শ্রেণীশত্রুকে সবচেয়ে ঘৃণা করে যারা সেসব গরীব কৃষক নিয়ে 'গেরিলা স্কোয়াড' গড়তে হবে। তাদের কানে চুপি চুপি বলা : অমুককে খতম করলে কেমন হয়। খতম করার আগে লুকোবার জায়গা যোগাড় করা চাই। তারপর

গোপনে হত্যা। হত্যাকাণ্ডের খবর জানাজানি হবার সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়া এবং সব ঘটনা থিতিয়ে গেলে পর আত্মপ্রকাশ। তাহলে গরীব মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার হবে। বড়লোকের মনে আতঙ্ক জাগবে। চাল আর তুষ আলাদা হয়ে যাবে।

'শ্রেণীশত্রুর রক্তে যে হাত লাল করেনি তাকে কমিউনিস্ট বলা চলে না।'—এই ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে গেল সি পি এম-এল র‍্যাঙ্কের মধ্যে। রবীন্দ্র রায়ের মতে, উপর্যুক্ত দলিলটি 'খতম অভিযানের' ভিত্তি যার ফলে সি পি এম-এল পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩)

সি পি এম-এল 'গেরিলা স্কোয়াড'-এর হাতে খতম বা গুরুতর জখম 'শ্রেণীশত্রুদের' এক অসম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হচ্ছে *দেশব্রতী*-র পাতা থেকে।

(১) ২.৯.৬৯ : গোপীবল্লভপুর থানার ধরমপুর গ্রামের একজন সুদখোর মহাজন খতম।

(২) ২.৯.৬৯ : দিনাজপুরের চোপড়া থানার অন্তর্গত কাজিগঞ্জের একজন জোতদার খতম।

(৩) ২৬.৯.৬৯ : খতম গোপীবল্লভপুরের একজন জোতদার।

(৪) ২৭.৯.৬৯ : পুরুলিয়া জেলার মেইটালা গ্রামের একজন কুখ্যাত জমিদার খতম।

(৫) ৩০.৯.৬৯ : গোপীবল্লভপুর থানার ছয় হাজারী অঞ্চলের কাঁঠালিয়া গ্রামের সুদখোর মহাজন দাশরথি ঘরুই খতম।

(৬) ১৩.১০.৬৯ : ডেবরা থানার ৯নং অঞ্চলের জোতদার জীবনদাস খতম।

(৭) ১৮.১০.৬৯ : ডেবরা থানার ১০নং অঞ্চলের ভুঁইএগ্রা গ্রামের জোতদার দ্বিজ রায় খতম।

(৮) ১৮.১০.৬৯ : বহড়াগড়ার কুখ্যাত জোতদার বৈষ্ণব শেঠ ও বহড়াগড়া থানার বর্ষাল গ্রামে জোতদারের দালাল বঙ্কিম করণ খতম।

(৯) ফরাক্কা থানার কেন্দুয়া গ্রামের জোতদার অজিত চৌধুরী ৭ অক্টোবর ঘায়েল। এই কুখ্যাত জোতদারটি কিছুদিন আগে থেকেই সংশোধনবাদী সি. পি. আই ও যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হয়ে পড়ে।

(১০) ২৩.১০.৬৯ : ডেবরা থানার ৪নং ইউনিয়নের জোতদার ও পুলিশের দালাল সতীশ পইড্যা খতম।

(১১) বলাগড় থানার (হুগলি) জোতদার বাসুদেব ঘোষ ঘায়েল। (ঘটনাটির তারিখ দেওয়া নেই)।

(১২) ২২.১১.৬৯ : বহড়াগড়ায় বড়শাল গ্রামের জোতদার হারাধন ঘোষ খতম।

(১৩) ৮.১২.৬৯ : কুমারগ্রাম থানায় ভলকা গ্রামের কুখ্যাত জোতদার ও মহাজন সুরেন সরকার খতম।

এরকম প্রায় তিরিশটি ঘটনার সূত্রে খতম অভিযান ও গেরিলা অ্যাকশনের বর্ণনা যাবতীয় অনুপুঙ্খসহ ছাপা হয়েছে *দেশব্রতী*-র পাতায়। আরও লক্ষণীয় যে 'কুখ্যাত' 'শ্রেণীশত্রু'-র তালিকায় প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার ও গ্রামের পোস্টমাস্টার-ও স্থান পেয়েছে। যেমন, গোপীবল্লভপুরের সারিয়া গ্রামের মন্মথ সাউ, যাকে খতম করা হয় ৯ নভেম্বর '৬৯, গ্রামের একজন পোস্টমাস্টার। অথবা ডেবরার ৩নং অঞ্চলের রাধাকান্তপুর গ্রামের মদন ভুএ্যা স্থানীয়

ঘাড়োতলা সর্বতোমুখী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিল বটে। কিন্তু যেহেতু সে ছিল শ্রেণীশত্রু, কাজেই গেরিলারা সিদ্ধান্ত নেয় : এই শ্রেণীশত্রুকে খতম করতেই হবে। আর খতম করার অভিযান সর্বদা তিন থেকে সাত জনের গেরিলা স্কোয়াডের দ্বারাই সংঘটিত।

পরবর্তীপর্যায়ে *দেশব্রতী*-র (১৬.৪.৭০) সংবাদ শিরোনামে রোমহর্ষক ভাষায় ঘোষিত : জেলায় জেলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের আগুন /উত্তরবঙ্গে; মেদিনীপুরে, চব্বিশ পরগণায় জোতদার, দালাল মিলিটারী খতম।

এবং সংবাদ পরিবেশনের মুনশিয়ানাতেই রয়েছে বিপ্লব-শিহরণ।

এ প্রসঙ্গে সত্যব্রত সেন-এর মন্তব্য : কৃষকরা যত না এগোচ্ছে, তার চেয়ে প্রবল রোমান্টিকতার বিস্তার। তার ওপর চীন থেকেও প্রচার করা হল যে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

দেশব্রতী ও *লিবারেশন* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রভৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্র রায়ের ধারণা (এমন কি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও কুণ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন): 'সি পি এম এল-এর রিপোর্টই হচ্ছে উচ্ছ্বাস আর আতিশয্যে ভরা। এটাই তাদের বিশিষ্ট ধরণ।'

লক্ষণীয় যে ভারতবর্ষে বিরাট কিছু ঘটছে এবং তা ঘটছে সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বে -এ ধারণা সৃষ্টির পিছনে চীনা পার্টির অবদান কম নয়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) ২৫.৯.৬৯ : পিকিং থেকে প্রচারিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) জনতার উপর নির্ভর করে অত্যাচারী জমিদারদের উপর আঘাত হানছেন, সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তুলছেন এবং শত্রুর 'ঘেরাও ও দমন' অভিযান চূর্ণ করছেন।

... বহু পার্টি সভ্য ও অন্যান্য বিপ্লবীরা গ্রামাঞ্চলের গভীর অভ্যন্তরে চলে গিয়েছেন; 'রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে বন্দুকের নল থেকে' চেয়ারম্যান মাও নির্দেশিত এই সত্যকে তাঁরা উৎসাহভরে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেছেন; গেরিলা ইউনিট তৈরি করার জন্য এবং কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী তৈরি করার জন্য কৃষকদের জমায়েত করছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে কৃষকরা দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের ও অত্যাচারী জমিদারদের শাস্তি দেওয়ার জন্য গণআদালত স্থাপন করেছেন। (*দেশব্রতী*, ৯.১০.৬৯)

(২) *পিকিং রিভিউ* (২.১.৭০) পত্রিকায় বলা হয়েছে : সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বে চারু মজুমদার নিজে শ্রীকাকুলামে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বেলে দেন। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সেখানে পৌঁছে তিনি 'অবিলম্বে গেরিলা স্কোয়াড তৈরী করে সংগ্রাম শুরু করার' নির্দেশ দেন। (*দেশব্রতী*, ৯.১.৭০)

(৩) ২৬.২.৭০ : পিকিং বেতারে প্রচারিত হয় : 'ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিপ্লবী কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম সম্প্রতি আরও অধিক বিকাশলাভ করেছে। নকশালবাড়ির সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গত তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কৃষক বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম উত্তরের দার্জিলিং জেলা থেকে নিকটবর্তী জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হুগলী ও পুরুলিয়া জেলায় এবং রাজ্যের পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলের অনেক জেলায় দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কৃষক সশস্ত্র শক্তি বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর জেলার প্রায় ৫০০ গ্রামকে তাঁদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত

করেছেন। সেখানে তাঁরা ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে সমাবেশ করে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম চালাচ্ছেন। একে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দ্বিতীয় নকশালবাড়ী বলে ভারতীয় বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো সভয়ে বর্ণনা করেছে।...

... পুলিশবাহিনী ও প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী মোতায়েনরত— ধরমপুর মহলবনী সড়কের উভয় পার্শ্বস্থ এলাকায় কৃষক গেরিলারা ১৯৬৯ সালের ২৭ শে নভেম্বর জমির থেকে ফসল তুলে নিয়েছেন। সড়কটি হাজার হাজার দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবী কৃষকের উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল, সহস্র সহস্র লালপতাকা আকাশে উড়ছিল পতপত করে। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল জনতার কণ্ঠ থেকে বিপ্লবী ধ্বনিতে। প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ ও সৈনিকরা এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মর্যাদাকে লুণ্ঠিত করে কতিপয় জমিদার সভয়ে কৃষকদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। মেদিনীপুর জেলায় কৃষক সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশে জমিদার ও তাদের পা-চাটা কুকুররা অতিশয় শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। খবরে প্রকাশ, দমন নির্যাতন চালানোর অপপ্রয়াসে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ মেদিনীপুর জেলার উপরোক্ত এলাকায় অতিরিক্ত দুই থেকে তিনটি সশস্ত্র পুলিশ কোম্পানী পাঠিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কৃষক সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিশিখা নির্বাপিত করা মোটেই সম্ভব নয়। তাঁরা ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের উপর আরও প্রচণ্ড আঘাত হানবেন। (*দেশব্রতী*, ৫.৩.৭০)

১৩

গ্রামে যখন শ্রেণীশত্রু খতমের হিড়িক, ছাত্র-যুবরাও তখন তার শরিক। খতমের নির্দেশ দেন স্বয়ং চারু মজুমদার; তার যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা দেন তাঁর অনুগামীদের কাছে বিভিন্ন ঘরোয়া সভায়। তারই একটার বর্ণনা দিচ্ছেন নইপল। তিনি লিখছেন, '.... দেবু বলল, কলকাতার যে সভায় প্রথম চারু মজুমদার ব্যক্তিহত্যার নীতি প্রচার করলেন, আমি সেখানে উপস্থিত। উত্তর কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি কামরায় আমরা হাজির। ঘরের সামনে একফালি বারান্দা। গোটা বারান্দা জুড়ে চটি জুতো। সবাই জুতো খুলে ছোট্ট ঘরখানায় গাদাগাদি করে বসেছে। পড়ন্ত বিকেল। চারু মজুমদারের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, আর তাঁরও তরুণদের প্রতি অসীম আস্থা।

ছোটখাট মানুষটির চোখে পুরু লেন্সের চশমা। গায়ে বুশ শার্ট, পরনে ট্রাউজার্স্। তাঁর বক্তব্য ও বাচনভঙ্গি অত্যন্ত সহজ সরল। দেবুর মনে হয়, তাঁর বলার ভঙ্গির মতোই তাঁর চলাফেরা বা নড়াচড়া। অত্যন্ত ঋজু। তাঁর ক্ষিপ্র চালচলন থেকে মনে হয় শীর্ণ শরীরে লুকিয়ে আছে এক বিশেষ শক্তি। হ্যাঁ, তিনি অপরকে উদ্দীপিত করার ক্ষমতা রাখেন।

চারু মজুমদার শুরু করলেন বলা। গোড়াতেই জানালেন পশ্চিমবাংলায় ও অন্যত্র গেরিলাদল কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। আমি জানি, আপনাদের কাজকর্ম ভাল হচ্ছে। তারা আমাদের ভয় পাচ্ছে। এবার তারা আক্রমণ করবে— ধরে নিতে পারেন। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে অত্যাচারী

ব্যক্তিকে খুন করলে লোকজন জমায়েত করা সহজতর হয়। কারণ লোকে দেখতে পায় যে অত্যাচারীকে ধ্বংস করা যায়। তাই আমি এই চিঠিখানি সবেমাত্র পাঠিয়েছি। তিনি হাতে লেখা চিঠিখানি পড়ে শোনালেন। চিঠিখানি ব্যক্তিহত্যার আহ্বান। কারও কোনও প্রশ্ন আছে কিনা তিনি জানতে চাইলেন।

আমি মর্মাহত, কারণ আমার জন্মগত সংস্কার এর প্রতিবন্ধক। নিজেকে বোঝালাম, এটা তো ঠিক খুন নয়, এটাতো অত্যাচারীর মৃত্যুদণ্ড! মনে আবার খটকা, মার্কসবাদের যাবতীয় গুরুই তো সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন। এটা তো সন্ত্রাসবাদের মতো শোনাচ্ছে।

সভায় নানারকমের প্রশ্ন উঠল। শহরে আমাদের কাজ কী হবে? একজন জমিদারকে মারলে তো তার জায়গায় আর একজন অত্যাচারী শোষক গজাবে—তার কী হবে?

সি. এম. (চারু মজুমদার) ধীরে ধীরে প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাদের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। এবং আমরা সবাই তাঁর কথায় নিঃসংশয়ে একমত হলাম। (*India/A Million Mutinees Now*, pp. 337, 341)

শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত ও তার বিনাশ বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ—এই তত্ত্ব অনুগামীদের কাছে চারু মজুমদারের মৌলিক অবদান বলে স্বীকৃত। চীন বিপ্লবে কি তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে? এ হেন নজির, সমগ্র মাও-রচনাবলী আঁতিপাঁতি করেও খুঁজে পাননি প্রবীণ ট্রাম-শ্রমিক নেতা গোপাল আচার্য। একদিন তিনি মাও-রচনাবলির সব কটা খণ্ড ছেলের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন—দেখাও তো কোথায় মাও-সে-তুং বলেছেন ব্যক্তিহত্যার কথা!

এইতো গেল ব্যক্তিহত্যা প্রসঙ্গ। এবার শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্মতার তত্ত্ব। উৎপল দত্তের মতে, অসম্ভব যান্ত্রিক ও শৌখিন চিন্তাধারার ফসল এটি। জপেনদা-র জবানীতে অত্যন্ত তীব্র ভাষায়, 'পাতি বুর্জোয়ার স্বপ্নালু চোখে শ্রমিক-কৃষক' দেখার শৌখিনতাকে তিনি আক্রমণ করেন :

'... তোরা পাতি বুর্জোয়ারা 'শ্রমিক' বলতেই কেমন গদগদ ভাববিহ্বল গাধা হয়ে উঠিস। মাঝে আবার তোদের কৃষকে পেয়েছিল, ছাপার অক্ষরে লিখতে শুরু করেছিলি 'কৃষক রাজ কায়েম' করার কথা। 'কৃষকের পায়ের কাছে বসে' শিক্ষালাভ করার কথা। ... চাষী কি সচেতন শহুরে কমরেডের চেয়ে অগ্রসর নাকি? চাষীর পশ্চাদপদতাকেও সমর্থন করতে হবে? ... কে বলেছে বাবুদের তুলনায় চাষী উদার? চাষী ঢের বেশী সংগ্রামী, নির্মম, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন—এটুকুই মার্কসবাদী স্বীকার করে। কিন্তু তার বাইরে কৃষক সংকীর্ণমনা, জমিলোভী এও শ্রমিকরা জানে, মার্কসবাদীর জানার কথা। চাষীর কথা বলতে গিয়ে চাষী হয়ে যাস কেন? তোরা না শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি? চাষীর দিকে অমন হাত জোড় করে ভক্তিভরে তাকাস কেন? তোরা না কমিউনিস্ট?' (*জপেনদা জপেন যা*, পৃ. ৬২-৬৩)

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে কৃষি বিপ্লবের চেহারা এবং সত্যিসত্যি গ্রাম ও চাষীর যে চেহারা, দু-এর মাঝখানে তো আশমান-জমিন ফারাক। অসীম রায়ের উপন্যাস, *অসংলগ্ন কাব্য*-এর নায়ক সোনা হেসে বললে, 'আমি যেদিন ওদের সঙ্গে সারাদিন হাল দিই সেদিন বুঝতে পারি, মাজাভাঙা অবসাদে ওরা কেন সন্ধ্যেবেলা ধুঁকতে থাকে আর খাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডেকে। লেখাপড়ার কথা ছেড়ে দিন, সামান্য একটু ভাববার সময় নেই, বিশেষ করে চাষের সময়। কেমন একটা তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো জীবনযাত্রা। তার মধ্যে আপনি এসেছেন

কৃষি বিপ্লবের ঝাণ্ডা হাতে।' (*অসংলগ্ন কাব্য*, পৃ. ৬২)

রবীন্দ্র রায় লিখছেন, ১৯৬৯ সালের মে মাস থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশে নকশালপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সে ধরণের ঘটনা নগণ্যই বলা চলে। আসলে মারামারি রক্তপাত যা ঘটছিল, তা প্রধানত যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যেই। শরিকী সংঘর্ষ তখন দৈনন্দিন ব্যাপার। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮)

কেন এত কলহকোন্দল ও রক্তাক্ত সংঘাত? যা ঘটছে সবই কি শ্রেণীসংগ্রাম? গ্রামে জমি নিয়ে কাজিয়া বা কলে-কারখানায় চা-বাগিচায়-কয়লাখনি অঞ্চলে আরক্ত সংঘাত—হয়তো শ্রেণীসংগ্রাম আখ্যা দেওয়া যায়। তাও সবক্ষেত্রে নয়।

যেমন, গ্রামাঞ্চলে শরিকী সংঘর্ষের মূল কারণ, নৃপেন ব্যানার্জির মতে, 'প্রতি খণ্ড খাস জমিতে তিন চারজন করে দাবিদার। প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো বছরে চাষ করেছে বর্গাদার হিসেবে এবং পরে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। অথচ জমি তো পাবে একজন। অতএব যারা পেল না তারা বিপক্ষীয় পার্টির দলভুক্ত হয়ে নিজের দাবি আদায়ের ফিকির করতে লাগল। ফলে শুরু হল অশান্তি।'

শহরে অশান্তির চেহারা একরকম— গ্রামে আর এক। সেখানে অনায়াসেই ঘরের চালে আগুন দেওয়া চলে। খড়ের চাল নিমেষেই পুড়ে ছাই। যাদের ঘর পোড়ে তারা কোথাও বা সি পি এম, আর কোথাও বা ফরওয়ার্ড ব্লক, আবার কোথাও বা সি পি আই বা এ ইউ সি বলে চিহ্নিত।

সব দেখে শুনে বিহ্বল অশোক মিত্র লিখছেন : 'পিছনে কি ছিল ক্রমশ ভুলে আসছি, সামনের দিকে তাকালে চোখে ঘোর লাগে, থমথম অবস্থানে আমরা : ক্রান্তি, শ্রেণী স্খলন, দ্বন্দ্বের বিদীর্ণ যন্ত্রণা : ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশের এরকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা।' (*কবিতা থেকে মিছিলে*)

১৪

১৩ মার্চ '৬৯-এ উগ্রপন্থা ছাত্রদের বোমার আঘাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রাণ হারালেন সি পি এম-এর যুবকর্মী কৃষ্ণ রায়। সেদিন ওই ধরণের হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যুক্তফ্রন্টের সব কটি দল। উগ্রপন্থাদের ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য দরকার হলে জনগণের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জ্যোতি ভট্টাচার্য।

ঠিক তার দুমাস পরে ১৫ মে সি পি এম-এর একজন যুবকর্মী বাদল দত্ত আলিপুরদুয়ারে ছুরিকাহত হয়ে প্রাণ হারান। এবং এবার আততায়ী আর এস পি সমর্থক অটোমবাইল ওয়ার্কার্স এ্যাসোশিয়েশনের লোকজন। বাদল দত্তের খুনের বদলা নেওয়া হল স্থানীয় আর এস পি অফিস পুড়িয়ে দিয়ে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য হরেকৃষ্ণ কোঙার পৌঁছলেন। তখনকার মতো পরিস্থিতি সামলানো গেল বটে, কিন্তু অচিরেই শরিকী বিরোধ ছড়িয়ে গেল জেলায় জেলায়,

মহামারীর চেহারা নিল এবং মওকা পেয়ে গেলেন সি. পি. আই (এম এল)-এর মুখপত্র *দেশব্রতী*-র সম্পাদক সরোজ দত্ত। কালি নয়— বিষ ঢেলে দিলেন তাঁর কলমে। প্রতিটি শব্দে সাপের ছোবল। প্রায় অশালীন ভাষায় তেড়ে লিখেছেন শশাঙ্ক ওরফে সরোজ দত্ত :

'ছয় মাস আগে কৃষ্ণ রায়ের পচা লাশ নিয়ে যারা মিছিল করেছিল এবং নকশালপন্থীদের ধরাধাম থেকে মুছে দেবে বলে জনতার হাতে রাইফেল তুলে দিতে চেয়েছিল, ছয়মাসের মধ্যেই তারা দেখছি একে অন্যের লাশ নিয়ে মিছিলে মিছিলে সারা বাংলাদেশ তুলকালাম করে তুলেছে, আর বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি প্রাণপণে ঢাক পেটাচ্ছে সেই পচা লাশগুলোর শোক মিছিলের। কত কায়দায়, কত ভঙ্গীতে ছবি ছাপা হচ্ছে সেই শোক মিছিলের। কত চমকপ্রদ সাহিত্যিক কেরামতী দেখিয়ে রিপোর্ট লেখা হচ্ছে এই সব হত্যাকাণ্ডের, এই সব শোভাযাত্রার। সত্য কথা বলতে কি, বহুকাল বুর্জোয়া সাংবাদিকতার রক্তমাখা উচ্ছ্বাসের এই কত্থকনৃত্য চোখে পড়েনি। এই সাংবাদিকতা সত্যি উপভোগ করার মতো।

বুর্জোয়া সংবাদপত্র গুলিতে কেন এত উল্লাস, কেন এত উচ্ছাস, কী দেখতে পাচ্ছে তারা এই হানাহানি, রক্তারক্তি, খুনোখুনীর মধ্যে? তারা দেখতে পাচ্ছে কৃষক কৃষককে মারছে, কৃষকের বর্শার ঘায়ে কৃষক লুটিয়ে পড়ছে, শ্রমিক মারছে শ্রমিককে। কিন্তু তারা জানে, এটা কোন বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ নয়, এ হচ্ছে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিপথগামী করে উন্নত প্রতিবিপ্লবী হানাহানি, যা গ্রামাঞ্চলে জোতদার শ্রেণীকে নিরাপদ করছে। তাই উল্লাসে ফেটে পড়ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও তাদের ঘাঁটি দালালদের এত রক্ষিতা পত্রিকাগুলি। সত্যি তাদের আজ আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই, তারা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে বিপ্লবী জনতার, বিশেষ করে বিপ্লবী কৃষক জনতার যে জাগ্রত রুদ্ররোষ গ্রামাঞ্চলে সমস্ত শক্তিকে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারত তা আজ গদি নিয়ে শরিকী কামড়াকামড়ির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে কৃষকে-কৃষকে রক্তারক্তিতে পরিণত হচ্ছে। অতএব তাদের আনন্দের খবর বৈ কি?'

('পত্রিকার দুনিয়ায়', *দেশব্রতী*, ৬ নভেম্বর ১৯৬৯)

ধানকাটা নিয়ে গ্রামাঞ্চলে কেন যুক্তফ্রন্টের শরিকে শরিকে সংঘর্ষ? শশাঙ্কর কাটা কাটা জবাব : 'যুক্তফ্রন্টের সব পার্টিই জোতদারদের পার্টি। ফসলের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে জোতদারে জোতদারে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি, মাঝখান থেকে কিছু হতভাগ্য গরীব মারা যাচ্ছে।' তিনি লিখছেন : 'ফসলকাটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের মতোই যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলি জোতদারের পার্টি হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে শরিকী লড়াইতে যে রক্তারক্তি খুনোখুনি হচ্ছে তার মূল এখানেই। যা অবস্থা তাতে জোতদার শ্রেণী শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু জোতদার শ্রেণীটিকে বাঁচাচ্ছে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার শরিক দলগুলি।'

শরিকী সংঘর্ষের ফলে সে যুক্ত অস্তিত্ব বিপন্ন, এ বিষয়ে সি পি এম নেতৃত্ব গোড়া থেকেই সজাগ। সি পি আই নেতৃত্ব ও তাঁদের কথায় পরে আসছি। দেখা যাচ্ছে, বক্তৃতায় ও বিবৃতির মাধ্যমে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত বারবার হুঁশিয়ারী দিচ্ছেন শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য। যুক্ত ফ্রন্টের অস্তিত্বের পক্ষে এ জাতীয় ঘটনা ক্ষতিকর তো বটেই, তাছাড়া তাঁর দৃষ্টিতে সি পি এমই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল। ২৪ মে হুগলী জেলার দুটি সমাবেশে প্রমোদ দাশগুপ্ত হুঁশিয়ারি দেন : যুক্তফ্রন্টের আত্মকলহ সর্বনাশের পথ এবং

এটাই শাসক শ্রেণীর নতুন কৌশল। এ সম্পর্কে ফ্রন্টের সমস্ত পার্টিকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন: অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ যুক্তফ্রন্টভুক্ত কিছু দলকে ভ্রান্তপথে চালিত করছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় মার্কসবাদী কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক হামলা চালানো হচ্ছে। কংগ্রেসের বাইশ বছরের নীতির ফলে যে সমাজবিরোধীরা জন্ম নিয়েছে, এতদিন তাদের কংগ্রেসই লালন করেছে। আজ পালা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়চ্যুত সমাজবিরোধীরা পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। যেহেতু আমাদের পার্টি আজ প্রধান শক্তি তাই আমরা আজ অনেকের আক্রমণের লক্ষ্য। এইসব সমাজবিরোধীদের আজ আমাদের কর্মীদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে এই আত্মকলহ সর্বনাশের পথ। শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী মহল জানে—বাইরের আক্রমণে যুক্তফ্রন্টকে ভাঙ্গা যাবে না, তাই তাদের নতুন কৌশল যুক্তফ্রন্টের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তার ঐক্য বিনষ্ট কর, পরস্পরের মধ্যে খুন জখম লাগিয়ে দাও। শাসকশ্রেণীর এই নতুন কৌশল সম্পর্কে ফ্রন্টের সমস্ত পার্টিকে সতর্ক থাকতে হবে। (*গণশক্তি*, ২৬.৫.৬৯)

পরবর্তী পদক্ষেপ দুই কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত বিবৃতি:

দুটি পার্টির মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার প্রয়াস চলবে।

কলকাতা, ২৭শে মে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত বৈঠকে ''দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশ'' ও বিশেষতঃ কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিলতা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে মতবিনিময় করেছে।

আজ প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে ঐ কথা জানিয়ে বলা হয়ে যে, এইসব প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ''উভয় পক্ষই এ বিষয়ে একমত যে, দুটি পার্টির মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য অবশ্যই প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।''

দুটি পার্টির প্রতিনিধি দল যুক্ত কার্যক্রম ও যুক্ত গণ-আন্দোলনের বিষয়ে আবার আলোচনায় বসতে সম্মতি ঘোষণা করেছে। যুক্তঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সি রাজেশ্বর রাও ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরাইয়া স্বাক্ষর করেন।

উভয় পক্ষই এই বিষয়ে একমত যে, এই দুইরাজ্যের যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। (*কালান্তর*, ২৮.৫.৬৯)

ঠিক তার পরের দিন সি পি এম-এর পক্ষ থেকে 'যুক্তফ্রন্টের ঐক্যনাশের অপচেষ্টা এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল' এই শিরোনামে ২৯ মে '৬৯ *গণশক্তি*-তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে হত্যা-খুন-জখমের পথে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেওয়াই হল প্রতিক্রিয়ার নয়া কৌশল। প্রতিবেদক লিখছেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ অগ্রগতির সামনে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আক্রমণের কৌশল পরিবর্তন করেছে। যুক্তফ্রন্টভুক্ত দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে, মারামারি বাঁধিয়ে তার ঐক্যবিনাশের অপকৌশল এরা গ্রহণ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি (মা.)ই আজ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। এই আক্রমণ কখনো পরিচালিত হচ্ছে কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা, কখনো পরিচালিত হচ্ছে উগ্রপন্থীদের দ্বারা, আবার অত্যন্ত দুঃখের হলেও কখনো

পরিচালিত হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির আশ্রিত কিছু লোকের দ্বারা। অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধিতা যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির মধ্যেও সমাজ বিরোধীদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করেছে। সমাজবিরোধীরাও আজ যুক্তফ্রন্টের দলগুলির মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে। আর এর পিছনে রয়েছে কংগ্রেস, প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি (মা:) শ্রমিক কৃষকের স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনিমাসের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি (মা:)র কৃষ্ণ রায়, অশোক মিত্র, বাদল দত্ত, মনীন্দ্র হালদার, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু প্রমুখ সাতজন জঙ্গী কর্মী।....

... কৃষক ও জোতদার মহাজনদের মধ্যেকার সংঘাত স্থানীয় যুক্তফ্রন্ট ভুক্ত-দলগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে রূপ নিচ্ছে।

এ ধরনের পারস্পরিক সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ১৩ জন খুন হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এর মধ্যে সি. পি. আই (এম)-এর ৭ জন, আর এস পির ১২ জন এবং এস ইউ সির ১ জন শহীদ হয়েছেন।

সংঘর্ষে আহত, কলকাতায় ৫০ জন, কুলতলীতে ৬৭ জন, ক্যানিং-এ ১৬ জন, বসিরহাটে ৪৫ জন, ডোমকলে ৪ জন, উত্তর হিজোলে কয়েকজন, মালদহে ১৪ জন, আলিপুরদুয়ারে প্রায় ৩০ জন, আসানসোল এলাকায় ১২ জন।

প্রমোদ দাশগুপ্ত কিন্তু শরিকী সংঘর্ষের খতিয়ান বা কে আক্রমণকারী আর কেই বা আক্রান্ত তা নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে অনিচ্ছুক। তিনি চান এই অন্তর্বিরোধের সমাধান। তাই তাঁর প্রস্তাব: বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন পার্টিকর্মীদের মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘর্ষগুলো ঘটে গেছে তাতে যুক্তফ্রন্টভুক্ত অন্যান্য পার্টির ন্যায় আমাদের পার্টিও অত্যন্ত উদ্বেগবোধ করছেন। রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট শরিকদলের মধ্যে বিরোধ যা কখনো কখনো সংঘর্ষে ও বিভিন্ন পার্টির স্থানীয় কর্মীর হত্যায় গিয়ে পর্যবসিত হচ্ছে, সেটা সংশ্লিষ্ট পার্টিরই শুধু গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে না, তা বিচলিত করে তুলেছে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিদেরও। যুক্তফ্রন্টের শত্রুরা ফ্রন্টের মধ্যে এই বিরোধে উৎফুল্ল। কংগ্রেস শাসন ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ও সংগ্রাম করে যুক্তফ্রন্ট যে গৌরবোজ্জ্বল ইমেজ গড়ে তুলেছেন, সন্দেহ নেই এই বিরোধের ফলে তা মসীলিপ্ত।

গত সাড়ে তিনমাসে ১৭টি রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হয়েছে। এক আমাদের পার্টিই হারিয়েছে দশটি মূল্যবান জীবন এবং আর এস পি দুটি ও এস ইউ সি একটি। এ ছাড়া এসব সংঘর্ষে আহতের সংখ্যা ২০০-র ও বেশি। কোন পার্টি কোন পার্টিকর্মীর হত্যার জন্য দায়ী, অথবা আলিপুর দুয়ারে সি. পি. আই. (এম) ও আর. এস. পির মধ্যে কি ঘটেছিল বা কি ঘটেছিল কোচবিহারে, সি. পি. আই ও ফ.ব.-এর মধ্যে অথবা কূলতলী ও ২৪ পরগণার অন্যান্য জায়গায় এস. ইউ. সি. এবং সি. পি. আই (এম)-এর মধ্যে বা রাণাঘাটে সি. পি. আই (এম) ও সি. পি. আই-এর মধ্যে বা জলপাইগুড়িতে আর. এস. পি. ও গোর্খালীগের মধ্যে কি ঘটেছিল—এসবের তালিকা দিয়ে লাভ নেই।

যুক্তফ্রন্টের প্রতিটি শরিকদল তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, তাদের নিজেদের মধ্যে এই বিরোধ ও হানাহানি মিটিয়ে ফেলতেই হবে। এ ধরনের বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি হওয়া উচিত, কোন অঞ্চলে ঘটনায় জড়িত পার্টিদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করা।

আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, জেলা ও রাজ্য নেতাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় কমরেডরা যদি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বসেন, তা হলে বিরোধের কারণগুলো বের করা যায় এবং খুঁজে পাওয়া যায় সমাধান।

...আমাদের পার্টি ফ্রন্টের ঐক্য শক্তিশালী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন এবং আমাদের এ চেষ্টায় অন্যান্য পার্টিরাও সহযোগিতা করবেন, আমরা আশা করি। (*গণশক্তি*, ২১.৬.৬৯)

জ্যোতি বসু মনে করেন, শরিকী সংঘর্ষের অন্তরালে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। তিনি ২১ শে জুন '৬৯ মধ্য কলকাতার এক জনসভায় বলেন, চারদিকে ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া। যেন তেন প্রকারেণ অরাজকতা সৃষ্টির কাজে লিপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস। আর তাদেরই সহায়ক 'সেই নকশালপন্থীরা' যারা বিপ্লবের নামে সমাজবিরোধী কাজ করতে চলেছে। আমরা চাই আমাদের যুব সমাজ সংগঠিত হোক। সর্বত্র তারা গড়ে তুলুন স্বেচ্ছাবাহিনী। (*গণশক্তি*, ২২.৬.৬৯)

জুলাই মাসের মাঝামাঝি যুক্তফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধ চেহারা আবার ফুটে ওঠে পরিস্থিতির চাপে। ১৪ জুলাই যুক্তফ্রন্টের ডাকে দুটি বিশাল মিছিল উত্তর ও দক্ষিণে অভিযান করে। লক্ষ কণ্ঠে স্লোগান ওঠে 'যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত রুখবই-রুখব।' তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

গতকাল চারটে বাজতে না বাজতেই ময়দানে মানুষের পায়ের চিহ্ন। ছাত্র, যুব, মাষ্টারমশাই, অধ্যাপক, কর্মচারী, শ্রমিক সকলে এসেছেন যুক্তফ্রন্টের ডাকে। মিছিলের পর মিছিল চারিদিককার সড়ক থেকে এসে মিলেছেন ময়দানে। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভার পর-দুটি মিছিল দুদিকে উত্তরে, দক্ষিণে।

দক্ষিণের মিছিলের পুরোভাগে অজয় মুখার্জী, জ্যোতি বসু, সুধীন কুমার, আবদুল্লাহ্ রসুল, সমর মুখার্জী, মনোরঞ্জন রায় প্রমুখ। আর উত্তরের মিছিলের সামনে বিশ্বনাথ মুখার্জী, প্রভাস রায়, সুবোধ ব্যানার্জী, সরোজ মুখার্জী, গীতা মুখার্জী, লক্ষ্মী সেন, সুধাংশু পালিত, কে.জি বসু প্রমুখ।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকী বিরোধ বন্ধ করার জন্য পাঁচ পার্টির পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতি প্রচারিত হয়।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকী বিরোধ বন্ধ করার জন্য পাঁচ পার্টির প্রতিনিধিদের প্রস্তাব এল। সুকুমার রায়, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জী, মাখন পাল ও অশোক ঘোষ বিবৃতিতে বলেছেন: বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পার্টির স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে যে সব বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটেছে, সে সব ঘটনায় পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকই অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছেন।

ফ্রন্টের প্রত্যেকটি পার্টিই উপলব্ধি করেন যে, এই শরিকী বিরোধ, যা কখনো কখনো সংঘর্ষে ও হত্যায় গিয়ে পর্যবসিত হচ্ছে, তা ফ্রন্টের গৌরবোজ্জ্বল ইমেজটাকেই শুধু কালিমালিপ্ত করে না, দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে গভীর চিন্তিত করে তোলে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন ও মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে হবে।

ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা আচরণবিধি তৈরী করে তা সবার মেনে চলা দরকার। এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা দরকার যে মতাদর্শগত ও অন্যান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একই সঙ্গে দাঁড়াবেন। একই উদ্দেশ্যে এবং একই শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। (*গণশক্তি*, ১৫.৭.৬৯)

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার জন্য এসব তৎপরতার আসল কারণ: একদল পুলিশের এসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এক অভাবনীয় প্ররোচনার রূপ নেয় একদল পুলিশের বিধানসভায় প্রবেশ করে আকস্মিক তাণ্ডবের মাধ্যমে। সেদিন ৩১ জুলাই '৬৯ কলকাতার রাজপথ যখন হাজার হাজার মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিলে মিছিলে মুখরিত তখনই বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একদল কুচক্রী পুলিশবাহিনী। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে জেহাদ। পুলিশের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের নির্ধারিত সুবিশাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিল এগিয়ে চলে চক্রান্তকারীদের মোকাবিলায়। বিধানসভার উত্তর গেটে হাজার হাজার মানুষের বিশাল জমায়েতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন : চক্রান্তকারীদের ঘৃণিত আক্রমণের জবাব জনগণ দেবেই দেবে। প্রতিক্রিয়ার এই স্পর্ধিত চক্রান্তকে পূর্ণ করবে সংগ্রামী জনগণ। তিনি বলেন : কোন প্রকার প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না। সুশৃঙ্খল এবং সংগঠিতভাবে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করতে হবে।

সেদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী জনগণের উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেন, চক্রান্ত চলছে। জনগণই যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। জনগণই তাকে রক্ষা করবে। আপনারা সরকারের শক্তি বাড়ান। সতর্ক থাকুন। (*গণশক্তি*, ১.৮.৬৯)

তার পরের দিন, ১ আগস্ট প্রমোদ দাশগুপ্ত কোচবিহারের এক জনসভায় পুলিশের এই ষড়যন্ত্রী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা করেন: পুলিশের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে স্বেচ্ছাসৈন্যদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, গণ-আন্দোলনের শক্তিতেই প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। সংগঠিত সংগ্রামী জনগণের শক্তিই পুলিশরাজ কায়েম করার চক্রান্ত ব্যর্থ করবে। শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত স্বেচ্ছাবাহিনীকে সেই শক্তিই গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কোন অংশ দায়িত্বপালনে যদি ব্যর্থ হয় এবং চক্রান্তের পর চক্রান্তে লিপ্ত হয় তবে প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছাসৈন্যদের এগিয়ে আসতে হবে সেই গুরু দায়িত্ব পালনে।

শরিকী সংঘর্ষ কিন্তু বন্ধ হল না। নব পর্যায়ে শুরু হল সি পি এম ও সি পি আই-এর মধ্যে। সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে সি পি এম ও সি পি আই-এর মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি—আশু কারণ বরানগরের ঘটনা এবং দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক ও সুদূরপ্রসারী।

৩০ আগস্ট '৬৯ বরানগর টেনামেন্ট স্কীমে ঘরদখল নিয়ে সি পি আই ও সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে, ইটপাটকেল, লাঠি, রড ইত্যাদির যথেচ্ছ আঘাত ও প্রত্যাঘাত চলে। ফলে স্থানীয় সি পি আই নেতা শিবপদ ভট্টাচার্য গুরুতর আহত হন। অপরদিকে সি পি এম-এর লক্ষ্মী ঘোষ আহত হন। সি. পি. এম নেতা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বাড়িতে বোমা পড়ে এবং তার স্ত্রী আহত হন। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

ঠিক তার ১ সপ্তাহ পরে ৮ সেপ্টেম্বর ব্রিগেডের জনসভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত সি পি আই-এর ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে সাম্প্রতিক মূল্যায়নের তীব্রভাষায় সমালোচনা করেন। কংগ্রেসের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা কেন্দ্রে ইন্দিরা ও মোরারজীর সংঘাত আদৌ আদর্শগত কারণে নয়। এম বাসবপুন্নাইয়া বলেন, আমরা মনে করি না একচেটিয়া পুঁজিপাত ও সাধারণ পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব থেকে তার উদ্ভব। কংগ্রেসকে বাঁচাবার প্রশ্নে এটা কৌশলগত বিরোধ। পার্টি বৈপ্লবিক বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করবে না—বিপ্লবের দিকে পিঠ ফেরাবে না। ইন্দিরার পিছনে ভিড়ে যাওয়ার

অর্থ জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন: সংগ্রামের আঘাতে যখন কংগ্রেস জর্জরিত, তখন দিল্লীতে বসে সংশোধনবাদীরা প্রস্তাব পাশ করলো ইন্দিরা গান্ধী প্রগতিশীল। আর বাংলাদেশে যখন গণসংগ্রাম প্রবলভাবে এগিয়ে চলেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে, যার বৃহত্তম শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ঠিক সেই সময়ে ঐ সংশোধনবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে সি. পি. আই. (এম) -এর বিরুদ্ধে। বরানগরের সামান্য ব্যাপার নিয়ে তারা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে উদ্যত।

অবিরত আক্রমণ শানিয়ে যেতে থাকেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। ১৪ ও ১৬ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে জে কে নগর ও বাঁকুড়া শহরের জনসভায় তিনি 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট'দের বিভেদপন্থী ও কুৎসাকারী বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তারা কুৎসার বন্যা বহাচ্ছে এবং এর জবাব জনগণই দেবেন। পুরানো তিক্ততার জের টেনে বললেন, ১৯৬২ সালে যখন একই পার্টির হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হল, তখন কিন্তু এঁরা—আজকে যাঁরা দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, তাঁরা চুপ করে বসেছিলেন, একটি বারের জন্যও প্রতিবাদ করেননি। (*গণশক্তি*, ২০.৯.৬৯)

লক্ষণীয় যে, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে নতুন করে মতভেদের সূত্রপাত হওয়ায় দুই পার্টির মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সি পি আই-এর মতে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসীরা প্রগতিশীল, যেহেতু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপের পদক্ষেপ নিয়েছে ইন্দিরা সরকার। এটা এক পুরানো অভ্যাস যা কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ কখনও ছাড়তে পারেননি। এক সময় নেহরুর পিছনে সমবেত হওয়া বা নেহরুর হাত শক্তিশালী করা আর বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধীকে বরণ করা একই মনোভাবের পরিচয়। সি পি আই-এর ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে নবমূল্যায়ন অবশ্যই তার পরবর্তী ভূমিকার পূর্বাভাস এবং রণেন সেনের মতে, সি পি এম-এর সঙ্গে তার দূরত্ব যে বাড়তেই থাকবে সেটাও প্রায় অবধারিত। তিনি বলছেন, '১৯৬৯ সালে আমি রাজ্যপার্টির সম্পাদক ছিলাম। আমি feel করতাম ওরা (সি. পি. এম) যত sectarian হচ্ছে এরা তত কংগ্রেসের দিকে যাচ্ছে। আমি রাজেশ্বর রাওকে সে কথা জানাই, জানতে চাই, কোন দিকে চলছে পার্টি? একবার নীচে নামা শুরু হলে আর থামা নেই।'

দুই পার্টির মধ্যে তিক্ততা বাড়তেই থাকে। *গণশক্তি*-র (২২.৯.৬৯) পাতায় ছাপা হল—'গতকাল দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুবসংঘের সমাবেশ ও মিছিল থেকে মুহুর্মুহু 'জ্যোতি বসু মুর্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়া হয়। তাদের পার্টি নেতাদের উপস্থিতিতে ও সম্মতিতেই এই কাজ চলতে থাকে।'

দুই পার্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ততার ফলে ফ্রন্টের অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি। এই পটভূমিতে সোমনাথ লাহিড়ী যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ বন্ধের জন্য এক নতুন প্রস্তাব রাখেন।

(১) তিক্ততা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অন্তত সাময়িকভাবে রাজনৈতিক মতপার্থক্য সম্পর্কে সমালোচনা মুলতুবি রাখা হোক।

(২) ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ও তিক্ততা রোধ করার জন্য যেসব ইউনিয়নে একাধিক শরিক কাজ করেন সেখানে অন্তত আগামী দুমাসের জন্য সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক।

(৩) লাঠি, রড, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে সশস্ত্র মিছিল বা সমাবেশ বন্ধ করতে হবে।

(৪) সাধারণভাবে ব্লক পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠন করা দরকার।

(৫) দলীয় কর্মীদের সভায় অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে একসঙ্গে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করা দরকার।

আবার নতুন করে ঐক্যের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৭ সেপ্টেম্বর '৬৯ যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে একবাক্যে সবাই স্বীকার করেন যে শরিকী সংঘর্ষ যুক্তফ্রন্টের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করছে। সব দলই আন্তঃপার্টি বিরোধ মীমাংসায় বদ্ধপরিকর এবং সভায় গৃহীত 'ঐক্যের আহ্বান' শীর্ষক প্রস্তাবটি বিভিন্ন পার্টির কর্মী ও জনগণের মধ্যে হাজারে হাজারে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়।

পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধ প্রশমনের পথ যখন খোঁজা হচ্ছে তখন কেরলের ঘটনা সে পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অক্টোবরের মাঝামাঝি কেরলে সি পি এম সি পি আই মতবিরোধের ফলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক বাতাবরণে নতুন এক মাত্রা যোগ করল। সি পি এম আশঙ্কা করছে কেরলের ছক ধরে পশ্চিম বাংলায় সি পি এম-কে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যুক্তফ্রন্টের মধ্যে নতুন এক জোট গড়তে চলেছে সি পি আই। এই আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে। তিনি বলছেন, 'আমরা যেহেতু কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অগ্রণী, তাই সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে ফ্রন্টের কোনো কোনো পার্টি দুর্নাম রটিয়ে আমাদের পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক অভিযোগের যে ফিরিস্তি দিচ্ছেন বাংলা কংগ্রেস, তাঁর মতে, তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে কয়েকটি দল। সরাসরি তিনি সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লককে এ বিষয়ে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষভুক্ত বলে চিহ্নিত করেন।

২৩ অক্টোবর '৬৯ কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতন হয়। মন্ত্রিসভার বিপক্ষে একযোগে ভোট দেন কংগ্রেস, কেরল কংগ্রেস, সি পি আই, মুসলিম লীগ, আই এস পি ও আর এস পি।

কেরলের রাজনীতির পালাবদল পশ্চিমবাংলায় অবশ্যই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিশেষ করে সি পি এম- প্রভাবিত মহলে। তড়িঘড়ি ডাকা, ২৫ অক্টোবার '৬৯ কলকাতার ময়দানের জনসভা থেকে ঘোষণা করা হল: দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা শাসকশ্রেণীর দালালি করছে। পশ্চিমবাংলার যে কোনো ধরণের চক্রান্ত প্রতিরোধে প্রস্তুত হোন। (*গণশক্তি*, ২৬.১০.৬৯)

সি পি আই-এর মুখপত্র *কালান্তর* (২৬.১০.৬৯) জানাচ্ছে : এই সভা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও আর এস পি-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ কমিউনিস্ট পার্টি ও আর. এস. পির বিরুদ্ধে 'আপোসহীন সংগ্রাম' চালাবার আহ্বান জানিয়েছেন।

'জ্যোতি বসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কিছু দল আছে যারা কেরালার মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং এর পুরোভাগে রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি।'

'এ. কে. গোপালন বলেন, কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের পতন ঘটায় কংগ্রেস সভাপতি, জনসংঘ, ডাঙ্গে প্রমুখ উল্লাস প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও আর. এস. পির নেতৃত্বে গত দুবছর ধরে যে চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তারই ফলে কেরালা সরকারের পতন ঘটেছে। তারা পশ্চিমবঙ্গেও এই চক্রান্ত করছে।'

কালান্তর-এর প্রতিবেদক লিখছেন : 'পাড়ায় পাড়ায় ডাঙ্গেপন্থীদের গণ-ধোলাই দিতে হবে' শ্লোগান দিয়ে সি. পি. এম কর্মীদের বিভিন্ন মিছিল ময়দানে এসে জড়ো হয়।'

বরানগরে কিছুদিন আগে ঘটে গেছে দুই পার্টির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। অতএব কেরলে

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পতনের জের সেখানে তো থাকবেই। ২৮ অক্টোবর বরানগরের বিভিন্ন পাড়ায় বিক্ষোভ মিছিল বার হয়। মিছিল থেকে ধ্বনি ওঠে : দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকাতর ক্ষমা নেই। (*গণশক্তি*, ২৯.১০.৬৯)

শুধু বরানগর নয়, সি পি আই-এর ভূমিকাকে ধিক্কার জানিয়ে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল করে সি পি এম। ২ নভেম্বর কলকাতা, দমদম, চুঁচুড়া, ইছাপুর ও নবদ্বীপে সি পি আই-এর বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ থেকে আওয়াজ তোলা হয় : কেরালার বেইমানদের ক্ষমা নেই। (*গণশক্তি*, ৬.১১.৬৯)

সি পি এম মহলে দেখা দেয় সি পি আই-এর মতলব সম্পর্কে গভীর সন্দেহ। দুই পার্টির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম তিক্ততার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। ঠিক পার্টি ভাগের দিনগুলের মতো। সি পি এম নেতৃত্বের ধারণা: পশ্চিমবাংলায়ও হয়তো সি পি এম কে বাদ দিয়ে সরকার গড়ার তালে রয়েছে সি পি আই। ২৫ নভেম্বর '৬৯ বরানগরের জনসভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন : মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গড়লে রাজ্যব্যাপী গণসংগ্রাম শুরু হবে।

এক থমথমে আবহাওয়া, একদিকে সি পি এম-সি পি আই সংঘাত, অপরদিকে বাংলা কংগ্রেসের অনশনের সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজের সরকারের বিরুদ্ধে অনশনের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। অভাবনীয় ঘটনা। ১৯৬৯ সালের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার আদৌ টিকবে কিনা, এ নিয়ে নানা মহলে জোর জল্পনা কল্পনা। ২৯ নভেম্বর এক বিশাল মিছিল কলকাতার রাস্তায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল।

বাংলা কংগ্রেসের অনশনের সঙ্কল্প সম্পর্কে *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় নিবন্ধে (৩০.১১.৬৯) মন্তব্য করা হল: যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকে শক্তিশালী করা।

বাংলা কংগ্রেসের এই অনশন ধর্মঘট জনগণের দাবির বিরুদ্ধে শত্রু শিবিরকেই শক্তিশালী করবে। এতে উৎসাহিত হবে কংগ্রেসী শাসকবর্গ।

প্রসঙ্গত, অজয় মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, তাঁর অনশন ধর্মঘট রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার ক্রমবর্ধমান অবনতির বিরুদ্ধে।

তার জবাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, আইনশৃঙ্খলার দোহাই আসলে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধিতা। এবং অনশন করে শ্রেণীসংগ্রাম রোখা যায়না।

১ ডিসেম্বর '৬৯ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ৩০ জন সঙ্গীসহ কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ পার্কে অনশন শুরু করলেন। এবং তারই সঙ্গে সূচিত হল পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে পটপরিবর্তন।

অবস্থা দেখে সি পি এম নেতৃত্ব ধরেই নিয়েছেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার আর বেশিদিন টিকবে না। নেপথ্যে চলেছে সরকার ভাঙার সুগভীর চক্রান্ত। এই চক্রান্তে সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক অবশ্যই সামিল; এমন কি এস ইউ সি-র মতিগতি ভালো নয় এবং সকলের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল সি পি এম।

অতএব সরকার ভাঙার চক্রান্ত চলছে ধরে নিয়ে তাঁরা শুরু করলেন তুমুল প্রচার অভিযান। প্রায় প্রতিদিনই সভা সমাবেশ ও মিছিল। শ্রমিক, ছাত্র, কর্মচারী, সমস্ত ফ্রন্ট ও গণসংগঠনের সমাবেশ থেকে একই আওয়াজ : যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার চক্রান্ত বরদাস্ত করা হবে না। শ্রমিক

শ্রেণী একে বরদাস্ত করবে না, এবং প্রতিবাদ ধর্মঘটে সামিল হবে—এই ঘোষণা করলেন কমল সরকার ১ ডিসেম্বর '৬৯ টিটাগড়ে চটকল শ্রমিক সমাবেশ থেকে।

৩ ডিসেম্বর '৬৯ পূর্ব কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১৭টি ট্রেড ইউনিয়নের কনভেনশন থেকে একই ভাষায় হুঁশিয়ারি জানানো হয়।

৭ ডিসেম্বর প্রমোদ দাশগুপ্ত হুগলী জেলার তিনটি সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং যারা ফ্রন্টে থেকে ফ্রন্ট ভাঙতে চাইছে তাদের পঞ্চম বাহিনী বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। শ্রমিক শ্রেণী তাদের বরদাস্ত করবে না। অজয় বাবুর অনশন বুর্জোয়া জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার পথ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত করার পথ। অজয়বাবু ও পথে যাবেন না, ফিরে আসুন। (*গণশক্তি*, ৯.১২.৬৯)

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রচার অভিযানকে তীব্রতর করা হল। ২৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ১৯তম সম্মেলন মঞ্চ থেকেও ঘোষণা করা হল: মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠিত হলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঐ একই দিনে সি পি এম-এর আহ্বানে জলপাইগুড়ি শহর প্রদক্ষিণ করে কুড়ি হাজার শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তদের এক দৃপ্ত মিছিল।

টালমাটাল অবস্থা। অস্থিরতার দিন আবার ফিরে এল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব সত্যিই বিপন্ন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা হল *গণশক্তি*-র পাতায় (২৩.১২.৬৯), যার শিরোনাম ঃ 'অশুভ ইঙ্গিত'। এখানে প্রায় পুরোটাই তুলে দেওয়া হল:

'পশ্চিমবঙ্গে শুধু অসভ্য নয়, বর্বর সরকার রয়েছে—একথা বলেছেন আর কেউ নয়, এ রাজ্যেরই মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী মেদিনীপুরের জনসভায়। তাঁর সাম্প্রতিককালের বক্তৃতাগুলোর প্রায় প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে ফ্রন্টেরই একটি শরিকের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। কোন কুৎসাই আর তাঁর মুখে আটকাচ্ছে না।

কিন্তু যে সরকারে তিনি মুখ্যমন্ত্রী, বারবার সে সরকারকে 'অসভ্য' 'বর্বর' বলতে কি তাঁর একটুও লজ্জা বোধ হচ্ছে না? পশ্চিম বাংলার মানুষ তো বরং এ সরকারের জন্য গর্ব বোধ করেন। এ রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব নবজাগরণের কোন চিহ্নই কি তাঁর চোখে পড়ছে না?

হ্যাঁ, কায়েমী স্বার্থের কাছে অবশ্য এ সরকারকে 'অসভ্য বর্বর' বলে মনে হতে পারে। কারণ তাদের স্বার্থে কিছুটা আঘাত এসেছে। এ সরকার আর তাদের পুলিশ দিয়ে সাহায্য করছে না। সরকার সাহায্য করছে তাদেরই যারা এতদিন ভয়ে মুখ ফুটে দাবী করতে সাহস পায়নি, যাদের ওরা নির্বিবাদে শোষণ ও বঞ্চনা করে আসতে পেরেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দিয়ে কায়েমী স্বার্থেরই মনের কথা বেরিয়ে আসছে, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে? কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্যই বারে বারে এই সব কথা বলছেন। একটা অশুভ ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট।'

সত্যিই কি পশ্চিম বাংলায় কেরল নাটকের পুনরাভিনয় ঘটতে যাচ্ছে? অর্থাৎ সি. পি. এম-কে বাদ দিয়ে যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি দল মিলে মিনিফ্রন্ট গড়ে সরকার গড়ার পথে পা বাড়াচ্ছে? প্রমোদ দাশগুপ্ত বিশ্বাস করেন, তার ষোল আনা সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি ২৮ ডিসেম্বর

চাকদহের সভায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত মোড় নিচ্ছে।

ইতিমধ্যে সি পি এম কর্মীদের নিহত হওয়াটা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। তুফানগঞ্জে দুজন সি পি এম সমর্থক প্রাণ হারালেন এবং আততায়ীরা ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থক। রাণীগঞ্জে মারা গেলেন কয়লাখনি শ্রমিক ধনেশ্বর মাহাতো। আততায়ীরা এস এস পি ইউনিয়নের লোক বলে চিহ্নিত।

গণশক্তি-র (২.১২.৬৯) সংবাদসূত্রে প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ফরোয়ার্ড ব্লকের ৩০০ জন সশস্ত্র সমর্থক কোচাবিহারের পশারীহাট পুড়িয়ে দিল। জেলার ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ নাকি ঘটনাস্থলেই ছিলেন। এটি সি পি এম- ফরোয়ার্ড ব্লক রেষারেষির জের।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কলহ এখন বিস্ফোরক আকার নিয়েছে। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত বাদানুবাদ, হানাহানি, খুনজখম, অগ্নিসংযোগ: সাধারণ মানুষ ভীতিবিহ্বল দর্শক। অথচ সরকার চলছে এবং সেটা যুক্তফ্রন্টের সরকার।

কী করে চলছে এ হেন ধাঁধার ব্যাখ্যা আপাতত মুলতুবি থাক, কারণ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আর একবার পালাবদল ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিয়তি প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতো। দল-ভাঙাভাঙির খেলা শুরু হবে—আরো ব্যাপক হারে। স্মৃতি হাতড়ানো শুরু হল যেন। ১৯৭০-এর সূচনাতেই প্রমোদ দাশগুপ্ত যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক ও বিভিন্ন দলের কাছে একখানা চিঠিতে সে আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন চিঠিতে বলা হচ্ছে :

(কলকাতা, ১৪ই জানুয়ারি '৭০) '...সেই ১৯৬৭-র দিনগুলিতে বাংলা কংগ্রেস শিবিরে দলত্যাগ মাথা তুলল এবং তাদের ১৭জন এম. এল. এ বিশ্বাসঘাতক ড: পি. সি. ঘোষের সঙ্গে হাত মেলালেন। ...বাংলা কংগ্রেসের এই অতীত কার্যকলাপ আমাদের সাবধান ও সতর্ক করে তুলেছে। তাই 'অসভ্য সরকার' 'বর্বর সরকার' অজয় মুখার্জীর সেই কুৎসামূলক উক্তির প্রত্যাহার আমরা দাবী করছি এবং এ দাবী করছি আমরা পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি জনগণের স্বার্থে তো বটেই, যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিজের স্বার্থেও বটে।

যদি এ নীতির প্রশ্নের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হয় তা হলে শান্তি আলোচনার কথা বলা নিছক আত্মপ্রতারণা ও জনগণকে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছু হবে না।'

১৫

যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা এ নিয়ে যখন সব মহলে সংশয়, তখনই তার বিকল্প এক অবয়ব খাড়া করলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। ২৪ জানুয়ারি '৭০ হুগলীর দুটি জনসভায় তিনি প্রথম বিকল্পের আভাস দিলেন যার নাম 'শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট'। তিনি বললেন, আর তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট নয়, যে সব দল ও ব্যক্তি সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তাদের নিয়ে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গড়তে হবে।

এই যুক্তফ্রন্টের ধারণা সরাসরি পার্টি-কর্মসূচি থেকে নেওয়া, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির যা অপরিহার্য শর্ত।

বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে তিনি বললেন 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একদিকে চলেছে চক্রান্ত আর অপরদিকে তার সপক্ষে রয়েছে সংগ্রামী ঐক্য। আমরা যদি শহর ও গ্রামের গরীব মানুষের এই ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করতে পারি তবে সব চক্রান্তই পর্যুদস্ত করতে পারবে। (*গণশক্তি*, ২৫.১.৭০)

সি পি এম-এর দৃষ্টিতে বর্তমান যুক্তফ্রন্ট-এর আসল শক্তি নীচের তলায় মেহনতী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। ওপর তলায় পার্টিতে পার্টিতে, নেতায় নেতায় অন্তহীন কলহ সত্ত্বেও নীচের তলার ঐক্য অটুট। কারণ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মানুষের অসংখ্য লড়াই-এর মধ্য দিয়েই তো যুক্তফ্রন্টের জন্ম। অতএব বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখ পার্টিগুলির নেতারা ফ্রন্ট ভাঙতে চাইলেও তৃণমূল স্তরের কর্মীরা সে কাজে বাধা দেবে। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রস্তাবিত 'শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট'-এর মর্মবস্তু আসলে নীচের তলার কর্মী ও সাধারণ মানুষের ঐক্য।

প্রমোদবাবুর শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন সি পি আই নেতা ভবানী সেন এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে। তার কথায় পরে আসছি। আপাতত এটা স্পষ্ট যে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের কেন্দ্র সি পি আই- সি পি এম বিরোধ। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্তর্বিরোধ কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের মূল কারণ। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কেন ঘটবে?

পার্টি ভাগের পর দুটো দল দুদিকে ছিটকে গিয়েছিল— গড়ে উঠেছিল বিদ্বেষের দেওয়াল উভয়ের মাঝখানে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্বের দৌলতে কিছুটা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই শরিকের মধ্যে মতাদর্শগত ব্যবধান সত্ত্বেও। বর্তমানে আবার নতুন করে বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং দুটি পার্টির মধ্যে ব্যবধান রোজই বেড়ে চলেছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের কার্যকালের গোড়া থেকেই সি পি আই জানায়—তারা মার খাচ্ছে। *কালান্তর*-এর পাতায় সি পি এম-এর বিরুদ্ধে ভুরিভুরি নালিশ। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল :

(১) ১৯ মে '৬৯ হরিণঘাটায় পার্টি অফিসে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের হামলার ফলে দুজন গুরুতর আহত। প্রায় দুশো সি পি এম কর্মী ও সমর্থক লাঠি ও রড নিয়ে এই হামলায় অংশ নেয়। সি পি আই-এর স্থানীয় সম্পাদক ড. শক্তি ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট কর্মী করিম মণ্ডল গুরুতর আহত।

(২) ২৩ মে রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে সি পি এম সমর্থক ও সি পি আই সমর্থকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় দুজন সি পি আই সমর্থক আহত ও একজন সি পি এম সমর্থক (মণীন্দ্র হালদার) নিহত। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে যান সি. পি. আই নেত্রী রেণু চক্রবর্তী ও সি পি এম নেতা প্রভাস রায়।

(৩) ২৭ মে দুই পার্টির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দুটি পার্টির যৌথ বিবৃতি প্রচারিত। তাতে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

(৪) ২৪ জুলাই সি পি আই-এর ২৪ পরগণার জেলা নেতা অরবিন্দ ঘোষ ও কমল হালদার সি পি এম কর্মীদের দ্বারা নিগৃহীত। ২৩ জুলাই আমতলাতে নিরীহ বাসিন্দাদের ওপর একদল হামলা করে। তারা সেখানে সরেজমিন তদন্তে যান। ফেরার পথে সি পি এম-এর কাশীনাথ আদকের নেতৃত্ব ঐ পার্টির কয়েকজন লোক কমিউনিস্ট নেতাদের জঘন্যভাবে আক্রমণ করে।

সি পি এম-কে বাদ দিয়ে সি পি আই পশ্চিমবঙ্গে ফ্রন্ট গড়তে চায় না—এ কথা স্পষ্ট ভাষায় সি পি আই এর পক্ষ থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভূপেশ গুপ্ত আজ এখানে বলেন। ৩০ ডিসেম্বর '৬৯ তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম ছাড়া কোনও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের মনস্থ করেন নি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে তাঁর দল বিশ্বাস করে যে, সি পি এম বাড়াবাড়ি করেছে কিন্তু তাঁরা কখনই পশ্চিমবঙ্গে কোন মিনি ফ্রন্ট সরকার চান না। সি পি এম তা চাইতে পারে, আমরা নই (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১.১.৭০)

(৫) সি পি আই-সি পি এম সম্পর্কের অবনতির চরম নিদর্শন হল ২৪ পরগণার প্রসাদপুরের ঘটনা। সি পি আই দাবি করে এই ঘটনায় যে তিনজন কমিউনিস্ট কর্মী নিহত হয়েছেন তাদের হত্যাকারী সি পি এম।

২ নভেম্বর '৬৯ কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সম্পাদক ডা. রণেন সেন ও কমিউনিস্ট নেতা অজিত গাঙ্গুলী ও অরবিন্দ ঘোষ ঘটনাস্থল ঘুরে এসে এক মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা করে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, সি পি এম দলের নেতারা মুখে ঐক্যের বাণী উচ্চারণ করেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশে তাঁদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সংগ্রামের বুলি নিয়ে রাজনৈতিক ঠগীর দল সংগঠিত হচ্ছে। (*কালান্তর,* ৩.১১.৬৯)

পুঞ্জীভূত তিক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে দুই পার্টির মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় আসন্ন এবং তারই সঙ্গে পর্যুদস্ত যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বের ভিত্তিমূল। ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার জন্য ২৫ জানুয়ারি যুক্তফ্রন্টের বৈঠকটি শেষ প্রয়াস বলা চলে। সেই সভার অন্যতম সিদ্ধান্ত : 'যুক্তফ্রন্টের কোন শরিকদলের উপর আক্রমণ, তার দপ্তর অথবা কোন শরিকদলের দ্বারা পরিচালিত কোন গণসংগঠন অথবা তার নেতা, কর্মী অথবা সমর্থকদের উপর হামলা কিংবা কোন শরিকদলের দ্বারা সংগঠিত সভা বা মিছিলে বাধাদান যুক্তফ্রন্ট বিরোধী কাজ। এর দ্বারা যুক্তফ্রন্টের শত্রুদেরই সাহায্য করা হয়।

এই সভা যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দলের কাছে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে তাদের নিজ নিজ দলের সদস্য ও সমর্থকদের কাছে যেন এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে আদেশ জারি করা হয়। সমস্ত জনসভায় এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কথা তাদের ঘোষণা করতে হবে।' (*কালান্তর,* ২৮.১.১৯৭০)

সি পি এম-এর বিরুদ্ধে সি পি আই-এর অভিযোগ : সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সি পি এম হামলা শুরু করেছে।

উদাহরণস্বরূপ : ২৬ জানুয়ারি সি পি এম-পরিচালিত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মীরা নারকেলডাঙ্গায় ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী দুর্গাপদ সরকারকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

গতকাল বীরভূম জেলার ইসলামবাজার এলাকার টাকনা গ্রামের সাহানাপাড়ার অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি সি পি এম-এর লোকেরা লুঠ করে নিয়ে গেছে।

আজ সকালে পশ্চিম মগরাহাটার শ্রী চন্দা স্কুলের হেডমাস্টার বাংলা কংগ্রেসের সমর্থক শ্রী শিশুপাল দাসকে সি পি এম-এর কর্মীরা ছুরিকাহত করেছে। গতকাল বাংলা কংগ্রেস আয়োজিত করিমপুরের জনসভা আক্রমণ করে ভেঙে দিয়েছে।

আজ সকালে সি পি এম কর্মীরা ট্যাংরায় এস ইউ সি-র কর্মীদের উপর সুপরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ চালিয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গত ২৫ জানুয়ারি যুক্তফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল, 'কোন দল অপর দলের নেতা কর্মী বা দফতরের উপর হামলা করবে না।'

প্রস্তাব গ্রহণের পর ২৪ ঘণ্টা কাটার পূর্বেই সি পি এম প্রস্তাব অগ্রাহ্য কে বিভিন্ন দলের উপর হামলা শুরু করেছে দেখে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন। (*কাল ত্তর*, ২৭.১.৭০)

৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভাতেই রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের সমাপ্তি সূত্রে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন : শরিকী সংঘর্ষ, প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থার গুরুতর বিচ্যুতির কারণে 'এই অবস্থা অসহনীয়'। তিনি বলেন, এর প্রতিকার চ ই। এ জিনিস পাঁচবছর ধরে চলতে পারে না, পারে না, পারে না।

অন্যদিকে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও মনে করেন, বেশিদিন এভাবে চলতে পারে না। তিনি বলেন, আমরা যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিতে চাই তাহলে উচিত জনসাধারণের কাছে গিয়ে সে কথা ঘোষণা করা।

বিধানসভার ভিতরে ফ্রন্টের এই বেহাল অবস্থা কংগ্রেসের পক্ষে নিশ্চয়ই উপভোগ্য ঘটনা। বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সে সুযোগ সদ্ব্যবহার করে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা আর সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে চান না, সুতরাং তাঁরা কোন ডিভিশন দাবি করবেন না। (*কালান্তর*-৬.২.৭০)

সি পি আই-এর মতে, ফ্রন্টের বর্তমান সঙ্কটের জন্য মূলতঃ দায়ী সি পি এম, তবে বাংলা কংগ্রেসের মূল্যায়নও সঠিক নয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে গতকাল বিধানসভায় বাংলা কংগ্রেস ও সি পি এম মন্ত্রীদের তীব্র মতপার্থক্যের বহিঃপ্রকাশে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, 'বর্তমান সঙ্কটের জন্য প্রধান দায়ভাগ হল সি পি এম নেতৃত্বের যাঁরা অব্যাহত ও ইচ্ছাকৃতভাবে শরিক দলগুলির বিরুদ্ধে বৈরিতা, কুৎসা ও হামলাসহ আক্রমণ চালানর নীতি অনুসরণ করছেন।'

'সেই সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, এই সরকার ''অসভ্য ও বর্বর'' প্রভৃতি যে মূল্যায়ন করেছে, কমিউনিস্ট পার্টি তার সঙ্গে একমত নয়।' রাজ্য পরিষদ বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে সি পি এম-এর প্ররোচনার

ফাঁদে পা দিয়ে তাঁরা যেন এমন কিছু না করেন বা বলেন যাতে যুক্তফ্রন্টকে বিভক্ত করতে সি পি এম-কে আরো সাহায্য করতে পারে।

'যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ আগামী ১২ থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যব্যাপী ''যুক্তফ্রন্ট বাঁচাও অভিযান'' চালাবার জন্য পার্টির সভ্য ও দরদীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।' (*কালান্তর*, ৭.২.৭০)

পরিশেষে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য সি পি এম-কেই দায়ী সাব্যস্ত করল সি পি আই, যেহেতু প্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাব এনেছেন। তার জবাবে সি পি আই নেতা ভবানী সেন লিখলেন একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ। যেখানে তিনি প্রমোদ দাশগুপ্তের মেহনতী মানুষের ফ্রন্ট গড়ার তত্ত্বকে ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতি ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে সর্বনাশা লাইন বলে চিহ্নিত করেন। এখানে নিবন্ধটির অংশবিশেষ তুলে ধরা হচ্ছে।

যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে কে? জনগণের সংগ্রামকে ধ্বংস কে করছে?

পশ্চিমবাংলার সি. পি. এম সম্পাদক শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্ত আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে তাঁর দল পশ্চিমবাংলায় মেহনতী শ্রেণীগুলির ঐক্য ভিত্তিক এক নতুন ধরণের যুক্তফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা করবে। এই বর্তমানের যুক্তফ্রন্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। এই নতুন যুক্তফ্রন্ট তার থেকে আলাদা ধরণের হবে।

এই কথা কটি দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিমবাংলার বর্তমান যুক্তফ্রন্টের মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করেছেন।

প্রমোদ দাশগুপ্তের ঐ বিবৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বর্তমানের যুক্তফ্রন্ট কখনও যুক্তফ্রন্ট ছিল না এবং এখন তো নয়ই। আসল যুক্তফ্রন্ট সি পি এম. এই যুক্তফ্রন্টের বাইরে গড়ে তুলবে।

সি পি এম যে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে ঐ বিবৃতি তার অখণ্ড নজির। বিবৃতিতে বর্ত্তমান ফ্রন্টের বদলে ''টয়লার্স ফ্রন্ট'' বা ''মেহনতী মানুষের ফ্রন্টের'' গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যার অর্থ হল সি পি এম জনসাধারণকে অন্যান্য পার্টি থেকে বিতাড়িত করতে এবং জনগণের কাছ থেকে অন্যান্য পার্টিদের বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এর অর্থ হল সর্বক্ষেত্রে বিভেদ এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ।

সি. পি. এম নেতৃত্ব যে নতুন যুক্তফ্রন্টের কথা বলছে তা তিনটি ধারণার ভিত্তিতে, যথা (১) এই ফ্রন্ট একমাত্র সি. পি. এম এর দখলে থাকবে, অন্য পার্টিদের বাদ দেওয়া হবে। (২) কেবল মেহনতী শ্রেণীগুলি যেমন শিল্পশ্রমিক এবং ক্ষেতমজুরদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে—সমাজের মধ্য শ্রেণী, যেমন পাতি বুর্জোয়াদেরও বাদ দেওয়া হবে। (৩) এই মেহনতী শ্রেণীরও যে অংশ সি. পি. এম. ছাড়া অন্যান্য পার্টির অনুগামী—এ নতুন ফ্রন্ট থেকে তাদেরও বাদ দেওয়া হবে।

কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন পর্যবেক্ষকই লক্ষ্য না করে পারে না যে পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে যে যুক্তফ্রন্ট আছে সেখানে সর্বোচ্চ ঐক্য প্রতিফলিত। কারণ মেহনতী শ্রেণীগুলির কোন না কোন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী বামপন্থী দলগুলি এই ফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ।

বর্ত্তমানে ''বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যে যুক্তফ্রন্ট'' আছে তার পরিবর্তে ''মেহনতী শ্রেণীগুলির ঐক্য ভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের'' কথা বলার অর্থ হল ১৯৬৬ এবং

১৯৬৮ সালে জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যুক্তফ্রন্ট জন্ম নিল তাকে অস্বীকার করা। বস্তুত প্রমোদ দাশগুপ্তের শ্লোগানের সার কথা হল শ্রেণীসংগ্রাম পরিত্যাগ করা।

জনগণের যে নতুন ধরণের ঐক্য পশ্চিমবাংলায় গড়ে উঠছে তা যেমন সি. পি. এম-এর একচেটিয়া নয়, তেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বোঝাপড়ার বিরোধী নয়।

পাট, সূতী শিল্পীর এবং বাগিচা শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্ত কমিটি হয়েছিল। বর্ত্তমান যুক্তফ্রন্টে যে সব পার্টিগুলি প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাজ্য সরকারে ক্ষমতার শরিক তারা সকলেই এই সাফল্যের সমান অংশীদার। কৃষকদের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা, যদিও কমিউনিস্ট পার্টি ঐ সংগ্রামে প্রধান ভূমিকায় আছে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত ভুলে যেতে চাইছেন যে বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্যই শ্রেণী সংগ্রামের নতুন জোয়ার এসেছে এবং যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলি ঐ শ্রেণীর অংশবিশেষ। শ্রেণী ছাড়া পার্টি এবং পার্টি ছাড়া শ্রেণীর যে ধারণা তাঁর বিবৃতিতে আছে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্বের বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত, অবশ্য একমাত্র সি. পি. এম এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে আরও প্রসারিত করে মেহনতী শ্রেণীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে কোনো দল যদি বাধার সৃষ্টি করে থাকে তবে সে দল সি. পি. এম। কারণ তারাই জিদের সঙ্গে কারখানা, গ্রাম ও থানা স্তরে যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠনে বাধা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রমোদ দাশগুপ্তের এই নতুন যুক্তফ্রন্টের তত্ত্বের মধ্যে নতুন কিছু নেই। এ হল বি. টি. রণদিভের সেই পুরনো স্লোগানের চর্বিতচর্বণ, যিনি ১৯৪৯ সালে গোটা পার্টিকে সংকীর্ণতাবাদের সীমাহীন খাদে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যা পার্টিকে প্রায় ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ সময়ে বামপন্থী ঐক্যের পরিবর্তে মেহনতী শ্রেণীগুলির ঐক্যের আওয়াজ দেওয়া হয়েছিল বামপন্থী পার্টিগুলি ছাড়াই এবং তাদের বিরুদ্ধে এই ফ্রন্ট ''নীচের তলা থেকে'' গড়ে উঠবে। ১৯৪৯ সালের সেই পরিত্যক্ত রাস্তাতেই সি. পি. এম নেতৃত্ব তাদের পার্টিকে আবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকে জনগণের ফ্রন্টের পাল্টা শ্লোগান হিসেবে ট্রটস্কীপন্থীদের চতুর্থ আন্তর্জাতিক থেকে এই মেহনতী শ্রেণীগুলির ফ্রন্টের শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল। ট্রটস্কীপন্থীদের ''টয়লার্স ফ্রন্ট'' মেহনতী শ্রেণীর অংশীদার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বোঝাপড়া নিষিদ্ধ করে প্রমোদ দাশগুপ্তের ''মেহনতী শ্রেণীগুলির ঐক্যের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট'' আসলে এক বিষয়।

প্রমোদ দাশগুপ্ত মেহনতী শ্রেণীগুলির মধ্যে ঐক্য ছাড়া অন্য কিছু চান না, তা যে কত অন্তঃসারশূন্য এইসব প্রয়াস থেকে তা ধরা পড়ে। কেরালার যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দিয়ে সি. পি. এম মেহনতী শ্রেণীগুলির ঐক্য ভেঙেছে এবং পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে ওরা কেরালার ঘটনার পুনরনুষ্ঠান চাইছে।

কিন্তু যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা নিঃসন্দেহে মেহনতী শ্রেণীগুলির মিত্র তাদের সম্পর্কে কি হবে? শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীরই বা কি হবে? কৃষক, ছোট উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদেরই বা কি হবে? সর্বোপরি একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামই বা কিভাবে হবে?

সি. পি. এম-এর এই নীতি মেহনতী শ্রেণীগুলির শুধু নিজেদের ঐক্য নষ্ট করবে না, তাদের মিত্রদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবে। এই পথে চললে তারা বিপ্লবের সর্ব্বনাশ করবে। (সে

বিপ্লব জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক যাই হোক)। এমন কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ও মধ্যচাষীদের অবহেলা করা যাবে না। ট্রটস্কীপন্থীদের "টয়লার্স ফ্রন্ট" এমনকি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেও অস্বীকার করে। এই হল সি. পি. এম-এর সেই লাইন যা কেরালা ও পশ্চিমবাংলায় এত প্রবল ভাবে অনুসৃত হচ্ছে। এই পথ হল মার্কসবাদ লেনিনবাদ পরিত্যাগের পথ। (*কালান্তর*, ২.২.১৯৭০)

ভবানী সেনের রচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিরন্তর যে ধরণের কাজিয়া অব্যাহত তা দৃশ্যত অরাজনৈতিক। এই প্রথম সি পি আই-এর পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত বলা হল এবং এ বিষয়ে সি পি এম-এর সঙ্গে মতবিরোধের তাত্ত্বিক ভিত্তিও তুলে ধরা হল সুপরিচিত কমিউনিস্ট পরিভাষায়। পার্টি অবিভক্ত থাকলে হয়তো যুক্তফ্রন্টের নীতি ও কৌশল নিয়ে আলোচনা সমালোচনা বিতর্কের ঝড় বয়ে যেত পার্টির মধ্যে। এখন তো তা হবার কথা নয়। সুস্থ রাজনীতির দিন ফুরিয়েছে এবং রাজনৈতিক বিতর্কের অবকাশ কোথায় আজ? ভবানীবাবুর লেখাটির জবাবে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে কোন তাত্ত্বিক রচনা চোখে পড়ে না। দুই পার্টির মধ্যে বোঝাপড়ার দিন শেষ এবং তার সঙ্গে শেষ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরমায়ু।

১৬

একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আসন্ন, অপরদিকে চারু মজুমদার আহ্বান জানাচ্ছেন 'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন'। তিনি লিখছেন :

'সত্তরের দশক শুরু হয়েছে। এই দশককে ভারতের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দশকে পরিণত করুন। চেয়ারম্যান মাও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সফল আমরা হবোই।' (*দেশব্রতী*, ২২.১.১৯৭০)

চারু মজুমদারের হাজারো তরুণ অনুগামীদের অন্যতম আশুতোষ মজুমদার, সি পি আই (এম-এল) এ যোগ দেবার কারণ জানাচ্ছেন দাদা, অরুণ মজুমদারকে :

'... আমরাই ভারতবর্ষের প্রথম সংগঠিত ও সার্বিক নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী। আমাদের সবই যে ঠিক তা বলি না। তবে আমাদের সঙ্গে অন্যদের তফাৎ এই যে আমরা বিপ্লবে শুধু বিশ্বাসী নই, হাতে কলমে বিপ্লব করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভুল আমাদের কোন কৌশলগত দিকে থাকতে পারে, কিন্তু হাতে কলমে কাজ না করলে ভুল ধরা পড়বে না, হয়তো ভুলের জন্য নিদারুণ মাশুল দিতে হবে। আমাদের মত হাজার যুবকের রক্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবেই কোন্‌টা ভুল বা কোন্‌টা সঠিক। আমার জন্য মাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করবেন, আপনি দেখবেন মাকে।'

আশু মজুমদার কবিতা লিখতেন। মায়ের উদ্দেশে লিখছেন : সুবোধ হব মা একদিন / দেখবে মা যেদিন জ্বলবে / প্রদীপ, / একযোগে। / গ্রামে গ্রামে, আলো জ্বেলে / আলোতে

আলোয় ভরপুর হয়ে / 'আমরা সেইদিন হব শান্ত'।

বিপ্লবের আকাঁড়া আবেগ অবশ্যই জন্ম দেবে কবিতা। তাই দ্রোণাচার্য ঘোষও লিখলেন : 'আমার স্বপ্নের রং লাল / বয়সের শব্দে শুধু শোষণ ছেঁড়ার দিনকাল।'

এই তরুণদের কাছে বিপ্লব ও কবিতা সমার্থক। যেমন অসীম রায়ের *অসংলগ্ন কাব্য*-র নায়ক গদ্যের ভাষায় কথা বললেও তাতে রয়েছে কবিতার ছোঁওয়া :

'আমার আটাশ-ঊনত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম গড়ে উঠেছিলাম। আমাদের অহল্যা অস্তিত্বে এই আলোড়ন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। সর্বত্র পরিবর্তনের এই নতুন চারা অঙ্কুর মেলেছিল। আমার চোখের সামনে আমাদের অতিপরিচিত আলকাতরা লাঞ্ছিত শহরতলীর পোড়ো দালান, দোকান, খোলা ড্রেন আর ফুটপাথহীন সরু রাস্তায় গায়ে পড়া বাস আর মাস্তানী চীৎকার সবই এক স্বর্গরাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। ... সেই সে খবরের কাগজের হেডলাইনে রাজনৈতিক নেতাদের কথায় অথবা একধরণের প্রাণহীন কবিতায় নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলা হয় সেই সূর্যোদয় ঘটবে আমাদেরই জীবদ্দশায়।' (*অসংলগ্ন কাব্য*, পৃ. ৮৮)

প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখছেন :

'রাত গভীর হলে ছেলেটি আসত লুকিয়ে তার মায়ের কাছে। মা জানত না ছেলেটি কি করে বেড়ায়, শুধু জানত পুলিশ তাকে খুঁজছে। পেলে মেরে ফেলবে। একদিন ছেলেটি মাকে সব খুলে বলল, তারা যা কিছু করছে (হতে পারে পুলিশ আর সি পি এম-এর ছেলেদের খুন করা)—তা কোনটাই নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। তারা এমন এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় সেখানে কোন অভাব থাকবে না কারও—অঢেল সুখ আর সম্পদের মধ্যে বাস করবে সকলে। ছেলেটি গুন্‌গুন্ করে শুনিয়েছিল একথাগুলি তার মাকে কতকটা স্বগতোক্তির মতো। (*মার্জিনাল ম্যান*, পৃ. ৪২৯)

ছেলেটি জানত না কীভাবে কতদিনে কায়েম হবে তার ইউটোপিয়ার জগৎ। নৈহাটি রেল ইয়ার্ড পুলিশের গুলিতে একদিন সে লাশ হয়ে গেল।

আবার শুনুন *অসংলগ্ন কাব্য*-র নায়কের উক্তি :

'শুধু শ্যামল গাঙ্গুলীর মতো ওয়াগন ব্রেকারের নেতারাই নন, সেইসব লোকজন যারা যখন যেমন তখন তেমন দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে জোঁকের মত সমাজের সব রস শুষে খাচ্ছে তারা তটস্থ, আতঙ্কিত। এই আতঙ্কের প্রয়োজন ছিল।...

আমাদের গঙ্গার ধারের বস্তিতে এই নতুন চেতনার বৈজয়ন্তী উড়তে দেখেছিলাম। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা লেনিন পড়ছে, মাও-সে-তুং পড়ছে। এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। আমরা সবাই তার শরিক, আমরা সবাই আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা এই বোধ বিদ্যুতের মত আমাদের এ অঞ্চলকে এক উদ্দীপনায় তাড়িত করেছে।' (পৃ. ৮৭)

তখন কি তারা জানত এই বিরাট উৎসবের লক্ষ্য কেবল এক বিশাল শোকযাত্রা? এই কলরব শুধু এক সমাধিক্ষেত্রের নৈঃশব্দ্যের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে? 'বিপ্লবের অসংলগ্ন কাব্য' রচিত হল যে মৃতদের কবিতার পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে তাদেরই অন্যতম আশু মজুমদার ও দ্রোণাচার্য ঘোষ।

১৭

সত্তরের দশক মুক্তির দশক। মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্র এবার গ্রাম নয়, শহর। বিপ্লবের রথের চাকা চলবে শহরের রাজপথ ধরে, গ্রামের আলপথ বেয়ে নয়। মৃণাল সেনের মতে, গ্রাম থেকে নকশাল আন্দোলন যখন শহরে চলে এল তখন ঘটল সর্বনাশ। রবীন্দ্র রায় লিখছেন, কলকাতার ছাত্র ও যুব সমাজ এতদিন অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। এরপর থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরে শহরের নানা জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ : ১৯৭০-৩রা মার্চ চীনবিরোধী চলচ্চিত্র *প্রেমপূজারী* দেখান হচ্ছিল বলে কলকাতার সাতটি সিনেমা হলে একযোগে হামলা চালায় ছাত্ররা।

রবীন্দ্র রায়ের মতে, চারু মজুমদারের কৃষক লাইনের ব্যর্থতা থেকে শহরে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব। কৃষক এলাকায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই বলেই শহরের দিকে পশ্চাদপসরণ। প্রসঙ্গত সি পি এম-এল-এর বেশির ভাগ নেতা ও সংগঠক শহরের ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ও সামান্য কিছু মজুর। কলকাতার ছাত্রদের জঙ্গীপনায় মুগ্ধ চারু মজুমদার ও সরোজ দত্ত হঠাৎ পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেও বৈপ্লবিক চরিত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁরা এতকাল শুধু ছাত্রদের কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে বলেছেন।

রবীন্দ্র রায় পুরোপুরি নিশ্চিত যে, কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হিংসা ও সন্ত্রাসের ঘটনা থেকেই উদ্ভব চারু মজুমদারের 'সত্তরের দশক হবে মুক্তির দশক' ঘোষণাবাক্যটি। চারু মজুমদার এসব পেটি-বুর্জোয়া ছাত্র-যুবকদের মধ্যে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের ক্যাডার খুঁজে পেয়েছেন, কারণ তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের শোধনবাদী অতীতের কলঙ্কমুক্ত। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-১১)

কলকাতা ও অন্যান্য শহরের বুকে যে সব 'বৈপ্লবিক' ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'ক্যাম্পাস বিদ্রোহ', অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চত্বরে প্রবল বিক্ষোভ-প্রক্ষোভ-ভাঙচুর ইত্যাদি। এর প্রধান হোতা ছাত্ররা। লক্ষণীয় যে একদল মেধাবী ছাত্রও এক ধরণের নৈরাজ্যবাদী বিশৃঙ্খল উল্লাসে মেতে উঠেছিল। কেন মেতে উঠেছিল তার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে এবং নানা জনে তা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। আপাতত অজিত রায়ের ব্যাখ্যাটি শোনা যাক। তিনি বলছেন, 'মেধাবী ছাত্ররা নকশাল আন্দোলনে চলে এল কারণ তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ চত্বর এত অশান্ত।'

তারপর শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি যখন শুরু হল তখন পেল এক ভিন্ন মাত্রা। তারই সঙ্গে শুরু নকশাল রাজনীতিতে লুম্পেনদের অনুপ্রবেশ এবং পরে তাদেরই একাধিপত্য। রবীন্দ্র রায় লিখছেন, শ্রেণীশত্রু কারা? কলকাতার বুকে সন্ত্রাসের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াল : সাধারণ পুলিশকর্মী, সি পি এম ক্যাডার, ছুটকো ছাটকা অসৎ ব্যবসাদার বা সুদখোর এবং বিরোধী রাজনীতির লোক। তাদের খতম করা হবে কেন? না, তারা বিপ্লবের পথ আটকাচ্ছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০)

নকশালদের গ্রাম থেকে শহরে ফিরে আসা প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষ লিখছেন, 'নকশালবাড়ির আগুন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিবে যায়। কালক্রমে নকশালবাড়ি

বিপ্লবের ভূত প্রধানত কলকাতা শহরে এসে নৃত্য শুরু করে এবং মাওবাদকে সসম্মানে কবরস্থ করে, ব্যক্তিগত হত্যা ও সন্ত্রাসের পথে মোড় নেয়।' (*দেশ*, ২৯ শ্রাবণ ১৩৭৮)

কেন তারা শহরে ফিরে এল? তার উত্তরে *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*-র প্রতিবেদক জানাচ্ছেন :

... যাদের মুক্তির জন্য শহুরে আদর্শবাদীরা গ্রামে বিপ্লব ঘটাতে গিয়েছিল, সেই ভূমিহীন ও গরীব চাষীরাই হয় তাদের বাধা দিয়েছে অথবা পাত্তাই দেয়নি। আমার সঙ্গে ১৯৬৯ সালে সদ্য গ্রাম থেকে ঘুরে আসা এক নকশাল অ্যাকটিভিস্টের দেখা হয় এবং দীর্ঘ আলোচনা হয়। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র। সে বলেছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিনীতি চাষীকে বিপ্লববিমুখ করে তুলছে। কারণ চাষী এখন জমির—তা সে যত সামান্য হোক— মালিক হবার স্বপ্ন দেখছে। তাই আমাদের কৃষিবিপ্লব সফল হবে না। যুক্তফ্রন্টের আমলে বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃত্বে বে-আইনী অথবা আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে যে জমি দখলের লড়াই শুরু হল, তাও নকশালদের সশস্ত্র কৃষি অভ্যুত্থানের দিবাস্বপ্ন ভেঙে দিল।' (*ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ১০.৭.৭১)

অতএব ১৯৬৯ সালের শেষ দিক থেকে গ্রামের গেরিলারা শহরে ও শহরতলিতে এসে ঘাঁটি গাড়ল। তারপর, গৌরকিশোরের ভাষায়, 'স্কুল পোড়ানো, মূর্তি ভাঙার জোয়ার এল।' তার মানে এই নয় যে তারা সভা মিছিল এসব করেনি। করেছে এবং এসবও তাদের ভাষায় 'গেরিলা অ্যাকশন'। *দেশব্রতী* (২২.১.৭০) লিখছে : 'বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে কলকাতার শ্রমিক ও অন্যান্য অঞ্চলে বিপ্লবী জনতার মিছিল'। (সংবাদ শিরোনাম)

'কিছুদিন ধরে সমস্ত কলকাতা জুড়ে এবং এক-একদিন এক-এক এলাকায় সন্ধ্যার অন্ধকারে শ্রেণীশত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোপনভাবে সংগঠিত বিরাট বিরাট মিছিল বেরুচ্ছে। ...

... মিছিলগুলো সংগঠিত হচ্ছে গোপন পার্টি সংগঠন মারফতই... রাত্রিতে অত্যন্ত গেরিলা কায়দায়; নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে হঠাৎ জমায়েত। তারপর জঙ্গী স্লোগান তুলে মিছিল চলতে থাকে বড় রাস্তা বাঁচিয়ে ভেতরের অলিগলি দিয়ে পাড়ায় এবং দুধারে কাতারে কাতারে জনতা মনোযোগ দিয়ে সে স্লোগান শোনে ও ইস্তেহার পড়ে।'

দেশব্রতী-র পাতা থেকে এখানে এ'জাতীয় কয়েকটি মিছিলের নমুনা তুলে ধরা হল :

১. ২০ ফেব্রুয়ারি '৭০: তারাতলা-হাইড রোড সংগঠনী কমিটির (সি. পি. এম-এল) ডাকে বন্ধ কারখানার লড়াকু শ্রমিকদের সংগ্রামের সমর্থনে মিছিল। মিছিলের সামনেই ছিল চেয়ারম্যান মাও-এর বিরাট প্রতিকৃতি ও বিরাট লাল ঝাণ্ডা। সি. পি. এম-এল-এর গোপন সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠিত প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক যুব ছাত্রের মিলিত মিছিল তারাতলা রোড ধরে হঠাৎ চলতে শুরু করে। তারাতলা রোডের ওপর কয়েকমাস ধরে বন্ধ এয়ারকণ্ডিশন কারখানা, আরও একটি বন্ধ কারখানা জে. কে. বিজনেস প্রভৃতির সামনে মিছিল পৌছলে পর সংগ্রামী শ্রমিকরা মিছিলকে স্বাগত জানান। লড়াকু শ্রমিকরা মিছিলের জঙ্গি শ্লোগানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন।

২. ২৮ মার্চ '৭০ : কল্যাণী শহরে দৃপ্ত মশাল মিছিল। মেদিনীপুর সহ বাঙলার প্রায় সব জেলাতেই সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থনে এই মিছিলটি সারা শহর পরিক্রমা করে। সকলের হাতে মশাল ও কণ্ঠে শ্লোগান। মিছিলটি দেখে কল্যাণী শহরের প্রতিক্রিয়াশীলরা আতঙ্কিত।

প্রতিক্রিয়াশীল সি. পি. এম বাধা দিতে চেষ্টা করলে, বিপ্লবীরা তাদের মোকাবিলার জন্য রড ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে তারা কুকুরের মত পালিয়ে যায়।

একই দিনে বহরমপুর শহরে ও টাকি-হাসানাবাদ অঞ্চলে *রেড বুক* হাতে জঙ্গী মিছিল পথ পরিক্রমা করে ও 'জনতার মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার তরঙ্গ তুলে গেরিলা কায়দায় মিলিয়ে যায়।'

৩. ২৯ মার্চ '৭০: কণ্ঠে বিপ্লবী শ্লোগান নিয়ে এক বিরাট মিছিল টিটাগড়ের শিল্পাঞ্চল পরিক্রমা করে। দুপাশে কাতারে কাতারে শ্রমিক ও মেহনতী জনতা দাঁড়িয়ে দেখে এবং তারা উল্লাস প্রকাশ করে। ছয় মাইল পথ পরিক্রমা করে আবার টিটাগড় স্টেশন রোডে এসে হঠাৎ মিছিলটি মিলিয়ে যায়।

৪. ৪ এপ্রিল '৭০: সি পি আই (এম-এল)-এর বেলেঘাটা আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে স্থানীয় বিপ্লবীগণ ক্যালকাটা ল্যাম্প ওয়ার্কস ও প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের লড়াকু শ্রমিকদের সমর্থনে সংগঠিত মিছিলটি এলাকার শ্রমিকমহলে বিশেষ সাড়া জাগায়।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, মিছিলগুলি যদি বিপ্লবের প্রচার অভিযান হয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যা চলছে— সে তো নিখাদ বিপ্লবের মহড়া। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত *দেশব্রতী*-র পাতা থেকে :

১. ৩১ জানুয়ারি '৭০: ডেবরা গোপীবল্লভপুরের সংগ্রামী কৃষকের রক্ত মাখা হাত নিয়ে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে দেব না / বিপ্লবী ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে শিক্ষামন্ত্রীর পলায়ন (সংবাদ শিরোনামা)। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সি পি এম-এর পান্ডা ঝানু সংশোধনবাদী সত্যপ্রিয় রায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে উঠে কিছু বলতে না বলতেই শত শত বিপ্লবী ছাত্র প্রতিবাদ করে বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান দিতে থাকেন, ডেবরা গোপীবল্লভপুরের কৃষকের রক্ত মাখা হাত নিয়ে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে দেব না। ..... মন্ত্রীমশাই তার পার্টির ফাসিস্ত যুব ফৌজের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও আর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে সাহস করে না, বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই সে পালিয়ে যায়।

২. প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন বাতিল (সংবাদ শিরোনামা)। শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদার ছাত্রদের কাছে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানানোর পরই ... ১৪ জানুয়ারি (মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ দিন) বিপ্লবীরা ব্যাপক ছাত্র সমাবেশ করেন। তিন চার জন অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র ফেলবার বাক্সটি নিয়ে আসেন। সাধারণ ছাত্রদের সামনে নির্বাচনের নোটিশ এবং মনোনয়নপত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে গিয়ে প্রিন্সিপালকে নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বলেন। প্রিন্সিপাল প্রথমে রাজী হয় না। এই সময় ছাত্রদের বিপ্লবী মেজাজ এমন পর্যায়ে উঠে যায় যে তাঁরা ঐ ঘরে টাঙ্গানো গান্ধীর ছবি নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন এবং চেয়ারম্যান মাও-এর উদ্ধৃতিসহ পোষ্টার লাগিয়ে দেন। ঘরের সমস্ত দেওয়ালে ওয়ালিং করে দেন এবং শ্লোগান দিতে থাকেন। ছাত্রদের এই বিপ্লবী মেজাজের সামনে প্রিন্সিপাল নতি স্বীকার করে এবং নোটীশ দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।

৩. ১৮ ফেব্রুয়ারি, '৭০: মিশনারী কলেজের পাদ্রী শয়তানদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্রদের বিদ্রোহ। কলকাতার বনেদীপাড়া পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অন্যান্য কলেজের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিচালনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিদেশী মিশনারীদের একমাত্র কাজ ভারতে বিপ্লব ঠেকানর জন্য 'মানুষ' তৈরী করা। এরা সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের দালালী

করে।...

... সম্প্রতি কিছু বিপ্লবী ছাত্র কলেজ লাইব্রেরীতে 'দেশব্রতী' ও 'লিবারেশন' রাখবার দাবীতে উপাধ্যক্ষের কাছে যান; উপাধ্যক্ষ ফাদার হুয়ার্ট, একজন বেলজিয়ান পাদ্রী। নানা অজুহাত দেখিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ দাবী মানতে অস্বীকার করে। স্বাভাবিকভাবেই কোন যুক্তিই তারা খাড়া করতে পারেনি। বিপ্লবী ছাত্রদের শ্রেণীঘৃণা এমন ভাষা পায় যে তারা এই অসম্মতির পর লাইব্রেরী তছনছ করেন এবং মোটা মোটা ইয়াংকী বইগুলো এনে ঐ বেলজিয়ান পাদ্রী উপাধ্যক্ষের মুখে ছুঁড়ে মারেন। ফলে তার চশমা ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়বার তারা লাইব্রেরীতে ঢুকলে, কর্তৃপক্ষ অফিসঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় ভয়ের চোটে। বিপ্লবী ছাত্ররা লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে উপাধ্যক্ষের টেবিল উপড়ে ফেলেন, টাইপরাইটার ও ফোন আছড়ে ফেলেন, ফাইলপত্র ছুঁড়ে অফিস ঘর তছনছ করেন। অধ্যক্ষ অর্থাৎ ফাদার বুহোম নামে আরেক ইউরোপীয় পাদ্রী বাধা দিতে এলে চড় ও পেটে ঘুষি খেয়ে পালিয়ে যায়। এরপর জনৈক বিপ্লবী ছাত্র জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমরা যেন মনে রাখি, জ্যোতি-ইন্দিরা-চ্যবন আর এই ফাদারগুলো একই লোক। এই ফাদারগুলোও ভারতবর্ষে বিপ্লবী কৃষকের রক্তে, শ্রীকাকুলামের শহীদদের রক্তে হাত রাঙিয়েছে। সুতরাং এদেরকে শ্রেণীশত্রু হিসাবে গণ্য করাই উচিত। এবং সেইদিক দিয়ে দেখলে এদেরকে মারা এমন কিছু বড় কথা নয়', এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীরা সমবেত ছাত্র, দিশী শিক্ষকদের ও অ-শিক্ষক কর্মচারীদের কাছে বিপ্লবী রাজনীতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।...

... প্রতিক্রিয়াশীল পাদ্রীরা কলেজ থেকে ৫ জন বিপ্লবী ছাত্রকে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু বিপ্লবী ছাত্ররা তা মুখ বুঁজে মেনে নেবেন না।

৪. ১০ এপ্রিল, '৭০: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্ররা প্রতিবিপ্লবীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। বিপ্লবী ছাত্ররা যাদবপুরে সি আই-এ-র সংস্থা ওয়ার্লড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস এবং মেহনতী জনগণের স্বার্থবিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ভারতকে বিকিয়ে দেওয়ার অন্যতম ঘৃণ্য চক্রান্তকারী গান্ধী দর্শন প্রচারের সংস্থা গান্ধী স্টাডি সেন্টারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুছে দিতে দৃঢ়সংকল্প হন। ...

... কমরেড চারু মজুমদারের নির্দেশিত গোপন পার্টির সঠিক ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁরা বিপ্লবী কায়দায় একটি সমাবেশ সংগঠিত করেন। এই সমাবেশে একজন ছাত্র কমরেড সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই সংস্থাগুলির চরিত্র উদ্ঘাটিত করেন। তারপর ব্যাপক ছাত্রদের একটি দৃপ্ত জঙ্গী মিছিল যার লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল অপূর্ব বিপ্লবী শৃঙ্খলা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা শুরু করে। বেলা তখন একটা। সঙ্গে সঙ্গে দুটো 'অ্যাকশান স্কোয়াড' একই সময়ে পরস্পরের থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ওয়ার্লড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস অফিস এবং স্টাডি সেন্টারের উপর আক্রমণ চালিয়ে তীব্র ঘৃণার সাথে অফিসের জিনিসপত্র তছনছ করেন, আগুন লাগিয়ে দেন ও ঘৃণ্য প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীর প্রতিকৃতি পুড়িয়ে ফেলেন। খুব দ্রুততা এবং তৎপরতার সাথে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে 'অ্যাকশান স্কোয়াড' দুটি মিছিলের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনা যেমন ছাত্র জনতার বিপ্লবী চেতনাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ ও নয়াসংশোধনবাদী মুষ্টিমেয় দালালদের মধ্যে প্রচণ্ড ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।

এ জাতীয় বেশ কিছু ঘটনা। তারই পাশাপাশি স্কুল পোড়ানো শুরু হল। উদ্দেশ্য প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ। এবং মনীষীদের মূর্তিভাঙা, যার উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রচলিত ঐতিহ্যের মুখে পদাঘাত। এ সবই 'বিপ্লবে'র মহড়া, কিন্তু সাধারণ মানুষ হতচকিত। এমনকি নকশাল অনুগামীদের একাংশের মধ্যেও সমালোচনার গুঞ্জন : এসব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তাদের জবাবে সরোজ দত্ত (শশাঙ্ক) লিখছেন : 'জনতা ভুল কাজ করে না, বিপ্লব মানেই বাড়াবাড়ি। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন, বিপ্লব মানেই বাড়াবাড়ি। আমরা সংশোধনবাদীদের মত বিপ্লবের প্রস্তুতি করছি না, আমরা বিপ্লব করছি; তাই বাড়াবাড়ির ভয় করলে আমরা বিপ্লবী থাকব না। যুবছাত্রদের যদি অভিনন্দিত করতে হয়, তবে এই বাড়াবাড়ির জন্যই করব।'

মূর্তি ভাঙার সমর্থনে তিনি লিখলেন : '... তারা গান্ধীর মূর্তিকে ভাঙছে মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। কারণ চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন—না ভাঙলে গড়া হয় না।

ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যখন ফাঁসিতে উঠেছিল বিদ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে বৃটিশের জয়গান করে 'বাংলার ইতিহাস' রচনা করেনি? তাই তো আজ ছেলেরা ভাঙছে গান্ধী ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। ... তাই আজ মূর্তি ভাঙছে শুধু মূর্তি ভাঙার জন্য নয়, এ কাজ তাদের নেতিবাচক কাজ নয়। মূর্তি ভাঙছে তারা পাল্টা মূর্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদে। গান্ধীর মূর্তি ভাঙছে ঝান্সির রাণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। গান্ধীঘাট ভাঙছে তারা মঙ্গলঘাট তৈরীর জন্য।' (*দেশব্রতী*, ৫ সেপ্টেম্বর '৭০)

নইপল-এর পরিচিত তরুণ নকশাল বন্ধু দেবু এসব কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে চারু মজুমদারকে একখানা চিঠি লেখেন। চারুবাবু তার উত্তরে জানান, এসব অতিউচ্ছ্বাসের ফল। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯)

উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা এসব তরুণদের কীর্তিকলাপ কিন্তু ঢালাও সমর্থন জানান সরোজ দত্ত। তিনি লিখলেন :

'... যারা মূর্তি ভাঙছেন তারা সবাই সি. পি. আই (এম. এল)-এর নন। তারা সবাই যে সি পি আই (এম এল)-এর নির্দেশ মেনে চলেন এমন কথা নেই। সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে যে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের সূচনা করেছে এবং বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে তারই আঘাতে নাড়া খাওয়া এবং তারই আলোকে জেগে ওঠা যুবছাত্রদের এ এক অভিনব গণ-আন্দোলন। ... পৃথিবীর কোনো দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে এর নজির চোখে পড়ে না।' (*দেশব্রতী*, ৫ সেপ্টেম্বর '৭০)

রবীন্দ্র রায়ের মতে, এ ধরণের যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ ও চারু মজুমদারের তত্ত্ব —এই দুই মিলে শহুরে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব। উভয়পক্ষ পরস্পরকে সহায়তা করেছে। চারু মজুমদার যুগিয়েছেন সমর্থন, বিনিময়ে পেয়েছেন তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। শ্রমিক-কৃষক নয়, চারু মজুমদার-কিংবদন্তী ছাত্র যুবকদেরই অবদান। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫)

নইপল-এর আর একজন বন্ধু দীপাঞ্জন কিন্তু জেলখানায় চারু মজুমদারের অনুগামীদের দেখে একেবারেই হতাশ। তিনি ১৯৭২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত জেলে ছিলেন। অজস্র স্কুলের ছাত্র অথবা লেখাপড়া শিকেয় তোলা তরুণে জেলখানা তখন ভর্তি। আর রাজনীতির অ আ ক খ জ্ঞান-ও তাদের ছিল না।

কেন তারা নকশাল আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপ দিল? তার কারণ খুঁজতে গিয়ে সলিল

চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে : এক, প্রতিবাদী ভূমিকার প্রতি বয়ঃসন্ধির সহজাত আকর্ষণ; দুই, প্রথাসিদ্ধ পড়াশুনার প্রতি স্বভাবজাত বিরূপতা; তিন, এলাকার ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কর্তৃত্বকামী চিন্তাধারা; চার, বাড়ির ভেতরের আবহাওয়া। মা-বাবার সঙ্গবর্জিত নিরীহ ছেলে কতখানি হিংস্র হতে পারে তা তাঁর নিজের চোখে দেখা।

হিংস্রতার বলি যারা তাদের সকলকে চিহ্নিত করা যেত না। মাঝে মাঝে বে-ওয়ারিশ লাশ পাওয়া যেত। তাদের মধ্যে ময়লা কাগজ কুড়ুনেওলারাও ছিল। তারাও নাকি সব পুলিশের ইনফর্মার।

এঁদিকে তখন ঘটছে দৃশ্যপটে দ্রুত পরিবর্তন। এবং আসন্ন হয়ে উঠেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আরও একবার।

১৮

১৬ মার্চ ১৯৭০। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন। ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রী শান্তিস্বরূপ ধাওয়নের হাতে তিনি পদত্যাগপত্র তুলে দিলেন। পতন হল ঠিক তেরো মাস পর চোদ্দো দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার। পদত্যাগের প্রাক্কালে প শ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন: রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ আঁকড়ে থাকা মানে দেশ ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এবং সেটা হবে মহা অপরাধ।

খবরটা শুনে কেউ বিস্ময়ের ধাক্কায় বিহ্বল বা অভিভূত নয়, কারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। গত তিন-চার মাস যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিছক আনুষ্ঠানিক অস্তিত্বটুকু টিকে ছিল মাত্র। শরিকে শরিকে চলছিল প্রবল আত্মক্ষয়ী লড়াই। অপরের রাজনৈতিক উৎসাদনই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা সেক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর। অতএব একজন আটপৌরে মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল অবিলম্বে বাজারে গিয়ে কিছু চাল, ডাল, কাঁচা আনাজ কিনে ঘরে ফেরা। সবাই ধরে নিয়েছে কাল থেকে শুরু হবে নতুন করে হানাহানি রক্তারক্তি। ঘনিয়ে আসবে শান্তি ও স্বস্তিবিহীন এক অনিশ্চয়তার যুগ।

এক সপ্তাহ আগে প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টি সদস্য, সমর্থক ও জনগণের প্রতি এক জরুরি আবেদনে জানিয়েছিলেন :

'বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকার প্রতিবাদ করুন। এবং এই পরিস্থিতিতেও যুক্তফ্রন্ট ও তার সরকারকে চালু রাখার দাবিতে এলাকায় এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করুন। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করার পরেই, জনগণের রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে এবং যুক্তফ্রন্ট ও তার সরকার চালু রাখার দাবিতে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের প্রস্তুতি নিন।

বিভিন্ন অঞ্চলে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করুন।'

আর একটি বিবৃতিতে বি পি টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় আবেদন

করেন : অজয় মুখার্জির পদত্যাগের পরেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে ২৪ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করুন।

অতএব ১৭ মার্চ '৭০ মঙ্গলবার সকাল ছ'টা থেকে ১৮ মার্চ বুধবার সকাল ছ'টা পর্যন্ত সি পি এম ও তার প্রভাবাধীন গণসংগঠনগুলির ডাকে রাজ্যব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

[illegible]/ *আনন্দবাজার পত্রিকা* (১৮.৩.৭০)-র সংবাদ শিরোনামা :

হরতালে হাঙ্গামা : নানাস্থানে বহু প্রাণবলি/দলীয় সংঘর্ষ ২৪ জন নিহত/নৈহাটি চিত্তরঞ্জনে কারফু।

প্রতিবেদকের বিবরণ সূত্রে জানা যায়, কলকাতায় ট্রাম, বাস, রেল, বিমান সবই অচল। নগরীর জনজীবন মন্থর ও স্তব্ধ। স্কুল কলেজ বাজার বন্ধ। তবে নতুন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, হরতালের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন পাড়ায় মিছিল দেখা যায়।

তবে জোর হাঙ্গামা হয়েছে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও কোচবিহার জেলায়। দলীয় সংঘর্ষে গভীর রাত পর্যন্ত অন্তত ২৪ জন (বেসরকারি মতে ৩০ জন) নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ২৪ পরগণাতে বার জন, বর্ধমানে তিন, হুগলিতে চার, কোচবিহারে তিন এবং কলকাতায় দু'জনের প্রাণহানি ঘটেছে। মোট আহতের সংখ্যা শতাধিক। আরও খবর, হুগলি ও চব্বিশ পরগণার উপদ্রুত এলাকায় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী মোতায়েন; কোচবিহার ও কাঁথিতে ১৪৪ ধারা জারি এবং চিত্তরঞ্জন, নৈহাটি ও হালিশহর এলাকায় বার ঘন্টার জন্য কারফু বলবৎ।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল, হাওড়ায় সি পি এম নেতা পতিতপাবন পাঠক বোমার টুকরোয় আহত ও ডেপুটি স্পিকার অপূর্বলাল মজুমদারের বাড়ি আক্রান্ত। তাছাড়া আক্রান্ত হয়েছে কামারহাটিতে প্রাক্তন মন্ত্রী চারুমিহির সরকারের বাড়ি। হুগলির রেয়ন কারখানায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে তিন জন নিহত। কোচবিহার শহরে হরতালের দিন দোকান খোলা নিয়ে সি পি এম ও ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তিন জন নিহত।

অল্পবিস্তর হাঙ্গামা ঘটে দুবরাজপুর, তমলুক, সিঙ্গুর, কাঁথি ও অন্যত্র।

কিন্তু যে ঘটনাটি কেন্দ্র করে চারিদিক তোলপাড়, সেটি বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ঘটনা। পুলিশিসূত্রে প্রকাশ, এদিন (১৭ মার্চ) সি পি এম-এর এক হাজার সমর্থকের এক মিছিল বেরোয় হরতালের সমর্থনে। এই মিছিলের মুখোমুখি হয় হরতাল-বিরোধী মুষ্টিমেয় কংগ্রেস-সমর্থকের মিছিল। সি পি এম-এর মিছিলের ওপর পটকা পড়ে এবং একজন সি পি এম সমর্থক আহত হন। অদূরেই ছিল কংগ্রেস সমর্থক মলয় সাঁইয়ের বাড়ি। বাড়িটি আক্রান্ত হয় এবং এই ঘটনায় নিহত হন মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই ও যতীন রায়। পুলিশ বর্ধমান শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এই ঘটনার সূত্রে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হরতাল শেষ এবং আবার সব কিছু সচল। কিন্তু তারপরও বেশ কিছুদিন সংবাদ শিরোনাম দখল করে থাকে 'সাঁই বাড়ির ঘটনা'। আলোড়ন সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক মহলে এবং ঘটনাটির নৃশংসতায় সাধারণ মানুষও বিচলিত। বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন নব কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস। একই দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন অজয় মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী ও পি এস পি নেতা বিদ্যুৎ বসু। আরও জানা যায় যে 'সাঁইবাড়ির ঘটনা'র সূত্রে অতিরিক্ত

পুলিশ সুপার ও এস ডি ও-র বিরুদ্ধে রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঠিক এক সপ্তাহ পর সি পি এম-এর বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেন : সংঘর্ষে নিহত মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁই বর্ধমানে সমাজবিরোধী বলে কুখ্যাত। একথা বর্ধমানের সকলেরই জানা। এমন কি কংগ্রেস আমলেও এরা দু'দফায় পি ডি অ্যাক্টে আটক ছিল। তাছাড়া আর একটি অপরাধজনিত মামলার শর্তসাপেক্ষে মলয় সাঁই-এর বর্ধমান শহরে প্রবেশ নিষেধ। অথচ ঐদিন মলয় সাঁই শহরে আসে গোলমাল বাধাবার জন্য।

১৭ মার্চ সার্থক হরতালের পর একটা মিছিল যখন এস বসু রোড ধরে যাচ্ছিল, তখন প্রতাপেশ্বর শিবতলায় প্রণব সাঁই ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বিনা প্ররোচনায় মিছিলটি আক্রমণ করে বোমা ও পাইপগান নিয়ে। আরও লোকজন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মজুত ছিল নিকটবর্তী মলয় সাঁই-এর বাড়িতে। অতর্কিত আক্রমণে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ জনতা আক্রমণকারীদের রুখে দাঁড়ালে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। তার ফলে তিন জন নিহত হয়।

বিবৃতিতে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অত্যাচার চলছে তার নিন্দা করা হয় এবং বলা হয়, রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা তার পিছনে রয়েছে। (*গণশক্তি*, ২৪.৩.৭০)

১৯

সি পি এম-এর দাবি : বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল সফল হয়েছে। এবং তারই সঙ্গে আবেদন জানানো হয় সমস্ত শরিক দলের কাছে : এখনও সময় আছে। এখনও যুক্তফ্রন্ট ও তার সরকার রক্ষা করা যায়। যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদল এবং এম এল এ-দের কাছে আমাদের আহ্বান, আপনারা এগিয়ে আসুন—প্রমোদ দাশগুপ্ত।

এই আবেদনের অবশ্যই সাড়া পাওয়া যায়নি, যেহেতু শরিক দলগুলির অধিকাংশ সি পি এম বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। সি পি এম-এর অভিযোগ : শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ভাঙার জন্য একদিকে পুলিশ, সি আর পি ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার বাহিনীর নির্বিচার হামলা ও গুলিবর্ষণ এবং অপরদিকে বিশ্বাসঘাতী দালালদের নৃশংস আক্রমণ। দালালের ভূমিকায় অবশ্যই যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল, যাদের মধ্যে রয়েছে বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দল। সমাজবিরোধীদের সহায়তায় তারা ধর্মঘটী শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের উপর হামলা চালায়—খুন করে। লালপতাকা হাতে করে ধর্মঘট ভাঙা ও শ্রমিকদের উপর এ ধরণের নৃশংস হামলা অভাবনীয় ও নজিরবিহীন। ২৪ পরগণা ও হুগলির চারটি শ্রমিক এলাকায় তার ফলে নিহত হয়েছেন ১৬ জন শ্রমিক। ত্রিবেণীতে বিড়লার কেশোরাম রেয়ন কারখানায় দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা ও কোম্পানির সিকিউরিটির লোকেরা একযোগে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে, নিহত হন সি পি এম-এর রেয়ন শাখা সম্পাদক ননী দেবনাথ ও চারজন ধর্মঘটী শ্রমিক, তারণ দুলে, রামজীবন, সুদর্শন সিং ও বীরেন সাহা।

২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় হরতাল ভাঙার অপচেষ্টার জন্য সি পি এম-এর বিশিষ্ট জেলা নেতা শান্তিময় ঘোষ সি পি আই ও অন্যান্য দলগুলিকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন :

'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস একযোগে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা এবং পার্টি নেতা ও কর্মীদের উপর হামলা করে। তাদের হামলায় বারুইপুর, হাজিনগর, বাটানগর, বনগাঁ এবং জয়নগরে মোট ৯ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি গুরুতর আহত। আহতদের মধ্যে বাটা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সুখময় চৌধুরী ও হাবড়ার দেবেশ মিত্র বর্তমানে মৃত্যুশয্যায়।

নৈহাটিতে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসীরা মিলে সাম্প্রদায়িকতার গুজব ছড়িয়ে কিছু লোককে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করতে সমর্থ হয়। স্থানীয় এম এল এ গোপাল বসু মানুষ-জনকে শান্ত করতে ছুটে গেলে, তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। জনগণের হস্তক্ষেপে তাঁর প্রাণ বেঁচে যায়। কিন্তু দুর্বৃত্তরা ১১ খানি ঘর পুড়িয়ে দেয়—পাঁচজনকে নৃশংসভাবে খুন করে ও জখম করে অন্তত ৫০০ জনকে। সংখ্যালঘুদের বাঁচাতে গিয়ে পার্টি নেতা জিতেন চক্রবর্তী ও প্রভাস ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন জখম অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত।

এস ইউ সি-র নেতৃত্বে একদল লোক দক্ষিণ বারাসতের পার্টি অফিস আক্রমণ করে ও অফিসকর্মী অজিত নস্করকে গুরুতরভাবে জখম করে।' (*গণশক্তি*, ২০.৩.৭০)

বাঁকুড়ায় দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের সাথে মিলিত হয়ে সি পি এম কর্মীদের মারধর করে বলে জানা যায়। তারা সি পি এম জেলা দপ্তরে জোর করে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করে ও টাকাপয়সা নিয়ে চলে যায়।

১৯ মার্চ '৯০ ঘোষিত হয়েছে পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতি-শাসন। বিধানসভা কিন্তু ভেঙে দেওয়া হয়নি।

১৭ মার্চের হরতাল পুরোপুরি পাল্টে দিল রাজনৈতিক দৃশ্যপট। দেখা গেল শুধু কংগ্রেস নয়, একদা যারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ, তাদের অনেকেই সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। রাষ্ট্রপতি-শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে সি আর পি এসে ছেয়ে ফেলল গোটা রাজ্য। তার পিছু পিছু লাঠি গুলি মারধর ধরপাকড় ১৪৪ ধারা কার্ফু। গোটা পশ্চিমবঙ্গ এখন শান্তিরক্ষবাদের মৃগয়াক্ষেত্র। সত্তরের দশকের সূচনা আদৌ শুভ নয়—যেন কালরাত্রি নেমে এসেছে দেশ জুড়ে। সাধারণ মানুষ বিমূঢ় ও বিহ্বল।

চরম অনিশ্চয়তার আবর্তে মানুষ যখন দিশেহারা, প্রমোদ দাশগুপ্ত তখন মগরাহাটের এক জনসভায় ঘোষণা করলেন : পুরনো কায়দায় আর যুক্তফ্রন্ট হবে না। শ্রমিক-কৃষক-গণতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামের পাশে যারা থাকবে সেই দলগুলিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়তে হবে। (*গণশক্তি*, ১০.৪.৭০)

রাজনীতির মূল ধারা বাঁক নিচ্ছে—তার আভাস সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন্ দিকে এবং কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে? কারা জনগণের সংগ্রামের শরিক আর কারা নয়—তার হদিশ দেবে কে? তার উত্তর জনগণের অজানা—আপাতত রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নই তার কাছে একমাত্র সত্য।

২০

রাষ্ট্রপতি-শাসন আসলে বকলমে কংগ্রেসের শাসন। আগেই বলা হয়েছে, ১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন কমে গেলেও ভোটের হার কিন্তু আদৌ কমেনি। ১৯৬৯-এর শেষাশেষি 'প্রগতিশীল' ইমেজ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নব কলেবর ধারণ। তিনি নতুন পথে এগোতে চাইছেন এই বাতাবরণ তৈরি হল। কারণ তিনি রাজন্যভাতা বিলোপ করেছেন ও চোদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। অতএব রাজনীতির আকাশে যেন নতুন নক্ষত্রের উদয়। পূর্বতন লাঞ্ছনাকারীরা নিজেরাই হতমান, অতএব অজয় মুখোপাধ্যায় ভাবছেন, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে কেমন হয়! সি পি আই-ও চলে এসেছে ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছাকাছি।

পশ্চিমবাংলায় যে কংগ্রেসের দাপাদাপি শুরু সেটা ইন্দিরা কংগ্রেস বা নব কংগ্রেস। আদি কংগ্রেস হতমান ও গণভিত্তিশূন্য। কমিউনিস্ট-বিরোধিতা যাদের মজ্জাগত, সেসব ছাত্র-যুবকেরা দলে দলে ভিড় জমাল ইন্দিরা-কংগ্রেসে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'লাল গোলামি ছেড়ে বলবন্দেমাতরম্' স্লোগান উঠল। প্রসঙ্গত 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম' বা 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগানের পাশাপাশি কংগ্রেসী ছাত্রদের শ্লোগানও কম জোরালো নয়। ইন্দিরা কংগ্রেসে পুরনো খদ্দর পরা জেলখাটাদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। অধিকাংশ নতুন মুখ, পোশাকে আশাকে চলনে বলনে সর্বাংশেই নতুন। রাষ্ট্রপতি-শাসন যেন তাদের জন্য খোলা ময়দান। জবহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরার জয়গানে মুখর তারা। ইন্দিরা-স্তুতি ও স্তাবকতা এখন কংগ্রেস কালচারে পরিণত।

শিপ্রা সরকারের ভাষায়, মুক্তির দশকের স্বপ্ন নিয়ে যারা ১৯৭০ সালকে অভ্যর্থনা করেছিল সেই চরমপন্থীরা তলিয়ে যাচ্ছিল ব্যক্তিহত্যা আর সন্ত্রাসের চোরাবালিতে।

শুধু এটুকু বললে সব বলা হল না— কেননা তারই পাশাপাশি দাঁত নখ বার করে মারমুখী আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল নবকংগ্রেস ওরফে ইন্দিরা কংগ্রেসের।

এই পটভূমিতে রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে চলেছে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন। বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ঘটনার জের এখন সর্বাত্মক দমন-পীড়নের আকার নিয়েছে। বর্ধমান জেলার নানা জায়গায় সংঘর্ষের অজুহাতে পাইকারি হারে কৃষককর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কংগ্রেসের লোকেরা খোলাখুলি পুলিশের গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ গ্রামে গ্রামে হানা দিচ্ছে ও যাকেই জোতদাররা দেখিয়ে দিচ্ছে তাকেই গ্রেপ্তার করছে।

অত্যাচার-নির্যাতনের সুদীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন *গণশক্তি*-র (৭.৪.৭০) সংবাদদাতা। যা থেকে বোঝা যায়, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে মানুষের জীবন দুর্বিষহ। প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় মানুষ কাতরাচ্ছে। অত্যাচারের অক্টোপাশ থেকে একটি জেলাও বাদ নেই। মানুষের দুঃসহ অভিজ্ঞতার কয়েকটি নমুনা :

মালদহ— ২৮ মার্চ '৭০: কালিয়াচকে পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত ও তিনজন আহত। জোতদার ও পুলিশের যৌথ অত্যাচার শুরু হয়েছে। ২৭ মার্চ পুলিশ পার্টি অফিস তল্লাশি করেছে। দরজা ভেঙে ঢুকে কৃষকদের ঘরবাড়ি তছনছ করছে, এমনকি মেয়েদেরও মারধোর

করছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ : জোতদার ও পুলিশের যৌথ সন্ত্রাস জেলা জুড়ে ক্রমবর্ধমান। দৌলতাবাদে জোতদারের আক্রমণে তিনজন পার্টি কর্মী গুরুতর আহত। সেখানে পুলিশ পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে পেটাচ্ছে। মেয়েদেরও রেহাই নেই। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরাও জায়গায় জায়গায় মারধর করছে। তাদের আক্রমণে ফারাক্কায় এগারজন কর্মচারী আহত। জিয়াগঞ্জে ১৮ মার্চ '৭০ সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে একজন ছাত্র নিহত হয়। ২১ মার্চ দুপুরে ভরতপুর থানার কাঁঠালিয়া গ্রামে কৃষকনেতা পঞ্চানন বিশ্বাস ও সাহাজুদ্দিকে ধরে পুলিশ আচমকা পেটাতে থাকে। মারের চোটে সাহাজুদ্দির একটি হাত ভেঙে গিয়েছে এবং অচৈতন্য অবস্থায় পঞ্চানন বিশ্বাসকে পুলিশের গাড়িতে থানায় আনা হয়।

হাওড়া : আমতা শহর শাখা সম্পাদক কমরেড শান্তিময় ঘোষ কংগ্রেস ও নকশালপন্থীদের যৌথ আক্রমণে নিহত।

হুগলি : গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে পোলবা ও পাণ্ডুয়াতে পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে।

নদীয়া : এই জেলায় পুলিশী অত্যাচার বেড়েই চলেছে। কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাণিঘাটা অঞ্চলে জোতদারের লোকেরা স্থানীয় কৃষক সমিতির সম্পাদক সুকুরউল্লাকে মেরে আধমরা করে দিয়েছে। চাকদহ ও হরিণঘাটা এলাকায় প্রায় প্রতিটি বাড়ি পুলিশ তল্লাশি করে। বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং ধৃত ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। হাসখালি থেকে স্থানীয় পার্টি নেতা বিমল চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ব্যাপক গ্রেপ্তার চলছে হাসখালি, বীরনগর, তাহেরপুর এবং খাসবাজারে। করিমপুর থানার পণ্ডিতপুর গ্রামে জোতদারের লোকেরা স্থানীয় কৃষক কর্মী হারেজুল্লাকে মেরে অন্ধ করে দিয়েছে।

মেদিনীপুর : খেজুরি থানার কৃষক সমিতির কর্মী গোবিন্দ বারিককে প্রথমে পেটায় জোতদারের লোকেরা, তারপর পেটায় পুলিশ। এখন তিনি থানার লক-আপে। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে থানা কৃষক সমিতির সম্পাদক প্রশান্ত মাইতিকে।

পশ্চিম দিনাজপুর : এখানে অত্যাচার চালাচ্ছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। তারা বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে মারধর করছে। সম্প্রতি করণ দীঘি থানার কৃষককর্মী ক্ষীরমোহন সিংকে পুলিশ প্রচণ্ড প্রহার করে জেলে পাঠায়। জেলে সিপাহীরা তাকে আরো মারে এবং ক্ষীরমোহন মারা যান।

বীরভূম : অত্যাচার বল্গাহীন— ধরপাকড় মারধোর সমানে চলেছে। সমস্ত মানুষ সন্ত্রস্ত-বিশেষ করে গরীবগুর্বোরা। সাঁইথিয়া থেকে জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কেশব দাস গ্রেপ্তার ও পরে জামিনে মুক্ত। আহমদপুর থেকে সি পি এম-এর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক দ্বারিক ব্যানার্জি ও গড়াইপুর গ্রামের কৃষককর্মী নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার। নানুরে স্থানীয় এম. এল. এ বনমালী দাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভাকর পাল সহ দু'শরও বেশি কৃষকের উপর ঝুলছে সাওতা গ্রামে ধানকাটা সংক্রান্ত মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। তাদের খোঁজে পুলিশ ও সি আর পি বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে। ইলামবাজারের কুয়াসিটা গ্রামের কৃষক কর্মী রাধামোহন দাসকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় পেটানো হয়। জলধর বাগদির বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে না পেয়ে মেয়েদের শাসানি দেয় পুলিশ। দুবরাজপুর থেকে কৃষক কর্মী

মদন বাউড়ি, অতুল ডোম, অমূল্য বাগদি প্রমুখ সাতজন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শোনা যায়, গ্রেপ্তার করার কাজে ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকজন ও সমাজবিরোধীরা পুলিশকে সহায়তা করে। এই থানার মুগা গ্রামের টেম্বু হেমব্রমকে জোতদারের লোকেরা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। লাভপুর থেকেও ধরপাকড়ের খবর আসছে।

জাঠা প্রচার শেষ করে ফেরার পথে সি আর পি-র ঘেরাও-এ পড়ে যায় পঞ্চানন মণ্ডল, ধরমদাস, ধনঞ্জয় দাস ও কয়েকজন কৃষক কর্মী। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাছাড়াও অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে।

বোলপুরে গ্রেপ্তার হয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষক মফিজউদ্দিন। পুলিশ সঙ্গে নিয়ে জোতদার হানা দেয় যজ্ঞনগর ও হরিপুর গ্রামে। খাসজমির ধান কাটার অভিযোগে হরিপুর গ্রামে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা বেনামি জমির ফসল জোতদাররা নষ্ট করে দেয়। কৃষক সমিতির কর্মী ভূজনী ঘোষের বাড়ি জোতদাররা পুড়িয়ে দেয়। বাহাদুরপুর গ্রামের একজন জোতদার ভূমিহীন কৃষকদের উপর গুলি চালিয়ে শিশুসহ তিনজনকে আহত করেছে। জোতদারদের কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

রাষ্ট্রপতি শাসনে বীরভূমে জোতদারদের এখন পোয়াবারো।

অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানায়। মহিলা সমিতির জ্যোতি চক্রবর্তী, প্রভা চ্যাটার্জি ও অর্চনা গুহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানাচ্ছেন : গত ২২ এপ্রিল একদিকে কংগ্রেসীরা আর অপরদিকে মঙ্গলকোট থানার ও সি, পুলিশ ও ২০০ সি আর পি নিয়ে মীরের পাড়া গ্রামটি অতর্কিতে ঘেরাও করে ৮৭টি দরিদ্র খেতমজুর পরিবারের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। দশ বছরের বালিকা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা— কেউ রেহাই পায়নি। গভীর রাত্রিতে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে নিদ্রিত স্ত্রী-পুরুষদের বন্দুকের কুঁদো লাঠি ও বুট দিয়ে আঘাত করে। মহিলাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে। পূর্ণ গর্ভবতী পুষ্পরাণী মাঝি (২৬) ও ডাব বাগদি (৩০)-কে নির্মমভাবে প্রহার ও ইজ্জতহানি করা হয়। সদ্য প্রসূতি তুলসী মাঝির (২৮) কোল থেকে শিশুপুত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার পর তাকেও শ্লীলতাহানি করা হয়। তাছাড়া সুবর্ণ দাসী (১৫), কাটুরাণী দাসী (২২), তরীবালা দাসী (১৬), শিবুবালা দাসী (৩০), তুলসী মাঝি (২৫), বিনুরাণী মাঝি (২৫), সন্ধ্যারাণী ধাড়া (২০) লতিকা মাঝি (২৭), পবিত্রবালা দাসী (২৫) কুরোবালা দাসী (৪৫), ইন্দুমতী মাঝি (৮০), লক্ষরাণী মাঝি (৫৫), ফুলেশ্বরী দাসী (৪০) প্রমুখ খেতমজুর মহিলাদের নির্মম প্রহার ও শ্লীলতাহানি করা হয়। অনেকে আত্মরক্ষার্থে জঙ্গলের দিকে ছুটতে থাকে কিন্তু জঙ্গলে গিয়েও তারা রেহাই পায় না। মায়ের কোল থেকে শিশুদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ৮/১০ জন মিলে এক একটি মেয়ের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। আশি বছরের বৃদ্ধারও নিস্তার নেই। স্ত্রীর সামনেই ষড়ানন মাঝিকে পুলিশ নির্মমভাবে পেটাতে থাকে। তার হাত-পা ভেঙে যায়, মাথা ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ষড়াননের স্ত্রী শ্যামা দাসীকে প্রহার করা হয়। তার চার বৎসরের শিশু পুত্রকে কূয়োর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়। বার বৎসরের মেয়ে সমিতাকে ধরে নির্মমভাবে লাঠিপেটা করা হয়।

৮৭টি খেতমজুর পরিবারের উপর এভাবে চলে অকথ্য অত্যাচার। (*গণশক্তি*, ২৮.৪.৭০)

২ মে প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলছেন : কংগ্রেস, জোতদার ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থকে সাহায্য করতে পুলিশ বর্ধমান জেলায় একেবারে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। ২৯ এপ্রিল

তথাকথিত বর্ধমান মামলার সূত্রে তারা বিনয় কোঙার এম এল এ ও গোকুলানন্দ রায় এম এল এ-র মতো আমাদের পার্টি নেতাদের পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে। যদিও এটা তারা বেশ ভালভাবেই জানে যে, ঐ ঘটনার সময় তাঁরা কেউ বর্ধমানে উপস্থিত ছিলেন না।

গ্রেপ্তার ও পরবর্তী অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন বিনয় কোঙার বিধানসভার অধ্যক্ষকে একটা চিঠির মাধ্যমে :

বিধানসভার সদস্য হিসাবে কয়েকটি ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গত ২৯ এপ্রিল তারিখে বর্ধমান শহরের চিকরহাট মহল্লায় কমিউনিস্ট (মা:) পার্টির ডাকে উপযুক্ত অনুমতিপ্রাপ্ত একটি জনসভায় আমি যখন বক্তৃতা দিতে ছিলাম তখন হঠাৎ রাত্রি আন্দাজ ৭টা ৪৫ মি: সময় বর্ধমান সদর থানার পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে এক বিরাট সি আর পি বাহিনী সভাকে ঘিরে ফেলে ও আমার উপর লাঠি চালাতে শুরু করে। লাঠি দিয়ে প্রথমে আমার কোমর, পরে আমার বাম হাঁটুতে মারার পর আমি মাটিতে পড়িয়া গেলে লাঠির তৃতীয় আঘাত আটকাইতে গিয়া আমার বাম হাতের কড়ে আঙুল ও তার পাশের আঙুলের মধ্যস্থান ফাটিয়া যায় ও রক্তাক্ত জখম হয়। প্রহারের সময় কেহ আমার হাত ঘড়িটা ছিনাইয়া লয়। 'উনি একজন এম. এল. এ., আর মারিস না'—কোনও এক ব্যক্তির এই মন্তব্যে আমার উপর প্রহার বন্ধ হয়।

আমায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ ভ্যানটি থানায় আসিলে থানা চত্বরে সমবেত সুনীল দাস, নব সাঁই প্রভৃতি কংগ্রেসের কিছু লোক, ছাত্রপরিষদের কিছু পরিচিত নোংরা ছেলে ও কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে এবং বড় দারোগা গাড়ি হইতে নামিতেই নব সাঁই ও অন্য একজন (মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই) বড় দারোগার পা জড়িয়ে ধরে তাদের কৃতজ্ঞতা জানায়। থানার ভিতরে আমাকে বসালে আগে উল্লেখ করা কংগ্রেসী ও গুণ্ডাগুলি আমায় কার্যত ঘিরে ধরে নানা রকম অশ্লীল মন্তব্য করিতে থাকে। বাহিরের বদমাসদের ডেকে এনে আমাকে বিরক্ত করার অধিকার দারোগাবাবুর আছে কিনা জানিতে চাহিলে বড় দারোগাবাবু আদরের ভঙ্গিতে তাদের পিঠ চাপড়িয়ে সাময়িকভাবে নীরব করে ও আমাকে থানা লক-আপে ঢুকিয়ে দেয়। তাহার আগে আমার ক্ষতের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় না। এমনকি আয়ওডিন চেয়েও পাওয়া যায় না। বিচারাধীন বন্দীরা মানুষ, কিন্তু বর্ধমান থানার লক-আপে দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে অসহনীয় স্থান। বহুদিনের সঞ্চিত স্যাঁতসেতে তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত ময়লায় ভর্তি।

... রাত্রে আমাকে ছাড়াও জেলার আমাদের জননেতা বিধানসভার সদস্য গোকুলানন্দ রায়কেও শহরের অন্য এক জনসভা থেকে বক্তৃতারত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে লক-আপে রাখা হয়। অন্য একজন সরকারী কর্মচারী যুবককেও বাড়িতে গ্রেপ্তার করে লক-আপে রাখা হয়। লক-আপে থাকাকালীন কংগ্রেসী গুণ্ডা ও দুর্বৃত্তদের দল রাত প্রায় দেড়টা দুটো পর্যন্ত দল বেঁধে লক-আপের সামনে আমাদের কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিতে ও অবিরাম বিরক্ত করিতে থাকে।...

... পরদিন সকাল হলে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। কেহ কেহ সরু কাঠি ঢুকাইয়া খোঁচাইবার চেষ্টা করে। সিপাহীরা তাদের বারে বারে সরাইবার চেষ্টা করিলেও থানার বড় দারোগার সন্দেহজনক প্রশ্রয়ের ফলে কোন সুফল পাওয়া যায় না। বেলা দশটার পর হতেই থানার ভিতরে ও বাইরে অনেক লোকের বিকট হল্লা শুনিতে পাই। জানিলাম শতখানেকের মত

কংগ্রেসী গুণ্ডা ও বদমাস আমাদের দড়ি ও হাতকড়া পরাইয়া রাস্তা দিয়া হাঁটাইয়া লইয়া যাইবার দাবি করিতেছে। বেলা ১১টার সময় বড়দারোগাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানান যে, জনতার দাবি অনুযায়ী পায়ে হাঁটিয়ে না নিয়ে গেলে গণ্ডগোল হতে পারে। আমি জানতে চাই বর্ধমান শহরে ১৪৪ ধারা আছে কিনা এবং তা গুণ্ডা বদমায়েসদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য কিনা? আমরা আরো জানিয়ে দিই যে, আপনারা যতই কংগ্রেসীদের উস্কানি দিন আমাদের জীবিত অবস্থায় অথবা সজ্ঞান অবস্থায় হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। মৃত অবস্থায় টেনে নিয়ে যেতে পারেন। বড় দারোগাবাবু তখন আমতা আমতা করে বলেন যে, তিনি এস পি বা ডি এস পি-র সাথে পরামর্শ করে কি করা যায় দেখবেন। পরে প্রায় দুইটার সময় আমাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় বিচিত্র ব্যবস্থায়। আমাদের একটা খোলা লরিতে দড়ি ও হাতকড়া পরাইয়া তোলা হয় এবং সামনে ও পিছনে অন্য গাড়ি রাখিয়া আমাদের ধীর গতিতে নিয়ে যেতে থাকে। আমাদের লরির দুই পাশে ৭০/৮০ জন ছেলে ছোকরা মস্তান কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে কুৎসিত ভঙ্গিতে নাচ, অশ্রাব্য গালিগালাজ ও শ্লোগান দিতে দিতে লরির সাথে যেতে থাকে। অল্প পরেই আমাদের দিকে ইঁটের বড় বড় টুকরো ও থুথু ইত্যাদি ছুঁড়তে থাকে এবং একটি ইঁট আমার সহবন্দী অশোক চক্রবর্তীকে আঘাত করে। সি আর পি আমাদের ঘিরিয়া থাকা ছাড়া অন্য কিছু করে না এবং সঙ্গে থাকা পায়ে হাঁটা পুলিশ অফিসাররা কোনরূপ বাধা দেয় না। খুব আস্তে আস্তে গাড়ি এগোতে থাকে। মাঝে মাঝে কংগ্রেসী আড্ডার কাছে গাড়ি থামানো হয়, আবার চলতে শুরু করে। এইভাবে বর্ধমান থানা থেকে কোর্ট পর্যন্ত মাত্র ৪০ গজ রাস্তা যেতে প্রায় আধঘন্টা সময় লাগে।...

৪.৫.৭০ ধন্যবাদান্তে
বিনয় কোঙার

বৈচিত্র্যের বিচারে এ ঘটনা নিঃসন্দেহে অভিনব। কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য আচরণ। রাষ্ট্রপতি-শাসনে কারও খাতির নেই। একই দমনযন্ত্রে সবাইকে পেষাই করা হচ্ছে। খেতমজুর থেকে এম এল এ পর্যন্ত সবাইকে সমানে লাঠিপেটা করা হচ্ছে। উল্লসিত কংগ্রেস মহল— বিশেষ করে বর্ধমান জেলায়। আর জোতদারকুলের তো আহ্লাদের শেষ নেই।

শুরু হয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ঢালাও আক্রমণ। শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের সংগ্রামলব্ধ যা কিছু— সবই কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আক্রমণ। কৃষক সমাজের উদ্দেশে হরেকৃষ্ণ কোঙারের আহ্বান : আক্রমণ এলে আত্মরক্ষা করবো— আত্মসমর্পণ কখনো নয়। দমদমে এক ভাষণে ৩০ মার্চ '৭০ তিনি বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষক যে জমি উদ্ধার করেছেন তা কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে। —প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত দিয়ে এই জমি রক্ষা করতে হবে। কেউ যদি আগুন জ্বালাতে আসে তবে সে আগুনে শুধু শ্রমিক কৃষকের কুঁড়ে ঘর পুড়বে না ওদের দালান-কোঠাও পুড়বে।

প্রতিরোধ অথবা পাল্টা মার-এর কোনটাই এই মুহূর্তে সম্ভব নয় একজন সন্ত্রস্ত কৃষকের পক্ষে। আপাতত কৃষক আচমকা মারের মুখে ভীতিবিহ্বল। সে জানত না যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্বের সঙ্গে তার নিজের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীযুক্ত। তার রক্ষাকবচ খোয়া গিয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বর্তমান অসহনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হলে চাই আবার রাজ্যে শ্রমিক-কৃষকের বন্ধু

সরকারের প্রতিষ্ঠা। এই দাবি তোলা হল ৩০ মার্চ '৭০ কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানের জনসভা থেকে। সি. পি. এম নেতারা ঘোষণা করলেন : আবার জনগণের রায় নেওয়াই একমাত্র গণতান্ত্রিক পথ।

২১

দৃশ্যপট আমূল পরিবর্তিত। গ্রাম-শহরে পুলিশ ও সি আর পি-র নির্মম অত্যাচারের সামনে মানুষ দিশেহারা।

গণশক্তি-র (৩০.৫.৭০)-র হিসেবে রাষ্ট্রপতি-শাসনের দু'মাসে পঞ্চাশ জন শ্রমিক-কৃষক-যুব-ছাত্র শহীদ হয়েছেন। দু'হাজারেরও বেশি গ্রেপ্তার নানা অজুহাতে। থানায় ও জেলে ধৃতদের প্রচণ্ড মারধর করা হচ্ছে। অত্যাচারের ফলে মৃত্যুর ঘটনাও বিরল নয়। যেমন ২৩ এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার করণদীঘির কৃষক আন্দোলনের কর্মী ক্ষীরমোহন সিংকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলে। বেলগাছিয়ার ট্রামশ্রমিক মহম্মদ সলিমকে পুলিশ গুলি করে মারে। ৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি থানার কৃষক নেতা তরণী রায়কে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর মা মহিলা কর্মী মঙ্গলেশ্বরী রায়কে সি আর পি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে।

জোতদার মহাজন ও পুলিশের অত্যাচারে গত দু'মাসে নদীয়া জেলার হুমনিয়াপোতা, মেদিনীপুর জেলার চকমক-রামপুর, ২৪ পরগণার গোসাবা ও বীরভূম জেলায় নিহত কৃষক ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বার জন।

এই পরিস্থিতিতে একান্ত জরুরি সম্মিলিত প্রতিরোধ, যা একদা গড়ে উঠেছিল ঘোষ মন্ত্রিসভার আমলে। এখন তার প্রশ্নই ওঠে না। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে ওঠা দূরে থাকুক, উপরন্তু বেড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক খুনোখুনি। বোমা ছুরি পাইপগান এখন রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে হাতে ঘুরছে। স্পষ্টতই লুম্পেনরা জায়গা করে নিয়েছে সব রং-এর পার্টিতে। অতএব খুনোখুনি বাড়তে বাধ্য। শহীদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। শহরে রাস্তার মোড়ে অথবা হাটে গঞ্জে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শহীদ বেদীর সামনে মানুষ থমকে দাঁড়ায়।

বদলে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চালচিত্র। কোনো রাজনৈতিক কর্মী অবাধে চলাফেরা করতে ভরসা পায় না। বিশিষ্ট জননেতা শিক্ষাব্রতী চিকিৎসক অথবা ছাপোষা মানুষ সকলেরই জীবন আক্ষরিক অর্থে বিপন্ন। গৌরকিশোর ঘোষের ভাষায়, 'সকলেই আজ সন্ত্রস্ত। নকশালপন্থীরা সন্ত্রস্ত, সি. পি. এম সন্ত্রস্ত, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা, এম. এল. এ, এম. পি, শিক্ষক. ছাত্র, অধ্যাপক, শ্রমিক, কেরানী, সরকারী অফিসার, পুলিশ, সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক, অভিনেতা অভিনেত্রী, রোগী ডাক্তার, মোক্তার জজ উকিল, ফরিয়াদী আসামী, সর্বশ্রেণীর লোক, ছেলে মেয়ে বুড়ো প্রত্যেকেই আজ পোষাকের তলায় থরথর করে কাঁপছেন'...

'... রাজনৈতিক নেতারা যে সব খুনীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তারা আজ এমনই পেশাদার হয়ে উঠেছে যে দাদাদের শাসন আর মানতে চাইছে না। পাইপগান আর রিভলবারের নলই যে

ক্ষমতার উৎস, এ তারা বুঝে ফেলেছে।......' (*দেশ*, ১৪ জৈষ্ঠ ১৩৭৮)

বিচলিত বীরেন রায় বলেছেন প্রমোদ দাশগুপ্তকে— রাজনৈতিক খুনোখুনি অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। তার জবাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন—এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে নিজেই খুন হয়ে যাবেন। যা ঘটছে তার উপর হয়তো নেতাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বদলে যাওয়া পটভূমিতে সি পি এম, সি পি আই, নকশাল— সবাই আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত। সকলেরই হাতে রক্ত। এই গোলমেলে সময়ে কে যে আততায়ী আর কে যে আক্রান্ত ঠাহর করা কঠিন একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে। এক ধরণের নির্বিকারত্বের আশ্রয় নিয়েছে সে। রাম বসু বলছেন—সেটা এমন একটা সময় খুন করলেও কেউ ছি-ছি করে না। বরং লাশ মাড়িয়ে লোকে অফিস যায়। রাম বসু লিখলেন 'কানামাছি' :

চোখে ছানি
হাতে ছোরা
রক্তাক্ত সময়
মাটিতে লুণ্ঠিত লাল
হিম দেহে জেগে আছে ছুরি।
... ...
নিভে যায় পড়শিদের সতর্ক জটলা
পুনরায়, কিছু পরে
সাজানো সংসার, সাজা, সিনেমা বোনাস
পুনরায় ঘুষখোর মিছিলে সংগ্রামী
ধোঁয়া-ওঠা ঘেয়ো দৃশ্যপট।

এই 'রক্তাক্ত সময়ে' সি পি এম-কে লড়তে হচ্ছে অস্তিত্বরক্ষার মরিয়া লড়াই। লড়তে হচ্ছে পুলিশ সি আর পি-র অত্যাচারের মোকাবিলায়— লড়তে হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। সি পি এম-এর বিরুদ্ধে সবাই আক্রমণ শানাচ্ছে। অবশ্যি মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও নকশাল। রাজ্যের সর্বত্র পার্টির নেতা সভ্য সমর্থকদের হতাহত হওয়ার ঘটনা বলতে গেলে প্রতিদিনের খবর। এখানে *গণশক্তি*-র পাতা থেকে কয়েকটি মাত্র নাম উল্লিখিত হল— কারণ এ তালিকার শেষ নেই।

১. মেদিনীপুরের সি পি এম, এম এল এ ষোড়শী চৌধুরী চন্দ্রকোনা থানার মাংরুল গ্রামে কয়েকজন কংগ্রেসীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁকে মৃত মনে করে রাস্তায় ফেলে রেখে আততায়ীরা চলে যায়।

২. ৮ মে '৭০: কংগ্রেসীদের আক্রমণে কলকাতার মেয়র প্রশান্ত শূর গুরুতর আহত। তারা মেয়রের ঘরে ঢুকে ডাণ্ডা দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে।

৩. ৭ জুলাই '৭০ : নবদ্বীপের রাস্তায় উগ্রপন্থীদের বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন দেবী বসু এবং স্থানীয় পার্টি নেতা শৈলেন দত্ত।

৪. ৮ জুলাই '৭০: উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের ছাত্র নেতা ও ছাত্রসংসদের সহকারী সম্পাদক সঞ্জয় পাল উগ্রপন্থীদের আক্রমণে নিহত।

৫. ৯ জুলাই '৭০: উত্তরপাড়ায় উগ্রপন্থীরা পিছন থেকে এক মিছিলের উপর বোমা ছুঁড়লে বেলুড় গ্লাস ওয়ার্কসের শ্রমিক কমরেড রামধর যাদব মারা যান।

৬. উত্তর হাওড়া লোকাল কমিটির সদস্য, অম্বিকা জুট মিলের শ্রমিক নেতা রামচন্দ্র রায় ২ আগস্ট নকশালপন্থী সমাজবিরোধীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

৭. ১৬ আগস্ট '৭০ : সকালে দমদম লোকাল কমিটির নেতা অনন্ত দত্ত দমদম বিমান বন্দরের অদূরে নকশালপন্থীদের আক্রমণে নিহত।

৮. ২১ আগস্ট '৭০ : হাওড়া জেলা কমিটির বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা জীবন মাইতি হাওড়া শহরে বাজে শিবপুরের শিবতলা লেনে প্রকাশ্য দিবালোকে নকশালপন্থীদের অতর্কিত আক্রমণে গুরুতর আহত। এবং ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৮-৪৫ মিনিটে পার্ক সার্কাসের এক নার্সিং হোমে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর।

৯. ১৪ সেপ্টেম্বর '৭০ : রাত ৯ টায় ৩০-এ বাস থেকে নামিয়ে আটাপাড়া কালীতলার মোড়ে যুবকর্মী অরুণ মণ্ডলকে নকশালরা খুন করে।

১০. বরানগর বনহুগলী অঞ্চলের শ্রমিক কর্মী বিজন সাহাকে নকশালরা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে গিয়ে ভি আই পি রোডে খুন করে।

১১. ২১ সেপ্টেম্বর '৭০: নদীয়া জেলার ছাত্রনেতা প্রশান্ত সরকার যখন সকালে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় নকশালপন্থীরা তাঁকে খুন করে।

১২. ১ অক্টোবর '৭০: জলপাইগুড়ির কৃষক নেতা ভোলা মুখার্জি নকশালদের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত।

১৩. ১৭ অক্টোবর '৭০: রেশন তুলতে গিয়ে নবদ্বীপ তেঘড়িয়া পাড়ার তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী মিহিরলাল দাস নকশালদের আক্রমণে জখম হয়ে ২৫ অক্টোবর কৃষ্ণনগর হাসপাতালে মারা যান।

১৪. ১৯ অক্টোবর '৭০: সকালে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অজিত গাঙ্গুলী নেতাজী কলোনিতে যাওয়ার পথে নকশালদের আক্রমণে গুরুতর আহত।

১৫. ৪ নভেম্বর '৭১ : বেলেঘাটায় স্কুলে ঢুকে কয়েকজন দুষ্কৃতী ঐ স্কুলের শিক্ষিকা, কে জি বসুর স্ত্রী, শ্রীমতী পারুল বসুকে ছুরিকাহত করে।

১৬. ১৮ নভেম্বর '৭০: মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের ছাত্রনেতা মোহনলাল ঘোষকে কলেজের ভিতর থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নকশালরা নৃশংসভাবে খুন করে।

১৭. ২১ নভেম্বর '৭০: বেলা এগারোটায় অশোকনগর বাণীপীঠ স্কুলের শিক্ষক ও সুপরিচিত সি পি এম নেতা ননী কর স্কুল থেকে বেরবার মুখে নকশালদের বোমায় আহত।

১৮. ৭ ডিসেম্বর '৭০: ছাত্র ফেডারেশনের শিবপুর বি ই কলেজ ইউনিট সম্পাদক অসীম গাঙ্গুলীকে রাত্রিবেলায় হাওড়ায় নীলমণি মল্লিক লেনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে। বি ই কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অসীম কলেজের নির্বাচনী প্রচারের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন।

খুনোখুনি বা রাজনৈতিক সংঘর্ষের সিংহভাগই ঘটছে সি পি এম ও নকশালদের মধ্যে। নকশালদের চোখে সি পি এম-ই বিপ্লবের প্রধান শত্রু। অতএব তাদের মারাই হচ্ছে একজন বিপ্লবীর পবিত্র কর্তব্য। তাছাড়া পাড়া থেকে সি পি এম-কে উৎখাত করলে পাড়ার উপর কর্তৃত্ব করা যায়। দৃষ্টান্ত : কলকাতার উপকণ্ঠে সিঁথি-আটাপাড়া অঞ্চল। অতএব উত্তরে কুমারটুলী-জোড়াবাগান থেকে শুরু করে দক্ষিণে বালিগঞ্জ-কসবা-যাদবপুর-সন্তোষপুর এবং পুবে ট্যাংরা-

বেলেঘাটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে সি পি এম-নকশাল দ্বৈরথ। খুন এবং খুনের বদলা খুন।

এই আত্মক্ষয়ী লড়াই প্রসঙ্গে শংকর বসু লিখছেন, 'খেয়োখেয়িটা তখন কলেরা বসন্তের মতো ছড়াচ্ছিল। এখন তো শেষ হাল। ...এটা সেরেফ দাঙ্গা ...হিন্দু মুসলমান রায়টের চেয়েও জঘন্য এক দাঙ্গা।' (*কমুনিস*)

২২

নকশালপন্থীদের কার্যকলাপকে সি পি এম আর নিছক রাজনৈতিক বিচ্যুতির আখ্যা দিতে রাজি নয়। এরা বিপ্লবী নয়—এরা প্রতিবিপ্লবী। অলোক মজুমদার বলছেন: সত্যিই যেভাবে এরা ছুরি ভোজালি চপার চালিয়েছে, পাক্কা ক্রিমিনাল ছাড়া একাজ অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ক্ষেত্রে ও টালিগঞ্জের জ্যোতি কাকিমার বেলায় এটা প্রমাণিত। জ্যোতি কাকিমা থাকতেন গ্রাহাম রোডের দোতলায়। পাইপ বেয়ে উঠে তাঁকে ছুরি মারা হয়। শরীরের চল্লিশটা জায়গায় সেলাই করতে হয়। বজবজে ভাইপো মারল কাকাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা লিস্ট করে মারে। এসব কাজ, যারা কেতাবি নকশাল, তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। অবশ্যি তারা বিরোধিতা করেছে বলে জানা যায়নি।

নকশালপন্থীদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের নিরিখে সি পি এম-এর কলকাতা জেলা কমিটির প্রচারপত্রে (১৫.৮.৭০) তাদের সরাসরি প্রতিবিপ্লবী বলে চিহ্নিত করা হয়। জনগণের কাছে আহ্বান জানান হয়, 'প্রতিবিপ্লবী নকশালদের হামলা প্রতিরোধ করুন।' বলা হয়, 'সি পি এম পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক শক্তি যখন সি আর পি প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার তখন নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র শাসক শ্রেণীকেই জনগণের উপর আক্রমণ করার নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। জনগণের আন্দোলনের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশ প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। হামলাবাজি বোমাবাজি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশ ঢোকার পথ সুগম করেছে নকশালপন্থীরা...'

'... কোথায় আজ সেই সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব? কোথায় সেই মুক্তাঞ্চল? কিছু দিশেহারা বিভ্রান্ত এবং অপরিণত লোকের কাজকর্ম কেবলমাত্র তখন সম্ভাবনাপূর্ণ গণ আন্দোলনেরই অশেষ ক্ষতি করেনি, হঠকারীরা কায়েমী স্বার্থের হাতে আগামী দিনের জন্য একটি হাতিয়ারও তুলে দিয়েছিল।...'

'... কার স্বার্থে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে নকশালরা বোমা মারছে? কি উদ্দেশ্যে নকশালপন্থীরা পার্টি সদস্য, সমর্থক, সংগ্রামী ছাত্র-শিক্ষক-মহিলা এবং শ্রমিক নেতা ও সংগঠকদের নিহত ও আহত করছে? উদ্দেশ্য একটিই এবং তা হচ্ছে সংগ্রামের পুরোধা শক্তিকে দুর্বল করার মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে মদত দেওয়া। নকশালদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পথচারী প্রভৃতি। আর এই সুযোগ নিচ্ছে প্রতিবিপ্লবী শক্তি। নকশালপন্থীরা এসব করছে বিপ্লবেরই নামে।...'

'... যেসব ছাত্র এবং যুবক এইসব প্রতিবিপ্লবীদের তথাকথিত বিপ্লবী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে

দলভুক্ত হয়েছেন তাদেরও আমরা চোখ খোলা রাখার জন্য আবেদন করছি। একটু বিচার করতে হবে কোন কাজে তাঁরা ব্যবহৃত হচ্ছেন। দু'একজন জোতদার হত্যা করে এবং দু'চারজন পুঁজিপতিকে হত্যা করে সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটানো যায় না। তার জন্য দরকার শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে ব্যাপক গণতান্ত্রিক শক্তিকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত করে তোলা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা। কেবলমাত্র এই পথেই শোষণের অবসান সম্ভব। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই নির্দেশ দিচ্ছে শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনকে যারা বিপ্লব বিরোধী বলে জাহির করেন, যারা গণ-আন্দোলন এবং গণ-উদ্যোগের বিরোধী তারা আসলে জনগণ-বিরোধী তাই বিপ্লব বিরোধী। তারা প্রতিবিপ্লবী ।...'

এই প্রচারপত্রে যে আর একবার সি পি এম-এর রাজনীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটা মনে হয়, দিগ্‌ভ্রান্ত নকশাল ছাত্রযুবকদের জন্যই লেখা, 'সমাজবিরোধী' বা লুম্পেনদের জন্য নয়। এটা অনস্বীকার্য যে মেধাবী ছাত্রদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নকশাল রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট এবং বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ-ও নকশালদের সহযাত্রী। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলছেন : '...ঝানু সাংবাদিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের হঠাৎ হাঁটুগেড়ে বসতে দেখলাম কয়েকজন অতিবিপ্লবীদের কাছে। ... যে কোন রোমহর্ষক উপন্যাসের নায়কদের চেয়ে এদের বীরগাথা সেদিন লোকের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। কিন্তু ঠিকানা ভুল করে মুক্তির দশককে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারল না এরা। শুধু স্বজাতি ও আত্মনিধনের মধ্যে নিজেদের গুলিয়ে ফেলে শ্রেণীশত্রু চিনতে পারলো না। প্রতিটি আঘাত ছিন্নমস্তার মতো নিজেদের দেহেই ধারণ করল শহীদেরা। শহীদের রক্তের কী ভীষণ অপচয়। জানি না এই ভুলের মাশুল ক'টি প্রজন্মকে দিতে হবে।' (*কফির কাপে সময়ের ছবি,* পৃ. ৪০-৪১)

'হিরো' তো নয়ই, এমনকি প্রমোদ দাশগুপ্ত এদের 'ট্র্যাজিক হিরো'র মর্যাদা দিতেও নারাজ। 'মেধাবী' ছাত্র অথবা ঝকঝকে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবালুতার প্রশ্রয় দেওয়ারও তিনি বিরোধী।

নকশালপন্থীদের সাম্প্রতিক ভূমিকা নিয়ে তাঁর বক্তব্য :

'...আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে এদের জোর প্রচার চালানো হচ্ছে। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে এদের হিরো বানানো হচ্ছে। ছোটখাটো ঘটনাকেও নানা রং-এ রঞ্জিত করে 'রোমাঞ্চকর' করে দেখান হচ্ছে। এমন কি এদের 'অতিগোপন' সিদ্ধান্তও আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যানের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে ছাপা হচ্ছে।'

'শুধু তাই নয় বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় প্রচার চালানো হচ্ছে বহু 'মেধাবী ছাত্রছাত্রী' এদের সাথে আছে। আমি বলব তাতে কি আসে যায়। ভারতবর্ষে যত বড় বড় আমলা আছে তাদের তো অধিকাংশই অত্যাচারী। কিন্তু মেধাবী ছাত্র না হলে কি আই সি এস, আই পি এস অফিসার হতে পারেন? তাছাড়া বহু অধ্যাপক বহু স্কলার তো সি আই এ-র এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। আসল ব্যাপার হলো—কে মেধাবী, কে অ-মেধাবী সেটা বড় কথা নয়। ছাত্রছাত্রীদের 'মেধা' কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে সেটাই বড় কথা। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিভার স্ফূরণ ঘটতে পারে না—'প্রতিভার বিকৃতি' হয়। আর বিকৃত প্রতিভার কোন মূল্যই নেই।'

'...নকশালপন্থী নেতাদের 'সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের' ফাঁকা আওয়াজ আর উপরিকাঠামো

পরিবর্তনের হাস্যকর কর্মসূচী আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর এই ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নকশালপন্থী নেতারা আজ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মীদের খুন করার ঘৃণিত পথ নিয়েছে। আমি আগেই বলেছি নকশালপন্থীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাজবিরোধীরা ঢুকেছে। সমাজবিরোধী-নকশাল এককাট্টা হয়ে পড়েছে। আজ মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের খুন করার কাজে এই সমাজবিরোধীদের কাজে লাগাচ্ছে। আর পুলিশ শোষক শ্রেণীর নির্দেশ ও প্রেরণায় এই কাজে সহযোগিতা ও মদত দিচ্ছে।

'এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। ১৯৬৭ সালে যে নকশালপন্থী নেতারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করে পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন, তাঁরা আজ নানা আঁকে বাঁকে নানা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যা করার কাজকেই পবিত্র কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করলেন! এছাড়া তাদের হয়ত আর কোন পথ ছিল না। আর একাজে যে প্রতিক্রিয়াশীল এবং শোষক শ্রেণী নকশালপন্থীদের সাহায্য করবে তা বাস্তব সত্য। এতে বিস্মিত বা আতঙ্কিত হবার কিছুই নেই। (*গণশক্তি*, ২০.৮.৭০)

২৩

ভাঙাভাঙি হানাহানির দৌরাত্ম্যে কবেই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির স্মৃতি। দল ভাঙাভাঙির পর একে অপরকে এমনিতেই কমিউনিস্ট মনে করত না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই সি পি আই-সি পি এম সম্পর্কের ক্রমাবনতি— যার কোপটা শেষ পর্যন্ত পড়ল সাধারণ মানুষের উপর। সেই ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগা দূরে থাকুক, রাষ্ট্রপতি শাসনের গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছে, দু'পার্টির মধ্যে তিক্ততা কেবল বেড়েই চলেছে। পরপর দু'টি ঘটনার অভিঘাতে সে তিক্ততা গিয়ে পৌঁছাল চরমে।

প্রথম ঘটনাটি দুর্গাপুরের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। ৭ আগস্ট '৭০ দিলীপ মজুমদার সহ সি পি এম-এর পাঁচজন স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ আগস্ট থেকে ধৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে দুর্গাপুরে লাগাতার শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিল সি পি এম-প্রভাবিত ইউনিয়ন।

সি পি আই সক্রিয়ভাবে এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। এবং ফলাও করে *কালান্তর* (১৩.৮.৭০)-এর পাতায় ছাপা হয় : দুর্গাপুরকে অচল করা গেল না। (সংবাদ শিরোনাম)

'খুনের দায়ে ধৃত পাঁচজন সি পি এম নেতার মুক্তির দাবিতে আজ সি পি এম দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দুর্গাপুরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন।

...ঐ এক তরফা ধর্মঘট কার্যত ব্যর্থ হয়েছে।'

দুর্গাপুর সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের ধরণ থেকেই সি পি আই-এর ধর্মঘট-বিরোধী মনোভাব প্রকট। নতুন করে দুই পার্টির মধ্যে সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠার একটি বড় কারণ নিশ্চয় 'দুর্গাপুরের ধর্মঘট'।

ঠিক তার সাতদিন পর দ্বিতীয় ঘটনা যার জের বহুদূর গড়াল। সি পি এম ও সি পি আই-এর সংঘর্ষের পরিণতিতে সি পি আই-এর বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা সুরেন ধর চৌধুরী গুরুতর

আহত হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় পাঁচমাস মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে ছিলেন। *কালান্তর*-এর সংবাদসূত্রে জানা যায়, ২০ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ব্যারাকপুরের একটি চায়ের দোকানে সি পি এম-এর লোকেরা হামলা করে, তারা সি পি আই-এর দু'জন কর্মী সমীর গুহ ও রবি চক্রবর্তীকে মারধর করে।

সি পি এম-এর এই গুণ্ডাবাজির প্রতিবাদে সি পি আই নেতা সুরেন ধর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মিছিল বার হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রাত ৯টা নাগাদ যখন ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড়ের কাছে পৌঁছায় সেই সময় সি পি এম-এর লোকেরা অতর্কিতে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর আক্রমণ করে ও শ্রীধর চৌধুরীকে গুরুতরভাবে আহত করে। মধ্যরাতে খবর নিয়ে জানা গেল শ্রীধর চৌধুরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। (*কালান্তর*, ২১.৮.৭০)

এই ঘটনার সূত্রে সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ এক বিবৃতিতে জানান : কমিউনিস্ট নেতাদের খুন করার নীতি সি পি এম না ছাড়লে গুরুতর প্রতিক্রিয়া হবে। (*কালান্তর*, ২২.৮.৭০)

২৫ ডিসেম্বর '৭০ সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। *কালান্তর* (২৬.১২.৭০) -এর পাতায় লেখা হল : 'কমরেড সুরেন ধর চৌধুরীর মতো একজন বিরলদৃষ্টান্ত বিপ্লবী সর্বত্যাগী কমিউনিস্ট, মার্কসবাদী নামধারী সি. পি. এম দলের লোকদের হাতে প্রাণ দিলেন —বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘন কালো অক্ষরে তা লেখা থাকবে।'

নিঃসন্দেহে এক শোচনীয় ঘটনা। এটি ঘটতে পারল যেহেতু পশ্চিমবাংলার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজাণু। ২০ আগস্ট সুরেন ধর চৌধুরী গুরুতর আহত এবং হামলাকারীরা সি পি এম-এর লোক বলে কথিত। ঠিক তার পরদিন একজন প্রবীণ নেতা জীবন মাইতি ছুরিকাহত (তিনিও পরে মারা যান) এবং আততায়ী নকশালপন্থী বলে পরিচিত।

এই দুই বিয়োগান্ত ঘটনা থেকে আর একবার প্রমাণিত : খুনেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দলীয় পতাকা বহন করে। লুম্পেনরাও এখন লাল পতাকাবাহী।

এখন আবার সি পি আই, সি পি এম সম্পর্কের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ঘটনা পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে, উভয় পার্টির মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র একেবারে ছিন্নভিন্ন। তার আর একটি প্রমাণ : সি পি এম আয়োজিত '৩১ আগস্ট শহীদ দিবস' উপলক্ষ্যে সি পি আই-এর প্রতিক্রিয়া। *কালান্তর* (১.৯.৭০) জানাচ্ছে : কলকাতায় সারাদিন বিক্ষিপ্ত ঘটনা। বোমাবর্ষণ গুলি/ ৫ জন নিহত/ ৫০ জন গ্রেপ্তার।

'সি পি এম-এর তরফ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক দিয়ে 'কলকাতা অবরোধ ও বে-আইনী সরকার অচল' করার ঘোষিত কর্মসূচী ব্যর্থ হওয়ায় আজ ঐ দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজি, রেল লাইনের ফিশ প্লেট অপসারণ ও বৈদ্যুতিক তার কেটে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছে।'

সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে সি পি এম-এর প্রতিবাদী কর্মসূচি 'ব্যর্থ' হওয়াতে সি পি আই-এর প্রতিক্রিয়া যেন প্রায় উল্লাসের পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্পষ্টতই অদূর ভবিষ্যতে আর সি পি আই-সি পি এম-এর সমঝোতা গড়ে উঠবে না। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসনের বল্গাহীন অত্যাচার ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর বামপন্থী মোর্চা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। যেহেতু সি পি আই-এর সঙ্গে রয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কয়েকটি ছোটখাট বামপন্থী দল এবং তারাও

আপাতত সি পি আই-কে ছেড়ে সি পি এম নেতৃত্বাধীন জোটে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত, অতএব পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সংগ্রামের পথ এখন আদৌ মসৃণ নয়।

২৪

পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী মানুষের মনোবল চূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি বদ্ধপরিকর। গোটা ১৯৭০ সাল জুড়ে চলল দমন-নিপীড়ন-অত্যাচারের স্টিম রোলার। যেন এক হিংস্র শ্বাপদ দাঁত নখ দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে তার শিকার। পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসের শিকার মূলত নকশাল ও সি পি এম। নকশালরা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে, অতএব তাদের ক্ষমা নেই। অপরদিকে পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা সি পি এম। অতএব তারা দিল্লীর শাসকদের চিন্তার কারণ এবং দমননীতিরও টার্গেট হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পতনের পর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যে এরকম আগ্রাসী রূপ নিতে পারে তা কি সি পি এম নেতারা আদৌ অনুমান করেছিলেন? সে বিষয়ে অন্তত অশোক মিত্র নিঃসন্দেহ নন। তিনি বলছেন, 'দিল্লীতে হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে যখন দেখা হয় (দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে) তখন তাঁকে বলি 'র' (RAW) কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের ছক কষছে। তিনি জোর গলায় বলেন : শহরে হয়তো তারা পারতে পারে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যে সংগঠন গড়েছি তাতে হাত দেবার সাধ্য কারও নেই।' অর্থাৎ সন্ত্রাস বলতে তখনো ধারণা টেগার্টের কায়দা—যা ছিল মূলত শহরে সীমাবদ্ধ। বড় জোর গ্রামে গিয়ে জমিদারের ছোট ছেলেকে ধরে আনা হত।

১৯৭০-এর পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মানুষের জীবনে রাষ্ট্রপতি শাসনের ন'মাসের অভিজ্ঞতার সারাৎসার হল অমানুষিক দমন পীড়ন যার পাশে ব্রিটিশ শাসনও যথেষ্ট ভব্যসভ্য দেখায়। অত্যাচারের প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে সি আর পি—যাদের হাজারে হাজারে গ্রামে শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দখলদার বাহিনীর মতো তাদের আচরণ এবং প্রায় প্রতিদিন তাদের একটানা দৌরাত্ম্যের খবর আসছে।

নদীয়ার গ্রামে গ্রামে ঢুকে টহল দিচ্ছে সি আর পি। এমন কি মাঠ থেকেও তারা গ্রেপ্তার করছে কৃষক সমিতির নেতা ও কর্মীদের। সুপরিচিত কৃষক নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, বাগে পেলে গ্রেপ্তার করছে। ১২ জুলাই '৭০ রাত সাড়ে তিনটেয় শিলিন্দা থানার কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি বিভূতি বিশ্বাসকে তারা গ্রেপ্তার করে।

নির্মমতার নতুন নজির সৃষ্টি করল সি আর পি বর্ধমানের গলসী থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে। ১৪ জুলাই '৭০ ঐ গ্রামের কৃষক ও খেতমজুরদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে সি আর পি। *গণশক্তি* (১৬.৭.৭০)-র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : তারা মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুটের তলায় পিষে মেরেছে সাতদিনের শিশুকে। ছয়মাসের সন্তান কোলে কৃষক রমণীকে মারতে মারতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মেমারি থানার বিজুরি গ্রামে ২৬ জুলাই '৭০ কৃষক মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে তারা

হত্যা করেছে কৃষক সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে। সি আর পি-র গুলি ও লাঠিতে আরও একজন কৃষক নিহত ও বহু আহত।

কলকাতার প্রতিটি থানায় সি আর পি মোতায়েন। কয়েকটি অঞ্চলে তারা রীতিমতো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। যেমন, বেলেঘাটা। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকেই মিঞাবাগান স্কুলে সি আর পি মোতায়েন। ১৪ জুলাই স্থানীয় থানার এক অফিসারের নেতৃত্বে তারা ৩৫ নং ওয়ার্ড যুব ফেডারেশনের অফিসে হামলা চালায়, লেনিনের ছবি ও সি আর পি-র গুলিতে নিহত শহীদ স্বপন সরকারের ছবি আছড়ে ভেঙে ফেলে।

বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বহু স্কুল সি আর পি-র শিবির। যেমন মে মাসে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী 'এ' জোন এবং 'বি' জোন মালটিপারপাস স্কুল দুটি বন্ধ রয়েছে। যেহেতু স্কুল প্রাঙ্গণে সি আর পি ক্যাম্প। লেখাপড়া বন্ধ।

সি আর পি'র ত্রাস থেকে অব্যাহতি নেই এমনকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। সেখানকার ছাত্রসংসদ-এর ঘোষিত দাবি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে সি আর পি প্রত্যাহার না হলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসবেন না। ২৪ জুলাই '৭০ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বিকেল সাড়ে চারটেয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে একটি ছাত্রসভা ডাকা হয়। হঠাৎ সি আর পি বিনা প্ররোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে লাঠি চার্জ করে। আচমকা আক্রমণে দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী, এমনকি অধ্যাপকরাও অল্প বিস্তর আহত হন। সি আর পি-র আর একটি দল তখন যাদবপুর স্টেশনে গিয়ে হামলা করতে থাকে। রেলযাত্রী ও স্থানীয় লোকজন কারও রেহাই নেই।

সি আর পি-র বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ২৫ জুলাই '৭০ যাদবপুরে বন্ধ ঘোষিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত পশ্চিমবাংলার অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক জীবন প্রায় বিপর্যস্ত। তার অন্যতম উদাহরণ শিবপুর বি. ই. কলেজ। সেখানকার আবাসিকদের প্রশ্ন বি. ই কলেজ কি বন্দী শিবির? যখন তখন তাঁদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। শুনতে হচ্ছে অপমানজনক উক্তি। মহিলা আবাসিক অথবা অধ্যাপকদেরও রেহাই নেই। একদিন ক্লাস চলাকালীন, কলেজ কর্মচারী ইন্দু চট্টোপাধ্যায়কে প্রচণ্ড প্রহার করে বি এস এফ-এর লোকেরা। তার উপর কলেজের অধ্যক্ষ মশায় আবাসিকদের রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঘরে থাকার আদেশ জারি করেছেন। (*গণশক্তি*, ৮.১০.৭০)

পুলিশ, সি আর পি, বি এস এফ প্রমুখ শান্তিরক্ষকদের দৌরাত্ম্যে ত্রাস ও বিভীষিকার কালরাত্রি নেমেছে গোটা রাজ্য জুড়ে। পাখি শিকারের মতো তারা মানুষ খুন করে চলেছে। সি আর পি ২ সেপ্টেম্বর '৭০ নাকতলার অবনীভূষণ চক্রবর্তীকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তাছাড়া তারা ঘরে ঘরে তল্লাশির নামে হামলা চালায়, একজন মহিলাসহ দু'শ জনকে আটক করে।

২০শে সেপ্টেম্বর সি আর পি পিটিয়ে মারে জোড়াবাগান এলাকার এক এগার বছরের কিশোরকে। তারা তল্লাশির নামে স্থানীয় কাউন্সিলার হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি তছনছ করে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন, সি আর পি-র অত্যাচারের ফলে বেহালার তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের কর্মচারী গোপালকৃষ্ণ বাগচির মৃত্যু ঘটেছে। *গণশক্তি* (২৭.৭.৭০)

কলকাতার উপকণ্ঠে ধাপা অঞ্চল সি আর পি-র আর একটি মৃগয়াক্ষেত্র। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর থেকে ধাপার বুকে চলেছে জোতদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সি আর পি ও গুণ্ডাদের লাগাতার হানাদারি। ২ নভেম্বর সি আর পি-র গুলিতে নিহত হয়েছেন দিলীপ দাস ও কৃষক রমণী মহারানী সাঁতরা। লাঠি ও গুলিতে আহত ১০৮ ও গ্রেফতার ২৯০ জন। তাছাড়া ৩২৫টি ঘর ভাঙচুর ও লুট। ঘরছাড়া হয়েছেন ১৬০০ জন কৃষক ও ধর্ষিতা দুজন কৃষক রমণী।

যাবতীয় অত্যাচারের আইনি ভিত্তি দেবার ব্যবস্থাও পাকা। *কালান্তর* (১২.৯.৭০) জানাচ্ছে, 'আরও একটি দমনমূলক আইন পুনরুজ্জীবিত হতে চলেছে'। রাজ্য সরকার ১৯৫৩ সালের ট্রাইব্যুনাল অব ক্রিমিনাল জুরিডিকশন আইনটিকে বলবৎ করে কলকাতাসহ রাজ্যের কয়েকটি জেলার স্থানবিশেষকে দু'একদিনের মধ্যেই উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে চলেছে। অর্থাৎ ঐসব বাছাই করা অঞ্চল ঘেরাও করে চলবে যথেচ্ছ অত্যাচার। এভাবে 'কুম্বিং' কথাটির উদ্ভব যা অচিরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে।

'কুম্বিং'-এর প্রথম মহড়াটি হয়ে গেল ১১ সেপ্টেম্বর '৭০ বেহালায়। তারপর তিনদিন বেহালা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কে বা কারা দু'জন পুলিশ খুন করেছে। ব্যস তার পিঠোপিঠি শুরু পুলিশ ও সি আর পি-র পৈশাচিক হামলা বেহালার ঘরে ঘরে। কার্ফু-কবলিত বেহালায় যাকেই হাতের কাছে পাচ্ছে তাকেই মারছে। লাঠি লাথি কিল ঘুষি চলছে অবাধে পুরোদমে। দূরপাল্লার বাসগুলি কার্ফু না জেনে বেহালা সীমানার ভেতরে আসতেই সশস্ত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যাত্রী কনডাকটার ড্রাইভার সবাইকে টেনে নামাচ্ছে। রাতের ডিউটি সেরে মানুষ ঘরে ফিরছে—পথেই পড়ল পুলিশের লাঠি মাথায়। অজ্ঞ রিকশাওয়ালা অন্যদিনের মতো রিকশা নিয়ে পথে বেরুতেই গ্রেফতার। অন্যদিনের মতো দুধ নিয়ে বেরিয়েছে গোয়ালা, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সি আর পি। ভিখিরিরা শুয়ে ছিল একটা দোকানের বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ওপর চলল প্রচণ্ড মারধর। *কালান্তর* (১২.৯.৭০)-এর সংবাদসূত্রে প্রকাশ : ১১ সেপ্টেম্বর '৭০ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে বেহালার এক জন মহিলাসহ দু'শ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

আগামী দিনে গোটা রাজ্যে যা ঘটবে তার প্রথম মহড়াটি হয়ে গেল বেহালায়।

২৫

হঠাৎ যেন ঘটনাপ্রবাহ নতুন খাতে বয়ে চলেছে ঠিক এক অবাধ্য নদীর মতো। ১৯৬৬-৬৯ সালের কল্লোলিত দিনগুলি এখন শুধুই স্মৃতি। তখন ছিল গণসংগ্রামের জোয়ার, ছিল সংগ্রামী মানুষের একতা আর ওপরতলায় নানা দল ও নানা মতের সমঝোতা। যা কিছু পশ্চিমবাংলায় ঘটছিল তখন তার একটা গন্তব্য ছিল। আর এখন? গণ-আন্দোলনের ভাটার টান সংগ্রামী মোর্চা ছিন্নভিন্ন—পরিব্যাপ্ত সন্ত্রাস।

নিঃসন্দেহে আন্দোলন সংগ্রামের বিপরীত পরিবেশ। সন্ত্রাস বিভেদ বিভ্রান্তির বাতাবরণ কিন্তু দমিয়ে দিতে পারেনি জনসমাজের লড়াকু অংশকে। তারা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে

যায়নি। সভা মিছিল হরতালে তারা ঠিকই সামিল। রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন অত্যাচারের পরোয়া না করে তারা লড়াই ঠিকই জীইয়ে রেখেছে। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল।

১. ৫ জুন '৭০ : 'কো অর্ডিনেশন কমিটির' ডাকে রাজ্যের সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারী বহরমপুরে সরকারি কর্মচারীদের উপর সি আর পি-র বর্বর হামলার প্রতিবাদে অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন। ২৫ জুন আবার পশ্চিমবাংলার আড়াই লক্ষ সরকারি কর্মচারি পুলিশ নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং জরুরি দাবিগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে একদিনের হুঁশিয়ারি ধর্মঘট করে সরকারি কাজকর্ম সব অচল করে দেন।

২. ১৪ জুলাই '৭০ : ছয় পার্টির জোট ও বিভিন্ন গণসংগঠনের ডাকে সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। *গণশক্তি* (১৪.৭.৭০)-র ভাষায়, রাজ্যের চারকোটি মানুষ তার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শাসকদের খবরদারির প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৩. ১০ আগস্ট '৭০ : রাজ্যের বেশ কয়েকটি শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীগণ একযোগে হরতালে সামিল হন। এই হরতালে অংশ নেন বিড়লা শিল্পসংস্থার ৭০ হাজার, সওদাগরি কর্মচারী ১ লক্ষ, সলিসিটার্স ফার্ম ৬ হাজার এবং ২ লক্ষ চটকল শ্রমিক সবশুদ্ধ চারলক্ষ শ্রমিক কর্মচারী।

৪. নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে শ্রমিক কর্মচারী লড়াই ও তার জয়পরাজয়ের খতিয়ানের চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দুর্গাপুরের লড়াই। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার লড়াই নয় এটি, এই লড়াই রাজনৈতিক স্বাধিকারের এবং এই লড়াই স্বৈরাচারী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে।

গণশক্তি-র সংবাদসূত্রে জানা যায় ৬ আগস্ট '৭০ ভোরে পুলিশ দিলীপ মজুমদার সহ পাঁচ জন জননেতাকে গ্রেপ্তার করে হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুর্গাপুর অচল হয়ে যায়। দোকানপাট স্কুল কলেজ বন্ধ। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের শ্রমিকেরাও বাস বন্ধ করে দেন।

ধৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১২ আগস্ট '৭০ থেকে শুরু হয় দুর্গাপুরের লাগাতার শ্রমিক ধর্মঘট। আই এন টি ইউ সি, কংগ্রেস, সি পি আই-এর বিরোধিতা এবং সি আর পি-র সন্ত্রাস সত্ত্বেও ধর্মঘট দশদিন স্থায়ী হয়। তার মধ্যে গুলি লাঠি কার্ফু কোনো কিছুই বাদ যায়নি।

সংগ্রামী দুর্গাপুরের পক্ষে সংহতি জানিয়েছে গোটা বর্ধমান জেলা ১৯ আগস্ট সর্বত্র সফল হরতাল-ধর্মঘটের মাধ্যমে।

২৩ আগস্ট দুর্গাপুরের ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার পরও চলেছে সেখানে বর্বর অত্যাচার। কার্ফু ও ১৪৪ ধারা দুইই যথারীতি বহাল। সাড়ে সাত হাজার শ্রমিককে চার্জশীট ধরানো হয়েছে। গ্রেপ্তার সত্তর জন ও মামলা দায়ের করা হয়েছে শতাধিক শ্রমিকের বিরুদ্ধে। নিরস্ত্র শ্রমিক কর্মচারীদের ঘিরে রেখেছে বার হাজার সশস্ত্র শান্তিরক্ষক।

৫. জনগণ আর একবার মুখোমুখি চরম হিংস্রতার। ৩১ আগস্ট শহীদ দিবস। গুলি চলেছে ১৩০ রাউণ্ড। মিলিটারি টহল দিয়েছে নানা জায়গায়। সরকারি হিসেবে মৃত পাঁচ ও আহত দু'শ।

তবুও হুগলি হাওড়া মেদিনীপুরের হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে কলকাতার সমাবেশে জমায়েত হন। (*গণশক্তি*, ৩১.৭.৭০)

মানুষের অপরাজেয় সত্তা চরম দুর্দিনেও অম্লান।

গ্রামে ফসল কাটা শুরু হয়েছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে সি আর পি-র হামলা। আরও সি আর

পি আনা হচ্ছে। 'আগামী দু'তিন মাস গ্রাম বাংলায় আরও প্রচণ্ড হামলা হবে। কায়েমী স্বার্থের এই ব্যাপক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। দরকার হলে রক্ত দিতে হবে। কৃষকের ঘরে ধান তুলতেই হবে।' (উদয়নারায়ণপুরে হরেকৃষ্ণ কোঙারের বক্তৃতা, ৩০.১১.৭০)

১৭ ডিসেম্বর '৭০। সাংবাদিক সম্মেলনে হরেকৃষ্ণ কোঙার জানাচ্ছেন, 'শত অত্যাচার সত্ত্বেও শতকরা আশি ভাগ ফসল লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ক্ষেতমজুর নিজের ঘরে তুলেছেন। গত দু'মাসে সতের জন কৃষক কর্মীর প্রাণদান ব্যর্থ হয়নি।'

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবাংলার বদলে যাওয়া রাজনৈতিক আবহে কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এখনো চোখে পড়ে, রুপোলি ঝিলিকের মতো। যেমন ২৬ নভেম্বর, সি পি এম আয়োজিত মালদহের জেলা কনভেনশনে সি পি আই-এর কৃষক নেতা নিমাই মুর্মুর উপস্থিতি। তিনি ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথা বলেন তাঁর ভাষণে। কারণ যে জমি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষক দখল করেছিল, রাষ্ট্রপতি শাসনের সুযোগে তা কেড়ে নেবার চেষ্টা চলছে পুলিশ ও জোতদারে মিলে।

আর একটি ব্যতিক্রমী দৃশ্য। ১ ডিসেম্বর '৭০ কাকদ্বীপ থানার উত্তরকালীয়াবাদ গ্রামে কৃষকের উপর গুলি ও জোতদারের অত্যাচারের প্রতিবাদে সি পি এম ও এস ইউ সি-র যুক্ত সমাবেশ ঘটে।

এসব খণ্ড বিক্ষিপ্ত উদ্দীপিত ঘটনার প্রভাব এতই সীমিত যে, তার অভিঘাতে গোটা পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের আশু পরিবর্তন সম্ভব নয়। সবাই যেন এক অভিশপ্ত পরিবেশে দম বন্ধ করে রয়েছে।

২৬

সে এক বিশেষ সময়ের ইতিবৃত্ত যখন পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রের গোটা শরীরে রক্তের ছোপ। খুন আর রক্ত। এবং মানুষের সমস্ত চেতনা জুড়ে তার আধিপত্য। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি নাগাদ খুনের হার যেন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। খুনের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কারও পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় নিশ্চয়— তবুও কয়েক দফায় প্রকাশিত খুনের অসম্পূর্ণ খতিয়ান আমাদের সামনে রয়েছে।

১. ৩১ আগস্ট '৭০ শহীদ দিবস উদ্‌যাপন-লগ্নে জানা যায়, ১ জুন থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন। (*গণশক্তি*, ৩১.৮.৭০)

২. রাষ্ট্রপতি শাসনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুলিশকে গুলি করে মারার অবাধ ক্ষমতা দেওয়ার পর এক সপ্তাহে পুলিশের গুলিতে ২৫ জন খুন। (*গণশক্তি*, ৫.১১.৭০)

৩. ২৭ নভেম্বর '৭০ পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, গত তিনমাসে খুন হয়েছে এরাজ্যে কলকাতা বাদে ২৭১ জন এবং কলকাতায় ১২০ জন। (*গণশক্তি*, ২৮.১১.৭০)

নিতান্ত অসম্পূর্ণ এই হিসেবের আওতায় ধরা পড়ে না সে-সময়ের রক্তপাতের পুরো ছবিটা। আসলে রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে খুন হয়েছে পুলিশের হাতে।

তার উপর রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছে প্রতিপক্ষের হাতে। তাছাড়াও এমন সব হত্যাকাণ্ড ঘটছে যার সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় খুনের খতিয়ান পড়ে পড়ে মানুষের বোধশক্তি অসাড়। গোটা পশ্চিমবাংলা যেন মৃত্যুর উপত্যকায় পরিণত। এই অঝোর রক্তপাত অন্য প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। তাই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন: 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে। ' শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, 'বীরেন্দ্র তাঁর কবিতা বইয়ের নামের মধ্য দিয়েই ছুঁতে থাকেন সেই সময়ের রক্তপাত : 'মানুষখেকো বাঘেরা বড়ো লাফায়'... একটি সাক্ষাৎকারে কবি জানিয়েছেন পরে, কোন্‌টা কবিতা হলো আর কোন্‌টা হলো না এটা ভেবে দেখার সময় তখন ছিল না, কেননা 'কাব্যগুণহীন জার্নালিজম' দিয়েই তিনি পুলিশি তাণ্ডবের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন।' (*এখন সব অলীক*)

হ্যাঁ, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে বেড়াচ্ছে। যেমন ২৫ সেপ্টেম্বর '৭০ পুলিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দর্শনের ছাত্র কৃষ্ণদাস বিশ্বাসকে গুলি করে মেরেছে। এবং সেই রাতেই ভ্যান থেকে নামিয়ে শিবপুর বি ই কলেজের ছাত্র অনুপ বসু, আশুতোষ কলেজের ছাত্র শঙ্কু দত্ত ও কৃষ্ণ সান্যালকে ভবানী দত্ত লেনে পুলিশ গুলি করে মারে। (*গণশক্তি*, ২৬.৯.৭০)

২০ নভেম্বর বারাসতের আমডাঙ্গা ও কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায় এগারজন যুবকের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, তাদের মাথায় গুলির চিহ্ন।

জ্যোতি বসুর মতে, এই হত্যাকাণ্ড পুলিশেরই কীর্তি, যেহেতু তাদের হত্যা করার অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (*গণশক্তি*, ২১.১১.৭০)

২৬.১.৭১-এ একই নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গার ধারে। ছ'টি তরুণের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

জল্লাদ পুলিশ যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত নির্জন অঞ্চলকে বধ্যভূমি বানিয়েছে তাদের অন্যতম সল্ট লেক। ২৩ নভেম্বর সি পি এম সমর্থক মলয়, তিলক ও পরিতোষকে পুলিশ গাড়ি করে সল্ট লেকের এক নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। তিনজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পুলিশ তাদের বলে, তোদের ছেড়ে দিলাম। তারা চলে যাবার উপক্রম করলে পুলিশ গুলি করতে উদ্যত হয়। এই সময় কাছাকাছি মাঠে কর্মরত কৃষকেরা এগিয়ে এলে পুলিশ এই তিনজনকে আবার গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

হুবহু একই রকমের আর একটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি (৪.৩.৭১) জানাচ্ছেন : কয়েকদিন আগে বেলেঘাটায় পাঁচ ব্যক্তিকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়, বিচার চেয়ে হতভাগ্যরা আবেদন করার পরও।

একটার পর একটা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। তারই একটা দৃষ্টান্ত শ্যামপুকুর থানার লক্-আপে ১৫ বছরের কিশোর সমীর ভট্টাচার্যকে পিটিয়ে মারা। যেহেতু 'নকশালপন্থী' তাই বিচারের ভণিতাটুকু পর্যন্ত নেই। পুলিশ তাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে। এই শুরু। এরপর থেকে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে-বাড়তেই থাকবে। সমীরের মৃত্যুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যি ঘটেছিল। পাড়ার স্কুলগুলি থেকে ছেলেরা বেরিয়ে আসে, কিছু কিছু দোকানপাট বন্ধ হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষ শ্যামপুকুর থানা ঘেরাও করে। দিনটা ছিল ১৯

আগস্ট, ১৯৭০। 'ঐদিন পুলিশকে অন্তত ৬ রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়। অনেক রাত পর্যন্ত পাড়ায় উত্তেজনা ছিল।' (*কালান্তর*, ২০.৮.৭০)

শ্যামপুকুর থানায় লক্-আপে মৃত্যুর দ্বিতীয় ঘটনার তারিখ ২২ অক্টোবর ১৯৭০। *কালান্তর* (২৩.১০.৭০)-এর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পুলিশের মারের চোটে থানার লক্-আপে কিশোর বয়সী সমর সাহা মারা যায়। সমরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় উত্তর কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হাঙ্গামা হয়। পুলিশ প্রায় ৮০ রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে দু'জন মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়।

একই দিনে ভবানীপুর থানার লক্-আপে অরুণ ঘোষ নামে একজন যুবককে পিটিয়ে মারে পুলিশ।

পুলিশী হত্যালীলায় এক বিশেষ মাত্রার সংযোজন : জেলে বন্দী হত্যা। ১৬ ডিসেম্বর '৭০ মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের গুলিতে আটজন বন্দী মারা যায়। নিহতরা নকশালপন্থী বলে পরিচিত। সি আর পি বাহিনী গোটা জেলখানা ঘিরে রেখেছে। (*গণশক্তি*, ১৭.১২.৭০)

সত্যিই যে 'মানুষখেকো বাঘেরা বড়ো লাফায়'—হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মানুষ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়। তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হল *গণশক্তি*-র পাতা থেকে ।

১) ২৩.৯.৭০ : বেলঘরিয়ায় ননী সাহাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে । তার প্রতিবাদে নিমতা-বেলঘরিয়া অঞ্চলে হরতাল প্রতিপালিত।

২) ৪.১১.৭০ : পুলিশ গ্যালিফ স্ট্রিটে বিজয় দাস, ভবানীপুরে ফটিক ভট্টাচার্য ও আমহার্স্ট স্ট্রিটে শেখর গুহকে গুলি করে মারে। আর মাঝরাতে অনল কুমার কর্মকারকে পিটিয়ে মারে বালি থানার লক্-আপে।

৩) ১২.১১.৭০ : উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর অঞ্চলের আনন্দ লেনে বাড়ির বারান্দায় বসে ছিলেন সি পি এম সমর্থক দুই ভাই, রণজিৎ চক্রবর্তী ও সমীর চক্রবর্তী। আচমকা গাড়িতে এসে পুলিশ তাঁদের গুলি করে মারে। প্রসঙ্গত তাঁরা দু'জনই হোমগার্ড।

৪) ১৪.১১.৭০ : ঢাকুরিয়ায় পুলিশের গুলিতে মারা যান পার্থ দাস নামে একজন যুবক।

৫) ১৯.১১.৭০ : জোড়াবাগান এলাকায় পুলিশ তুষারকান্তি ঘোষ নামে একজন যুবককে গ্রেফতার করার পর গুলি করে মারে।

পুলিশী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অন্যতর হত্যাকাণ্ডের সহাবস্থান। এই দুই মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক অন্তহীন শোকযাত্রা। এবং যার প্রতিক্রিয়ায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'জ্বলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র এপাড়ায় ওপাড়ায়।' এলোপাথাড়ি খুনের আওতায় এখন প্রায় সবাই, একজন নগণ্য মানুষও। নিহতদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন রাজনৈতিক নেতা, বিচারপতি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পুলিশ, হোমগার্ড, ব্যবসাদার, ছাত্র, এমনকি আলুওয়ালা বা ময়লা কাগজ কুড়িয়ে বেড়ান যাঁরা— তাঁরাও।

এই একঘেয়ে খুনের ঘটনা দেখে ও পড়ে মানুষের কাছে বিষয়টাই বৈচিত্র্যহীন। কেউ কৌতূহল বোধ করে না কেন তিনজলার কাঠের ব্যবসায়ী রামভজন সিং ছুরিকাহত হলেন তা জানার জন্যে। তেমনই কেউ প্রশ্ন করবে না, কাদের দ্বারা ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার শ্যামাপদ দে খুন হলেন। বা গড়িয়া অঞ্চলে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা নিহত উত্তম মান্না কোন্ পার্টির লোক ছিলেন।

এভাবে খবর জড়ো হয় এবং ছাপা হয় খবরের কাগজের পাতায় বড় হরফে অথবা ছোটো হরফে। পাঠককুলের ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহ ও ঔদাসীন্যের কাছে খুনের খবর গুরুত্ব হারিয়ে চলে যায় প্রথম পাতা থেকে ভেতরের পাতায়। তবে এটাও ঠিক, '৭০ সালের শেষাশেষি বেশ ক'জন ব্যবসায়ী ও পুলিশ খুন হয়েছে।

গোটা সত্তর সাল ধরে পুলিশ ও অন্যান্যদের কর্মকুশলতায় যেসব হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল, তার একটা প্যাটার্ন হয়তো আছে। যারা মারা গেল তারা হয়তো 'বিপ্লবের বলি' বা প্রতিবিপ্লবের। একটা হিংসার জবাবে আর-একটা প্রতিহিংসার ঘটনা তো ঘটতেই পারে। 'বিপ্লবের' জন্য প্রাণ দেওয়া নেওয়া অনায়াসেই চলে। আবার 'বিপ্লব' দমনের নামেও মানুষ শিকার কিছু বে-আইনী কাজ নয়। কিন্তু সমস্যা সেসব আরক্ত ঘটনা নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা কোনো প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে না।

তার কয়েকটি মাত্র উল্লিখিত হল, নাহলে যে রক্তপাতের কাহিনী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

১) ১৮.১২.৭০ : রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে দুপুরে পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পি. সি. ভট্টাচার্য তাঁর ঘরে ছুরিকাহত হয়েছেন। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

২) ১৯.১২.৭০ : রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতঃভ্রমণরত 'বারাসত হত্যাকাণ্ড' কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারাপদ মুখার্জি ছুরিকাহত হয়েছেন।

৩) ৩০.১২.৭০ : সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গোপাল সেনকে দুর্বৃত্তরা খুন করেছে। ড. সেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আততায়ীর ছুরিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

(এ প্রসঙ্গে প্রবীর রায়চৌধুরীর মন্তব্য : উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যাকাণ্ড বাম রাজনীতি খতম করার প্ল্যানের অন্তর্গত। এই ঘটনার কিছুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংসদের নেতা ও ব্লক কংগ্রেসের নেতা জিতেন রায়কেও খুন করা হয়। এসবই বাম রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের অনীহা জাগানোর পরিকল্পনা।)

৪) ১২.১.৭১ : সকাল সাড়ে দশটায় বেলুড় পলিটেকনিক-এ অধ্যাপক সত্যেন চক্রবর্তী যখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, কয়েকজন দুর্বৃত্ত আচমকা ক্লাসে ঢুকে তাঁকে খুন করে।

পশ্চিমবাংলার জনজীবনে আরও যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, সম্ভবত, এসব তারই পূর্বলক্ষণ। *যুক্তি তক্কো গপ্পো* ছবিটির প্রথম দৃশ্যটিতে রয়েছে মঞ্চে একদল ভূত নৃত্য করছে আর এক স্থবির বুড়ো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। কী তাৎপর্য এই দৃশ্যের? ঋত্বিক ঘটকের জবাব : 'আমি বাপু বলতে চেয়েছি ভূতের নৃত্য চলছে গোটা বাংলাদেশে'। আর এই স্থবির মানুষটি যেন হতভম্ব লোকসাধারণের প্রতিভূ।

১৯৭১ সালের গোড়ায় যে নির্বাচন হতে চলেছে—এই তো তার পটভূমি।

২৭

১০ মার্চ ১৯৭১। আজ বুধবার পশ্চিমবঙ্গে ভোট। *আনন্দবাজার* (১০.৩.৭১)-এর প্রতিবেদন :

প্রায় পঁচিশ মাসের মাথায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আবার ভোট। একেবারে ভিন্ন পটভূমি এবারের ভোটের, একেবারে আলাদা রাজনীতি। সেবারে ছিল যুক্তফ্রন্ট বনাম কংগ্রেস, এবার সে যুক্তফ্রন্টও নেই। সে কংগ্রেসও নেই। এবার নানা দলের লড়াই, নানা পথের লড়াই। নানা মতের লড়াই।

সে পশ্চিমবঙ্গও নেই, সে রাজনীতিও নেই। ইতিমধ্যে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। বহু মা শোকে বোবা হয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে বহু জোড়া শাঁখা জলে ফেলে দিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু চিতা জ্বলেছে।

এবার তাই বৃহত্তর কলকাতায় 'ভোট ফর' স্লোগান থেকে বোমার আওয়াজ বেশি। এবার তাই পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের চেয়ে সি আর পি ও সৈন্য বেশি। এবার প্রার্থীরা প্রাণ দিয়েছেন, কর্মীরা নিহত হয়েছেন। এবার এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন হচ্ছে। এবার তিনটি কেন্দ্রে প্রার্থীরা নিহত হয়েছেন বলে নির্বাচন বন্ধ থাকছে, যে-জিনিস এ রাজ্যে কোনো দিন হয়নি।

একাত্তরের নির্বাচন স্পষ্টতই এক বে-নজির পরিস্থিতিতে হতে যাচ্ছে। বোমা পাইপগান এখন রাজনীতির অনুষঙ্গ এবং লোকের গা-সওয়া। অতএব বোমার আওয়াজে লোকে আগের মতো চমকায় না। কিন্তু প্রার্থী খুন একেবারেই বে-নজির ঘটনা। সচকিত মানুষ ভোট বর্জনের ডাক আগেও শুনেছে। এবারে শুধু ডাক নয়, তারই সঙ্গে হুমকি। ফাঁকা হুমকি যে নয়, সেটা কাজে দেখিয়ে দিল যারা হুমকি দিয়েছে।

১) ২৮.১.৭১ : দুপুরে হুগলি জেলার চণ্ডীতলায় খুন হলেন চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রস্তাবিত প্রার্থী সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

২) ৮.২.৭১ : রাত্রিতে সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের নব কংগ্রেস প্রার্থী যদুগোপাল রায় খুন।

৩) ১৭.২.৭১ : উখড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মণ্ডল খুন।

৪) ২০.২.৭১ : কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হেমন্তকুমার বসু খুন।

অন্যান্য প্রার্থী খুন হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটেনি, এবারে তাই ঘটল। হেমন্ত বসু নিহত হওয়াতে সারা বাংলা তোলপাড়। *আনন্দবাজার* (২১.২.৭১) লিখছে :

শ্রী হেমন্ত বসুর ছুরিকাঘাতে নিহত এই সংবাদে কলকাতা ও শহরতলির নানা জায়গায় জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। স্থানে স্থানে জনতা ক্রোধে ফেটে পড়ে। শ্রীবসুর খুন হওয়ার সংবাদ গিয়ে পৌঁছলে দমদম শ্যামনগর মোড়ে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা সি পি এম-এর নির্বাচনী অফিস তছনছ করে। নোয়াপাড়ায় সি পি এম-এর একজন সমর্থক ছুরিকাহত হন। উলুবেড়িয়ায় কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক-এর চেয়ারম্যান নেতাজীর সহকর্মী শ্রী হেমন্ত বসুর মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর।

এই অভাবনীয় হত্যাকাণ্ডে মানুষ মাত্রেই বিস্মিত ও বিমূঢ়। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়।

কালান্তর (২১.২.৭১)-এর প্রতিবেদন: শ্রীবসুর মৃত্যুতে শহরের দোকানপাট, সিনেমা, ট্রাম-বাস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে পতাকা অর্ধ-নিমিত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আগামীকাল ২৪ ঘণ্টার জন্য 'বাংলা বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছে আটপার্টি জোট ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমন্বয় কমিটি।

সি পি এম-এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল, এটা সি আই এ-র কাজ। পার্টির পক্ষ থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সি আই এ-র চক্রান্তেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এই ঘৃণ্য হত্যার নিন্দা করার মতো ভাষা নেই। অবিলম্বে অপরাধীদের খুঁজে বার করে শাস্তি দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন বানচাল করার জন্য যে গভীর চক্রান্ত চলছে এটা তারই অংশ। জনগণকে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতেই হবে।

ইতিমধ্যেই মানুষের মনে কিন্তু বিভ্রান্তি ও সংশয় জাগানোর কাজ অনেকটা এগিয়েছে। 'হেমন্ত বসুকে হত্যা করল কে? সি পি এম আবার কে?'—এই শ্লোগান নানা দলের মিশ্র জটলা ও স্বতঃস্ফূর্ত শোকগ্রস্ত মানুষের মিছিলে প্রথম থেকেই শোনা গেছে। কে বা কারা এই শ্লোগান প্রথম উচ্চারণ করল তা বলা কঠিন। ফরওয়ার্ড ব্লকের শোকাচ্ছন্ন কর্মীরা হতে পারে, এমনকি কংগ্রেসীরাও হতে পারে। মনে হয়, নিছক শোকের ধাক্কায় নয় সি পি এম বিরোধী জেহাদ উস্কে দেবার জন্যই এই শ্লোগানের উদ্ভব।

২৮

এক অভূতপূর্ব প্রতিকূল পরিবেশে একাত্তরের নির্বাচনে সি পি এম-এর অংশগ্রহণ। এমনিতেই সন্ত্রাসের বাতাবরণে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরও পুলিশ সি আর পি ও মিলিটারির তাণ্ডব অব্যাহত। তার উপর নির্বাচনের কাজে যুক্ত শত শত সি পি এম কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। পোস্টার সাঁটতে গিয়ে সি আর পি-র গুলিতে মারা গিয়েছেন বেহালার বাচ্চু মজুমদার। বারাসতের পার্টি কর্মী মন্টু দাস স্ক্রুটিনি করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দুর্বৃত্তদের ছুরিতে।

হেমন্ত বসুর নিজস্ব পাড়া শ্যামপুকুর-শোভাবাজার-বাগবাজারে তো সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। অলোক মজুমদার বলছেন, ৯ নং ওয়ার্ডের সি পি এম কর্মীদের পাড়া ছাড়তে হয় ১৯৭০ সালের ১৮ জুলাই। চীৎপুরের পুবদিকে শোভাবাজারের পিছনে দু'একটা রাস্তা ও গলি ছাড়া আর কোথাও চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। একই হাল ঠিক সাত দিন পরে ১৯ নং ওয়ার্ডের পার্টি কর্মীদের। নিমতলার কাঠগোলা ও বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট ছাড়া তাদের আর কোথাও ঠাঁই নেই। খুন হয়ে যেতে হবে অন্য কোথাও গেলে। ২৩ সেপ্টেম্বর '৭০,

তিনি নিজেও ছুরিকাহত হয়ে প্রথমে হাসপাতালে—ছাড়া পেয়ে তারপর থেকেই বাড়িছাড়া।

একাত্তরের নির্বাচনের আগে উত্তর কলকাতায় যেখানে ১০০ জন কমরেড ঘরছাড়া, সারা কলকাতায় সে সংখ্যা পাঁচশ'র কাছাকাছি। উপদ্রুত অঞ্চলগুলির মধ্যে তখন পুরো বেলেঘাটা, ট্যাংরা, বালিগঞ্জের কসবা ও তিলজলা এবং টালিগঞ্জ বিশেষভাবে চিহ্নিত।

অলোক মজুমদার জানাচ্ছেন, আক্রমণ শুরু করে গোড়ায় নকশাল দ্বিতীয় পর্যায়ে পুলিশ সি আর পি, তার পিছু পিছু কংগ্রেসের মস্তান— যারা ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেস বলে চিহ্নিত। অর্থাৎ পুলিশ, সি আর পি, কংগ্রেস, নকশাল সবাই তাড়া করে সি পি এম কর্মীদের ঘরছাড়া পাড়াছাড়া করল। এই যখন পরিস্থিতি ঠিক তখনই হেমন্ত বসু খুন হলেন।

হেমন্ত বসুর হত্যাকারী কে বা কারা— সেটা যাচাই হবার আগেই সি পি এম-কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানর চেষ্টা হল নানা মহল থেকে। সি পি এম-এর ভাষায় 'তিন কংগ্রেস আট পার্টি ও নকশাল' সকলেরই আক্রমণের বর্শাফলক সি পি এম-এর দিকে উদ্যত। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথ বেয়ে হেমন্ত বসুর শেষযাত্রার দু'পাশে লক্ষ লক্ষ লোক স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে ধিক্কারধ্বনি শুনেছে আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলেছে। উপর্যুপরি নানা ঘটনার ধাক্কায় মানুষ এমনিতেই দিশেহারা, তার উপর এই অভাবনীয় কাণ্ড। মানুষের মুখে কুলুপ এঁটে গেল।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনপ্রার্থীদের উপর হামলা কিন্তু অব্যাহত। আরও কয়েকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে :

১.৩.৭১ : আলিপুর কেন্দ্রের সি পি আই প্রার্থী নিজের বাড়িতে ছুরিকাহত। যে চারজনকে পুলিশ ধরেছে তারা ছাত্র পরিষদের কর্মী বলে পরিচিত।

৫.৩.৭১: দমদম কেন্দ্রের আদি-কংগ্রেস প্রার্থী পীযূষ ঘোষ ছুরিকাহত হয়ে মারা গিয়েছেন। একই দিনে আততায়ীর ছুরিতে ঐ দলের বর্ষীয়ান নেতা বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিহত। তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে হাওড়ার হেমচন্দ্র লেনে।

হেমন্ত বসুর হত্যায় যে মানুষ তড়িতাহত, সে মানুষই কিন্তু আর একটি পাইকারি হত্যাকাণ্ডের বেলায় প্রতিক্রিয়াশূন্য।

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে লাঠিচার্জ

সাতজন নিহত

গতকাল (২৪.২.৭১) জেলের অভ্যন্তরে লাঠিচার্জের ফলে সাতজন বন্দী নিহত ও ৪০জন আহত্। পুলিশ গুলিও চালিয়েছে। নকশালপন্থীরা একজন কারারক্ষীকে আক্রমণ করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৩ জন কারারক্ষী আহত। জেলের অভ্যন্তরে হত্যার প্রতিবাদে আজ বহরমপুরে [illegible] •*গণশক্তি*, ২৫.২.৭১)

একের পর এক স্নায়ুবিদারী ঘটনার ধাক্কায় মানুষের বোধবুদ্ধি আসাড়। এদিকে নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, সন্ত্রাসের মাত্রাও তত বাড়ছে। ১ মার্চ '৭১, প্রমোদ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে। তল্লাশির সময় তারা কাঁটাতার দিয়ে গোটা পাড়া ঘিরে ফেলছে। বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে পুলিশ ও

মিলিটারি যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরছে আর পেটাচ্ছে। এরকম তাণ্ডব চলছে অশোকনগর, চুঁচুড়া ও কৃষ্ণনগরে। কলকাতায় ও বাইরে মোট আটশতাধিক নিরীহ নাগরিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

গণশক্তি-র সূত্রে আরও খবর : নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বর্ধমান শহর ও পাশাপাশি অঞ্চলে কংগ্রেস ও পুলিশ যৌথভাবে ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। বর্ধমান শহরের কংগ্রেস অফিসের সামনেই পার্টিকর্মী অরুণ দত্ত ছুরিকাঘাতে নিহত। আসানসোলের পল্লীশ্রীতে দুর্বৃত্তদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন পার্টি সদস্য কমরেড রঞ্জিত চন্দ। রাণীগঞ্জে পার্টি-পরিচালিত শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর মিলিটারি হামলা চালায়। মিলিটারির হামলায় জামুরিয়ায় পার্টির নির্বাচনী সভাটিও ভণ্ডুল।

আরও খবর, ৪ মার্চ '৭১ উত্তর কলকাতায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও গ্রে স্ট্রীটের সংযোগস্থলে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও শিক্ষক নেতা রথীন দেব ছুরিকাহত হয়েছেন।

নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে আর এসব ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। স্বস্তিহীন দিন আর বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন পশ্চিমবাংলার মানুষ।

২৯

১০ মার্চ ১৯৭১। মানুষ আবার পথে বেরিয়েছেন— গন্তব্য ভোটদান কেন্দ্র। পশ্চিমবাংলার সচেতন মানুষ এর আগে বহুবার ভোট দিয়েছেন। ভোট দেবার জন্য হয়তো দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে, তবুও ধৈর্য হারাননি। কারণ সে তো ভোট নয়, সে যে এক বিচিত্র উৎসব। তাই ভোটের দিন এলে মনে হত, আবালবৃদ্ধবনিতা— সবাইকে যেন উৎসবের মৌতাতে পেয়েছে।

সেই ছবি এবারের ভোটের নয়। উদ্বেগ-উত্তেজনা-আশঙ্কা-আতঙ্কে মেশামেশি পরিবেশে এবারের ভোট। ভোট দেওয়াটাও এবার সাহসের পর্যায়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে *আনন্দবাজার,* (১১.৩.৭১) এর সংবাদ শিরোনাম :

সব আতংক সব আশংকা মিথ্যা করে দিয়ে এই বাংলায় নির্ভয় নির্বাচন

ভয় ছিল ভোট হবে না। হয়েছে। ভোট নয়, ভয়ই হার মেনেছে ওই বাংলার মতো এই বাংলায়!

আলোচ্য ভোটের তাৎপর্য ও গুরুত্বের নিরিখে সার্থক শিরোনাম। লক্ষণীয় যে এই প্রথম একই পঙ্‌ক্তিতে পাশাপাশি ঠাঁই করে নিল 'এই বাংলা' ও 'ওই বাংলা'। তার কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। এবার থেকে 'পাকিস্তানী' নয়, 'বাঙালি'ই হবে পূর্ব-বঙ্গবাসীর আত্মপরিচয়। সে কথায় পরে আসা যাবে। আপাতত পশ্চিমবাংলার নির্বাচন প্রসঙ্গ।

কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা মিশিয়ে *আনন্দবাজার*-এর প্রতিবেদক লিখছেন :

রটে ছিল বেশি ভোট পড়বে না। পড়েছে। শুধু পড়া নয়, সম্ভবত সব রেকর্ড ছাপিয়ে ছাড়িয়ে। ১০ই মার্চ। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দেখা গেল সবাই যেন সহসা সাহসী। কেন্দ্রে

কেন্দ্রে মুখের মেলা, দীর্ঘসারি, প্রতীক্ষিত জনতা। সগৌরবে উত্তীর্ণ পশ্চিমবাংলা।

শতকরা হার কত? সঠিক বলা যায় না। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ। সরকারি হিসাবে কিছু কম, কোথাও আবার নব্বই ছুঁই ছুঁই। ভোটদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি সর্বত্র চোখে পড়ার মত। কোথাও পুরুষের সমান সমান, কোথাওবা পুরুষের তুলনায় কিছু বেশি। এত বিপুলভাবে মহিলাদের ভোট দিতে এর আগে দেখা যায়নি।

গণশক্তি-র (১০.৩.৭১) সংবাদসূত্রে জানা যায়, সারাদিনে কলকাতা ও ২৪ পরগণায় মিলিটারির গুলিতে দশজন প্রাণ হারিয়েছেন।

তবে পরিস্থিতি বিচারে এই প্রাণহানির ঘটনাও প্রায় স্বাভাবিকত্বের পর্যায়ে পড়ে। প্রতিদিনের গা-সহা রক্তপাতের তুলনায় অসহ্য কিছু না।

নির্বাচনী ফলাফল

আনন্দবাজার-এর (১৫.৩.৭১)-এর প্রতিবেদন :

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ২৭৭টি আসনের মধ্যে ১২৩টিতে জয়ী হয়েছেন। দরকার অন্তত ১৩৯টি। শেষপর্যন্ত রাজ্য বিধানসভার ১১১টি আসন একা সি পি এম-এর দখলে।

নবকংগ্রেস তাদের পালা শেষ করলেন ১০৫-এ। প্রসঙ্গত বরানগরে জ্যোতি বসু আবার জয়ী। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ১১ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দলগত অবস্থা : সি পি এম— ১১১; আর সি পি আই—৩; বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস— ২; ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী)—২; ওয়ার্কার্স্ পার্টি—২; নির্দল (ইউ এল এফ)—৩।

নব কংগ্রেস—১০৫; বাংলা কংগ্রেস—৫; আদি কংগ্রেস—২; পি এস পি—৩; এস এস পি—১; সি পি আই—১৩; এস ইউ সি—৭; ফরওয়ার্ড ব্লক—৩; গোরখা লীগ—২; মুসলিম লীগ—৭; আর এস পি—৩; ঝাড়খণ্ড—২; জনসঙ্ঘ—১।

নির্বাচনী ফলাফলের প্রেক্ষিতে অশোক মিত্র মনে করেন, মাত্র গুটিকয়েক আসনের জন্য সি পি এম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না তার মূলে হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড। তার ফলে সি পি এম অন্তত ৩৫টি আসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যেখানে তারা দু'হাজারেরো কম ভোটে হেরে গিয়েছে। যদি ঐ বিশেষ হত্যাকাণ্ড ঐ বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত না হত, তাহলে জ্যোতি বসু হতেন মুখ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবাংলার রাজনীতির ধারাপথ বদলে যেত। (*The Hoodlum years*, p p. 37-38)

কিন্তু তা হবার নয়। ১৮ মার্চ সি পি আই-এর পক্ষ থেকে ভবানী সেন জানান, সি পি এম-কে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করতে পারছে না, কারণ ঐ দলকে সরকার গঠনে সমর্থন করা এই রাজ্যের জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানকল্পে কমিউনিস্ট পার্টি নব-কংগ্রেস যদি কোন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রয়াসী হয় তাহলে তাকে সেই কাজে সমর্থন করবে। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য এই সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না। (*কালান্তর,* ১৫.৩.৭১)

এ প্রসঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্তের মন্তব্য : দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নতুন কিছু নয়। নির্বাচনের পর আমাদের ওদের সম্পর্কে এই ধারণাই ছিল। এর মধ্য দিয়ে ওরা ভবিষ্যতে আরও শিক্ষা পাবে। পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী কমিউনস্টদের এই সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। পুঁজিপতি জমিদারদের স্বার্থে কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে গিয়ে ওরা আত্মঘাতী পথ নিয়েছে। (*গণশক্তি*, ১৯.৩.৭১)

কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসছে, অতএব গোটা রাজ্য জুড়ে নতুন করে পুলিশী সন্ত্রাস ও উল্লসিত কংগ্রেসীদের মদমত্ততা। তল্লাশির নামে মধ্য হাওড়ায় সি পি এম অফিস তছনছ। পুলিশের বুটের লাথিতে পার্টি অফিসের সামনের শহীদ বেদীটি চুরমার। কৃষ্ণনগরে চলছে কংগ্রেসীদের বেপরোয়া তাণ্ডব। নদীয়া জেলার সি পি এম দপ্তরটি কংগ্রেসীদের সৌজন্যে পুড়ে ছাই।

কোচবিহারের শহরে ও গ্রামে চলেছে পুলিশ ও মিলিটারির ব্যাপক দমন-পীড়ন। নির্বিচার গ্রেফতার ও মারধর। এই জেলায় কংগ্রেস জিতেছে, অতএব মহা উল্লাসে কংগ্রেসীরা সি পি এম কর্মী ও সাধারণ মানুষদের 'উচিত শিক্ষা' দিয়ে চলেছে। একই চিত্র কলকাতার উত্তরাঞ্চলে। হুগলি জেলায় চলেছে সর্বত্র ব্যাপক গ্রেপ্তার ও তল্লাশি। তল্লাশির নামে বাড়িঘর তছনছ। পুলিশী বর্বরতার কাছে কারও রেহাই নেই—শিশু ও মহিলাদেরও না।

এই পটভূমিতে চলেছে পশ্চিমবাংলায় নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতি। নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হবেন বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়। সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে সিণ্ডিকেট কংগ্রেস (আদি কংগ্রেস) ও সিণ্ডিকেট-বিরোধী সি পি আই।

কলকাতা-দিল্লী, দিল্লী-কলকাতা-অনেক দৌড়াদৌড়ি, অনেক বৈঠক, অনেক শলাপরামর্শের পর এই সরকারের জন্ম। সি পি এম-কে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখাই একমাত্র লক্ষ্য— তাই ৫ জন এম এল এ-র দলপতি বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে চলেছে ১০৫ জন এম এল এ-র দল নব কংগ্রেস। একাত্তরের নির্বাচনের রায় কংগ্রেস-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে এল।

অজিত রায়ের মতে, বিধানসভায় ১১১টি আসন ও লোকসভায় ২০টি আসন লাভ সি পি এম-এর এই সাফল্য এককথায় অপূর্ব। '*Marxist Review*' মন্তব্য করেছিল, পশ্চিম বাংলায় ইন্দিরার রথ থেমে গেল। তার জন্যে '*Marxist Review*'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলার সি পি এম নেতৃত্বকে উষ্ণ অভিনন্দনবার্তা পাঠানো হয়।

পঞ্চম পর্ব

কালো ঘনায় গাঁয়ে, মিশায় শহর,
কুটিল ছায়া, চতুর্দিকে শ্মশান,
অন্ধ আলো আকাশে কাকে তাড়ায়!
সন্ধ্যাতারা, চেনা সে লালতারা।
হৃদয়ে গান কাদের দুর্বার

— বিষ্ণু দে / মাঝিরা মাল্লারা

১

সচকিত গোটা পশ্চিমবাংলা। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে পূর্ববাংলার জনগণ। সীমান্তের ওপারের মুক্তিযুদ্ধের কলরোল মুখর হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের পাতায় :

বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম

বাংলাদেশের সর্বত্র সামরিক বাহিনীর ফ্যাসিস্ট অভিযান গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ

শত্রুসৈন্যের মোকাবিলায় বাংলাদেশের রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সংগ্রাম সংহতি জ্ঞাপন

কলকাতা, ২৭ শে মার্চ। সর্বশেষ খবর— ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে শত্রুসৈন্য পশ্চাদপসরণ করেছে। এই সমস্ত অঞ্চলকে বাংলাদেশের জনগণ মুক্ত করেছেন। চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' বলে ঘোষণা করার অব্যবহিত পর থেকেই মিলিটারির ফ্যাসিস্ট অভিযানের বিরুদ্ধে বাংলার বীর যোদ্ধারা লড়ছেন। একের পর এক রেললাইন পুল ইত্যাদি উড়িয়ে দিচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে জঙ্গীশাহী আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। সামরিক বাহিনীর গুলিতে কত ব্যক্তি নিহত বা আহত হয়েছেন তার হিসেব পাওয়া যায়নি। ইয়াহিয়া খান দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গোপন স্থান থেকে ঘোষণা করেছেন : আমরা কুকুর বিড়ালের মতো মরবো না, বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তান হিসাবে শত্রুর মোকাবিলা করব।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) সংগ্রামী বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করেছেন। (*গণশক্তি*, ২৭.৩.৭১)

পূর্ববাংলার গণঅভ্যুত্থানের সংবাদীবাহী চীৎকৃত শিরোনাম ও উদ্দীপ্ত বর্ণনা পুলক শিহরণ জাগায় এপারের সংগ্রামী মানুষের দেহমনে। সহমর্মিতার আবেগে ধুয়ে মুছে যায় নৈরাশ্য ও পরাভবের গ্লানি। আমরা যা করতে চেয়েছি অথচ পারিনি, ওরা তা পেরেছে। এই তো ছিল সেদিন সীমান্তের এপারে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার যুবমনের একমাত্র অভিব্যক্তি। তারই প্রতিচ্ছবি আগরতলা থেকে লেখা (২৮.৩.৭১) নৃপেন চক্রবর্তীর চিঠিখানি :

'... পূর্ববাংলার আগুনে ত্রিপুরার যুবশক্তি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ স্বতঃস্ফূর্ত 'আগরতলা বন্ধ'। হাজার হাজার ছাত্র যুবক বর্ডারে। খবর আসছে কোথাও ব্রীজ ধ্বংস করা হয়েছে, কোথাও রাস্তা কেটে দেয়া হয়েছে, রেললাইন তুলে ফেলা হয়েছে। এ যেন সেই ক্রীতদাসদের গণঅভ্যুত্থান। অন্ধ হতে পারে, কিন্তু ব্যাপকতা ও তীব্রতা কী অভূতপূর্ব!'

একই আবেগের শরিক পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ। কলকাতার ছাত্রমিছিল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজ ওঠে—বাংলাদেশের অপর নাম—ভিয়েতনাম-ভিয়েতনাম। আবেগের সংক্রমণ ঘটে যারা দেশভাগের শিকার, সে মানুষজনের ঘরে ঘরে। অখণ্ড বাংলার স্মৃতি যেন আবার দপদপিয়ে ওঠে। ফেলে আসা ভিটেমাটির জন্যে আনচান করে মন। পূর্ববাংলার নদীনালা হাটবাজার গাঁ-গঞ্জে গাছগাছালি যেন চলে আসে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। স্মৃতিবিমোহিত শিক্ষক কেরানী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী সবাই।

আবেগের স্রোতে মিলিয়ে যায় আন্তর্জাতিক সীমানা, একাত্মবোধে বাঁধা পড়ে দু'বাংলার মানুষ। অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ হয় গানে ও কবিতায়। ওপারের লড়াই-এর ময়দান থেকে ছিটকে আসা গানের কলি উঠে আসে এপারের শিল্পীদের কণ্ঠে, আবিষ্ট হয়ে শোনে এপারের মানুষজন। কবিতার লাইন কবিতা-অনুরাগীদের মুখে মুখে ফেরে এ-বাংলায়। এভাবে ছিটকে আসা কবিতার কয়েকটি লাইন নতুন কলেবর পায় এপারে। ওপার থেকে আসা কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি সামনে রেখে লেখা হয় কবিতার বাকি চরণগুলি—রচয়িতা কলকাতারস এক স্কুলবালিকা। তৈরি হয় আস্ত একটি নতুন কবিতা :

ডাক এসেছে

'ধূ ধূ বাংলায়
ডাক দিয়ে যায় স্বপ্নের দিনগুলি
আজকে মিছিলে
আমার ভাইয়ের বুকেতে লাগলো গুলি'।

সেদিনও এমনি ঘুঘু ডেকেছিলো
চৈত্রদিনের সুরে
শ্মশানে নীরব আত্মার শোকে
বাতাসে কান্না ফেরে।
কালপুরুষের রেখায় রেখায়
কি যে ইঙ্গিত লেখা,
লক্ষ কণ্ঠে তুফান উঠেছে
জ্বালাও অগ্নিশিখা।
মৃত্যু হয়েছে পায়ের ভৃত্য
শিকল ভাঙার দিনে,
গান গেয়ে আজ চলে গেল কারা
আলোর পথটি চিনে।

(*একসাথে*, জুন, ১৯৭১)

অজস্র কবিতা নিশ্চয় তখন লেখা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। কিন্তু 'ডাক এসেছে' শুধু তো একটি কবিতার নাম নয়—এটা যে এক নতুন উপলব্ধি। যার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশ-এর জনগণের সংগ্রামের প্রতি এ দেশের মানুষের সোচ্চার সমর্থনে।

১) ২৭ মার্চ, '৭১ : আগরতলায় বারঘণ্টার হরতাল।

২) ২৭ মার্চ, '৭১ : কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল। পাক ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে ছাত্রদের গণ-ডেপুটেশন।

৩) ২৮ মার্চ, '৭১ : শ্রমিকদের একঘণ্টার জন্য টুল ডাউন স্ট্রাইক। কর্মবিরতির সময় পশ্চিমবাংলার শ্রমিক বাংলার মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা ঘোষণা করে প্রস্তাব নেন।

লোকাল ট্রেনে শ-এ শ-এ ছেলেরা যাচ্ছে বনগাঁ, সেখান থেকে হাঁটাপথে বর্ডারে। প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায় যাদবপুর, গড়িয়া, টালিগঞ্জ, দমদম, বেলঘরিয়া, সোদপুর থেকে ষোলো-সতেরো-উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলেরা চলেছে মাথায় করে পাউরুটি চাল আটা নিয়ে। কেউ কেউ আবার বোমার মশলা ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তাদের অনেকেই হয়তো ঘরছাড়া বা পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। তবুও তারা যাচ্ছে, বর্ডার পেরিয়ে কয়েক মাইল ভেতরে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে জিনিসপত্র। ভাবছে : আমরা যা পারলাম না, ওরা তা করুক।

রণজিৎ গুহকে এক চিঠিতে (৮.৪.৭১) সমর সেন লিখছেন : 'পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর চাপে লোকে এখানকার নির্বাচন, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি নিয়ে কিছুদিন মাথা ঘামাচ্ছে না।' সত্যিই তাই— পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক নির্বাচন ও তার পরিণাম— আপাতত সবই গৌণ। সি পি আই ও সি পি এম—উভয়েই স্বাগত জানিয়েছে পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার অবশ্যি সি পি আই (এম এল) যার থেকে সূচনা নকশাল আন্দোলনে অন্তর্বিরোধ। তার কথায় পরে আসা যাবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে লোকের মুখে কেবল পূর্ববাংলার ঘটনা।

সীমান্তের ওপার থেকে আসা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার রাস্তায় স্বচ্ছন্দে চলছেন-ফিরছেন। খান সেনাদের অত্যাচার আর প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী বলছেন তাঁরা। গোগ্রাসে গিলছে সবাই। শরণার্থীদের জন্য টাকা তোলা হচ্ছে বিভিন্ন দল, সেবা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের উদ্যোগে। ঐ দেশে খান সেনাদের অত্যাচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসছেন শরণার্থীরা— ঢেউ -এর মতো।

শরণার্থী হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন, ন্যাপ নেতা মৌলানা ভাসানি ও অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আমেদ ছাড়াও আওয়ামী লীগ ও ন্যাপদলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা ও কর্মী। কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মস্কোপন্থী খোকা রায় ও মণি সিং; পিকিংপন্থী নেতা দেবেন শিকদার ও শরদিন্দু লালা। তাছাড়া এসেছেন অমল সেন, জাফর, রাশেদ খাঁ মেনন ও নিজামুদ্দিন। ভারতে আসার পথে ত্রিপুরা সীমান্তে মারা যান মস্কোপন্থী নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার। পশ্চিমবাংলায় অথবা ত্রিপুরায় তাঁরা নিজেদের পুরনো কমরেড ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মিলেমিশে গেলেন।

ওদেশ থেকে পালিয়ে আসা কবি, সংগীতশিল্পী ও চলচ্চিত্রশিল্পীদের মিলনকেন্দ্র তৈরি হল কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটের এক জীর্ণবাড়ির দোতলায় একখানা বড় ঘরে। শঙ্খ ঘোষ লিখছেন : 'এঁদের দেখাশোনার ভার বইছেন কলকাতার যে লেখকসমাজ তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলবলকে সেখানে গান শেখান সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহেদুল হক; চিত্র পরিচালক জহির রায়হান আসেন তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ নিয়ে; তাঁদের পাশে সন্ধ্যাবেলায় সমবেত হন কলকাতার লেখক-কবিরা, বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁদের আবেগে ভরে উঠতে থাকে এখানকার সাময়িকপত্রগুলি।'

২

আবেগের ঋতু কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, এপার বাংলার লেখক শিল্পীরা কি কেবল পুব দিকেরই দুঃখ গাইবেন? নকশাল দমনের নামে এ সরকারের বর্বরতাও কি কিছু কম? তাঁরা কেন সে বিষয়ে নীরব?

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওপার বাংলার অত্যাচারিত মানুষের যন্ত্রণার শরিক হয়ে লিখলেন *আনন্দবাজার* (বুধবার ৬ পৌষ ১৩৭৮)-এর পাতায় 'ক্ষমা? ক্ষমা নেই'। তার জবাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন :

সুভাষ যা দেখেছেন

সুভাষ! যা দেখেছেন যশোহরে, মণিরামপুরে; যে পিশাচ
জল্লাদ মেহের আলি— তার কীর্তি, পাশবিক ধর্ষণ ও নরহত্যা :
চোখে কি পড়েনি, অন্য এক অবাক বাংলায়, যা আপনার স্বদেশ, সেখানে
ঐ কালো ছায়া—ঐ ভয়ংকর মুখ! মানুষের মাংসপিণ্ড লোলুপ নরখাদক
আমাদের আকরমের মায়েদের থালায় লাথি মেরে
নিয়ে যায় আকরমকে থানায়; বেয়নেট খুঁচানো ইসমাইল পড়ে থাকে
নির্জন খালের ধারে—
'ক্ষমা? ক্ষমা নেই'—আপমর পবিত্র স্পর্ধা মানুষের সপক্ষে, সুভাষ;
এই তো প্রত্যাশা ছিল : আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রতিবেশী
পশুদের পাপ কিংবা পুণ্যশ্লোক কবিদের দেশপ্রেম ছাড়া
সংবাদ ছাপে না...
আপনার প্রচণ্ড ক্রোধ—দেশান্তরে—তাই আমাদের কেমন তরল বলে মনে হয়! (১৯৭১)

আর যাই হোক, এটা কবির লড়াই-এর সময় নয়। খান সেনাদের দৌরাত্ম্যের ফলে ওপার বাংলা যদি নরক আখ্যা পায়, তাহলে রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের দাক্ষিণ্যে এপার বাংলা কি নন্দনকানন বলে ভুল হবে কারও?

অতএব, 'এই নরকে কিসের কবিতা,
কার জন্য বা?
যেদিকে যাই, মানুষখেকো লাফায়;
আকাশ কাঁপায়!'

—লিখছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তারপর যা সব ঘটবে তাতে বিচলিত হবেন কবি অ-কবি সবাই।

৫ আগস্ট ১৯৭১, নিহত-হলেন সরোজ দত্ত। অতি ভোরে তাঁকে ময়দানে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারে পুলিশ। রটিয়ে দেওয়া হয় তিনি নিখোঁজ এবং পুলিশ জানে না তাঁর হদিশ। সরোজ দত্ত জীবিত অথবা মৃত—এ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির চেষ্টা হয়। ৮ আগস্ট '৭১ *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় সরোজ দত্তের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২ আগস্ট *কালান্তর*-এর

সংবাদে বলা হয়, সরোজ দত্তকে হত্যা করা হয়েছে। ২৪ আগস্ট *আনন্দবাজার*-এ বলা হয়েছে : '...পুলিশ প্রথমে বলে সরোজবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরে জানায় ৫ই আগস্ট দক্ষিণ কলকাতা থেকে পুলিশ একজন লোককে ধরে আনে, কিন্তু না চিনতে পেরে তাঁকে ছেড়ে দেয়। অনুসন্ধান করে অবশ্য জানা গিয়েছে যে, সরোজবাবুকে সরোজ দত্ত বলে চিনেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তারপর থেকে কেউ নাকি সরোজবাবুর কোনো খোঁজ পান নি...'। তিনটি দৈনিক পত্রিকায় এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর নীরব। এতে সবাই নিঃসন্দেহ যে সরোজ দত্তকে পুলিশ খুন করেছে। এই পটভূমিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন :

বিচার

(সরোজ দত্তকে নিবেদিত)

অন্যায় মানুষ করে,
বিচারের ভার দেবতার
নাকি দানবের?
আপনি জীবিত নাকি মৃত তার প্রশ্ন
অর্থহীন;
চোখের সামনে কত নিষ্পাপ শিশুরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে
প্রশ্ন করিনি, প্রশ্ন কাকে করবো?
এ দেশে মানুষ কেউ আছে নাকি? আমিই কি
এখনো মানুষ! (১৯৭১)

৩

মাত্র আটদিনের ব্যবধান। সরোজ দত্ত খুন হওয়ার পিঠোপিঠি কাশীপুর-বরানগরের ঘটনা—পাইকারি খুনের অনন্য নজির। পার্থক্য শুধু একটাই, সরোজ দত্ত নিহত লোকচক্ষুর আড়ালে আর কাশীপুর-বরানগরের নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত দিনের আলোয়, হাজার হাজার মানুষকে সাক্ষী রেখে। মানুষ ভয়ে আতঙ্কে নীল। ১২ আগস্ট রাত থেকে ১৪ আগস্ট '৭১ সারাদিন বাধাহীন বিরামহীন এই হত্যালীলার অনুষ্ঠান। এই তিনদিন যতজনকে মারা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা কখনও জানা যাবে না। কত মৃতদেহ গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গিয়েছে আর মৃতদেহ যে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে বা গায়েব হয়েছে তার হিসেব কে দেবে? হ্যাঁ, জল্লাদদের উল্লাস আর নিহতদের আর্তরব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অদ্ভুত সিম্ফনি। আবার অবশ্যম্ভাবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মানুষ যারা কেউ করে না রা!' অথবা অনেক অনেক খুনখারাপি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে তার সমস্ত সত্তা বিকল—চেতনা অসাড়!

সংবাদপত্র পাঠ করে জানা যায়, প্রথমে হয় একটি খুন এবং তার বদলার প্রয়োজনে একশ-

দেড়শ-দুশ খুন। এবং সেটা সম্ভব যদি পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্রয়দাতার হয়। এবার দেখা যাক খবরের কাগজে কী লেখা হয়েছে।

বরানগর অঞ্চলে নারকীয় তাণ্ডব

কলকাতা, ১৩ই আগস্ট— সমগ্র কাশীপুর থানা এলাকায় গতকাল রাত থেকে যে ব্যাপক হত্যালীলা চলেছে, রাজ্যের খুনোখুনির রাজনীতিতে তা পূর্বের সমস্ত ঘটনাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। এই নরমেধ যজ্ঞে নিহত সতের জন, গুরুতর আহত সাত। বেসরকারী সূত্রে এবং পুলিশের একাংশের মতে নিহত ও আহতের সংখ্যা ৩০-এর উপর। অনেককে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ মহল থেকেই বলা হয়েছে।...

... লালবাজার পুলিশের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন : আজ বেলা ছটা নাগাদ রতন বাবু ঘাট, শিলাঘাট ও প্রামাণিক ঘাটের কাছে চারটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। জলপুলিশ একটি মৃতদেহ তুলতে পেরেছে, অন্য তিনটি বানের জলে ভেসে গেছে।

(বেলা ২টার পরে গঙ্গায় আজ প্রবল বান এসেছিল)।

বরানগর পোস্টাপিসের কাছে অজিত কর নামে একজন যুবক খুন হওয়ার পরে, বরানগরে রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্ফু দেওয়া হয়। ঘটনা সম্পর্কে লালবাজারে ডি সি ডি ডি দেবী রায় বলেন, শাসক কংগ্রেস নেতা নির্মল চট্টোপাধ্যায় গতকাল কাশীপুর-বরানগর এলাকায় খুন হবার পর রাত্রি ৮টা নাগাদ প্রায় এক হাজার লোক খুনীর সন্ধানে নেমে পড়ে। উত্তেজিত জনতা বহু দোকানপাট তছনছ করে আগুন লাগায়। পরে দমকল ও পুলিশ গিয়ে আগুন নেভায়।

উত্তেজিত জনতার মধ্যে কয়েকজন অমল বিশ্বাস নামে এক তরুণকে গুলি করে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এর আধঘণ্টা পরে প্রায় ১০০ লোক পাইপগান ও ভোজালি নিয়ে রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী লেনে ভবানী বিশ্বাসের বাড়ি আক্রমণ করে। ভবানী বিশ্বাসকে বাড়ি থেকে টেনে বাইরে এনে ছুরি মারে ও হত্যা করে।

এরপর সারারাত ধরে হত্যাকাণ্ড চলে। পুলিশ সে বিষয়ে শুধু বলেছে : একদল লোক 'উইচ হান্টিং'-এ বার হয়। যতদূর জানা গেছে, রাত্রে সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীরা পুলিশের কাছ থেকে কোথাও বড় রকমের কোনো বাধা পায়নি। (*যুগান্তর*, ১৪.৮.৭১)

যুগান্তর-এর সংবাদদাতা পুলিশসূত্রে যে রিপোর্ট জোগাড় করেছেন, তা নিতান্তই খাপছাড়া ও অসম্পূর্ণ। ঘটনার ব্যাপ্তি ও নৃশংসতা অত্যন্ত লঘু করে দেখানোর প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। অবশ্যি *যুগান্তর* (১৫.৮.৭১) সম্পাদকীয় নিবন্ধে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে :

'...এই ঘটনা ঘটল এমন এক সময়ে যখন পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন আইন দিয়ে এবং সি আর পি ও মিলিটারি দিয়ে পুলিশের শক্তি বহুগুণে বাড়ান হয়েছে। বরানগর-কাশীপুর এলাকা বেশ কিছুকাল ধরেই উপদ্রুত। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার হঠাৎ সেখানে কোন কাণ্ড ঘটেনি। তাহলে বীভৎস তাণ্ডবের কৈফিয়ৎ কি? পুলিশ কি করছিল? আগের দিন রাত্রে যখন খুনের বদলা নেওয়ার জন্য হাজার খানেক মানুষ পথে নেমেছিল তখনই তো যা ঘটতে চলেছে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। তবু শুক্রবার সারাদিন এই হত্যালীলা চললো কি করে? এতবড় একটা কাণ্ড ঘটল অথচ একজনেরও গ্রেপ্তারের খবর নেই কেন? সব কিছু ঘটে

যাওয়ার পর কারফিউ জারী করলেই কি সব দায়িত্ব চুকে যায়?

এই দুঃসহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি মানুষের নিরুপায় অসহায়তার ছবি ফুটে উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দা বিমলেন্দু সরকারের জবানবন্দীতে। তিনি বলছেন : এত যে কাণ্ড ঘটছে কিছুই জানি না। ফিরছি আসানসোল থেকে। ১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চিড়িয়ামোড় থেকে এক রিক্‌শা নিলাম। কেউ যেতে চায় না। না, ওদিকে যাব না, ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। জোরজার করাতে একজন রাজি হল, বেশি ভাড়া দেব বলাতে। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। আবছা অন্ধকারে একদল বিবিবাজারের মোড়ে রিক্‌শা আটকাল। তাদের হাতে রিভলবার আর ছোরা চকচক করছে। রিক্‌শা ঘিরে তাদের মত্ত উল্লাস, পেয়েছি একজনকে—শালা মাকু পার্টি—শালা নকশাল, আমাদের নির্মলদাকে খুন করেছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন আমায় চিনতে পেরে বলে উঠল, 'আরে সরকারদা! আপনি এখন কোথা থেকে? যান, যান, সোজা বাড়ি চলে যান, আর বেরুবেন না।' সেখান থেকে ছাড়া পেয়েও নিষ্কৃতি নেই। কিছুদূর যাবার পরে উদ্যানবাটী-র মোড়ে, আবার একদল হারে-রে-রে করে ছুটে আসছে। তাদের সঙ্গে আবার আর্মড পুলিশ। আমায় দেখে পুলিশ খিস্তি করল—'শালা শূয়ারকা বাচ্চা! টাইম নাহি মিলা—আভি আতা হ্যায়! মস্তানদের একজনের হুকুম : 'তাড়াতাড়ি ঢোকো— দরজা বন্ধ করো। একদম রাস্তায় উঁকি দেবে না—আলো জ্বালা নেই।' লক্ষ্য করলাম, আশেপাশে কোনো বাড়ির একটা জানলাও খোলা নেই। আর তখন চার নম্বর বাসস্ট্যান্ডে আগুন দাউদাউ জ্বলছে। নির্মল চ্যাটার্জিকে ৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ডেই মারা হয়েছে। আমায় বলা হল, 'চল্লিশটা ফ্ল্যাটের মধ্যে একমাত্র তুমি ব্যাটাছেলে যে বাড়ি ফিরেছ।'

সারারাত শুধু গুলি আর বোমার আওয়াজ। সারারাত জেগে। আমাদের হাউসিং এস্টেটে একজন যুবকও সে-রাতে ঘরে ছিল না। সকাল যখন হল, তখন এক বীভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি। হঠাৎ একটা রিক্‌শা চোখে পড়ল— তাতে চাপানো হয়েছে চার পাঁচটি মৃতদেহ। তার ওপর পা রেখে রাইফেল হাতে দুটি ছেলে রিক্‌শায় বসে।

১৩ আগস্ট শুক্রবার। দুটি কংগ্রেসী বাড়িতে কেবল লোক ফিরেছে। তাছাড়া কেউ বাড়ি ফেরেনি। হাউসিং-এ কোনো ছেলে নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ছোঁড়াগুলোর হাতে আর্মড পুলিশের রাইফেল। হাত তুলে বেরিয়ে গেলাম এক চেনা ডিমওয়ালার কাছে। ডিম বিলি করলাম ঘরে ঘরে।

১৪ আগস্ট বিকেলে বাজার খুলল। লোকজন বাড়ি ফিরছে, হাতে বাজারের ব্যাগ। শুনলাম উদ্যানবাটী-র উল্টোদিকে সি পি এম অফিস ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। আমাদের পাড়াতেই খুন হয়েছে ১৩-১৪ জন। বাইরে থেকে মেরে মেরে লাশ পাঠানো হয়েছে গঙ্গায় ফেলার জন্য। গঙ্গায় মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল।

এই দুঃসময়েও মানুষের বিবেক ও শুভবুদ্ধি যে বিনষ্ট হয়নি, মায়া ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন তারই নিদর্শন। তিনি লিখছেন : '... ১২ আগস্ট '৭১। নর্থ সুবার্বান হাসপাতালে নাইট ডিউটিতে কম্পাউণ্ডার পাঁচু দত্ত করছিলেন ইমার্জেন্সি ডিউটি। তিনি গিয়েছিলেন বাথরুমে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কেউ তার দুটি পা জড়িয়ে ধরায় ভয় পেয়ে তিনি চিৎকার করে উঠতেই, শোনা গেল কাতর কান্না— 'আমাকে বাঁচান্ ওরা আমাকে দেখলে মেরে ফেলবে। আমি কিছু করিনি।' দেশলাই জ্বেলে তিনি দেখেন একটি তেরো-চোদ্দো বছরের বাচ্চা ছেলে।

বিব্রত পাঁচুবাবু জানতে চান, ব্যাপার কী? ছেলেটি জানায় হাসপাতালেরই কংগ্রেসী গুণ্ডা পঞ্চম তার বাহিনী নিয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খুন করবে বলে। ও নাকি নকশাল ইনফর্মার। পাঁচুবাবুর ধারণা ছিল হাসপাতালে ভর্তি থাকা রুগীকে কেউ কিছু করতে পারে না। ওয়ার্ডে রুগী সম্পূর্ণ নিরাপদে। সেই ধারণা থেকেই তিনি সেদিন ছেলেটিকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ না পেয়ে 'বেড'-এ ভর্তি করে নিলেন রুগি হিসেবে।

'সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঘাতকবাহিনী এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাঁর বুকে ছুরি ঠেকিয়ে প্রশ্ন করে, 'ছেলেটিকে ভর্তি করা হল কেন?' তার অর্থ নকশালদের সঙ্গে পাঁচুবাবুর যোগাযোগ আছে। পাঁচুবাবু কাঁপতে কাঁপতে পায়ে ধরে কেঁদে কোনমতে উদ্ধার পান। যদিও পাঁচুবাবু ছিলেন কংগ্রেসের লোক কিন্তু সেদিন তাঁকেও পায়ে ধরে কাঁদতে হয়েছিল। সেই হতভাগ্য ছেলেটি বিশ্বাস করেছিল যে এবারের মত বেঁচে গেল সে। কারণ, সে হাসপাতালের বেডে ভর্তি হয়ে গিয়েছে—অতএব নিরাপদ। তার পরের অবস্থাটা সে ভাবতে পারেনি। গুণ্ডার দল সশস্ত্র অবস্থায় Male Medical Ward -এ হানা দিয়ে প্রতিটি 'বেড'-এ ছেলেটিকে খুঁজতে থাকে। ভয়ে বোবা হয়ে যায় 'ওয়ার্ড সিস্টার' ও সমস্ত পেশেন্টরা। প্রতিটি পেশেন্ট-এর মুখের উপর টর্চ ফেলে দেখতে থাকে তারা। সেই ছেলেটি যার নাম আজ আর মনে নেই ভয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বেড থেকে তাকে তুলে নেয়। ওয়ার্ড সিস্টার তার রুগীকে বাঁচানোর জন্য কাতরভাবে কাঁদতে থাকে কিন্তু কোন লাভ হয় না। তারা 'পেশেন্ট'কে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। সেই রাতেই দশআনির জমিদারবাড়ির পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করা হয় গুণ্ডা পঞ্চম-এর নেতৃত্বে। যারা কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব কর্মচারী ভয়ে সিঁটিয়ে যায়।

'... তারপরে সারারাত ধরে চলতে থাকে বাড়িতে বাড়িতে, আনাচে কানাচে, গলি ঘুপচিতে গুণ্ডাদের তল্লাসি নকশাল খুঁজে বার করার। কাশীপুর রোডের উপরে শুধু পুলিশের কালোগাড়ির মিছিল আর গুণ্ডাদের বিকট উল্লাস। ১২ তারিখ সারারাত আর ১৩ তারিখ দিনরাত ধরে চলে এই তল্লাসি আর খুনের মহোৎসব। দলে দলে চলেছে গুণ্ডা বাহিনী আর তাদের সঙ্গে রয়েছে সাধারণ নিরীহ ভাল ছেলেরাও। ম্লানমুখে তারা গুণ্ডাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিছক প্রাণের মায়ায়।

'... এর মধ্যেই দেখা গেছে অল্পবয়সী কয়েকজন নকশাল ছেলে প্রাণের ভয়ে হাসপাতালের 'ডেথ হাউস'-এ মড়ার মত পড়ে থেকেছে। কংগ্রেসী হওয়া সত্ত্বেও ডোমেরা তাদের ধরিয়ে দেয়নি। দেখা গেছে 'আই আউটডোর'-এর ডার্করুমে গাদাগাদি করে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে নিঃশব্দে থেকেছে কয়েকজন। 'আউটডোর'-এর কর্মচারীরা নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে—বাইরে থেকে আউটডোরে ও ডার্ক রুমের তালা বন্ধ করে রেখে। জানি না শেষপর্যন্ত বাঁচান সম্ভব হয়েছিল কিনা।

'তিনদিন ধরে জ্বলেছে রতনবাবু রোডের বিশ্বাসবাড়ি। দুপুর বেলা মাংস পোড়া গন্ধে পুরো অঞ্চলের বাতাস বিষাক্ত হয়েছে। শোনা গেছে নকশাল ছেলে বাবলা বিশ্বাসকে না পেয়ে তার বাবাকে কেটে টুকরো টুকরো করে পেট্রল ঢেলে পোড়ান হয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক। গুণ্ডারা পুলিশকে বলছে, 'আপনারা চুপচাপ থাকুন। সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আমরা ফেলে যাচ্ছি, আপনারা শুধু তুলে নিয়ে যান।' পুলিশ তাদের কথামতো রাইফেল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে

থেকেছে আর গুণ্ডাদের ফেলে যাওয়া দেহগুলি হাসপাতালে বয়ে নিয়ে এসেছে। হাসপাতালের কয়েকজন সিস্টার আর কর্মচারী মিলে কাদা আর রক্ত মাখা দেহগুলি পরিষ্কার করে, যারা তখনও বেঁচে আছে তাদের হাতের কাছে যা পেয়েছে ছেঁড়া কাপড় সায়া ইত্যাদি পরিয়ে দিয়েছে। সেদিন একজন মাত্র ডাক্তার ছিলেন হাসপাতালে। তিনি নিজে আর জি কর-এর একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঐ 'বডি' গুলোর মধ্যে যারা তখনও বেঁচে (সব ১৬-২৬-এর মধ্যে বয়স) —তাদের তিনচারজন করে একসঙ্গে নিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন বারে বারে সারাদিন-সারারাত। এই হাসপাতালে ভর্তি করার ঝুঁকি তিনি আর নেননি। এভাবে দুদিন দুরাত অন্তত কয়েকশ ছেলের মৃত অথবা অর্ধমৃত শরীর চোখের সামনে দেখতে হয়েছে।

'... তারপর দীর্ঘ তাণ্ডব থেকে একসময় নেমে আসে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। এই তিনদিন কাশীপুরে কোনো দোকান বাজার খোলা ছিল না। পথে দেখা যায়নি কোন সাধারণ মানুষ। তারপর আসে ১৫ই আগস্ট। কংগ্রেসের লোকেরা প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে ফরমান জারী করে, যাতে প্রতিটি বাড়ীতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা তোলা হয়। সেদিন সেই আদেশের বিরোধিতা করার সাহস কাশীপুরে কারও ছিল না।

'আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা, তারা কেউ এখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পায় না। ভাবে, সেই ভয়াল দিনগুলি যদি আবার ফিরে আসে। যা লিখেছি তা কিন্তু কিছুই নয়—একটা বি-শা-ল ঘটনার ভগ্নাংশ মাত্র। অনেক কথাই বলা হল না। শুধু মনে পড়ে, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অনেক তরুণ ও কিশোরের মুখ। কানে বাজে অনেক মায়ের বুকফাটা হাহাকার।'

... ...

মামুলি প্রতিবাদ জানিয়ে নিয়মরক্ষা করেছে সি পি আই। দেখা যাচ্ছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ এক বিবৃতিতে বরানগর-কাশীপুর অঞ্চলে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।' (*কালান্তর*, ১৪.৮.৭১)

সি পি আই যেভাবে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তাদের পক্ষে এর বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

প্রতিক্রিয়ার নগ্ন ও ভয়াল রূপ দেখে উদ্বিগ্ন প্রমোদ দাশগুপ্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনকে এই ঘটনার সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। (*গণশক্তি*, ১৪.৮.৭১)

সত্যিই কি কেউ সেদিন দেওয়ালের লিখন পড়তে পেরেছিলেন? নকশাল নিধনের পরে যে সি পি এম-এর পালা এবং তারপর বাকিদের— পশ্চিমবঙ্গে যে 'শ্বেত সন্ত্রাস'-এর অধ্যায় শুরু হল, সে চেতনা বোধহয় তখনো দানা বাঁধেনি।

৪

১৯৭২ সালের গোড়ায় দেখা যাচ্ছে, 'চারু মজুমদার যুগ যুগ জীও' শ্লোগানটি মুছে ফেলে দেয়ালে দেয়ালে লেখা হচ্ছে 'ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জীও।' সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছেন ভারতের দিকে দিকে প্রতিবিপ্লবের জয়যাত্রা। কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ, দিশেহারা। ঘাতকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রতিহিংসার লালসায়। পুলিশ সন্ত্রাস, মিসা ও মস্তান-গুণ্ডাদের রক্তচক্ষুর সামনে সাধারণ মানুষ ভয়ে বোবা। তার উপর সীমান্তে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করে প্রতিক্রিয়ার জয় ষোলকলায় পূর্ণ। 'পাকিস্তান খতম কর' আওয়াজে দিগ্‌বিদিক মুখরিত। সংবাদপত্রের পাতায় হাটেবাজারে লোকের মুখে মুখে এই এক জিগির। এবং এই কাজ যে সার্থকভাবে করেছে সেই ইন্দিরা গান্ধী এখন এশিয়ার মুক্তিসূর্য।

১৯৭০ সালের মার্চে যুব-ছাত্রদের উদ্দেশে চারু মজুমদার লিখেছিলেন, 'তোমরা যদি এই কাজগুলি আন্তরিকভাবে কর, তাহলে আমি জোর গলায় বলছি ১৯৭০ সালে নয়তো বড় জোর ১৯৭১-এর গোড়াতে দেখবে বাংলার মাটিতে মুক্তিফৌজ মার্চ করছে।' (*লিবারেশন*, মার্চ ১৯৭০)

কোথায় মুক্তিফৌজ— কোথায় কী! খোদ সি পি আই (এম-এল)-এর পার্টিগত অস্তিত্ব নিয়ে এখন টানাটানি। পার্টির মধ্যে মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছে। পুলিশ ও মিলিটারির ভয়াবহ অত্যাচারের মুখোমুখি পার্টির লোকজন খড়কুটোর মত অসহায়। ১৯৭২ সালের জুনে, চারু মজুমদারকে স্বীকার করতে হল : আমাদের দেশের সশস্ত্র লড়াই একটা স্তর পর্যন্ত ওঠার পর আমাদের অগ্রগতি থেমে গিয়েছে। আমরা জোর ধাক্কা খেয়েছি। (*In the Wake of Naxalbari*, p. 332)

রবীন্দ্র রায়ের মতে, ডিসেম্বর '৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধ যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে থাকে তো সি পি এম এল-এর ক্ষেত্রে সেটা আত্মবিলুপ্তির কারণ। সি পি এম এল ক্যাডাররা চীনের ভূমিকায় হতবাক্। চীনের মতে, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া সরকারকে চীনের সমর্থন সি পি এম এল ক্যাডারদের চোখে সুবিধাবাদের নামান্তর। ক্যাডারদের একটা বড় অংশ চীন সম্পর্কে রীতিমতো বীতশ্রদ্ধ। পার্টির মধ্যেও এ নিয়ে মতবিরোধ। চারু মজুমদারের মতে ভারতের বিপ্লবীদের উচিত মহম্মদ তোহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমর্থন জানানো যাতে তারা মুক্তিযুদ্ধের সুযোগে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে পারে। অপরদিকে অসীম চ্যাটার্জি চীনের পার্টির নেতৃত্বকে ষোলো আনা মেনে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপেরই বিরোধী। চারুবাবু ও অসীমের মধ্যে বিরোধের ধরণ খানিকটা কেতাবি ধরণের হলেও, এটা পার্টির আভ্যন্তরীণ সঙ্কটেরই ইঙ্গিত। ইতিমধ্যে পার্টির মধ্যে ক্ষয় ও ধ্বংসের ক্রিয়া রীতিমতো শুরু হয়ে গিয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১৮)

সৌরেন বসু বলছেন, সংগ্রামের ধরণ-পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে পার্টির মধ্যে আরও আগে থেকে। ১৯৭০-এর আগস্টেই সুশীতল রায়চৌধুরী মূর্তি ভাঙা, স্কুল পোড়ানো উপলক্ষ্য করে এক সমালোচনা-নিবন্ধ পেশ করলেন পার্টির কাছে। শ্রীকাকুলাম থেকে কর্মীরা জানাচ্ছেন— 'শ্রেণীশত্রুর খতম অভিযানের মধ্য দিয়ে মুক্ত এলাকা গড়ে ওঠা— স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছু

নয়।' মেদিনীপুর থেকে সমালোচনা আসে— মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে একটার পর একটা খতম অভিযান চালিয়েছি। ব্যাপক গণজাগরণ তো দূরের কথা, শত্রুর আক্রমণের সামনে আশ্রয়হীন অবস্থায় আজ আমরা ভ্রাম্যমাণ দলে পরিণত। কেন এরকম হল? *(চারু মজুমদারের কথা)*

পার্টির মধ্যে যখন চারু মজুমদারের বিরুদ্ধে অনেকেই সমালোচনায় সোচ্চার, বাইরে থেকে তাঁর রণকৌশলের প্রতি সমর্থন আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চীন নীরব। শ্রীকাকুলামের পরিণতি প্রসঙ্গে পিকিং বেতারের একদম চুপ মেরে যাওয়া সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ।

সি পি আই (এম-এল)-এর শেষ পরিণতি প্রসঙ্গে শঙ্কর ঘোষের মন্তব্য : পার্টি তৈরি হওয়ার একবছরের মাথায় সি পি আই (এম-এল)-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০-এর মে মাসে। তার এক বছরের মধ্যে পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো, প্রধানত শ্রেণীশত্রু খতম ও চারু মজুমদারের বৈপ্লবিক কর্তৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

৫

ইতিমধ্যে হাওয়া ঘুরে গিয়েছে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ১৯৭১-এর নির্বাচনের ফল থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে কলকাতা আর 'লাল শহর' নয়; কারণ, এখানকার মধ্যবিত্ত ভোট অধিকাংশই কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছে। তার মূলে সি পি এম-সি পি এম এল-এর মধ্যে বিরামহীন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও নকশালি কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত বিরূপতা। রণজিৎ গুহকে লেখা সমর সেনের চিঠি (২৪.১১.৭০) থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে : 'কলকাতার খবরাখবর তো অত্যন্ত খারাপ। তবে এসময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষার ব্যাপারে হামলাগুলো অসংখ্য বাপ-মা ও ছাত্রকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। প্রথম দিকে এসবের অর্থ ছিল। এখন রাজনৈতিক পার্টি ও পুলিশ এত হিংস্র যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মানে বহুসংখ্যক লোক antagonise করা। মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত লাগে।'

তার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে, শংকর ঘোষের ভাষায়, জোর করে টাকাপয়সা আদায় ও মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘরে জোর করে থাকা ও খাওয়া। যাকে তাকে যখন তখন চোখ রাঙানো ইত্যাদি ঘটনা। অতএব জেরবার মধ্যবিত্তের বিরূপতা যেমন ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত, তেমনি পুলিশও তার পুরো সুযোগ নিয়েছে।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত : ১৯৭১-এর নির্বাচনের পর প্রতিবিপ্লবী অভিযান শুরু হল জোরকদমে। গোটা রাজ্য জুড়ে কায়েম হল পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্ব। ২৮ জুন, ১৯৭১— সিদ্ধার্থ রায়ের জমানা শুরু। এবং শানানো হল নকশালদের বিরুদ্ধে দ্বি-মুখী সর্বাত্মক অভিযান। সিদ্ধার্থ রায় একাধারে কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যপালের উপদেষ্টা। অতএব একদিকে তৈরি হল কংগ্রেসী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আর অপর দিকে আধা-সরকারি প্রতিরোধ বাহিনী, যারা মাসে পাবে ১০৫ টাকা। ৭১-এর অক্টোবর নাগাদ রবীন্দ্র রায়ের হিসেবে দুই বাহিনী মিলিয়ে দাঁড়াল ৩ লক্ষের মতো।

'কলকাতায় যখন নকশালদের রমরমা তখন তারা চরম নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর রেখেছে। এবার প্রতিহিংসার পালা আরও ভয়াবহ। কোন বাছ বিচার, দয়া মায়া নেই। কারণ, পুলিশ বিশ্বাস করে যে খতমের উদ্যোগ ছাত্রদের হাত থেকে পেশাদার খুনীদের হাতে চলে গিয়েছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪)

তদানীন্তন আই জি রঞ্জিত গুপ্তর হিসেবে (মার্চ ১৯৭০ - ১৫ জুন ১৯৭১) কলকাতায় যারা নকশালদের হাতে খুন হয়েছে :

১. সি পি এম	৪৪
২. কংগ্রেস (শাসক)	৪
৩. ফরওয়ার্ড ব্লক	২
৪. সি পি আই	১
৫. সরকারি কর্মচারী	২
৬. হোমগার্ড	৮
৭. পুলিশের চর (সন্দেহে)	১২
৮. বস্তির মালিক	১
৯. ব্যবসাদার	২
১০. সুদের কারবারি	২
১১. পুলিশ	২৮
১২. বিবিধ	২১
	মোট : ১৩৯

তাঁর মতে এইসব হত্যাকাণ্ড নকশাল নামধারী লুম্পেনদের কাজ। নকশালদের আদর্শগত ভিত নিতান্তই কাঁচা। তারা বুঝতে পারেনি যে লুম্পেনদের দলে টানলে তার পরিণাম কী মারাত্মক। শেষ পর্যন্ত লুম্পেনদেরই আধিপত্য কায়েম হয় সি পি এম-এল-এ। তারা খুন করার পর কলকাতায় গলিঘুঁজিতে হারিয়ে যেতে বেশ ওস্তাদ। পুলিশ খুনের ঘটনা থেকেই বোঝা গেছে, এসব পাকা হাতের কাজ— যা সমাজবিরোধী লুম্পেনদের পক্ষেই সম্ভব—কারণ পুলিশ তাদের জাতশত্রু। (*The Revolution That Failed*)

এ প্রসঙ্গে শংকর ঘোষ বলছেন, সারা পশ্চিমবাংলায় নকশালদের হাতে দেড়শো জনের মতো পুলিশ খুন হয়েছে কিন্তু কেউই ইন্সপেক্টারের ওপরের র‍্যাঙ্কের নয়। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কথাটা স্বীকার করে বলেন, কোনো কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার বা ডেপুটি আই জি-র মতো উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। সস্তায় কিস্তিমাত করাই ছিল আসল লক্ষ্য। তাই সাধারণ পুলিশকেই মারা হয়েছে।

অমিতাভ চন্দ্র মনে করেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সি পি আই (এম-এল) ঘোষিত 'কৃষিবিপ্লব' ও 'জনযুদ্ধ'-এর তত্ত্ব কেবল 'শ্রেণীশত্রু' খতমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর কলকাতা শহরে যা ঘটেছে তা 'বৈপ্লবিক লড়াই'-এর নামে বিশুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। ('The Naxalite Movement')

সন্ত্রাসবাদ আর হঠকারিতা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অতিক্রত ১৯৭৫ সালের মধ্যে বিপ্লব সমাপ্ত করতে হলে প্রয়োগে ও আচরণে হঠকারিতার প্রাধান্য অনিবার্য। ফলে, অহেতুক

ক্ষয়ক্ষতি ও অবধারিত জীবনহানি। এ প্রসঙ্গে জেলখানায় সংঘর্ষ ও বন্দীহত্যার কথা ওঠে। শংকর ঘোষ লিখছেন, মেদিনীপুর, আলিপুর, বহরমপুর, বীরভূম, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, দমদম ও হাওড়া— জেলগুলির ভেতরে বারবার সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে নিহত হয়েছেন ২০০ জনের মতো নকশাল বন্দী। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে দমদম জেলে ১৯৭১-এর মে মাসে। তাতে মারা যান ১৬ জন নকশাল বন্দী এবং গুরুতর আহত ৮৮ জন।

এত তাজা প্রাণের কী বিপুল অপচয়! চরম হঠকারিতার খেসারত এই তরুণদের অকালমৃত্যু। কেউ কেউ মনে করেন, জেলখানার ভেতরে হঠকারী আচরণের তাত্ত্বিক ছিলেন সরোজ দত্ত। নিমাই ঘোষ লিখছেন, 'সুশীতলদা ও সরোজদার চিঠি জেলের কমরেডদের মধ্যে বিতর্ক বয়ে এনেছিল। সুশীতলদার বক্তব্য ছিল যে অহরহ জেল ব্রেক করা যায় না। বিপ্লবীদের সাধারণ ওয়ার্ডারদের রেসপেক্টে নিয়ে নিতে হবে। সরোজদা এমোশনালি লিখছেন জেলের ওয়ার্ডগুলোর প্রত্যেকটাকে একটা গ্রাম ভাবতে হবে। জেল সরকারের একটা সুদৃঢ় ঘাঁটি। বিপ্লবীরা অবশ্য তাও ভেঙে দেয়। কিন্তু মনে করুন একটা ওয়ার্ডের একজন জমাদারকে খুন করে আর একটা ওয়ার্ডে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সাধারণ কয়েদীরা অ্যাকসেপ্ট করবে না, পাগলি হলে কাউকে ছেড়ে দেয় না। জেল থেকে একটা চিঠি সরোজদাকে লিখেছিলাম। সরোজদা উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। (*স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত*, পৃ. ২৪২)

অরবিন্দ ঘোষ সরাসরি উস্কানিমূলক বলে মনে করেন সরোজ দত্তর জেলের লাইন। তিনি লিখছেন, 'সরোজবাবু বেশির ভাগ কাজ করতেন আবেগের বশে। যেমন তাঁর জেলের লাইন। জেলে উকিল বা অন্য কোনো সাহায্য নেবে না। আর জেলে বিভিন্ন উস্কানিমূলক কাজ করা; অর্থাৎ জেলে যা করা যায় না তাই করা। আমি দেখেছি কমরেডদের অনেকে জামিন পেতে পারতো, নিচ্ছে না, পরে খত দিয়ে ছাড়া পেয়েছে। উকিলের সাহায্য না নেওয়ায় অনেকের সাজা হয়ে গেছে। জেল পালানোর বিভিন্ন ঘটনায় অনেক কমরেডকে অকারণ মরতে হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিশ্চয় জেল পালাতে হবে—কিন্তু জামিন পেলে জেল ভাঙার দরকার কি? এর ফলে যাঁরা থেকে যান তাঁরা ভয়ঙ্কর অত্যাচারিত হন।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২)

হঠকারিতা আসলে নকশালদের কী নেতা, কী ক্যাডার সকলেরই মজ্জাগত। তারই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন মৃণাল সেন। তিনি বলছেন : *কলকাতা* '৭১-এর এডিটিং-এর সময় দেখেছি, লোকে ভয়ে আসত না। বনশাল আসত আর কাজের কথা সেরেই চলে যেত। স্টুডিও চত্বরে গোপন ডেরা বানিয়ে থাকত কয়েকটি নকশাল ছেলে। তারা আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে গেলে স্টুডিও-র পিছনে। ভয় হল, মেরে ফেলবে নাকি! জিজ্ঞেস করল, বনশাল শ্রেণীশত্রু কিনা। বোঝালাম চলচ্চিত্রে যা লগ্নি করা হয় তার রাজনৈতিক চরিত্র নেই।

তাদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া তৈরি হয়। খাবারদাবার-ও ভাগ করে খাই। তাদের বলি পুলিশ বা সি আর পি এলে তারা যেন এসে যে কোনো ফিল্ম-এর রীল নিয়ে বসে পড়ে। আমি তখন বলব, আমার লোক এরা, কাজ করছে। হঠাৎ একদিন সি আর পি এসে হানা দেয়। সবাই পালায়, একজন শুধু গাছের ওপর চড়ে লুকোয়। সে বোধ হয় রাগ সামলাতে না পেরে ওপর থেকে বোমা ছুঁড়ে মারে সি আর পি-দের লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাকে নামানো হয়। জখম ছেলেটিকে নিয়ে তারা চলে যায়। কয়েকদিন ধরে চলল তার ওপর অকথ্য নির্যাতন। তারপর তাকে আনা হয় বাকিদের গোপন আস্তানা দেখিয়ে দেবার জন্য। তিনদিন পর ছেলেটিকে গুলি করে মারা হয়।

৫

নকশাল রাজনীতির সঙ্গে মৃত্যু যেন গাঁটছড়া বাঁধা। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, চারু মজুমদার যেভাবে বারবার আত্মদানের কথা বলতেন তাতে মনে হত তিনি যেন একদল আত্মঘাতী মানুষের আখড়া তৈরি করতে চলেছেন। ১৯৬৭-৭২ এই ছ'টি বছর অনেক মৃত্যুর ঘটনায় আকীর্ণ। তার মধ্যে তিনটি মৃত্যু নকশালদলের মূল অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।

১৩ মার্চ ১৯৭১। সুশীতল রায়চৌধুরী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৯। তিনি 'মনীষীমূর্তি' ভাঙার বিরোধিতা করে একটি আন্তঃপার্টি দলিল প্রচার করেছিলেন— এই দলিল নিয়ে পার্টিতে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

সরোজ দত্ত-র মৃত্যু ঘিরে এক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি হয়। আজও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি যে সরোজ দত্ত গ্রেফতার ও পুলিশের হেফাজতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড আর গোপন থাকেনি। তাঁর ভ্রাতৃবধূ রিক্তা দত্ত লিখছেন : 'আমরা খোঁজ পাই না। একদিন শুনলাম অমৃতবাজারে বেরিয়েছে সে নেই। যখন শুনলাম প্যান্টের ভেতর থেকে লুঙি বেরিয়েছিল, বুঝলাম সরোজ দত্ত ছাড়া কেউ নয়। একবার আমাদের নড়াইলের বাড়িতে এক বৃদ্ধ কৃষক কমরেড এসেছিলেন। এসে ধুতি খুলে ফেলছে। আমি বললাম— এ কী করছেন! দেখি তলায় লুঙি আণ্ডার উইয়ারের মতো পরে ধুতি পরেছেন। বাবুদাকে গল্প করেছিলাম, বাবুদা তাই অভ্যাস করে।' (*স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত*, পৃ. ২০১)

গোপন আস্তানা থেকে সরোজ দত্ত-র ধরাপড়ার ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন। ভবানী (রায়) চৌধুরী বলছেন, 'যতদূর শুনেছি, প্রমাণ করা যাবে না, বসন্ত রায় রোডের বাড়িটি পুলিশের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। পুলিশ নাকি ওঁকে সরোজ দত্ত বলে চিনতে পারেনি। ঘড়িটা ডান হাতে পরা, লুঙির উপর প্যান্ট পরা দেখে চিহ্নিত করে। বিপ্লবী সতর্কতা দাবি করে ওঁর না যাওয়াটা। কেন গেলেন যদি বলেন, এটা একটা অসর্তকতা। ষড়যন্ত্র কিনা, কেউ তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল কিনা বলা যাবে না, করা উচিত ছিল না।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২)

গোপন সংগঠনের গোপনীয়তা ঠিক মতো রক্ষিত হয়নি যে তার প্রমাণ সরোজ দত্ত-র গ্রেপ্তার। মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'আমাদের বাড়িটা এত ওভারইউজড ছিলো, বিভিন্ন চিঠি আসতো, মিটিং প্লেস ছিলো, পোস্টবক্স হিসেবে ব্যবহার হতো, যাঁরা অ্যারেস্টেড হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কাগজপত্র থাকতে পারে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩)

এবার চারু মজুমদারের মৃত্যুপ্রসঙ্গ। স্ত্রীকে লেখা চারু মজুমদারের শেষ চিঠি :

লীলা, 14.7.72

তোমাদের খবর পাই না অনেকদিন। এখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হয়েছে। তুমি চিঠি লিখলে সেটা আমি পেতে পারি এক মাসের মধ্যেই। কাজেই চিঠি দিও। অনীতা বোধ হয় কলেজে চলে এসেছে। মিতু, অভী কেমন আছে জানিও। ওদেরও বোল আমাকে চিঠি দিতে। এখানে আমাদের অবস্থা ভাল। ভিয়েটনাম ডে-তে একটা মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মিছিলটা হবে শ্রমিক কমরেডদের নিয়ে। ২০ শে জুলাই। কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বড় কম হচ্ছে। তার কারণ খতমের উপর বড় বেশী

জোর পড়ে গিয়েছে। এটা বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি। পার্টির মধ্যে সমালোচনা বেড়েছে, কাজেই সংশোধিত হবে। আমাদের পার্টি অল্পদিনের, অভিজ্ঞতাও কম ফলে বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। কমরেডদের নজরে পড়েছে বিচ্যুতি, এটাই শুভলক্ষণ। যাই হোক, তোমাদের খবর দিও। আমি একরকম আছি। ভালবাসা নিল। যদি সম্ভব হয় তাহলে কলকাতায় এসো।

(*আজকাল*, ২৪ মে, ১৯৯২)

চিঠিখানিসহ ক্যুরিয়ার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, সম্ভবত শিয়ালদহ স্টেশনের কাছাকাছি।

চিঠিতে উল্লিখিত 'বিচ্যুতি'র দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চীনা পার্টির নেতারা। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চীনে যান সৌরেন বসু। সঙ্গে করে তিনি নিয়ে আসেন চীনা পার্টির বক্তব্য। কাংশেং আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন : জমির জন্য লড়াই নয়, কৃষকরা লড়ছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য— এভাবে বলাটা সঠিক হবে না। তা ছাড়া শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে বিপ্লবী হওয়া যায় না—কমরেডদের জন্য এ ধরণের পূর্বশর্ত আরোপ করাও যুক্তিযুক্ত নয়, তাতে সংগঠনের চরিত্র পাল্টে যায়।

চৌ এন লাই বলেন : শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাও কিন্তু সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের দুঃখ কষ্টের অংশিদার হও, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। অ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়িয়ে আত্মদান করো না। লড়াই চালাও শত্রুর বিরুদ্ধে। গোপনে পুলিশ মারাটা অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ— তার প্রভাব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তাতে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে।

চীনের পার্টির সমালোচনা পার্টির মধ্যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। চারু মজুমদার সরোজ দত্তর মৃত্যুর পরে কার্যত কোণ-ঠাসা।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'গুরুদের ভাগ্যে প্রায়শই অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্ক্ষিত চেলাই জোটে। চারুবাবু যদি তাঁর চেলাদের ভক্তিরসে মজে না যেতেন তাহলে আরও বিচক্ষণ নেতা হতে পারতেন। কানু সান্যাল, সৌরেন বোস, খোকন মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জি, সরোজ দত্ত প্রমুখ তাঁর অন্ধভক্তরা একদা তাঁকে বৈপ্লবিক কর্তৃত্বের পবিত্রবেদীতে সংস্থাপিত করেন। সরোজ দত্ত পুলিশের হাতে খুন, তাছাড়া বাকি সব ভক্ত যাঁরা তাঁকে দেবতুল্য মনে করতেন তাঁরা সব একে একে তাঁকে ছেড়ে যান এবং খুব খারাপ ভাষায় তাঁকে গালমন্দ করেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭)

ভাস্কর নন্দী বলছেন : আগে চারুদা মানব ছিলেন। তারপর এদের পাল্লায় পড়ে হলেন অতিমানব। অতিরিক্ত ওষুধ খাবার ফলে বাস্তবকে বস্তুগত নিয়ম দিয়ে দেখবার নীতি ক্রমশ বর্জন করেছিলেন। এর সঙ্গে মিশে গেল কর্তৃত্ববাদ মানার সংস্কৃতি ...দিলীপ ব্যানার্জি, দীপক বিশ্বাস, অনল রায় নামে কয়েকটা ফাটকাবাজ লোক চারুদাকে ঘিরে রেখেছিলেন তখন। সমস্ত সময় অক্সিজেন নিতে হচ্ছে, পেথিড্রিন ইঞ্জেকশান নিতে হচ্ছে ঘন ঘন চারুদাকে।...

...সত্তরে তিনি বন্দী ছিলেন সরোজ বাবু ও ভদু বোসের (সৌরেন বোস)। একাত্তরে দিলীপ ব্যানার্জিদের। (*অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার*, পৃ. ৭০-৭১)

চারু মজুমদারের মারা যাবার মাস দেড়েক আগে খোকন মজুমদার (আব্দুল হামিদ) তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। চারু মজুমদারকে তখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দেখাদিল। খোকন মজুমদারের মনে হয়েছিল, চারু মজুমদার নতুনভাবে চিন্তা করছেন। আর বুঝতে পারছিলেন যে খারাপ লোকজন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭)

চারু মজুমদার কলকাতায় আসেন ২০ জুলাই-এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিল প্রত্যক্ষ করতে। তার আগেই কেন্দ্রীয় কমিটির পত্রবাহক ও রাজ্য কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক দীপক বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ চারু মজুমদারের গোপন আস্তানার সংবাদ পায়। প্রায় অতর্কিতে হানা দিয়ে রাত ভোর হবার আগেই ১৬ জুলাই '৭২ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। অনুরূপ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা সরকারও। কলকাতার পুলিশ কমিশনার রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভোররাতেই খবরটি সিদ্ধার্থ রায়কে জানান। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই সেই খবর জানান ইন্দিরা গান্ধীকে।

২৮ জুলাই '৭২ লালবাজার পুলিশ লক-আপে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়না তদন্তের পর রাত ৯-২০ মি. একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তাঁর মরদেহ কেওড়াতলা নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে পিছনে একটি প্রাইভেট গাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা। রাত দশটার কিছু পরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের চারজন ও পুলিশবাহিনীর লোকেরা। শ্রীমতী মজুমদার সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।

রবীন্দ্র রায়ের মতে, 'চারু মজুমদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই (এম-এল)-এর 'বৈপ্লবিক কর্তৃত্বের' অবসান ঘটল। পড়ে রইল বৈপ্লবিক আন্দোলনের এক ধ্বংসস্তুপ, ভস্মশয্যা থেকে তাকে জাগাবার জন্য কেউ রইল না।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫)

চারুবাবুর মৃত্যুর পর নকশাল আন্দোলনের উপর যবনিকা টানা যেতে পারে। মাঝে মাঝে শোনা যায় এখানে সেখানে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সারা ভারতের জেলখানাগুলি নকশাল বন্দীতে বোঝাই। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসেবে, ১৯৭৩-এ নকশাল বন্দীদের সংখ্যা ৩২ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া চলছে কুড়িটির মতো ষড়যন্ত্র মামলা।

নকশাল আন্দোলনের ভাঁটার টান শুরু হতেই শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে। যেসব তরুণ কারাবাস করছে বা অজ্ঞাতবাসে রয়েছে তাদের আবার স্বাভাবিক জীবন-স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে এই উদ্যোগ। অর্থাৎ অনেক মারধর করা হয়েছে, এবার সংশোধনের পালা। (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)

যুদ্ধ থেমে গেলেও স্বপ্নে থেকে যায় তার রেশ (কথাগুলি আমার নয়)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরী ছাত্র সংসদ সে দিনগুলির স্মৃতি এখনো ধরে রেখেছেন : 'সত্তরের দশক' হবে 'মুক্তির দশক' এ বিশ্বাস স্পন্দমান ছিল যাদের ধমনীর রক্তোচ্ছ্বাসে, সেইসব মুখচ্ছবি আজ যেন দূরগামী একরাশ স্মৃতি।

যুদ্ধে ছিলাম স্বপ্নে আছি

(শহীদ স্মরণে)

যাবতীয় দায় সারা, শুধু তোমার বেদীর কাছে
রেখে দিয়ে একগোছা ফুল কিম্বা মালা
সেই রীতি আমাদের নয়
বুকের ভেতর বড় জ্বালা,

ধরা বাঁধা অঙ্গীকারে দু'একটা কবিতা লিখে
তা জুড়োবে না
কেউ কেউ ধীরে সুস্থে
ফিরে গেছে আরামের সুখী আস্তাকুঁড়ে—
তারা নয় সহযোদ্ধা সহোদর তোমার।
পরাজয়ে পরাজয় মানবে না যারা,
তারা আজো পথ হাঁটে
গান গায় তোমাদের অনবদ্য সুরে।
(সন তারিখ দেয়া নেই)

বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে হারিয়ে গেল অনেকে। তবুও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র চারু মজুমদার হয়ে উঠলেন এক কিংবদন্তী। তার স্বীকৃতি অন্তত পাওয়া যায় বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অজিত রায়ের রচনায় :

'...বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ঐতিহাসিক ভূমিকার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা হল, তার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি প্রেরণার পিছনে মননশীল বুদ্ধিজীবীর প্রভাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে নকশাল নেতা চারু মজুমদার পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের মননশীল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর এক বিচিত্র সমাবেশ ও পরম্পরা আজ পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে বাঙালী চেতনাকে। এঁদের কেউ প্রতিষ্ঠিত ভাবধারার নৈতিকতা প্রসারিত ও গভীরতর করার চেষ্টা করেছেন, কেউ বা করেছেন এদের নৈতিক ভিত্তিকে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা। কারও কারও কার্যকলাপ হয়তো স্ববিরোধ ও অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট। এঁদের সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে আজ অনেক তর্কবিতর্ক চলছে এবং তা চলাই উচিত।'

(*বাঙালী বুদ্ধিজীবী : ঐতিহাসিক পটভূমি*)

৬

১৯৭২ সাল। ভারতবাসীর জন্য নববর্ষের নানা সুসংবাদ। ১৯৫৬-র আগস্ট থেকে পি এল ৪৮০ প্রকল্পে আমেরিকা থেকে যে গম কেনা হচ্ছিল তার আর দরকার নেই। ১৯৭০-৭১ সালে রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপন্ন হওয়াতে ধানচালে দেশ এখন স্বয়ম্ভর। তার চেয়েও বড় খবর, পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করার পর দেশে-বিদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মহিয়সী নারী রূপে বন্দিতা। ইন্দিরা-মহিমার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অন্তত সি পি আই-এর দেরি হয়নি। কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বাত্মক মৈত্রীর রাস্তা নিল সি পি আই। নরহরি কবিরাজ এ প্রসঙ্গে বলছেন : নেতারা এর পিছনে একটা তত্ত্ব খাড়া করেন। ডাঙ্গে তার প্রধান প্রবক্তা আর পাণ্ডাদের মধ্যে ছিলেন অধিকারী ও ভবানী সেন। অধিকারীর মতে, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী দুভাগে বিভক্ত— বৃহৎ ও নাতি-বৃহৎ। কংগ্রেসের নেতৃত্বে রয়েছে নাতি-বৃহৎ বুর্জোয়ারা। অতএব জাতীয় গণতান্ত্রিক

বিপ্লবের 'যৌথ নেতৃত্ব তত্ত্বের উদ্ভব' কারণ, নাতি-বৃহৎ বুর্জোয়ারা সামন্ত্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে শুধু তা নয়, এরা রীতিমতো বিপ্লবী। ডাঙ্গে থিওরির ধারে কাছে না গিয়ে বাস্তববাদী দৃষ্টিতে দেখার কথা বলত। ইন্দিরা যা করছে, তাঁর মতে, সেসব প্রগতিশীল কাজ। ইন্দিরা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী অংশের প্রতিনিধি।

পুলিশের আই. জি দাবি করছেন, পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে উন্নতির দিকে। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। যদিও ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিনেই খুন হলেন সি পি এম-এর দমদম লোকাল কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুনীল সেন।

মার্চে নির্বাচন। নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে আর অশোক মিত্রের ভাষায় ঘনিয়ে আসছে 'হায়েনার রাত।' এবারের নির্বাচন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ—একদিকে কংগ্রেস-সি পি আই জোট এবং অপরদিকে সর্বাত্মক বাম ঐক্যের জোট। আর এস পি , এস ইউ সি ও ফরওয়ার্ড ব্লক, যারা ছিল না সি পি এম-এর সঙ্গে '৭১-এর নির্বাচনে—তারাও এসেছে এবার বাম জোটে।

১৭ ফেব্রুয়ারি '৭২ ময়দানের জনসভায় জ্যোতি বসু বলেন, আজ আনন্দ ও গর্বের দিন। আজ আবার সব বামপন্থীদল এক হয়ে এই সভায় মিলিত হয়েছি। আমরা রাজ্যে বামপন্থী সরকার গঠন করতে চাই।

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বলেন, হেমন্ত বসুর হত্যাকারীদের পরাজিত করে পশ্চিমবাংলার বুকে বামপন্থী সরকার কায়েম করতেই হবে। এই বামপন্থী সরকারই পারবে হেমন্ত বসুর হত্যাকারীদের খুঁজে বার করতে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৮.২.৭২)

না, তা হবার নয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কী অপার মহিমা! তাঁর যাদুদণ্ডের স্পর্শে নির্বাচনে ভেল্কি খেলে গেল। নির্বাচনের পর দেখা গেল মোট ২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ২১৬টি আসন আর কংগ্রেসের মিত্র সি পি আই ৩৬টি আসন; এবং যে সি পি এম মাত্র একবছর আগেও পেয়েছিল ১১১টি আসন, তারা পেয়েছে এখন ১৪টি আসন। *আনন্দবাজার*-এর (১৪.৩.৭২) ভাষায় : পশ্চিমবাংলায় ব্যলটে বিপ্লব।

পরবর্তী সংবাদ :

জ্যোতি বসু পরাজিত—কংগ্রেসের রেকর্ড আসন।

১২টি জেলায় সি পি এম নেই

(*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৬.৩.৭২)

কী করে সংসাধিত হল এই 'ব্যলট বিপ্লব'? তার উত্তরে *গণগক্তি* (১২.৩.৭২)-র সংবাদ শিরোনাম :

পুলিশ ও কংগ্রেসের বোমা গুলি বুলেটের মুখে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন

অন্ততঃ কুড়িটি কেন্দ্রে বেয়নেটের মুখে ভোটারদের ভোটাধিকার হরণ

ভোটপত্রে কংগ্রেস ও দক্ষিণ কমিউনিস্ট গুণ্ডাদের ছাপ

পরের দিন *গণশক্তি* (১৩.৩.৭২)-র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : গত ৪৮ ঘণ্টায় ১১ জন নিহত। বহু মানুষ আহত ও কয়েকটি পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গুণ্ডাবাহিনীর রক্ষাকর্তা এবং আক্রান্তদেরই গ্রেপ্তারে তৎপর।

প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে এই নির্বাচনকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসন বলে ঘোষণা করলেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে পার্টির কাউন্টিং এজেন্টরা ভোটগণনা কেন্দ্রে যাবেন না। প্রথমে আমরা এতটা ধারণা করতে পারিনি, এখন বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবর ও ঘটনার ধরণ দেখে আমরা সুনিশ্চিত এটা পূর্বপরিকল্পিত। (*গণশক্তি*, ১৪.৩.৭২)

৭

গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে অমাবস্যার রাত। আঁধারে হায়নাদের চোখগুলি জ্বলছে ফসফরাসের মতো। আবার বেরিয়ে পড়েছে রক্তলোলুপ হায়েনার দল।

অশোক মিত্র বলছেন—১৯৭২ সালের তথাকথিত 'ব্যলটে বিপ্লব' যে ডাহা জালিয়াতি আর ভূয়ো, সে কথা বাইরের লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। তবুও যা ঘটেছে তা বলতে হবে। একবার বিবেচনা করে দেখুন—আপাদমস্তক সশস্ত্র ভীষণদর্শন ঠ্যাঙাড়ের দল, হাতে কংগ্রেসের তেরঙ্গা আর মুখে প্রধানমন্ত্রীর জপমন্ত্র—কোনো একটি অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে : ভোটের দিন কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। আর বিকেল পাঁচটার আগে কেউ বেরিয়েছে তো, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, ধড় থেকে মুণ্ডু খসে পড়বে। ভোটের দিন একই চেহারার লোকজন, হাতে স্টেনগান আর কোমরে ছোরা ঝোলানো, বুথের বাইরে ভোটারদের লাইন খুঁটিয়ে দেখছে। অপছন্দসই কোনো পুরুষ অথবা মহিলাকে দেখামাত্র তাকে সংক্ষেপে বলা হল : যান, সোজা বাড়ি চলে যান। ভাববেন না, আপনার ভোট আমরাই দেব। এভাবে ঘণ্টা দুই গেল, তারপর বিরোধীদলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বার করে দেওয়া হল। তখনো যারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বলা হল, চলে যান সবাই, ভোট শেষ হয়ে গেছে। তখন সবে দুপুর বারটা। তারপর তারা গোছা গোছা ব্যলট নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে স্ট্যাম্প মারতে লাগল। প্রিসাইডিং অফিসার আর পোলিং অফিসারবৃন্দ নীরবে এই অভিনব দৃশ্য অবলোকন করলেন। কে কী বলবে—প্রাণের মায়া আছে সকলের। নিপুণতার সঙ্গে সর্বকার্য সমাপনান্তে প্রিসাইডিং অফিসারকে দিয়ে যথাবিধি স্বাক্ষর করানো হল। ব্যলট বাক্স বাঁধাছাঁদা হল ও যথাস্থানে প্রেরিত হল। পশ্চিমবঙ্গের অবাধ নির্বাচন পরম শান্তিতে সম্পন্ন। (*The Hoodlum years* p. 41-42)

এভাবে নির্বাচন হলে যা হয় আর কি, জ্যোতি বসুও প্রায় অপরিচিত এক সি পি আই প্রার্থীর কাছে ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলেন। মাত্র এক বছর আগে এই বরানগর কেন্দ্রে অজয় মুখোপাধ্যায়কে তিনি ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন—তাছাড়া ১৯৫২ সাল থেকে বরানগর কেন্দ্রে তিনি বরাবর জয়ী।

জ্যোতি বসু বলছেন : 'ভোটের দিন-দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের পার্টি অফিসে গিয়ে দেখি প্রচুর মানুষ, পুরুষ, মহিলা—কয়েকশো তো বটেই, বা হাজার খানেক। ওরা বলছে ওদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। পুলিশের সামনেই বন্দুক দেখাচ্ছে। ওরা নির্বাচনী বুথের দরজা বন্ধ করে সমস্ত ব্যলট পেপারে ছাপ মেরে ফেলে দিচ্ছে, তারপর বলছে, ভোট শেষ। এক জায়গায় পনেরো হাজার ভোট, আমরা পৌঁছতেই পারলাম না, ওরা ঢুকতেই দিল না পার্টিকে। বাড়ি

বাড়ি গিয়ে বলছে ভোট দিতে যাবেন না, ভোট হবে না। কখনও বলেছে, ভোট হয়ে গিয়েছে, যাবার দরকার নেই। আমি তখন কমরেডদের বললাম, পার্টি অফিসকে জানিয়ে দিন যে এখানে ভোট হচ্ছে না।

'থানায় গেলাম। ও সি বললো, 'দেখছি দেখছি।' আমি বললাম, কী আর দেখবেন? দেখি থানার ঠিক পাশের ভোটকেন্দ্রে তালা লাগানো। আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ি ভোট হয়ে গেল? ওরা চুপ। আমি বললাম, আপনারা চলুন, অন্তত জেনুইন ভোটারদের ভোট আলাদা করে দিতে দিন, অন্য বাক্সে রাখুন। ওরা বলল, আই জি কে না বলে সেটা করা নাকি সঙ্গত হবে না। আমি বললাম, বুঝে গেছি, আপনারা কিছু করবেন না। থানাকে মিলিটারি ডাকতে বললাম। মিলিটারির গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল, আমরা বলা সত্ত্বেও থামল না।

'ওরা অনেকে বলল কাউন্টার করবার কথা। আমিই বারণ করলাম। লাভ হবে না, মাঝখান থেকে আরও কিছু কমরেড মরতো। আমি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম —আই উইথড্র। প্রেসকে বললাম। এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মোটামুটি অবস্থা। ১৯৭১ সালে হারবার পরে ওরা কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি।' (*জ্যোতিবাবুর সঙ্গে*)

এটারই নাম 'ইন্দিরা হাওয়া', যা পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দিন ১১ মার্চ, ১৯৭২-এ বয়ে গিয়েছিল ঝড়ের বেগে। মানুয কেন সেদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল? তার উত্তরে অশোক মিত্র বলছেন, প্রথমত আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষকদের স্নেহধন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট সমাজবিরোধীরা সেদিন মানুষকে আতঙ্কে বোবা বানিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হতাশা। মানুষের মনোবল শূন্যের কোঠায়। এবং তার সবটুকু কৃতিত্ব নকশাল তাত্ত্বিকদের প্রাপ্য। তাঁরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিপ্লব করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক সার্বিক নৈরাজ্য। ডেকে এনেছেন পাল্টা সন্ত্রাস। সবাই জানে, সেদিন ভোটের নামে কী হয়েছিল। কিন্তু দলবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ! তাহলে তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠ্যাঙাড়েরা আর পুলিশ দাঁড়িয়ে অবলোকন করবে সমগ্র দৃশ্য। (Ibid, p. 44)

১৯৭২-এর নির্বাচনের পটভূমি প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু বলছেন, এই নির্বাচনের প্রস্তুতি অনেকদিন ধরেই ওরা করেছে। প্রথমে ওরা ভেবেছিল পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করবে না মার্চ মাসে— সেই মতো ঘোষণাও করেছিল। কিন্তু পরে এই পদ্ধতিটা ঠিক করে ওরা পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচন ঘোষণা ও নির্বাচনের মধ্যে ছয় সপ্তাহে আমাদের প্রচুর লোককে খুন করে। নির্বাচনের পাঁচদিন আগে ৬ মার্চ, ১৯৭২, ওরা ১২ জন মার্কসবাদী কর্মীকে খুন করে দমদম দখল করে। মার্কসবাদী নেতা তরুণ সেনগুপ্ত বাধ্য হন এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে। সোনারপুরের পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি টালিগঞ্জে প্রশান্ত শূরকে খুন করার জন্য গুলি ছোঁড়া হয়—সে গুলি লেগে পাশে দাঁড়ানো এক তরুণ কর্মী মারা যান। ওরা ঢাকুরিয়ায় হরিদাস মালাকারকে অপহরণ করে।

বিপ্লব দাশগুপ্ত-র প্রশ্ন: ভারতের সাধারণ মানুষ কি বিশ্বাস করেছিল যে এই ধরণের সন্ত্রাস ও জালিয়াতি হয়েছে ১৯৭২ সালের ওই নির্বাচনে?

জ্যোতি বসুর উত্তর : না, তখনও ভারতের কোথাও এই ধরণের ঘটনা এত ব্যাপকভাবে হয়নি। বিহার বা অন্যত্র বুথ ক্যাপচার এইসব হত, কিন্তু সমস্ত রাজ্য জুড়ে পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে এই রকম জালিয়াতি আগে কখনও হয়নি। তাছাড়া ১৯৭৫

সালের জরুরি অবস্থার আগে ইন্দিরা সরকারের এই 'আধা ফ্যাসিস্ট' চরিত্রটা ভারতের মানুষের কাছে ধরা পড়েনি। সারা ভারতে এমারজেন্সি শুরু ১৯৭৫ সাল থেকে, আমাদের ১৯৭১-৭২ থেকে। (*জ্যোতিবাবুর সঙ্গে*)

৮

এর আগের নির্বাচনগুলির সঙ্গে ১৯৭২-এর নির্বাচনের আদৌ মিল নেই। এ সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা—নির্বাচনের নামে রক্তাক্ত প্রহসন। তার কয়েকটি নমুনা এবার দেখা যাক।

টালিগঞ্জ : সি. পি. এম প্রার্থী প্রশান্ত শূর আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর পোলিং এজেন্টরা প্রহৃত ও তাঁদের বন্দুক দেখিয়ে বুথ থেকে বার করে দেয়া হয়েছে। বুথগুলি পুরোপুরি গুণ্ডাদের কর্তৃত্বে চলে যায়। অবরুদ্ধ এলাকাগুলি থেকে অনবরত অমঙ্গলবার্তা আসতে থাকে। বামপন্থী পোলিং এজেন্টরা প্রাণে বেঁচে আছেন কি না এই নিয়ে লোকের জল্পনা শুরু হয়। প্রশান্ত শূরের ইলেকশন এজেন্ট শৈলেন বোস একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সৌভাগ্যবশত তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিশেষ করুণায় তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড পেয়েছিলেন। ৭৩টা পোলিং স্টেশন ঘুরে আহত রক্তাক্ত পোলিং এজেন্টদের তিনি একে একে বার করে আনলেন। পুলিশের উপস্থিতিতে বিরাট বিরাট থান ইটের আঘাতে গাড়ির কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ। (*গণশক্তি*, ১৮.৩.৭২)

খড়দহ : ভোট হয়েছে ১১ মার্চ নয়, ১০ মার্চ রাতে।

সি পি এম-কে ভোট দিতে পারে এই সন্দেহে বাড়ি বাড়ি হামলা, ভীতি প্রদর্শন, ঘরছাড়া ইত্যাদি কাজ চলে পাইকারী হারে। ১০ মার্চ রাতে ৯২, ৯৩, ৯৪ নং কল্যাণনগর বুথ ও ৯৭ নং কর্ণমাধবপুর বুথে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসী গুণ্ডারা রিভলবার দেখিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের হাত থেকে ব্যলট ছিনিয়ে নিয়ে ছাপ মেরে অধিকাংশ ভোটবাক্সে ফেলে যায়। দক্ষিণপল্লী বুথের প্রিসাইডিং অফিসার আপত্তি জানালে, বাইরে গুলি চালিয়ে ভয় দেখিয়ে কাজ সারা হয়। খড়দহ পৌর এলাকায় ভোট দেয়ার কাজ অধিকাংশ বুথে গুণ্ডারা রাতেই সেরে ফেলে। প্রত্যুষে যে ভোটাররা কোনক্রমে বুথে ঢুকতে পেরেছেন তাঁরাই দেখেছেন ভোট হয়ে গেছে। অবশ্য অধিকাংশ ভোটারকেই ভোটের লাইন অথবা রাস্তা থেকে বন্দুকের গুঁতো অথবা গলাধাক্কা খেয়ে ফিরতে হয়েছে।

নির্বাচনের দিন বেলা এগারটা নাগাদ হঠাৎ কয়েক লরি গুণ্ডা টিটাগড়ে খড়দহ কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্যালয় ডাক্তার গিরিজা চ্যাটার্জির বাড়ি ঘিরে চারদিক থেকে আক্রমণ চালায়। ঐ বাড়িতে তখন সপরিবারে ডাঃ চ্যাটার্জি, প্রার্থী সাধন চক্রবর্তী ও শতখানেক নির্বাচনী কর্মী উপস্থিত ছিলেন। চারদিক থেকে গুলি চালাতে চালাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে গুণ্ডারা। কাঁচের জানলাগুলো ঝনঝন করে মেঝেতে ভেঙে ছিটকে পড়তে থাকে। তেতলার ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেয় মহিলা পুরুষ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা মিলিয়ে শতাধিক মানুষ। গুণ্ডারা প্রথমে দোতলা, তারপর তেতলা ওঠার দরজা সশব্দে ভাঙতে থাকে। তার সঙ্গে দোতলা ও তেতলা

লক্ষ্য করে নিচ থেকে অবিরাম বোমা ছোঁড়া হতে থাকে। একতলার ঘরগুলিতে তখন আগুন জ্বলছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই হিংস্র তাণ্ডব চলছে—টিটাগড় থানা থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। অবশেষে সপরিবারে ডাঃ চ্যাটার্জি, সাধন চক্রবর্তী ও শতাধিক আক্রান্ত রক্তাক্ত মানুষ থানায় এসে আশ্রয় নিলেন। এদিকে তখন গুণ্ডারা টিটাগড় পেপার মিল ইউনিয়ন অফিসবাড়িটি ভেঙে চূরমার করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বি টি রোডের পাশে মুসলিম বস্তিতেও তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। (*গণশক্তি*, ১৮.৩.৭২)

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এ ধরণের ঘটনা একটি-দুটি নয়, বহু।

চীফ ইলেকশন কমিশনার শ্রীযুত সেনবর্মা বিশ্বাসই করতে চান না যে পশ্চিমবাংলায় এসব ঘটেছে। তাঁর মতে, যা ঘটেছে বলে শোনা যাচ্ছে তা যান্ত্রিক নিয়মেই অসম্ভব (mechanically not possible)। তাঁকে অশোক মিত্রের প্রশ্ন : কোন্‌টা অসম্ভব? বুথ দখল করে বিরোধী পোলিং এজেন্টকে তাড়িয়ে দেয়া? অথবা প্রাণের ভয় দেখিয়ে সাচ্চা ভোটারদের তাড়িয়ে দেয়া? বুথ দখলের পরে ছাপ্পা ভোট ব্যলট বাক্সে ফেলা? কোনটা অসম্ভব—মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মহাশয়? সবই সম্ভব এবং সবই করা হয়েছে ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ পশ্চিমবাংলায়। অবশ্যি তার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে থিউ সরকারের 'অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন'। এবং সকলেরই জানা যে থিউ সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সরকার। (*Ibid*, p. 44-45)

ভারতে তথা পশ্চিমবাংলায়ও কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অশুভ ছায়া একেবারে অনুপস্থিত! সে সন্দেহ যে একেবারে অমূলক নয়— তার প্রমাণ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিক ময়নিহান-এর স্বীকারোক্তি। তিনি বলছেন: আমরা দুবার মাত্র দুবার ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলিয়েছি এবং সেখানকার রাজনৈতিক দলকে দরাজ হাতে অর্থসাহায্য করেছি। একবার কেরলে ও আর একবার পশ্চিমবাংলায় (যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা)—দুবারই কংগ্রেস দলের হাতে কমিউনিস্টদের নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা ঠেকাবার জন্য টাকা দিয়েছি। তাঁরা টাকা চেয়েছিলেন এবং একবার কংগ্রেস নেত্রী খোদ ইন্দিরা গান্ধীর হাতে টাকা তুলে দিয়েছি। (*A Dangerous Place*, p. 41)

৯

নির্বাচন-প্রহসন শেষ। এবং তার পিছু পিছু কংগ্রেসী দুর্বৃত্তদের ঝটিকা অভিযান। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা জুড়ে তাদের হিংস্র আক্রমণ। একমাত্র লক্ষ্য: বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন কর। তাদের সহায়তায় পুলিশ ও সি আর পি সদা মোতায়েন। প্রয়োজন হলে মিলিটারি তলব করা হচ্ছে। আক্রমণের ধরণ : এলাকার পর এলাকা চষে ফেলে বামপন্থীদের পাড়া ছাড়া করা, দরকার হলে খুন করা। অরক্ষিত বাড়ি লুটপাট করে সাফ করা, তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল অবশ্যই সি পি এম-এর স্থানীয় পার্টি অফিস। বহু জায়গাতেই সেগুলি পুড়ে ছাই।

নির্বাচন-উত্তর এধরণের আক্রমণের অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল উত্তর কলকাতা। নির্বাচনের ফলাফল

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এক বিরাট এলাকা জুড়ে পুলিশ ও গুণ্ডাদের যৌথ তাণ্ডব। ১৪ মার্চ '৭২ শোভাবাজার বাজারের লাগোয়া নাগরিক সমিতির অফিসটি রাত একটায় পুড়িয়ে দেয়া হল। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ উত্তর কলকাতার কংগ্রেস নেতা শত ঘোষ বেশ কিছু লোকজন ও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে লালবাগান অঞ্চলে টহল দিতে থাকেন। এদিকে ১৪৪ ধারা রয়েছে। শত ঘোষের সঙ্গীরা দলে দলে উন্মত্ত অবস্থায় এলাকা চষে ফেলতে থাকে সি পি এম-এর লোকজনদের খোঁজে। হঠাৎ লালাবাজার বস্তির কাছাকাছি নিজেরাই কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়—শতদাকে গুলি করেছে—শতদাকে গুলি করেছে। চীৎকার করতে করতে আরও পুলিশ, আরও ১০৫ টাকা-অলা ইনফর্মার, আরও গুণ্ডা সবাই গোকুল মিত্র লেনের বস্তিতে ঢোকে। তারা বাড়িঘর তছনছ করতে থাকে—বাড়ির মেয়েদের শাসাতে থাকে। পরে এই বাহিনী নিষ্ঠুর উল্লাসে রাজবল্লভ পাড়ায় প্রবেশ করে। বাড়ি বাড়ি হামলা চালায়—কংগ্রেসীদের বাড়িও বাদ যায় না। ভয় দেখাবার জন্য বোমা ফাটায়, পুরুষদের না পেয়ে তারা মেয়েদের মারধর করে। বোমা ফেলা হয় শ্যামপুকুর কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব-এর বাড়িতে। রাজবল্লভ পাড়ার পার্টি অফিসে আগুন দেয়ার পর ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলবাগান বস্তিতে চড়াও হয়ে হামলা করা হয়। ১৫ মার্চ সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় চলে বেপরোয়া লুঠতরাজ ও মারধর এক ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। ওদিকে তখন চলছে ১৭, ১৮ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডগুলি থেকে সি পি এম কর্মীদের ঘরছাড়া করার অভিযান। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মিলিয়ে কয়েকশ মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তু। পার্টি-সমর্থকরা পর্যন্ত বাড়িতে থাকতে পারছে না। ভস্মীভূত পার্টি অফিসের সামনে চলছে মাইক বাজিয়ে 'বিজয়োৎসব'। চটুল ফিল্মী গানের ফাঁকে ফাঁকে চলছে ঘোষণা : বাঁচতে চাও তো আমাদের দলে নাম লেখাও। নইলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

উত্তর কলকাতার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে গুণ্ডাদের দাপাদাপি। ঘরের দরজা বন্ধ করে রুদ্ধশ্বাস উত্তর কলকাতার সাধারণ ছা-পোষা মানুষ। শুনছে বাইরে মত্ত উল্লাস আর বিকট বোমার আওয়াজ। শ্যামপুকুর থানায় বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থীর সামনে জবুথবু বসে থানার ও সি। কংগ্রেস নেতার ঘনঘন চীৎকার: 'দেরি করবেন না, পাখি সব উড়ে যাবে। ঘিরে ফেলুন-ঘিরে ফেলুন। টেনে টেনে বার করুন শালাদের। শুয়ারের বাচ্চারা কেউ যেন পালাতে না পারে।' (*গণশক্তি*, ১৮.৩.৭২)

অলোক মজুমদার বলছেন : ১৯৭২-এর নির্বাচনের পরের দিন থেকেই পার্টিকে কাশীপুর, বেলগাছিয়া ও উত্তর কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে হয়। কয়েকশ কমরেড আশ্রয় নেন বেহালায়। প্রবীর রায়চৌধুরী বলছেন, বেহালায় লঙ্গরখানা খোলা হয়।

একই শ্বাসরোধী অবস্থা কলকাতার উপকণ্ঠ বরানগরে। সি পি এম-এর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে জ্ঞান মুখার্জি জানাচ্ছেন : কংগ্রেস ও দক্ষিণ কমিউনিস্ট গুণ্ডারা মিলে নির্বাচনের আগে যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল তা আজও অব্যাহত। তারা এখন নির্বিচারে পুলিশ ও মিলিটারির প্রত্যক্ষ মদতে গণ-আন্দোলনের কর্মী, নেতা, পৌরপ্রধান, পৌরসদস্য, ডাক্তার, শিক্ষক ও সি পি এম-এর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও গোটা পরিবার সহ পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছে। তারপর খালি বাড়িতে ঢুকে গুণ্ডারা যথেচ্ছ লুটপাট করেছে। এলাকার দশটি পার্টি অফিসই বিধ্বস্ত ও অগ্নিদগ্ধ। তিনটি ক্লাব ও লাইব্রেরি পুড়ে ছাই। কয়েকশ শ্রমিক কর্মচারী চাকুরিস্থলে যেতে পারছে না। ইতিমধ্যে

পাঁচজন গণ-আন্দোলনের কর্মী খুন হয়েছেন। অঞ্চলের পরিচিত সি পি এম কর্মী ও নেতাদের বাড়িতে জোর করে গুণ্ডারা প্রবেশ করছে। সি পি এম নেতা চন্দ্র রায়ের বাড়ি ১৩ মার্চ রাত্রে গুণ্ডারা দখল নেয় এবং যথাসর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। চন্দ্র রায়ের স্ত্রী, বৌদি ও বাড়ির মেয়েদের তারা প্রাণের ভয় দেখিয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে।

এই চিত্র সর্বত্র। *গণশক্তি* (২৫.৩.৭২)-র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় এলাকায় এলাকায় প্রতিদিন গুণ্ডাদের দলবদ্ধ আক্রমণ চলছে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১১ মার্চ '৭২, ঢাকুরিয়া-হালতু অঞ্চল ঘিরে পুলিশ ও গুণ্ডাদের হামলা, ফলে ২০০ জন বামপন্থী কর্মী ও সমর্থক এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

১৯ মার্চ, ঢাকুরিয়া, হালতু ও কসবা অঞ্চলে সমাজবিরোধীদের পুনরায় হামলা। হামলার ফলে নস্করপাড়া (হালতু) বাজারের ভিতর এলাকায় সুপরিচিত ও জনপ্রিয় নেতা কমরেড বিমল ঘোষ নিহত।

নির্বাচনের পরবর্তী দিনগুলি বয়ে আনল সোনারপুর এলাকায় একটানা জুলুমের অভিজ্ঞতা। মারধর, গ্রেফতার, হুমকি ও জোর করে অর্থ আদায়। পার্টির বহু কর্মী ও সমর্থক বাড়িছাড়া। এলাকার পরিচিত সি পি এম-এর লোকজনদের নাম ধরে খোলাখুলি বলা হচ্ছে : কাউকে বাড়ি আসতে দেব না—এলে লাশ পড়ে যাবে। জানা গেল কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা মিলে একটা কমিটি করেছে। সেই কমিটির অনুমতি ছাড়া নাকি কেউ আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। গুণ্ডাদের উৎপাতে হরিনাভি স্কুল, রাজপুর বিদ্যানিধি স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক স্কুলে যেতে পারছে না। রাজপুর পৌরসভার তিনজন কর্মচারীকে আর কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা হুমকি দিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর সম্পাদক অমিয় ভট্টাচার্যকে গুণ্ডারা মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

সুভাষগ্রাম স্টেশন অঞ্চলে যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে যখন তখন পেটানো হচ্ছে। দিন চারেক আগে দীপক কানুনগো নামে এক ছাত্রকে ধরে গুণ্ডারা পিটিয়েছে।

দুর্গাপুর : স্যাক্সবি হুইল কারখানার গেটে পার্টিকর্মী যোগেন দাস, হরিপদ চক্রবর্তী ও বিমল ব্যানার্জিকে কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট গুণ্ডারা প্রচণ্ড মেরেছে। পার্টি সমর্থকদের ভয় দেখানো হচ্ছে—গুণ্ডারা তাদের চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়াবে বলছে।

শিলিগুড়ি : শহরের রাস্তায় প্রকাশ্যে ও বাড়িতে ঢুকে মার্কসবাদী কর্মীদের উপর কংগ্রেসী গুণ্ডারা সমানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

বীরভূম : জেলার নানা জায়গায় বিজয়োৎসবের নামে কৃষকদের মারধর ও সাজানো মামলায় হয়রান করা হচ্ছে।

আরও দুঃসহ অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত পরে বলা হবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে, ১৯৭২-এর নির্বাচন ও তার পরের দিনগুলিতে যা ঘটে গেল— সে অভিজ্ঞতার দোসর নেই সারা ভারতে কোথাও। প্রতিবাদে মুখর হল না অন্য রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। অলোক মজুমদারের মতে, পার্টির প্রধান দুর্বলতা এইখানে— গোটা ভারতকে পশ্চিমবাংলার পাশে আনা সম্ভব হল না।

১৮ মার্চ '৭২, এক বিবৃতিতে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আমরা এই বিধানসভায় যোগদান করব না। ফ্রন্টের কোনো সদস্য শপথও নেবেন না। কারণ গোটা রাজ্যের নির্বাচনে পুরোপুরি জালিয়াতি হয়েছে।'

প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রসঙ্গত বলেন, বিধানসভায় যোগ দেব না মানে এই নয় যে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র পরিত্যাগ করছি। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯.৩.৭২)

এই পটভূমিতে ১৯ মার্চ পশ্চিমবাংলার জনগণের উদ্দেশে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে আরও 'কঠিন অগ্নিপরীক্ষার' জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, জাল নির্বাচনের পর এ রাজ্যে জনগণের উপর নেমে এসেছে নৃশংস আক্রমণ। গণতন্ত্র হত্যার এই অভিযান পশ্চিমবাংলার মানুষ নিঃশব্দে মাথা পেতে মেনে নিতে পারে না। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের আরও আত্মত্যাগ করতে হবে। নির্যাতন সহ্য করতে হবে। কিন্তু অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ পশ্চিমবাংলার মানুষ করবে না।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতী কৃষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র যুবক ও সমস্ত গণতন্ত্র-প্রিয় মানুষের কাছে আমাদের আবেদন—ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের মোকাবিলা করুন। ফ্যাসিবাদী জল্লাদরাজের বিরুদ্ধে এক হয়ে রুখে দাঁড়ান। যে কোনো বিপদই আসুক না কেন, আমাদের পার্টি জনগণের পাশে থাকবে, বামপন্থী ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করবে ও ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে আরো ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

সমস্ত বামপন্থী পার্টির বিরুদ্ধেই আক্রমণ চলছে, কিন্তু আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। হাজার হাজার কর্মী ও দরদী আজ কঠিন বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছে। হিংস্র শত্রুর আক্রমণে যাদের রক্ত ঝরছে, যারা নির্যাতিত হচ্ছেন, যাদের জীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, যারা বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী তাদের সহজ সান্ত্বনা দিয়ে আমরা অপমান করতে পারি না, তাঁদের সহযোদ্ধার অভিবাদন। আমাদের কর্মী ও দরদীদের কাছে আহ্বান— জনগণের উপর আস্থা রেখে শান্তভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন, নতুন অবস্থার উপযোগী নিজেদের শক্তির পুনর্বিন্যাস করুন, সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক ঐক্যকে মজবুত করুন এবং ব্যাপক জনগণের আন্দোলন সংগঠিত করুন।

- জাল ও অবৈধ নির্বাচন বাতিল হোক
- ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ধ্বংস হোক
- বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ
- কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) জিন্দাবাদ

প্রসঙ্গত *গণশক্তি* (৫.৪.৭২)-র সংবাদসূত্রে জানা যায়, গত ২০ দিনে বামপন্থী ফ্রন্টের ২৪ জন কর্মী নিহত, হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া ও অন্তত দশ জন নিখোঁজ। ইউনিয়ন অফিস বেদখল ও পার্টি অফিস পুড়ে ছাই। কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং—সর্বত্র একই চিত্র। বামপন্থী বিরোধী দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে কংগ্রেস শাসক দল ও সরকার হিংস্র আক্রমণ

চালাচ্ছে।

এমনকি গরীব হকারদেরও রেহাই নেই। একদল সশস্ত্র কংগ্রেসী শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে হকারদের উপর চড়াও হয়ে *বাংলাদেশ* ও *দর্পণ*-এর কপিগুলি কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বামপন্থী দলের কাগজ বা সাময়িকপত্র বিক্রি করার অপরাধে কয়েকজন হকারকে বেদম মার দেয়া হয়। একজন কিশোর বয়সী হকার গুরুতর আহত।

একই 'অপরাধে' উত্তর কলকাতার হাতীবাগান অঞ্চলের মায়া বুক স্টল বিধ্বস্ত। হিটলারের প্রেত যেন কলকাতা জুড়ে টহল দিচ্ছে। প্রেতচ্ছায়ার প্রভাব থেকে শিক্ষা ও শিক্ষক— কারও মুক্তি নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন পঠন-পাঠন বিঘ্নিত, সেখানেও প্রতিষ্ঠিত ত্রাসের রাজত্ব। হাওড়া জেলার বালি ও লিলুয়া থানার স্কুলগুলি সংকটাপন্ন। বালি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্দা, দুর্গাপুর, সাঁপুইপাড়া, আনন্দনগর প্রভৃতি স্কুলে অরাজক অবস্থা। লিলুয়া থানার বামনগাছি ও ভট্টনগর অঞ্চলের স্কুলগুলিও অচল হবার উপক্রম। ১৯৭১-এর নভেম্বর থেকেই গুণ্ডাবাহিনীর হামলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তটস্থ। যাঁরা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি অথবা নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য, তাঁদের অধিকাংশই এলাকাছাড়া। যাঁরা হুমকি সত্ত্বেও স্কুলে যাচ্ছিলেন, নির্বাচনের পর তাঁদের উপর শুরু হয়েছে প্রচণ্ড অত্যাচার। রিভলবার দেখিয়ে ও ছোরা বুকে ঠেকিয়ে কংগ্রেসী গুণ্ডারা বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে পদত্যাগপত্র আদায় করে নিয়েছে।

একই ঘটনার পুনরভিনয় রাষ্ট্রীয় পরিবহণে। সেখানেও বামপন্থী শ্রমিক কর্মচারীরা কংগ্রেসী আক্রমণের টার্গেট। *গণশক্তি* (৬.৪.৭২)-র সংবাদসূত্রে জানা যায়, কংগ্রেস-পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নের যোগসাজশে গত ৪ এপ্রিল শতাধিক বহিরাগত লোক গণেশ এভিনিয়ু সিটি অফিস থেকে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কর্মী ও সমর্থক এরকম ২৫ জন কর্মচারীকে অফিস থেকে বের করে দেয়। অনেককে মারধোর করে শাসানো হয় যে, আবার অফিসে এলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের অভিযোগ : নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একজন শ্রমিক খুন, আহত ৩৫ জন ও মোট ১৮৫ জন শ্রমিক কর্মচারী কাজে যেতে পারছেন না।

অলোক মজুমদার বলছেন, লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতারা যেহেতু কাজে যেতে পারছেন না, তার সুযোগ নিল মালিকপক্ষ। বেছে বেছে ইউনিয়নের মুখিয়া। শ্রমিকদের ছাঁটাই করা শুরু করল মালিক। এভাবে ছাঁটাই হয়ে গেলেন জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ১৩-১৪ জন শ্রমিক। তাছাড়া বেঙ্গল ল্যাম্প, স্যাক্সবি ফার্মা, পটারি প্রভৃতি মিলিয়ে সারা কলকাতায় ছাঁটাই হয়ে গেলেন শতাধিক শ্রমিক।

সন্ত্রাসের আবহাওয়া কলকাতার উপকণ্ঠ বরানগর থেকে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বরানগর এশিয়াটিক পেইন্টস্ শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম নেতা সুশীল ঘোষ কাজে যেতে পারছেন না। বেঙ্গল ইমিউনিটি ও ন্যাশশাল কার্বন-এর লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের কর্মীদের রুজি-রোজগারও বিপন্ন। কারখানায় গেলে তাঁরা খুন হয়ে যাবেন। ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী নেপাল আইচ কাজে তো যেতে পারছেনই না, উপরন্তু এলাকার বাইরে।

চিত্ত মৈত্র বলছেন, বরানগর-কাশীপুরে কোনো সি পি এম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এলাকায় থাকতে পারলেন না। সে ফাঁকা জায়গায় চলে এল আই এন টি ইউ সি। আচমকা আক্রমণের মুখে শ্রমিকরা হতচকিত। প্রতিরোধ করতে পারেনি।

ফলে, বি টি রোডের দুধারে ছোট বড় যত কারখানা— সব জায়গায় রাতারাতি লালঝাণ্ডার জায়গায় তেরঙ্গা উড়তে লাগল। শ্রমিকরা আপাতত মেনে নিল জোর জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো অবস্থা নেই।

কিন্তু 'লালদুর্গ' দুর্গাপুরের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে শ্রমিকরা প্রতিরোধ জারি রেখেছে, তাই শাসকদলের আক্রোশ সেখানে মাত্রাহীন চেহারায়। ১৭ এপ্রিল '৭২ দুর্গাপুরের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন : নির্বাচন পরবর্তীকালে দু'জন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সুজিত দাস শর্মা ও অজিত দাস নিহত হয়েছেন। মারাত্মকভাবে জখম শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী। কাজে যেতে পারছেন না বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী। অনেককে মারধর করার পর শাসানো হয়েছে—এরপর কাজে যোগ দিতে এলে লাশ পড়ে যাবে। অনেককে কোয়ার্টার থেকে বার করে দেয়া হয়েছে। শ্রমিকদের আই এন টি ইউ সি-তে যোগ দিতে হবে, না হলে দুর্গাপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যাদের কাজের বাইরে রাখা হয়েছে, কাজে যাবার শর্ত হিসেবে তাদের কিছু খসাতে হবে। টাকার অঙ্ক ক্ষেত্রবিশেষে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ। এবং তার সঙ্গে সই করতে হবে একটি বন্ড। তাতে লেখা : 'আমরা সি আই টি উ-র কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ। এখন ইন্দিরা গান্ধীর মহান আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে আই এন টি ইউ সি-তে যোগ দিতে চাই।' কংগ্রেসীরা এর নাম দিয়েছে 'শুদ্ধিকরণ অভিযান'।

এবার গোটা বর্ধমান জেলার দিকে তাকান যাক। সি পি এম-এর 'শক্ত ঘাঁটি' বর্ধমান জেলা জুড়ে যা চলছে এক নজরে তার বিবরণ :

১. এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন—১২৯৬
২. ইউনিয়ন অফিস বাড়ি জবরদখল—১৫
৩. মিসা ও পি ডি অ্যাক্ট-এ আটক—৩৪৫
৪. জেলে আটক বিচারাধীন বন্দী—৪১০
৫. গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে—৪৬০৮
৬. জামিনে মুক্ত—৪২১৩
৭. পুলিশ ও গুণ্ডাদের আক্রমণে নিহত—১০
৮. হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ—১৬৯
৯. সাজানো মামলায় জড়ানো হয়েছে—১০,০০০

(*গণশক্তি* ১১.৫.৭২)

আবার বর্ধমান জেলার মধ্যে কালনা থানা বিশেষভাবে সন্ত্রাস-কবলিত। প্রায় সাতশ মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মারধর, হুমকি জুলুমবাজি এখানকার প্রতিদিনের ঘটনা। এমনকি মেয়েদের ইজ্জত নিয়েও টানাটানি। ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, সমস্ত এলাকা জুড়ে বিরাজ করছে ত্রাস ও শঙ্কা। আতঙ্ক ছড়াবার জন্য দিনরাত বোমা ফাটানো হচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জুলুম তো ছিলই, তাছাড়া যারা নিরুপায় হয়ে থেকে গিয়েছিল, তাদের দিতে হচ্ছে জরিমানা। নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। জরিমানার টাকা দিতে না পারলে ভোগ করতে হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন। কারা কারা সি পি এম-এর সমর্থক তাদের লিস্ট তৈরি। কারা কারা সি পি এম-এর মিটিং-মিছিলে যেত সেসব পাকা খবরও জোগাড়। অতএব

তাদের উপর চাপ আসছে কংগ্রেসের ফেস্টুন বওয়ার। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তাদের কংগ্রেসের মিছিলে যেতে হচ্ছে। শ্লোগান দিতে হয় 'সি পি এম ধ্বংস হোক।' যারা বাড়ি ছাড়েনি সেসব পার্টি দরদীদের কপালে জুটল চরম দুর্ভোগ।

১১

প্রমোদ দশগুপ্ত জানাচ্ছেন, গত তিন বছরে পার্টির যে ৬৪০ জন কমরেডকে খুন করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মোট ৩১২ জন পার্টি সদস্য, ৭ জন প্রবীণ সংগঠক ও নেতা, ১৫২ জন ছাত্র যুব আন্দোলনের জঙ্গী কর্মী এবং ৭ জন মহিলা আন্দোলনের কর্মী।

হত্যা, গ্রেপ্তার ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও পার্টির শক্তি খর্ব হয়নি। পার্টি কর্মীদের হত্যা করে পার্টি সংগঠন ভাঙা যায়নি। (*গণশক্তি*, ১৪.৬.৭২)

পার্টি সংগঠন অটুট রইল বটে, কিন্তু বদলে গেল গোটা রাজ্যের দৃশ্যপট। সার্বিক সন্ত্রাসের আবহে কোনোরকমে তখন আত্মরক্ষা করে টিকে থাকাটাই সি পি এম-এর পক্ষে বিরাট সাফল্য। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ঘোরালো যখন দেখা যায় ১৭ সেপ্টেম্বর '৭২ বারুইপুরে জ্যোতি বসুর সভা পর্যন্ত বানচাল করে দিল কংগ্রেসীরা। *গণশক্তি* (১৮.৯.৭২) লিখছে : 'কংগ্রেসীরা সভার প্রধান বক্তা জ্যোতি বসু এবং জ্যোতির্ময় বসুর উপর আক্রমণ করে। সভা চলাকালে কংগ্রেসীরা সভামঞ্চ লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে থাকে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।'

জ্যোতি বসু বলছেন, লোকজন খারাপ হয়নি। জ্যোতির্ময় বলছে, হঠাৎ দেখি পনেরো কুড়িটা কংগ্রেসি ছেলে চিৎকার করতে করতে এল। ওদের দেখে লোকেরাও একটু প্যানিকড হলো, আমি জ্যোতির্ময়কে বললাম, আপনি বলুন। এরপর আমি বলতে উঠলাম, পাশেই আটজন রাইফেলধারী পুলিশ, প্লেইন ক্লোথেও কয়েকজন পিছনে হাত রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যেই ওরা মাইকের আর আলোর তার কেটে দিল। অন্ধকার হয়ে গেল। সভার কমরেডরা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। আমি বললাম, করবেন না, তাহলে এই রাইফেলের বুলেট আপনাদের দিকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়বে। বুঝলাম মিটিং আর হবে না। সভা ভেঙে গেল। আমি আর জ্যোতির্ময় গাড়িতে উঠলাম। তখন ওরা আমার গাড়ির ওপর ইঁট মারতে শুরু করল, উইন্ডস্ক্রিন ভাঙল, আমার গায়ে অবশ্য লাগেনি, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের গায়ে লাগল। (*জ্যোতিবাবুর সঙ্গে*)

এই নৈরাশ্যের আঁধারেও রুপোলি ঝিলিকের মতো দু'একটি ঘটনার দেখা মেলে। কল্যাণী স্পিনিং মিল-এর শ্রমিকেরা পথ দেখাল। ঐ কারখানার ৬৭ জন শ্রমিক দীর্ঘদিন কাজে যেতে পারেনি। ১৫ সেপ্টেম্বর '৭২ তাঁরা আবার কাজে যোগ দিতে গেলে, কংগ্রেসীরা কারখানায় ঢুকে শ্রমিকদের উপর লাঠি, লোহার রড, ছোরা ইত্যাদি নিয়ে চড়াও হয়। সেদিন তাঁদের ফিরে আসতে হয়।

পরের দিন ১৬ সেপ্টেম্বর সমস্ত শ্রমিক এক জোট হয়ে কংগ্রেসী সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং মিলকর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে ঐ ৬৭ জন শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে।

এবার রুখে দাঁড়ালেন হিন্দ মোটরের শ্রমিকরা। ২৫ সেপ্টেম্বর '৭২ সকালে একজন শ্রমিককে জোর করে তুলে নিয়ে কংগ্রেস অফিসে আটক রাখা হয়। তারপর শুরু কারখানার গেটের সামনে কংগ্রেসীদের বোমা ও গুলি। বোমায় ও গুলিতে ১৫ জন শ্রমিক আহত হন। সাথে সাথেই শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসেন। তারপর শুরু তিন হাজার শ্রমিকের বিরাট বিক্ষোভ মিছিল। কংগ্রেসীরা তখন দ্রুত পলায়ন করে ও আটক শ্রমিককে ছেড়ে দিতে õfrÉýûþ •*গণশক্তি*, ১৬, ১৭, ২৬ সেপ্টেম্বর '৭২)

সেপ্টেম্বর থেকে পরিস্থিতি একটু অন্যরকম : আবার আন্দোলনের পথে পা বাড়াচ্ছে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ।

১২ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ছোটবড় প্রায় দু'হাজার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার চারলক্ষ শ্রমিক পাঁচদফা দাবিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নই এই ধর্মঘটে সামিল। (*গণশক্তি*, ১৩.৯.৭২)

গ্রামাঞ্চলেও আবার নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায়। সস্তা দরে খাদ্য, খাজনা ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে মিছিল জেলায় জেলায় আবার চোখে পড়ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিছিলে, উলুবেড়িয়ায় ২৪ সেপ্টেম্বর, প্রায় চারহাজার মানুষ সামিল। নির্বাচনের পর এই প্রথম।

গণশক্তি-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে '৪ঠা অক্টোবর' দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম বামপন্থী জোটের ডাকে শহীদমিনার ময়দানে লক্ষ মানুষের জমায়েত কলকাতা ও জেলাগুলি থেকে হাজার হাজার মানুষ সামিল। মূল্যহ্রাস, কাজ, পর্য্যাপ্ত রিলিফ ও সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে এই জমায়েত।

১২

১৯৭৩ সাল। চরম সংকটের মধ্যে দিনযাপন করছেন শিল্পী বিজন চৌধুরী। ১৯৭০ সালে বালিতে কংগ্রেস-নকশাল যৌথ আক্রমণে তিনি ঘরছাড়া, ভেসে বেড়াচ্ছেন এখান থেকে ওখানে। চাকরিটি গিয়েছে। গৃহচ্যুত কর্মচ্যুত বিড়ম্বিত বিজন চৌধুরীর জীবনে আবার বিপর্যয়। ১৯৭৩ সালে ঘটল স্ত্রী-বিয়োগ। আক্ষরিক অর্থেই বিপর্যস্ত বিজন কিন্তু হার মানেননি। মানুষ হতাশ হতে পারে, এমন কিছু আঁকবেন না তিনি। ছবির নান্দনিক সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে এঁকে চললেন সভা, মিছিল ও শৃঙ্খলিত রাজবন্দীদের ছবি। জন্ম নিল তাঁর অসামান্য সৃষ্টি—*Falling Heroes* সিরিজের ছবিগুলি। বীরের পতন। ভূপতিত কিন্তু অপরাজিত। তারা যুদ্ধ করে বাঁচতে চায়। রঙ ও রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছবির ক্যানভাস জুড়ে সম্ভোগ—দোতারা বাজিয়ে গান—মানুষের দুর্দম আবেগের আবহ। শেষ ছবিটি আট ফুট লম্বা। আবার ফিরে আসছে তারা এবং সারেঙ্গি বাজিয়ে একজন নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের। পটভূমিতে এক মস্ত বড়ো সূর্যমুখী ফুল। আর এক আরম্ভের দিনের ইশারা।

আর এক আরম্ভের প্রতীক্ষায় রয়েছে সেই সাঁওতাল মেয়েটিও। বিশ্বভারতীর প্রবীণ অধ্যাপক সন্তোষ বসু বলছেন : অধ্যাপক উপেন দাসের কাজের মেয়েটি ভোটের পর থেকে আর আসছে না। সেদিন সকালে আসতেই উপেন দাস বলে উঠলেন—কিরে মেঝেন, তোরা তো হেরে গেলি। ঘর ঝাড় দিতে দিতে সাঁওতাল তরুণীর জবাব, 'আবার হবে।' মৃদু অথচ দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। সন্তোষ বসু ও উপেন দাস দুজনেই হতচকিত।

একটা লড়াই-এ হেরে গেলেও যুদ্ধ তো থামেনি। অতএব আর এক দফা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে হবে, যেহেতু দেশজুড়ে আবার আকাল। চাল ডাল গম তেল নুন সব কিছুরই আকাশছোঁয়া দাম। শ্রমিক কৃষকের তো কথাই নেই, মধ্যবিত্ত কেরানীরও নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা।

তারই পটভূমিতে ২৭ জুলাই '৭৩ পশ্চিমবাংলায় বন্‌ধ ডাকা হয়। শাসকদলের শরিক হওয়া সত্ত্বেও বন্‌ধের ডাক দিয়েছে সি পি আই। তারপর তাতে যোগ দিয়েছে সি পি এম এবং বন্‌ধ বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। অতএব কংগ্রেসী ঠ্যাঙাড়েরা স্রেফ পিটিয়েই বন্‌ধ ব্যর্থ করে দিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্যি চোখরাঙানিতেই কাজ হল।

আনন্দবাজার (২৮.৭.৭০) লিখছে : পশ্চিমবঙ্গে এবার বন্‌ধ ব্যর্থ হল, কিছুই অচল হয়নি। বন্‌ধের দিনে কলকাতায় ট্রাম বাস ট্যাক্সি রিক্সা সবই চলেছে। খোলা থেকেছে দোকানপাট, বাজারহাট, সিনেমা স্কুল, হাজিরা পড়েছে অফিস কাছারি কারখানা আদালতে, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠও ছিল সরগরম।

এই প্রথম একটি বন্‌ধ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেল।

সি পি আই-এর পক্ষে শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের ভীতিপ্রদর্শন ও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের ফলে তাঁদের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, ট্রামবাস জোর করে চালানো হয়েছে। দোকানপাট যা খুলেছে তা ভীতিপ্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের ফল। গত দু'দিনে তাঁদের পাঁচশতাধিক কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন, বন্‌ধ বানচাল করতে কংগ্রেস এদিন সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে।

৩১.৭.৭৩ : আতঙ্ক ও ভয় এখনো চেপে রয়েছে। তবে নানা জায়গায় তাকে কাটিয়ে ওঠার খবরও শোনা যায়। কলেজে কলেজে হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও বন্‌ধের দিন বেশির ভাগ কলেজে শিক্ষকরা আসেননি। আমাদের কলেজে [রিষড়া বিধানচন্দ্র কলেজ] দিনের বেলায় একজনও আসেন নি। (আমার ডায়েরির পাতা থেকে ঃ)

একটুখানি ঢেউ তুলে আবার নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহ। এক বদ্ধ জলাভূমি। পাড়ায় পাড়ায় যুব কংগ্রেসের রাজত্ব আর কলেজে কলেজে ছাত্রপরিষদের দাপাদাপি। ওদের মিছিলে সাধারণ ছাত্রদের যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, না হলে বিপদ। এরকম একটা মিছিল এড়াবার জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলেজ লাইব্রেরিতে লুকিয়ে থাকতে হয়। বিরোধী রাজনীতির ছাত্ররা মাথা তুলতেই সাহস পেত না। তাদের শায়েস্তা করার জন্য বহিরাগতরা চলে আসত। এরকম একদিন 'বাইরের কিছু সশস্ত্র যুবক এসে স্কটিশ চার্চ কলেজের একটি ছাত্রকে টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছিল.....অধ্যাপিকা কেয়া চক্রবর্তী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শাড়ি প্রায় খুলে যাওয়া সত্ত্বেও ছাত্রটিকে পক্ষীশাবকের মতো বুকে জড়িয়ে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচায়।' (*কেয়ার বই,* পৃ. ৪০৬)

শিক্ষাজগতের সমসাময়িক চিত্র যখন গণটোকাটুকি, শিক্ষক-লাঞ্ছনা ও পরীক্ষার নামে প্রহসন তখন ক্রমশই কেয়ার কাছে নিজের ভূমিকাটি হাস্যকর রকমের বাতিল ও অকেজো মনে হতে থাকে। (*কেয়ার বই*, পৃ. ৪২৪)

এই তো সময় যখন সংবেদনশীল মানুষমাত্রেই অসহায়। রামরমণ ভট্টাচার্য আর গল্প লিখতে পারছেন না। কারণ, সেই রাজপথ-কাঁপানো মিছিল আর চোখে পড়ে না। 'শোভাযাত্রা বেরুলে, ঘরে থাকতে পারতাম না'—বলছেন রামরমণ, 'আহা! সে কি যে রোমাঞ্চের দিন ছিল।'

এখন আর এক সময়। (আমার ডায়েরির পাতা থেকে : ১১.১১.৭৩। দীর্ঘকাল পর আজ শোভাবাজার গেলাম। মানুষ ঘাড়নিচু করে রাস্তা দিয়ে চলেছে। মিইয়ে যাওয়া মানুষ। নির্জীব শান্তির জগতের বাসিন্দা সবাই। সমস্ত অশান্তির শেকড় উপড়ে ফেলে সশস্ত্র বাহিনীর আউটপোস্ট বসেছে। ওয়াচ টাউয়ার থেকে অতন্দ্রপ্রহরী রাস্তার উপর নজর রাখছে। হাটখোলা পোস্ট অফিস-এর গায়ে আর কোনও সত্য মিত্র ওয়াল পেপার সাঁটবে না। রুশ বিপ্লব চীন বিপ্লব ভিয়েতনাম—কোনো প্রতীক কোথাও প্রকাশ্যে চোখে পড়ে না। হাটখোলা পোস্ট অফিস-এর দেয়াল এসবই একদিন বুকে ধরে রাখত। কোথাও একটা পোস্টার বা ওয়ালিং নজরে আসে না। সবই লেপা পোঁছা সাদা।

রাস্তা দিয়ে রাসবিহারী চলে গেল। যন্ত্রণায় কুঞ্চিত মুখের চামড়া। ২৬-২৭ বছর আগে জোরালো গলায় শ্লোগান দিত সে। বুড়িয়ে গেছে রাসবিহারী। তার যৌবনের বিনিময়ে পৃথিবীতে যৌবন এল না।)

১৩

১৯৭৪ সাল। বছরের গোড়া থেকেই রাজনৈতিক দৃশ্যপট যেন দ্রুত বদলাচ্ছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একক লড়াইয়ে পশ্চিমবাংলা যখন ক্ষতবিক্ষত তখন খবর আসছে লড়াই শুরু করেছে গুজরাট ও বিহারের মানুষ। ভিন্নতর রণাঙ্গন কিন্তু একই পটভূমি।

ইন্দিরার দেবী-মহিমায় চিড় ধরেছে। 'গরিবী হটাও' শ্লোগান এক বৃহৎ ধাপ্পায় পরিণত। জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রোজই। গরীবের জীবন দুর্বিষহ। অপরদিকে বিড়লাদের আমানত ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ২৭১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪৮০ কোটিতে দাঁড়ায়, আর ১৯৭৩-এ সেটা দাঁড়ায় ৬০১ কোটি টাকায়। সেইসঙ্গে কালোবাজারি ও মজুতদারি দেশের অর্থনীতিতে জাঁকিয়ে বসেছে। অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন : গরিবি হটাও-এর বদলে গরিবরা সঙ্কট থেকে গভীরতর সঙ্কটে পরিশেষে নিশ্চিহ্ন হবার মুখোমুখি। তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এখানে সেখানে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, ধর্মঘট, সংগ্রামের রূপ নিল। এই সংগ্রামের মুখ্যপ্রাঙ্গণ প্রথমে গুজরাট, পরে বিহার। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮ জুলাই '৯৩)

গুজরাট। বিক্ষোভের বারুদে যেন হঠাৎ হঠাৎ বিস্ফোরণ। ১৯৭৪ সালের গোড়া থেকেই গোটা রাজ্যের জনগণ নবনির্মাণ সমিতির ডাকে বিক্ষোভে উত্তাল। 'থালি বাজাও'-এর ডাক দিল নবনির্মাণ সমিতি। থালি বাজিয়ে প্রতিবাদ জানানো এক ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি। প্রতিবাদী

আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী নামে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি '৭৩, ভুখা মিছিলের উপর সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ৫ মার্চ আবার পুলিশ গুলি চালায়। দু'দফায় বহু লোক হতাহত। অন্দোলন স্তব্ধ হয়নি। উপরন্তু বিধানসভা ভেঙে দেবার দাবি ওঠে, 'দিল্লী চলো' ডাক দেয়া হয়। জনগণের আক্রোশ এবার ফেটে পড়ে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস বিধায়কদের বিরুদ্ধে। তাদের মাথা ন্যাড়া করে মুখে কালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়ানোর চেষ্টা পর্যন্ত চলে। ১৬৮ জন এম এল-এ-র মধ্যে ৯৫ জন পদত্যাগ করেন, বিধানসভা ভেঙে দেবার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট করেন ১২ মার্চ। ১৫ মার্চ বিধানসভা ভেঙে দেয়া হয়; রাষ্ট্রপতি-শাসন আগেই বলবৎ করা হয়েছিল।

গুজরাট বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি বামপন্থী মহলে। সাধারণ মানুষজনেরও গুজরাটের আন্দোলন সম্পর্কে কৌতূহল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বিহার কিন্তু পশ্চিমবাংলার জনচেতনায় সাড়া জাগাল, গুজরাট যা পারেনি।

(ডায়েরির পাতায় লিখেছিলাম : ২১.৩.৭৪ : বিহার। বিহারের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরছে। বিহারের কথা ওঠাতে বাসের যাত্রীর মুখে একগাল হাসি। অসহ্য এক গুমোটের অবসান হতে চলেছে যেন।)

সত্যিই তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে বিহারের ছাত্র-যুব বিদ্রোহ। সত্যিই কি আবার পালা-বদলের দিন আসছে ? যুবশক্তির আকস্মিক বিস্ফোরণ এবং সরকারি দমননীতির প্রচণ্ডতায় এক অচেনা বিহারের আত্মপ্রকাশ। অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন : '১৬ মার্চ ১৯৭৪, বামপন্থী ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের সূচনা। দাবিগুলির অন্যতম ছিল শিক্ষা-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকার সমস্যার সমাধান। ১৮ মার্চ তারা বিধানসভা অভিযানের কার্যক্রম নেয়, ওই দিন ছিল প্রথম অধিবেশনের তারিখ। যুবকগণ বহুস্থানে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। ৫ ঘণ্টা ধরে সমগ্র পাটনা শহরে চলে লুঠতরাজ, আগুন, সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, গুলি। দুপুর দুটো থেকে রাজধানীতে ১৯ ঘণ্টার জন্য কার্ফু, রাস্তায় নামে সেনাবাহিনী। গুলিতে নিহত ৫, আহত ২০। আহতদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী, এম. এল. এ, এম. এল. সি. অফিসার, পুলিশ, ছাত্র, যুবক, মহিলা। বিধানসভার অভ্যন্তরে গুলি চলে, মন্ত্রীরা আক্রান্ত হন। *সার্চলাইট* পত্রিকার অফিস ও ছাপাখানা বিক্ষোভকারীরা পুড়িয়ে দেয়। মদের দোকান, পেট্রল পাম্প, রেলের গুদাম, হোটেল, রেলের ওয়াগন ইত্যাদি লুঠ হয়। পরদিন সমস্ত রাজ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী দু-তিন দিনে পাঁচটি রেল স্টেশন আগুনে ভস্মীভূত হয়, পুলিশের গুলিতে আরও ১০০ জন মারা যায়, জখম হয় ৩১ জন। পাটনা, বিহারশরিফ, রাঁচি, গয়া, মুঙ্গের, ছাপরা ও বেতিয়ায় কার্ফু বলবৎ হয়। ২৩ মার্চ ডাকা হয় বিহার বন্‌ধ। এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে পুলিশের গুলিতে আরও ৮ জন নিহত হয় ও ১২ জন জখম হয়। সরকারী কাজকর্ম ও প্রশাসন অচল করার কার্যক্রম পূর্ণবেগে চলতে থাকে মাসের পর মাস। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৮ জুলাই '৯৩)

১৪

শ্রমিক-কর্মচারী মহলেও প্রবল অসন্তোষ। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপ সমাজের নিচুতলার মানুষের পক্ষে দুঃসহ। তার পরিণতিতে সারা ভারত রেল ধর্মঘট। প্রসঙ্গত, চৌদ্দ বছর পরে ৮মে ১৯৭৪ আবার ঘটতে চলেছে। জুলাই, ১৯৬০-এর সারা ভারত কেন্দ্রীয় সরকারি ধর্মঘট চলেছিল মাত্র চারদিন। দেশজোড়া অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, গুজরাট ও বিহারের গণ-অভ্যুত্থান সব মিলিয়ে ১৯৭৪-এর রেল ধর্মঘটের চালচিত্র। তাই রেলশ্রমিক সংগ্রাম ঘিরে গোটা দেশ তোলপাড়। শাসকদল ও সরকারের দৃষ্টিতে রেল ধর্মঘট তাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধ। অতএব ধর্মঘটের মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিলেন সরকার। তার কথায় পরে আসছি।

'৭৪-এর রেল ধর্মঘটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একমাত্র আই এন টি ইউ সি ছাড়া সমস্ত ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিক একজোট। আর অ-কংগ্রেসী যাবতীয় রাজনৈতিক দলের সমর্থন রয়েছে রেলশ্রমিক সংগ্রামের প্রতি।

রেলশ্রমিকদের মূল দাবি : আপাতত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে অবিলম্বে রেল শ্রমিকদের তার সমহারে বেতন দেওয়া হোক; বোনাস; কাজের সময় সর্বক্ষেত্রে অনধিক আটঘণ্টা; ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংক্রান্ত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার। রেলশ্রমিক নেতা কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন : জাতীয় সম্মেলনের পর থেকে সমগ্র রেল শ্রমিক যে কোনো মূল্যে এই দাবি আদায়ের দুর্জয় সঙ্কল্পে অবিচল ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বহুধাবিভক্ত রেলশ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতম ঐক্যের সৃষ্টি হয়। একমাত্র আই এন টি ইউ সি-ভুক্ত এন এফ আই আর ছাড়া সমস্ত ছোট বড় রেলশ্রমিক ইউনিয়ন সম্মেলন থেকে গঠিত 'ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব রেলওয়েমেন্‌স স্ট্রাগল' বা সংক্ষেপে বিখ্যাত এন. সি. সি. আর. এস-এর মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য এতে সামিল হয় অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন যা ১৯৭৩-এ দুবার সফল ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়েছিল। এন. সি. সি. আর. এস-এর কেন্দ্রীয় অ্যাকশান কমিটিতে দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশিষ্ট নেতারাও সামিল ছিলেন। যদি ব্যাপকতম ঐক্যের মঞ্চ হিসাবে এন. সি. সি. আর. এস. গড়ে না উঠত, তবে কুড়ি দিনেরও অধিককাল এ ধর্মঘট চালিয়ে এক নয়া ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হত না।

এই প্রথম সতের লক্ষ রেলকর্মী একটি মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৮ মে ধর্মঘটে সামিল হতে যাচ্ছেন। ভোর ছ'টায় ধর্মঘট শুরু এবং চলমান ট্রেন পরবর্তী মেন স্টেশনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাবে।

৮ই মে '৭৪ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র সংবাদ শিরোনাম:

দুপক্ষই অনড় : আজ থেকে রেলের চাকা বন্ধ।

রেলমন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্র যথারীতি হুমকি দিয়েছেন : এখনও সময় আছে। ধর্মঘটের নোটিশ তুলে নিন। ঝাঁপ দেবেন না। কিনারা থেকে ফিরে আসুন। ধর্মঘট হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে

না। ১৯৬০-এর মতো এবারেও তা আপনা থেকে ভেঙে যাবে। আমরা ট্রেন চালাব।

রেল বোর্ডের এক মুখপাত্র বলেছেন, প্রয়োজন হলে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে। দরকার হলে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। রেললাইন পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। •*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৮.৫.৭৪)

আয়োজনের কোনো খামতি নেই। শংকরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : ধর্মঘটের মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও রেলপথ পাহারার কাজে বি. এস. এফ, আর. পি. এফ, টেরিটোরিয়াল আর্মি ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। তাছাড়া রয়েছে রাজ্যগুলির নিজস্ব পুলিশ বাহিনী। অর্থাৎ সবশুদ্ধ মিলিয়ে ৪০ লক্ষ সশস্ত্র শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হয়েছে রেল ধর্মঘটীদের শায়েস্তা করার জন্য। (*The Historical Railway Strike*)

সতেরো লক্ষ ধর্মঘটী বনাম চল্লিশ লক্ষের সশস্ত্রবাহিনী! এ প্রসঙ্গে স্টেটসম্যান (৮.৫.৭৪) মন্তব্য করে যে, এর আগে কোনোও শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে সরকার এরকম কঠোর মনোভাবের পরিচয় দেয়নি।

রেল ধর্মঘট ভাঙার আয়োজন যে প্রায় যুদ্ধকালীন অবস্থায় পৌঁছেছে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল খড়্গপুরেই মোতায়েন এক হাজার টেরিটোরিয়াল আর্মির লোক! হাওড়ায় পাঁচ হাজার যাত্রীবাহী কামরা পুলিশ বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। খড়্গপুরে তাঁবু খাটাবার জন্য তিন কোটি টাকার শুধু তেরপলই কেনা হয়েছে। (*পীপ্‌ল্‌স ডেমোক্র্যাসি,* ৫ মে ১৯৭৪)

সরকারই প্রথম আক্রমণ শুরু করে। চূড়ান্ত আলাপ আলোচনার বৈঠক বসার সাতঘণ্টা আগেই ২ মে ভোর রাত্রিতে রেলশ্রমিক নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ, পি. কে. বরুয়া. এইচ. এস. চৌধুরী ও ৩০০ জন রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য নৃসিংহ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি, পরোয়ানা জারি করা হয়।

শংকরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া। লখনউ ও বরোদা ডিভিশনে কলম ধর্মঘট, গোটা গুজরাট রাজ্যে তাৎক্ষণিক রেল ধর্মঘট। তিরুনেভেলিতে রেল ইঞ্জিনের আগুন ও জল ফেলে দেয়া হল। ফিরোজপুর, পাঠানকোট, গয়া ও ঝাঁসিতে রেলের বুকিং অফিস বন্ধ। বেরিলি, আমেদাবাদ ও অমৃতসরের শতকরা ৮০ জন রেলশ্রমিক সেদিন থেকেই ধর্মঘট শুরু করে দিল। অনেক জায়গায় শ্রমিকেরা রেলপথের উপর বসে পড়েন।

সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণের বিরুদ্ধে ৩ মে '৭৪ দিল্লীতে সি পি আই, সি পি এম, আর এস পি, এস ইউ সি ও এস. পি— সবশুদ্ধ পাঁচটি বামপন্থী দল হরতাল ও ধর্মঘটের ডাক দেয়। জনসংঘ জনসভা করে, ধর্মঘট নয়।

সরকারের তরফ থেকে আক্রমণ ক্রমশ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। ধর্মঘট ৮ মে '৭৪ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর আগেই সরকার ধর্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করতে চাইল। শুরু হল বেপরোয়া ধরপাকড়। দেখা যাচ্ছে, ৭ মে পর্যন্ত ৬০০০ রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে :

পশ্চিমবঙ্গ	১৮০০
গুজরাট	১৩২৩
যুক্তপ্রদেশ	৭৮০
তামিলনাড়ু	৩৭০

মধ্যপ্রদেশ	৩০০
পাঞ্জাব	২৭৬
অন্ধ্র	২১০
মহারাষ্ট্র	১৭৪
হরিয়ানা	১৫৫
উড়িষ্যা	৭৩
কর্ণাটক	৫১

বরখাস্ত হয়েছেন :

উত্তর রেল—৬০	দক্ষিণ রেল—৪০
পশ্চিম রেল—১৮	দক্ষিণ-মধ্য—১২
পূর্ব রেল—৪০	দক্ষিণ-পূর্ব—৪১

১৫

৮ মে '৭৪-এর রেল ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে, ৯ মে থেকে দেশের সব ডাকঘরে মনি অর্ডার, রেজিস্ট্রি চিঠি, পার্শেল ও অন্যান্য জিনিস পাঠানো বন্ধ রাখা হবে বলে এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে।

৮ মে '৭৪ ডায়েরিতে লিখেছিলুম : রেল ধর্মঘট শুরু হয়েছে। হাজার হাজার মাইল নিস্পন্দ অজগরের মতো রেলপথ আর ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে অলস বগী আর ইঞ্জিন—যখন কল্পনায় ভেসে ওঠে, তখনই মনে হয় বিরাট কিছু ঘটছে।

সি আর পি, জি আর পি, মিলিটারি, মিসা, ডি আই আর সবই তো আছে। কিন্তু এসবের তোয়াক্কা না করে লক্ষ লক্ষ মানুষ কেমন ঝাঁপ দিল। ... শিয়ালদহ স্টেশন। এ যে সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। কোথায় সেই হাজার হাজার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো মানুষেরা ... কোথায় গেল সেই ইউনিফর্ম-পরা টিকিট চেকার আর হরেক রকমের রেলের লোক! প্রায় নির্জন চাতাল—যাত্রী-শূন্য প্ল্যাটফর্ম। কোনও ট্রেন ছাড়েনি, কোনও ট্রেন আসেনি।

প্রথম দিন থেকেই সরকারের দ্বিমুখী অভিযান। ধর্মঘট ব্যর্থ— ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক—এই প্রচার। আর রেল কলোনি থেকে ধর্মঘটী রেলকর্মীদের সপরিবারে উচ্ছেদ। প্রচারাভিযানের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থাকে ভাড়া করা হয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ইউ এন আই-এর খবর : আকাশবাণী ও টেলিভিশনে রেল ধর্মঘটের সংবাদ যেভাবে পরিবেশিত হচ্ছে, আকাশবাণীর স্টাফ আর্টিস্টস্ ইউনিয়ন তার প্রতিবাদ জানিয়ে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী, আই কে গুজরাল সমীপে একটি পত্র দিয়েছেন। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১০.৫.৭৪)

দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে গ্রেপ্তার, বরখাস্ত ও সাসপেনশনের পাশাপাশি রেল কোয়ার্টার থেকে উচ্ছেদ। পাইকারি উচ্ছেদের ঘটনার তালিকায় রয়েছে বোম্বাই রেল কলোনি, নিমপুরা,

খড়গপুর ও কাঁচড়াপাড়া রেল কলোনি। বিশেষ করে কাঁচড়াপাড়ায় ধর্মঘটী পরিবারের মেয়েরা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। (পরিশিষ্ট ২ দেখুন)

রেলশ্রমিক পরিবারের মেয়েদের সংগ্রামী ভূমিকা রেল ধর্মঘটের এক গৌরবোজ্জ্বল দিক। দিল্লীতে সরকারের অনুগত রেলকর্মীদের কপালে সিঁদুর ও হাতে বালা পরিয়ে দেয় ধর্মঘটী শ্রমিক পরিবারের মেয়েরা। কানপুর থেকে পি টি আই সংবাদ দিচ্ছেন : আনকারজংগ স্টেশনে ধর্মঘটী কর্মীদের ৫০ জন স্ত্রী তাঁদের শিশুদের কোলে নিয়ে তাঁদের স্বামীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৩.৫.৭৪)

রেল ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের কনফেডারেশন ১০ মে '৭৪ থেকে ধর্মঘটী রেলকর্মীদের প্রতি সহানুভূতি ও সংহতি জানানোর জন্য ডাক-তার-ফোন সহ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন : ধর্মঘটে অংশ নিলে ভারতরক্ষা বিধিতে শাস্তি দেওয়া হবে।

রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির নয় জন নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন বলে কমিটির সভাপতি কে. জি. বসু *আনন্দবাজার*-কে জানান। আয়কর, অডিট, কাস্টমস, ডাক-তার ও টেলিফোন ইত্যাদি সব মিলিয়ে লক্ষাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি পশ্চিমবাংলায় কর্মরত। রেলকর্মীদের সমর্থনে ডাকা ধর্মঘট ১২ মে '৭৪ তুলে নিতে হয়। তবে ১৫ মে দেশ জুড়ে অনশন ও সমাবেশের আয়োজন করে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি যে 'সংহতি অভিযান' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত কে. জি. বসু, দীপেন ঘোষ ও পুষ্পেন্দু সেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি ধর্মঘটের সূত্রে ১০ মে '৭৪ গ্রেপ্তার হন।

রেল ধর্মঘটের 'সংহতি অভিযানে' সামিল এ আই টি ইউ সি, সিটু, ইউ টি ইউ সি, হিন্দ মজদুর সভা, ভারতীয় মজদুর সভা, প্রতিরক্ষা কর্মচারি ফেডারেশন ও ফুড কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মী সংঘ সমর্থন জানাল রেলকর্মীদের দাবিসনদকে।

আকাশবাণীতে বিকৃত সংবাদ প্রচারের কঠোর সমালোচনা করেছেন বোম্বাই সাংবাদিক ইউনিয়ন।

মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার শ্রমিকরা 'সংহতি-ধর্মঘট' পালন করেন ১৫ মে '৭৪। একই দিনে বিহারে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয় বিহারের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির ডাকে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির ডাকে ১৫ মে '৭৪, 'ভারত বন্‌ধ-এর'-এর কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি।

কলকাতা ভারত বন্‌ধ-এর দিনে (ডায়েরির পাতা থেকে)

১৫ মে '৭৪। আজ ভারত বন্‌ধ। ট্রাম বাস কিন্তু চলছে। গোড়ায় সব দোকানই প্রায় বন্ধ ছিল বিধান সরণী ও সার্কুলার রোডের। বেলা বাড়তেই বন্ধ দোকান খোলার জন্য জুলুম শুরু। মারধর ও বন্ধ দোকানের তালা ভাঙাও বাদ গেল না। হামলার মোকাবিলায় লোক এগিয়ে আসছে না। অথচ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন রয়েছে হরতালের পক্ষে। গুণ্ডামি যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিচ্ছে— এর বেশি কিছু নয়। একদিন চাকা ঘুরবে এটাই কেবল ভরসা।

১৬

ধর্মঘটের বারোদিনের মাথায় রেল কর্মীদের মধ্যে দোদুল্যমানতার লক্ষণ চোখে পড়ার মতো। ডায়েরির পাতা থেকে :

২০ মে '৭৪। রেল ধর্মঘট এখনও চলছে। ধর্মঘটী প্রতুল পোদ্দার বলছেন, শ্রমিকদের মনোবল অটুট। প্রতুলবাবুর ঘরে আমার মতো মাঝবয়সীদের জমায়েত, সকলেরই ইচ্ছে ধর্মঘটীরা জিতুক। এমন সময় শেয়ালদা সেকশনের গার্ড চিত্তবাবুর প্রবেশ। তাঁর ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থা। বাড়ির লোক, রেল ধর্মঘটের নেতা, স্ট্রাইক-ভাঙা সহকর্মী সবাইকে তারস্বরে খিস্তি করতে লাগলেন। সংশয় জাগল, এরা জিতবে তো? আমাদের ইচ্ছের সঙ্গে জড়িয়ে রইল উৎকণ্ঠা।

দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের বেলায় ধর্মঘটীদের মনোবল ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন বিশেষ করে অত্যাচার যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পশ্চিমবাংলায় নানা জায়গায় ধর্মঘটীদের মারধোর, শাসানি ও অন্যান্য উৎপীড়নের ঘটনা বেড়েই চলেছে। *আনন্দবাজার* (১২.৫.৭৪) লিখছে : বজবজ বালিগঞ্জ সোনারপুর বারুইপুর বেলেঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশ ও একশ্রেণীর সমাজবিরোধী ধর্মঘটী রেলকর্মীদের মারধোর করা শুরু করেছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বনগাঁ স্টেশনে পিকেটিং করার অভিযোগে সি পি আই ও সি পি এম সমর্থক বারোজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। নৈহাটি স্টেশনে রেল ধর্মঘটের সমর্থনে আয়োজিত এক মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

১৭ মে '৭৪ আসানসোল রেলকলোনিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে বক্তৃতারত সি পি এম নেতা রবীন সেন এম পি-কে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাস্থলে গ্রেফতার হয়েছেন সি পি আই নেতা নিরঞ্জন ডিহিদার। ধর্মঘটী রেলকর্মীদের উপর পুলিশী অত্যাচার বেড়েই চলেছে। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৮.৫.৭৪)

১৫ মে '৭৪ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে সোসালিস্ট পার্টির মিছিলটির উপর সমাজবিরোধীরা হামলা চালায়। চারদিক থেকে কেবল হামলার খবর।

তবুও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সমর্থন রেল শ্রমিক ধর্মঘটীদের প্রতি অটুট। ২৪ মে '৭৪ পশ্চিমবঙ্গের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক যৌথ মিছিল রাজভবনের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষক প্রতিনিধিদল ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে এক স্মারকলিপি রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তাঁর সচিবের কাছে পৌঁছে দেন।

২৫ মে গার্ডেনরিচ রেল কলোনিতে আটজন বামপন্থী নেতা প্রশান্ত শূর, শ্যামসুন্দর গুপ্ত, বিমান মিত্র, কলিমুদ্দিন শামস, অশোক ব্যানার্জি, সুনীল দাস, তপন রায়চৌধুরী ও মদন দাস—১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে গ্রেপ্তার হন।

পশ্চিমবাংলায় যখন এই অবস্থা ভারতের অন্যান্য জায়গায় নিশ্চয় রেলধর্মঘটীরা সদয় ব্যবহার পাচ্ছেন না।

শংকরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, ইজ্জতনগরে পুলিশ জোর করে শ্রমিকদের কাজে নিয়ে যায়। পুলিশ শাসায়, নাহলে জেলে যেতে হবে। মোগলসরাই, বেনারস, ইজ্জতনগর ও ঝাঁসি

প্রভৃতি জায়গায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। ১২০০ ধর্মঘটী শ্রমিককে মারতে মারতে গ্রেফতার করে। ৫০০ জনকে জেলে পাঠায়। সমস্ত অঞ্চল বন্দী শিবিরে পরিণত। (*The Historical Railway Strike*)

২৬ মে প্রথমে ডাঙ্গে ও তারপর সমাজতন্ত্রী নেতা এন জি গোরে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

২৭ মে '৭৪। রাষ্ট্রপতি আবেদন জানালেন : রেলকর্মীরা ধর্মঘট তুলে নিন।

ঐ দিনই সংগ্রাম কমিটি বিনাশর্তে রেল ধর্মঘট তুলে নিলেন। ২৮ মে আবার নিয়মিত রেল চলাচল।

২০ দিনের রেলধর্মঘটের পর :

(১) গ্রেফতার ৫০,০০০ (২) কারারুদ্ধ ৩০,০০০ (৩) বরখাস্ত ৬০,০০০ (৪) উচ্ছেদ ৩০,০০০।

২৭ মে *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*-এর অর্থনীতি-ভাষ্যকার লিখছেন : ১৯ দিন রেল ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যা ক্ষতি হয়েছে টাকার হিসেবে সেটা এক হাজার কোটিরও বেশি। এই ক্ষতিপূরণ হতে বহু বছর লাগবে।

ঐতিহাসিক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত। প্রসঙ্গত ধর্মঘট চলাকালীন ১৩ জনের সংগ্রাম কমিটি কখনও জেলের ভেতরে অথবা বাইরে একসঙ্গে বসতে পারেননি। ধর্মঘটের শেষদিন পর্যন্ত ১৫ লক্ষ রেলকর্মী কাজে যাননি। নেতারা যখন ধর্মঘট তুলে নিলেন, তখন তাঁরা মিছিল করে কাজে যোগ দিতে গেলেন। বাইরে পড়ে রইলেন হাজার হাজার সহকর্মী যাদের জন্য তাদের অপরিসীম মনোবেদনা।

এই ধর্মঘট প্রত্যাহার নিয়ে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রবল মতবিরোধ। শংকরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, সিটু, হিন্দ মজদুর সভা, হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত, ভারতীয় মজদুর সভা, ইউ. টি ইউ. সি— সবাই একযোগে এ আই টি ইউ সি.-কে সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধর্মঘট বানচাল করার জন্য দায়ী করে।

২৯ মে '৭৪ দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জর্জ ফার্নান্ডেজ স্বীকার করেন : ধর্মঘট নিঃশর্ত প্রত্যাহারের কারণ যারা ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল— তারা নানা সুরে কথা বলছিল। (*দ্য স্টেটস্ম্যান*, ১.৬.৭৪)

১৭

রেল ধর্মঘট পরাভূত। অবসন্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদী আন্দোলন ও অপরদিকে দেশজোড়া মানুষের বিক্ষোভ। মানুষ খুঁজছে এক নতুন বিকল্প এবং একজন সর্বজনস্বীকৃত নেতা যাকে ঘিরে গড়ে উঠবে বিকল্প প্রতিবাদী মঞ্চ। সমকালীন বিরোধী দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একজনও সর্বজনগ্রাহ্যতার অধিকারী নন। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে জয়প্রকাশ নারায়ণের মঞ্চে প্রবেশ। জীবনসায়াহ্নে এসে জয়প্রকাশ আর একবার জ্বলে উঠলেন— হয়তো শেষবারের

মতো। তাঁকে ঘিরে আগস্ট আন্দোলনের অগ্নিবলয়— যে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতি তখনো পুরোপুরি বিলীন হয়নি। লোকসাধারণের চোখে তিনি নির্লোভ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ— যেহেতু তিনি নিজেকে বরাবর সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে।

অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন, 'ঘটনার পরম্পরায় ও বাধ্যবাধকতায় বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব বর্তায় জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর। এই বছরের (১৯৭৪) গোড়ার দিকে তিনি এক মন্তব্যে বলেন, দেশে দুর্নীতি ও অপশাসনের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের মত আর একটা আন্দোলন আত্যন্তিক হয়ে উঠেছে। চাই এক গভীরতর ক্রান্তি যা সমাজে গুণগত রূপান্তর নিয়ে আসবে। সামাজিক ব্যবস্থায় স্থাপিত হবে পূর্ণ গণতন্ত্র। পরবর্তীকালে এই ভাবধারাকে তিনি সর্বাত্মক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছিলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দুর্নীতি কুশাসন এবং অন্যান্য ব্যাপারে আমি নীরব দর্শক থাকতে পারি না, তা সে পাটনাতেই হোক, দিল্লীতে বা অন্য যেখানেই হোক। এর জন্য অন্তত আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম করিনি। আমি যুদ্ধ করছি দুর্নীতি, কুশাসন এবং কালোবাজারির বিরুদ্ধে। আমি যুদ্ধ করছি অতি- মুনাফা, মজুতদারি এবং সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর এবং সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। দলহীন গণতন্ত্র যার বাস্তব রূপায়ণ। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৮ জুলাই, '৯৩)

১৮

দুর্বার হয়ে ওঠে বিহারের ছাত্র আন্দোলন। ৪ নভেম্বর '৭৪ পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস অগ্রাহ্য করে জয়প্রকাশ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক মিছিল নিয়ে সেক্রেটারিয়েট ভবনের দিকে এগিয়ে যান। কাছাকাছি পৌঁছলে পুলিশের লাঠিতে জয়প্রকাশ আহত হন। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর পাটনা ও ৬ নভেম্বর বিহার বন্ধ-এর ডাক দেন জয়প্রকাশ।

অচিরেই জয়প্রকাশ হয়ে উঠলেন 'লোকনায়ক' ও লোকের মুখে মুখে জে পি। বিরোধী শক্তির কেন্দ্রবিন্দু এখন জে পি ও তাঁকে ঘিরে সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় ক্রান্তিদল ও সোস্যালিস্ট পার্টি একই মঞ্চে সামিল। সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধী ঐক্যের প্রথম আত্মঘোষণা ৬ মার্চ ১৯৭৫-এর সংসদ অভিযানের মাধ্যমে। সেদিন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে লালকেল্লা থেকে পাঁচলক্ষাধিক লোকের এক মিছিল সংসদের দিকে এগিয়ে যায়। জয়প্রকাশ ও অন্যান্য নেতারা ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে একটি দাবিপত্র লোকসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করেন। তারপর সংলগ্ন বোট ক্লাব ময়দানে জয়প্রকাশ তাঁর বক্তৃতায় জনগণকে সতর্ক করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ নিয়েছেন, তার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে রাজ্যে রাজ্যে হিংসাত্মক কাজের প্ররোচনা দিচ্ছেন। সময়মতো প্রতিরোধ করতে না পারলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৭.৩.৭৫)

১৯

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আশু বিপদ বাম-দক্ষিণ সবাইকে নিয়ে এল এক জায়গায়। এমনকি পশ্চিমবাংলায় গড়ে উঠেছে রাজনীতিতে দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে এক অভাবনীয় মেলবন্ধন। তারই দৃষ্টান্ত *আনন্দবাজার পত্রিকা* (২৭.২.৭৫)-র শিরোনাম ও পরিবেশিত সংবাদ :

এক আসরে তিন ধারার তিন নেতা

বুধবার (২৬.২.৭৫) ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্মেলনে সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু এবং জনসংঘ নেতা হরিপদ ভারতী একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেন। পরস্পরবিরোধী তিন ধরণের রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক এই তিন নেতার জীবনে এই ঘটনা এই প্রথম। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট সুরকার তিমিরবরণ, খ্যাতনামা সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও জ্যোতি বসু প্রমুখ চারশো বিশিষ্ট নাগরিক।

একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, অর্থনৈতিক প্রশ্নে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি না। উনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী আর আমি গান্ধীবাদে। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে কাজ করবো। জ্যোতিবাবু, ত্রিদিববাবুদের সভা করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভলান্টিয়ারী করবো। তিনি জানতে চান কেন রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের পল্লীতে যেতে পারবেন না? কেন শাসকদলের গুণ্ডারা জনসভা ভেঙে দেবে? কেনই বা ভোটের নামে প্রহসন চলবে?

জ্যোতিবাবু বলেন, আমাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে। কিন্তু শাসকদল ও সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে হরণ করেছে, তাতে চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবো, কথা বলার জন্য লড়াই করবো।

সম্মেলন থেকে দাবি জানানো হল, ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর। মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দাও। ন্যায় ও অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ চাই।

গণতন্ত্র ফিরিয়ে আন— এই একটি মাত্র দাবিতে নানা মতের, নানাপথের মানুষের ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারপতি ভি. এম. তারকুণ্ডে। মানুষের ভিড় হলের বাইরে রাস্তায়ও উপচে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঘটল এক নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে বাম ও দক্ষিণ একই মঞ্চে আসীন এই ঘটনা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী।

পরবর্তী পদক্ষেপ ৬ জুন '৭৫ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে কলকাতায় মহামিছিল।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ; জ্যোতি বসু, প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। *গণশক্তি* (৬.৬.৭৫) লিখছে :

গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে যে ঐক্যের আহ্বান ১৯৭২ সালের পর থেকেই দেয়া হচ্ছিল মিছিলটি যেন তার বাস্তব রূপায়ণ। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা ছাড়া সবকটি জেলার সর্বস্তরের মানুষ এই মিছিলে সামিল হয়েছেন। কি কৃষক, কি শ্রমিক, কি কর্মচারী, কি ছাত্র-যুব-মহিলা সমাজের কোন অংশ বাদ নেই। এই গণজোয়ারে ভেসে উঠেছে সেসব সন্তানহারা -স্বামীহারা-পিতৃহারা সমস্ত মুখ। তাঁরাও সমস্ত শোক ভুলে আশার স্পন্দন খুঁজে পেয়েছেন লক্ষ মানুষের সঙ্গে তালে তালে পা মিলিয়ে। তাঁদের পাশাপাশি হেঁটেছেন পাড়াছাড়া-গৃহছাড়া-কর্মচ্যুত মানুষের দল। এই মিছিল তো শুধু প্রতিবাদ মিছিল নয়—এ যে বিজয় মিছিল। দল-মত-জাতি-ধর্ম সমস্ত বৈষম্য ভুলে গোটা রাজ্যের মানুষ শাসক কংগ্রেসের গণতন্ত্র নিধনের বিরুদ্ধে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐক্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

... ...

অমাবস্যার রাত এবার শেষ হবার মুখে। ভয় ত্রাস কাটিয়ে উঠে মানুষ আবার পথে নেমেছে। *আনন্দবাজার পত্রিকা* (৬.৬.৭৫) লিখছে :

সত্যিই মহামিছিল। উদ্যোক্তারা আগেই ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা মহামিছিল বার করবেন সুতরাং তাঁদের পূর্বঘোষণা ঠিকই হয়েছে। মিছিলের সামনের দিকে লাল শালুতে লেখা ছিল 'গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিবাদ মিছিল'। তাছাড়া মিছিলকারীরা সকলেই নিজের নিজের দলের পতাকা ও ফেস্টুন বর্জন করে। মিছিলকারীরা ধ্বনি দিয়েছেন কিন্তু কেউ নিজের দলের নামে ধ্বনি দেননি। মিছিলটি দুধারের মানুষের প্রাচীরের ভিতর দিয়ে ফুলে ফেঁপে চলতে চলতে ব্রিগেড থেকে বেরিয়ে শিয়ালদহ প্রদক্ষিণ করে শহিদ মিনার ময়দানে এসে শেষ হয়।

২০

দেশের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন ঘটিয়েছে জে পি-র আন্দোলন যা বর্তমানে স্বৈরাচার বিরোধী মূল স্রোত বলে চিহ্নিত। উপেক্ষা করাও যায়না অথচ সেই স্রোতে গা ভাসানোও যায় না—অজিত রায়ের মতো উভয় সংকটের মধ্যে বিপ্লবী বাম রাজনীতি। জে পি-র আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসন আরও পাকাপোক্ত হবে। আর যদি জে পি-র আন্দোলন সফল হয়, তাহলে জয় হবে আর-এক প্রতিক্রিয়াশীল জোটের, যার মধ্যে রয়েছে মার্কসবাদবিরোধী ও সোভিয়েতবিদ্বেষী ভাবধারা-প্রাণিত জনসংঘ, ভারতীয় ক্রান্তিদল ও সংগঠন কংগ্রেস।

অজিত রায় লিখছেন, যদিও জয়প্রকাশের আন্দোলনের পরিণাম বিপ্লবী বামশক্তির স্বার্থের পরিপন্থী, কিন্তু তার অভিঘাত বাম আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক। দুর্নীতি, দমনপীড়ন এবং গণতন্ত্রবিরোধী ও ফ্যাসিবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে হৈ চৈ তুলে ইন্দিরা সরকারকে যথেষ্ট

বেকায়দায় ফেলেছেন জে পি। তার ফলে বাম আন্দোলনের পক্ষে কার্যকর ও সবল পদক্ষেপ নেয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে। অতএব এই দুই পরস্পরবিরোধী দিক সম্পর্কে অবহিত হয়ে জে পি-র আন্দোলনকে বিচার করতে হবে।

অজিত রায়ের মতে, দেশের পরিস্থিতি বর্তমানে এক অদ্ভুত সংঘাতের চেহারা নিয়েছে—যার একদিকে রয়েছে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদী প্রবণতাদুষ্ট শাসকগোষ্ঠী এবং অপরদিকে রয়েছে সম্ভাব্য ফ্যাসিবাদী শক্তিসমাবেশ। সি পি আই সম্ভাব্য ফ্যাসিবাদী বিপদটুকুই শুধু দেখছে, কিন্তু দেখছে না বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসিবাদী আচার আচরণ, যাকে তারা কার্যত সমর্থন করে যাচ্ছে। বিপ্লবী বামশক্তিকে উভয় বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। ইন্দিরা সরকারকে কোনমতেই সমর্থন করা চলে না তো বটেই, উপরন্তু জে পি-র আন্দোলনের ফলে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ইন্দিরা সরকারকে আরও দুর্বল ও কোণঠাসা করার জন্য তাকে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জে পি ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আদর্শগত অথবা অন্যান্য নীতিগত প্রশ্নে আপস করা চলবে না। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত কঠিন কৌশলগত সমস্যা, কিন্তু এই সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। (*J. P.'S Movement and Indian Democracy*)

সি পি আই-এর দৃষ্টিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতের বুকে সম্ভাব্য ফ্যাসিবাদের অগ্রদূত। কারণ জয়প্রকাশের জেহাদ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ও পরিশেষে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করাই হল জে পি-র চরম লক্ষ্য।

'জয়প্রকাশ মার্কা ফ্যাসিবাদের' বিরুদ্ধতা করার জন্য তাঁরা যে রাজ্য কংগ্রেস ও যুবকংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত, সে কথাও তাঁরা তারস্বরে ঘোষণা করেছেন। ৩০ মার্চ '৭৫, *কালান্তর*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'জয়প্রকাশী আন্দোলনের স্বরূপ'-এর শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয় :

'জয়প্রকাশ মার্কা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি যে অভিযান শুরু করেছে এবং রাজ্য কংগ্রেস ও যুবশক্তি যে সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন—এই সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন ফ্যাসিবাদী বিপদের মোকাবিলা করতে হবে— পশ্চিমবঙ্গে জয়প্রকাশপন্থীদের স্থান নেই।'

প্রসঙ্গত, জয়প্রকাশের আন্দোলন সম্পর্কে সি পি এম-এর লাইনেও রয়েছে দ্বৈত মনোভাবের স্বাক্ষর। বলা যায়, সি পি এম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা অজিত রায়ের মূল বক্তব্যের কাছাকাছি। ৬ মার্চ জে পি যখন দিল্লীতে পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দেন, সেদিন সি পি এম সেই অভিযানে যোগ না দিয়ে, তারই সমর্থনে কলকাতায় আলাদা সমাবেশ করে। তার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন : এই একই দিনে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ডাকে দিল্লীতে পার্লামেন্ট অভিযান হবে। যে সমস্ত দাবিতে সংসদ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সেগুলি সমর্থন করে। এটা আনন্দের কথা যে, পশ্চিমবাংলার বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি দীর্ঘদিন ধরে মিসা, ভারতরক্ষা ইত্যাদি কালা আইন, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের যে দাবি জানিয়ে আসছিল আজ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং কংগ্রেসবিরোধী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। সংসদ অভিযানেও এই দাবি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টি (মার্কসবাদী) সংসদ অভিযানে এই জন্যই অংশগ্রহণ করছে না যে, ঐ অভিযানে জনসংঘ, সিন্ডিকেট কংগ্রেস, বি এল ডি-র ন্যায় দক্ষিণপন্থী দলগুলি রয়েছে।

ঐ একই সভায় জ্যোতি বসু, 'জয়প্রকাশের আন্দোলন ফ্যাসিবাদী'—সি পি আই-কৃত এই মূল্যায়নের অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা বলেছে, এটা ফ্যাসিস্ট আন্দোলন। অথচ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এত খুন করল, এত মানুষ এলাকাচ্যুত, গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে মারা হচ্ছে আর মানুষের আন্দোলনের উপর এমন হিংসাত্মক বর্বর আক্রমণের দৃষ্টান্ত তো ধনতান্ত্রিক দেশেও বিরল। জনগণের চরম সর্বনাশ করেছে কংগ্রেস। জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। তার বিরুদ্ধে এই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা তো টুঁ শব্দটিও করছেন না? জানি না কতদিন ওদের এই ঘৃণিত ভূমিকা থাকবে। ওদের কার্যকলাপ দেখে মানুষ লালঝাণ্ডা ও কমিউনিস্টদেরই ওপর না বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। (*গণশক্তি*, ৭.৩.৭৫)

২১

ইতিমধ্যে ভিন্নতর এক ঘটনার ধাক্কায় দেশের রাজনীতি পুরো চেহারাটাই বদলে গেল। ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরার লোকসভার আসন বাতিল হল। বিরোধী নেতারা ১১-১৫ জুন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ধর্না দেন, রাষ্ট্রপতির কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলার দাবি জানিয়ে। ইন্দিরা গান্ধী জানান, তিনি বিরোধীদের কথায় পদত্যাগ করবেন না। 'প্রধানমন্ত্রী থাকছি, থাকতে চাই।' সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার তাঁর রায়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর লোকসভায় ভোটাধিকার ছাড়া আর সব ক্ষমতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে—নির্বাচনী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত। এই রায় ঘোষিত হয় ২৪ জুন, ১৯৭৫। আর ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের ১ নং ধারা অনুযায়ী আপৎকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এবং ভোরবেলা থেকেই বিরোধী পক্ষের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা (২৭.৬.৭৫) লিখছে : জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা জানিয়ে আজ সকালে জাতির উদ্দেশে এক বেতারভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'অল্প কিছুসংখ্যক লোকের কাজকর্মে বিশাল গরিষ্ঠ অংশের অধিকার আজ বিপন্ন। যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যাতে জাতীয় সরকার দেশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা ও কাজ করার শক্তি হারান, তাহলে দেশের বাইরে থেকে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সে সব কথা বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।'

আজ সন্ধ্যায় (২৬.৬.৭৫) সরকারের প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার ড. এ আর বাজি সাংবাদিকদের জানান, 'কয়েকটি গোষ্ঠীর নেতারা যে কার্যক্রম নিতে চলেছিলেন, তার ফলে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় ঐ কার্যক্রমের লক্ষ্য জনজীবনের শৃঙ্খলা নষ্ট করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, যোগাযোগ

ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন করা এবং সব মিলিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো। সর্বোপরি সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই পটভূমিতে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছে।'

সেন্সরশিপের যবনিকা ভেদ করে যতটুকু জানা গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে জয়প্রকাশ ও তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দ সবাই বন্দী। এ প্রসঙ্গে *গণশক্তি* (২৬.৬.৭৫) লিখছে : ভোর থেকেই বিরোধীপক্ষের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা জয়পাল সিং, মোরারজী দেশাই প্রমুখ সংগঠন কংগ্রেস, এস. পি, জনসংঘ, বি এল ডি প্রমুখ বিরোধী নেতৃবৃন্দ দিল্লীর কারাগারে আটক। জ্যোতির্ময় বসু, সুরেন্দ্রমোহন প্রমুখের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

গণশক্তি-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয় :

গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ— গণপ্রতিরোধ চাই

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিয়েছেন। জরুরি অবস্থার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বিরোধীপক্ষের উপর আক্রমণ হানা হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বিরোধী শক্তির নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এমন কি তাঁর নিজের পার্টির মধ্যে যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর নীতিগুলির বিরোধিতা করেছেন তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সরকারের নীতিগুলির চরম ব্যর্থতায় ইন্দিরা গান্ধীর সরকার আজ আতঙ্কগ্রস্ত। গুজরাট নির্বাচনে পরাজয় এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে প্রতিকূল রায়ে আজ বিশেষভাবে আতঙ্কিত হয়ে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার গণতন্ত্রের অবশিষ্ট রেশসমূহকেও সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

জনগণের প্রতি সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর আহ্বান : গণতন্ত্রের উপর এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি চাই। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার চাই।

... ...

সি পি আই (এম-এল), আর এস এস, আনন্দমার্গ, জামাতে ইসলামি প্রমুখ ২৬টি সংগঠন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত। অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন : 'সমগ্র দেশের বুকে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার ও আতঙ্ক; স্বাধীনভাবে মুখ খুলে কথা বলতে মানুষের ভয়—বাতাসে যেন বিষ। জীবন যেন অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেল, দুর্দৈব কোন দিকে থেকে আসবে এমনই এক অদৃশ্য ভয়।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৮.৭.৯৩)

জানা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বেশ কয়েক ঘণ্টা পর মন্ত্রিসভা পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন। ভোরবেলা মন্ত্রিসভার সব প্রবীণ পূর্ণমন্ত্রীকে ইন্দিরার বাসভবনে একটি বৈঠকের নামে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু আলোচ্য সূচি সম্পর্কে কোনো আভাস দেওয়া হয়নি। তাঁরা এসে জরুরি অবস্থার কথা জানাতে পারেন, জানতে পারেন দেশজোড়া ব্যাপক ধরপাকড়ের কথা। কিন্তু তাঁকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস কারও হয়নি।

২২

২৬ জুন ভোর সাড়ে পাঁচটায় জর্জ ভার্গিস-এর ফোন এল এবং রাজ থাপার জানতে পারলেন, যা আশঙ্কা করা হচ্ছিল তা ঘটেছে। জে পি ও তাঁর কয়েকশ অনুগামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাজারে গুজব ন'শ— যদিও সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। কারণ— সব সংবাদপত্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ, কোনো প্রভাতী সংস্করণ বার হয়নি। তবে সারা দিন রেডিও-তে কেবল ইন্দিরা-প্রশস্তি শোনানো হল। তিনি যে ছেলেবেলা থেকেই 'জোয়ান অব আর্ক' হবার স্বপ্ন দেখছিলেন এই খবর বারে বারে বলা হল।

আরুইন রোড বরাবর গাড়ি করে যেতে যেতে রাজ দেখছেন, রাতারাতি তালকাতোরা গার্ডেন সামরিক ছাউনিতে পরিণত। কনট প্লেসে গিজগিজ করছে শত শত রাইফেল ও স্টেনগান হাতে খাকি উর্দির লোক।

শ্রীমতী থাপার অফিসের জানলা দিয়ে দেখছেন, দিল্লী শহরের চেহারা যেন রাতারাতি পাল্টে গিয়েছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে রাস্তার দুধারে ইন্দিরার ভ্রূকুটি কুটিল মুখের পোস্টার। কতকটা মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মতো দেখতে এবং তার তলায় লেখা : তিনি অরাজকতা রোধ করে শৃঙ্খলা এনেছেন। কোনোটাতে বা লেখা : প্রজাতন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভুল বানানে হিন্দী ও ইংরেজিতে বাসের গায়ে লেখা : গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না। মোটরগাড়ির স্টিকারেও একই সাবধানবাণী। সেন্সরশিপ জারি হওয়ার ফলে মানুষ তো এমনিতেই বোবা। সংবাদপত্র জগতো বিনাযুদ্ধে নতিস্বীকার করেছে। অতএব নির্ভরযোগ্য সংবাদের উৎস যখন নিরুদ্ধ তখনই তো গুজবের রমরমা এবং তাই গুজবের বিরুদ্ধে এত সাবধানবাণী। দেখে শুনে শ্রীমতী থাপারের মনে হয়েছে, ফ্যাসিবাদের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। এবং তারাই তার সঙ্কেত পাচ্ছে যারা ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার সঙ্কেত অবশ্যি শ্রীমতী থাপার আরও এক সপ্তাহ আগেই পেয়েছিলেন, যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হবার পর রোজই সারাদিন ইন্দিরার সফদর জঙ্গ রোডের বাড়ির সামনের মাঠে বাস ভর্তি লোক এনে জমায়েত করা হত। এবং ইন্দিরা গান্ধী মাঝে মাঝে জমায়েতের সামনে বক্তৃতা দিতেন। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত মিউনিসিপ্যালিটির দুধের গাড়ি। রাজ থাপারের ধোপার মেয়ে এক ঘড়া দুধ বিনা পয়সায় নিয়ে এসেছিল। ধোপা নিজে গরম গরম পুরী খেয়েছিল—তাও বিনা পয়সায়। শুধু বলতে হয়েছিল 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ' আর 'জজসাহেব মুর্দাবাদ'। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বেচারা বিচারপতির কুশপুত্তলিকা অসংখ্যবার পোড়ানো হল। এই দৃশ্য দেখে জার্মান দূতাবাসের জনৈক কূটনীতিবিদ শ্রীমতী থাপারকে বলেন, 'এ যে দেখছি হিটলারের জনসভার মতো।' কথাটা তখনই মনে ধরেছিল রাজ থাপারের এবং অচিরেই হিটলারের ছায়া যেন তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন করে। বিশেষ করে যখন দেখলেন, দিল্লীর দেয়ালে দেয়ালে লেখা 'ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা'—তখন তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ, ভারতের বুকে নেমে এসেছে ফ্যাসিবাদের ছায়া। (*All These years*, pp. 405-411)

'জরুরি অবস্থা' জারির এক সপ্তাহ বাদে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাতে রয়েছে পর্যায়ক্রমে গ্রামবাসীদের ঋণ বিলোপ করা হবে; শহর-অঞ্চলে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে; মুচলেকা শ্রমিক (বন্ডেড লেবার) প্রথা রদ ও গ্রামের

ভূমিহীন শ্রমিকরা কিছুদিন যাবৎ যে বাস্তুজমিতে বসবাস করছেন, তার মালিকানা দান করা হবে; স্বনামেই থাক আর বেনামিতেই থাক, চোরাচালানিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে; কর ফাঁকির জন্য কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা হবে, ইত্যাদি।

অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায়, 'বর্তমান রূপান্তরিত পরিস্থিতিতে দুটো উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে তিনি নিরলসভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন—(১) তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার আসনটিকে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং বিরোধীপক্ষ ও সংবাদপত্রের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা, এবং (২) আবহমান কালের জন্য ভারতের বুকে পারিবারিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় জমি কর্ষণ করা। লোকসভা নির্বীর্য, নিষ্ক্রিয়, বেশির ভাগ বিরোধী সদস্য গ্রেফতার হওয়ায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রায় স্তব্ধ। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান সংশোধন করে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বিষয়ে তিনি মনোযোগী হলেন।

১৯ জুলাই '৭৫, রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে একটি অর্ডিনান্স জারি করে বলা হল, মিসায় আটক কোনও ব্যক্তি, বিদেশী নাগরিক হলেও, ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি জানাতে পারবে না। স্বাভাবিক ও সাধারণ আইনের সাহায্য প্রার্থনা করে সে আদালতেও যেতে পারবে না।

৭ আগস্ট '৭৫, বাদল অধিবেশন মুলতুবি হবার আগে লোকসভায় একটি (৪২-তম) সংবিধান সংশোধন বিল পাশ হয় ৩৩৬-০ ভোটে। তাতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষ, এই চারজনের নির্বাচন নিয়ে কোনও সংশয় বা বিরোধ দেখা দিলে সে সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন সংসদ কর্তৃক গঠিত আইনানুগ এক কর্তৃপক্ষ। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভবিষ্যতে নির্বাচনী মামলার লাঞ্ছনা যাতে প্রধানমন্ত্রীকে ভোগ করতে না হয় সে জন্যই এই সালঙ্কার বন্দোবস্ত। আর লোকসভার হালহকিকত কী, বিপক্ষে কোনও ভোট না পড়া তার প্রমাণ।

৮ জানুয়ারি, ১৯৭৬। এক অর্ডিন্যান্স জারি করে বলা হয়, সংবিধানে ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের দাবিতে কেউ আদালতে যেতে পারবে না।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮.৭.৯৩)

সরকার অন্যায়ভাবে নাগরিকদের আটক করলে বা অত্যাচার করলে তার বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস-ই ছিল রক্ষাকবচ। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের অধিকারও কেড়ে নেবার জন্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এক মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি ২৭ জুন ১৯৭৫ যে আদেশ জারি করেছেন তদনুযায়ী জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালে কোনও নাগরিকই, তা তিনি যতই নির্দোষ হোন না কেন বা তাকে যদি ভুল বা মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে বা অলীক অভিযোগের ভিত্তিতে বেআইনীভাবে বা অন্যায়ভাবে বা ভুলক্রমে আটক রাখা হয়ে থাকে তবুও, তিনি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের প্রতিকারকল্পে কোনও আইনসঙ্গত বা সংবিধানসঙ্গত অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না।' (*দি স্টেটসম্যান*, ১০.১.৭৬)

সহজ কথায় প্রতিটি ভারতবাসীর যাবতীয় মৌলিক অধিকার খোয়া গেল।

অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন, 'দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ পারিবারিক শাসন কায়েম করার জন্য জমি প্রস্তুত করার গরজে তিনি তাঁর ছোট পুত্র সঞ্জয়কে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরেন। সঞ্জয়ের অভ্যুদয় ঘটে যুব কংগ্রেসের নেতা রূপে, ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু অল্প

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল তাঁর চারপাশে এমন সব যুবকের ভিড় যারা শিক্ষাসংস্কৃতিতে খাটো, চলনে বলনে অশালীন এবং নানা কারণে যারা প্রতিবেশীদের নিকট নিন্দিত। জরুরি অবস্থার সুযোগ ও কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ আস্কারায় এই যুবগোষ্ঠী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সমাজজীবনে সৃষ্টি করে এক সন্ত্রাসের বিভীষিকা। শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য অত্যন্ত সুচতুরভাবে সঞ্জয়ের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নির্মাণের কাজে জরুরি অবস্থার পরিবেশকে ব্যবহার করতে থাকেন। এমনকি সঞ্জয়ের নেতৃত্বাধীন যুব কংগ্রেস খোদ কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসাবে মর্যাদাশীল হয়ে উঠেছে এমন প্রচারও করতে থাকেন।

মন্ত্রী, দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং পদস্থ সরকারি অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে সঞ্জয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে ও 'ফাইল' পাঠাতে। তাঁর মৌখিক অনুমোদন নিয়ে ফাইল চালাচালি হতে থাকে; বিরোধীদের মতে, সঞ্জয় হয়ে দাঁড়াল সংবিধান-বহির্ভূত কর্তৃত্ব, একস্ট্রা-কনস্টিটিউশনাল অথরিটি। এই অথরিটিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার সাহস সে-সময় কারও ছিল না। ভয় ও স্তাবকতা, এই দুয়ের সংমিশ্রণে এমন পরিবেশ রচিত হয়েছিল যে, ভারতের একটি বিখ্যাত সচিত্র সাময়িকপত্রের পাঠকগণ ভোটে সাব্যস্ত করেন, সঞ্জয় গান্ধী ১৯৭৬ সালের সেরা ভারতীয়।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮.৭.৯৩)

এবং এই অবস্থার গুণকীর্তন করার লোকেরও অভাব ছিল না। আচার্য বিনোবা ভাবে জরুরি অবস্থাকে 'অনুশাসন পর্ব' বলে ঘোষণা করেন; বলেন, এর অর্থ হল এক শৃঙ্খলার যুগ। আর ঢালাও সমর্থন করে সি পি আই।

কালান্তর (১১.৮.৭৫) লিখছে :

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতায় কায়েমী স্বার্থ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সঠিক ভাবেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এই চক্রান্তের উপর আঘাত করেছেন। আজ শহীদ মিনার ময়দানে কমিউনিস্ট পার্টি আহূত জনসভায় কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ একথা বলেন।

নয়া ফ্যাসিবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে কার্যকর করার জন্য কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজে নামতে শ্রী ভূপেশ গুপ্ত আহ্বান জানান।

... ...

নয়াদিল্লী, ২৬ আগস্ট এক বিবৃতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও বলেন যে, দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন : এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা থেকে অনেকগুলি সদর্থক ফল পাওয়া গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ২১ দফা কর্মসূচি রূপায়ণের উপরে বিশেষ জোর দিয়ে শ্রী রাও বলেন যে, এই কর্মসূচি জাতির প্রগতির পক্ষে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ব্যাপক জনতাকে জড়িত করে নেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ কর উচিত। (*কালান্তর*, ২৭.৮.৭৫)

সমর সেনের মতে, সি পি আই-এর এই ভূমিকা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। ইন্দিরা-বিরোধী বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের জোট, সি পি আই-পন্থীদের মতে, সি আই এ-র কার্যকলাপ ও

প্রভাবের ফল। বিদেশে বিশেষ করে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলি (চীন, উত্তর কোরিয়া ও আলবেনিয়া বাদে) ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করল, ভিয়েতনাম পর্যন্ত। কতো বামপন্থী ধরা হয়েছে সেটা বোধ হয় এ-সব দেশগুলির জনগণের অজানা ছিল। (*বাবুবৃত্তান্ত*, পৃ. ৯৭)

২৩

২৩ জানুয়ারি ১৯৭৬। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন : জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবার পর সারা দেশে চার হাজার ছ'শ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীমতী রাজ থাপারের মতে, গ্রেপ্তারের সংখ্যা তার অনেক গুণ বেশি। ২৫ অক্টোবর '৭৫। তাঁর ডায়েরিতে লেখা : ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা এখন একলক্ষ দশ হাজার এবং একদিন অন্তর একজন করে বন্দী মারা যাচ্ছে বিহারের জেলখানায়, সেখানকার হালত সবচেয়ে খারাপ। এই খবর পাওয়া গিয়েছে শান্তিভূষণের এক লোক মারফৎ।

তিনি লিখছেন, যুক্তপ্রদেশের সব জেলখানা উপচে পড়ছে—তাই সরকারি বাংলোগুলি পর্যন্ত জেলখানায় পরিণত। মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি হাক্সারকে অনুরোধ করেছেন—কোনও একটা বন্দোবস্ত করার জন্য। 'এত লোক আমি রাখবো কোথায়?'—অসহায় মুখ্যমন্ত্রীর খেদোক্তি।

শ্রীমতী থাপার শিক্ষা জগতের মানুষজন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। সতীর্থদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অথচ অন্য শিক্ষকরা নির্বিকার। প্রতিবাদের আঙুল তুলছে না কেউ।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় ঘোড়সওয়ার পুলিশ টহল দিচ্ছে দেখে সবাই ভয়ে তটস্থ। লাল মুখোশ পরা একজন পুলিশের চরের গল্প সকলের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে যে জবহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হোস্টেলের ঘর থেকে থানায় তুলে এনে তার সামনে হাজির করা হয়। 'লাল মুখোশ'-এর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৃত ছাত্রদের তিহার জেলে পাঠানো হতে থাকে। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩-১৫)

সমর সেনের মতে, 'ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি কাজ দিয়েছে বোধহয় সেন্সরশিপ, কেন না অন্যস্থানে আন্দোলনের খবর না পেলে বিরোধীদের মনোবল ভেঙে যায়, অসহায় লাগে, মনে হয় জনগণ বাছুর বনে গিয়েছে। ...কিন্তু এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে উত্তর ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কড়াকড়ি কম ছিল। এখানে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলাচামুণ্ডারা ইংরেজিতে ওয়াকিবহাল নয় বলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কিছুটা সুবিধে হয়। একজন মন্ত্রী তো 'স্টেটস্‌ম্যান' অফিস থেকে রাত্রে বেরিয়ে এসে সগর্বে বলেন যে সব কিছু 'census' করে দিয়ে এসেছেন।' (*বাবুবৃত্তান্ত*, পৃ. ৭৩, ৯৭)

সেন্সরশিপের এমনই মহিমা যে, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জবহরলালেরও রেহাই নেই। অশোক মিত্র লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া চলবে না। আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান সম্প্রচার নিষিদ্ধ। তেমনই নিষিদ্ধ নেহরুর আত্মজীবনীর

কয়েকটি অংশ যা কোনও রচনায় উদ্ধৃত করা চলবে না। মহাত্মা গান্ধী সম্পাদিত 'হরিজন' অথবা 'ইয়ং ইন্ডিয়া' থেকে কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ-এর পুনরুদ্ধৃতি নিষিদ্ধ।' (*The Hoodlum years*, p. 139)

অন্নদাশংকর রায় একটি গল্পে লেখেন, 'ইংরেজ গিয়েছে কিন্তু স্কচ এসেছে।' এই পঙ্‌ক্তিটিতে সেন্সর কর্তৃপক্ষের আপত্তি। অতএব গল্পটি ছাপা হল না।

সমর সেন লিখছেন, 'অল্পসল্প খবর ও গুজব বন্ধ হল না, সেন্সরশিপ ও সমাচার সত্ত্বেও। 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্করবাবু সস্ত্রীক গ্রেপ্তার হলেন। তারও পরে 'কলকাতা' পত্রিকায় লেখার অপরাধে গৌরকিশোর ঘোষকে ধরা হল। দীপঙ্করবাবু মাওপন্থী, গৌরকিশোর ঘোষ বরাবর কমিউনিস্ট-বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু অর্থলোভ বা উন্নতির জন্য নয়। বরুণ সেনগুপ্ত সিদ্ধার্থশঙ্করের চক্ষুশূল, জেলে গেলেন। তার অনেকপরে গা-ঢাকা দেওয়া জ্যোতির্ময় দত্ত, 'কলকাতা'র সম্পাদক।....

'...ভারতবর্ষব্যাপী নেতাদের গ্রেপ্তারের পর, জনসাধারণের সমস্ত অধিকার যখন ক্ষুণ্ণ হল, তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোন আন্দোলনের খবর আমরা পাইনি। চু-এন-লাই-এর মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভা ডাকা হ'ল, পুলিশ হতে দিল না, উদ্যোক্তারা মেনে নিলেন। মাও-সে-তুং মারা যাবার [illegible]।' (*বাবুবৃত্তান্ত*, পৃ. ৯৭)

বাজারি দৈনিক পত্রিকাগুলি 'সেন্সরশিপ' মেনে নিয়ে যথারীতি বেরোতে থাকে। শুধু সান্ধ্যদৈনিক *গণশক্তি*-র সম্পাদকীয় স্তম্ভের জায়গাটা প্রায়ই ফাঁকা থাকত। জরুরি অবস্থার কোপ শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল কয়েকটি র‍্যাডিকাল পত্রপত্রিকার উপর। *ফ্রন্টিয়ার*-এর ২৮ জুন '৭৫ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যেহেতু ওই সংখ্যায় ইন্দিরা গান্ধী বিষয়ে একটি অতিশয় তীব্র সম্পাদকীয় ছিল। যে ছাপাখানা থেকে *ফ্রন্টিয়ার* ও *দর্পণ* ছাপা হত, সেই ছাপাখানাটি ১৯৭৬-এর এপ্রিলের শেষাশেষি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। কারণ, *দর্পণ* পত্রিকা কোনো লেখা মহাকরণে পাঠায় না। ফলে *দর্পণ* ও *ফ্রন্টিয়ার* ছাপা কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। রাজনীতির লোক না হয়েও জ্যোতির্ময় দত্ত এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। তিনি *কলকাতা* পত্রিকার এক 'জরুরি অবস্থা'- প্রতিবাদী সংখ্যা বার করলেন। *কলকাতা*-র সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত ও তার সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত রাষ্ট্রদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হলেন। স্বৈরাচার- বিরোধিতার এক অভিনব পদ্ধতি হিসেবে গৌরকিশোর ঘোষ মশায় মাথা ন্যাড়া করে লোকসমাজে আবির্ভূত হলেন। অবশ্যি অচিরেই তাঁকে যেতে হল জেলে। এবং কারান্তরাল থেকে ওজস্বিনী ভাষায় লেখা স্বৈরাচার- বিরোধী এক প্রচারপত্র দেশবাসীর উদ্দেশে বাইরে পাঠান। এখানে তার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হচ্ছে :

দাসত্ব নয়, দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা!

আমার প্রিয় স্বদেশবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!

কারাগারের অভ্যন্তর থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে এই আমার প্রথম এবং সম্ভবত শেষ চিঠি লেখা।...

... ৬ অক্টোবর ১৯৭৫ ভোররাত্রে আমার বাড়িতে হানা দিয়ে ইন্দিরার গোয়েন্দা পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখাবার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেননি। এবং অতঃপর সেই দিনই রাত্রে আমাকে বিনা বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অপবাদে এমারজেন্সি

মিসা আদেশবলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে আটক রাখা হয়। তদবধি আমি কারাগারে। আমার বা আপনাদের হাতে এমন কোনও মৌলিক অধিকারই আজ অবশিষ্ট নেই, যা ব্যবহার করে আমি আদালতের শরণ নিয়ে সরকারের এই অন্যায় জুলুমের প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারি; আমার স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারি। এখন আর আমি একা নই, ভারতবাসী মাত্রেই আজ কারাগারের বাসিন্দা। ব্যতিক্রম শুধু ইন্দিরা এবং সঞ্জয়।

ক্ষমতালোলুপ ইন্দিরার প্ররোচনায় রাষ্ট্রপতির আদেশবলে অথবা লোকসভার সংখ্যাধিক্যের জোরে নাগরিক সাধারণের সমস্ত রকম স্বাধীনতা আজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সংবিধানকে হত্যা করা হয়েছে। এবং সুপ্রীম কোর্টকেও করা হয়েছে বৃহন্নলা। কেবল দমন আর পীড়ন। কেবলই মিসা আদেশের প্রয়োগ। আজ এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমতী ইন্দিরার সাধের ক্ষমতার সৌধ। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের পরিবর্তে, হায়, আজ ইন্দিরার একমাত্র সহায় গুপ্ত পুলিশ, শুধু গুপ্ত পুলিশ। মিসার ঢালাও অপপ্রয়োগ কত করুণ হতে পারে, কারাগারে তার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। অজস্র নিদর্শন। নানা রকম। পাঁচ বছর, সাতবছর বিনা বিচারে আটক। তের বছর, পনেরো বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীও বছরের পর বছর বিনাবিচারে আটক। মানবতার এমন ঢালাও অপমান আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। এরা কেউ আপনাদের ভাই, কেউ বোন, কেউ ছেলে, কেউ বা মেয়ে।

অথচ এর কোন প্রতিকারও নেই। সংবাদপত্রে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমাদের এবারের প্রজাতন্ত্রী দিবসের উপহার হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আমাদের কী দিতে চাইছেন! দাসত্ব! ষোল আনা দাসত্ব।

রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার নিয়ে আমার, আপনার এবং আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর আদালতে যাওয়া রহিত করেছেন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অনুরূপভাবে সংবিধান বর্ণিত ১৪, ২১ এবং ২২ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত আমাদের মৌলিক অধিকারগুলির প্রয়োগ স্থগিত হয়ে গিয়েছে।...

... সুধীজনমণ্ডলী! এখন আপনারাই বিচার করে দেখুন, এর পরেও মানুষ হিসাবে বাঁচার কোন্ অধিকার আর আমাদের থাকে? বিচার করে দেখুন, ২৬ জুনের আগে পর্যন্ত আপনারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রজাতন্ত্রী ভারতের স্বাধীন নাগরিক। আর মাত্র সাত মাসের মধ্যেই আপনারা প্রত্যেকেই পরিণত হয়েছেন ইন্দিরাতন্ত্রী ভারতের শৃঙ্খলিত ভূমিদাস। কোনও অধিকারই আপনার নেই। আপনি সাত মাস আগেও ছিলেন স্বাধীন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। আর আজ? হতে চলেছেন প্রভুভক্ত জীবেরও অধম। আপনি যেই হোন, আজকের সমাজে যে-স্থানেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, কোথায় নিরাপত্তা?...

...আপনি আইনজীবী? চিকিৎসক? অধ্যাপক? শিক্ষক? ছাত্র? শিল্পপতি? শ্রমিক? ব্যবসায়ী? রাজনীতিবিদ? কংগ্রেসী? কোথায় আপনার নিরাপত্তা? যাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর প্রয়োজন নেই, ক্ষমতালোভী ইন্দিরার কাছে তার মূল্য ছেঁড়া জুতোর চাইতে বেশী নয়। এমন কি আনুগত্যের সতত লাঙ্গুল সঞ্চালনকারী প্রভুভক্তির দামও ইন্দিরার কাছে কানাকড়ি নয়। প্রমাণ সর্দার স্বরণ সিং, প্রমাণ উমাশঙ্কর দীক্ষিত, প্রমাণ বহুগুনা, প্রমাণ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি।

প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! কী ভাবছেন বেড়ার উপর বসে? এ সাময়িক ব্যবস্থা? ইন্দিরা বিরোধীদের বেয়াদবিতে ক্রুদ্ধ হয়ে এই ব্যবস্থা নিয়েছেন? রাগ পড়ে গেলেই লক্ষ্মী মেয়ের মত ফেরত

দেবেন আমাদের অপহৃত সব অধিকার? না কি ভাবছেন দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় বেঁধে আজ তো চামড়া বাঁচাই, পরের কথা পরে ভাবা যাবে? না কি ভাবছেন দেশের উন্নতির জন্য দিলামই বা আমাদের সব অধিকারের আহুতি ? এই যদি আপনার ভাবনার গতি হয়, তবে হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থানের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন, সতর্ক হোন, নিজেকে এবং আপনার নিষ্পাপ বংশধরদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এখনই তৎপর হোন। আর উন্নতি?...

... দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ এবং পাইকারী আটক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে দাসত্ব কায়েম করে প্রধানমন্ত্রীর বড় সাধের কুড়ি দফা কর্মসূচির মন্ত্র জপ করলেই দুধ-মধুর বন্যা বয়ে যাবে—এটা একটা বিরাট ধাপ্পা। এবং মিথ্যা মরীচিকা। যারা স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী, তাদের মদমত্ততার ভিত্তি মিথ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই প্রচারের উচ্চনাদী জয়ঢাক পিটিয়ে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠার এত আয়োজন। মিথ্যাকে অপসারিত করে সত্যের প্রকাশ ঘটাতে পারলেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা তাই তাসের প্রাসাদের মত হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। কেননা তার কোনও নৈতিক শক্তি নেই।

তাই মিথ্যা অপসারণের দায়িত্ব শিক্ষিত লোকমাত্রকেই নিতে হয়। এ তার বিবেকের নির্দেশ, এ তার মনুষ্যত্বের দায়। আপনারা এই দায় গ্রহণ করবেন না? আপনাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় ও নিষ্ক্রিয়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ইন্দিরার একনায়কতন্ত্র, নির্লজ্জ ফ্যাসিবাদ আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের গলায় এঁটে দেবে দাসত্বের শৃঙ্খল! আর আপনারা তা মেনে নেবেন শুধু আজকের দিনের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর বিনিময়ে? মনে রাখবেন নিষ্ক্রিয়তাও পাপ, কেননা তাও সহযোগিতাই।

... আসুন, আমরা মিথ্যাকে উন্মোচন করি এবং সত্যকে প্রকাশ করি। আসুন, আমরা নিগ্রহ ভোগের দ্বারা প্রসন্ন চিত্তে সন্ত্রাসকে পরাভূত করি। আসুন, আমরা স্বৈরাচারী প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করি। আসুন আমাদের সব ভালবাসা স্বাধীনতায় অর্পণ করি। আসুন, অহিংসায় দীক্ষিত হই, কারণ অহিংসাই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি রাখে। এবং আজ, প্রজাতন্ত্রী দিবসে, আসুন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি—দাসত্ব নয়, দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা। স্বৈরাচার নয় গণতন্ত্র।

... জয় হোক গণতন্ত্রের।

জয় হোক প্রেমের। জয় হোক মানুষের।

ইতি বিনীত
গৌরকিশোর ঘোষ
এমারজেন্সি মিসা কয়েদী
(*আমাকে বলতে দাও*)

প্রেসিডেন্সি জেল, দশ সেল
প্রজাতন্ত্রী দিবস, ১৯৭৬

যে সুধীজনমণ্ডলীর উদ্দেশে গৌরকিশোর ঘোষের এই আকুল আহ্বান তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সমর সেন কিন্তু আশাহত। তাঁর মতে, 'এমার্জেন্সির সময় তাঁরা (বুদ্ধিজীবীরা) বিশেষ কিছু করেননি, বিশেষ করে পূর্বভারতে। ... যারা নিজেদের সংস্কৃতিতে অগ্রগামী মনে করতেন তাঁরা রেডিও বা টেলিভিসনে এবং তথ্যচিত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। রবীন্দ্রভক্তরা তাঁর নানা গানের উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গলা খুলে অন্য গান গাইতেন। বিগত একজন লেখক বলেছিলেন তাঁর নিজের লেখা একটি নৈরাশ্যবাদী কবিতা রেডিও-তে পাঠ

করতে দেওয়া হয়নি। অন্য কবিতা কেন পড়লেন, জিজ্ঞেস করিনি।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮)

আসলে বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশেরই কোনো রাজনৈতিক বোধ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। এই জরুরি অবস্থার দরুন তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই—তাই একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

তবে 'জরুরি অবস্থা' কী তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন মেহনতী মানুষেরা। *গণশক্তি* (১১.২.৭৬) লিখছে : কলকাতায় সর্বত্র হকার উচ্ছেদ। এবং কয়েকলক্ষ মানুষ নতুন করে কর্মহীন, অন্নহীন।

তাছাড়া সরকারি তথ্য অনুসারে সারা দেশে গতবছর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, মাত্র ছয় মাসে ৩২২১ টি শিল্পসংস্থায় লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার এবং ছাঁটাইয়ের দরুন মোট ৩,৮৮,৭৩১ জন শ্রমিক কর্মচারীর জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়েছে। (*গণশক্তি*, ২১.৩.৭৬)

আরও জনবিরোধী ঘটনা নিশ্চয় ঘটেছে; সেন্সরশিপের দৌলতে সেসব লোকে জানতে পারেনি। গুজব অবশ্য রটে। এবং বড়ো বড়ো ঘটনা তার ফলে ধামাচাপা পড়েনি। যেমন ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলিপুর জেল থেকে ঠিক ক'জন পালিয়েছিলেন সে খবর অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের কাছে পৌঁছে যায়। উল্টোডিঙিতে পুলিশের গুলি চালানো চাপা পড়েনি। 'জন্ম নিরোধ' অভিযান প্রায় জবরদস্তির পর্যায়ে পড়ে রাজাবাজারে। সে সময় বোরখাপরা মুসলমান মেয়েরাও পুলিশের মুখোমুখি হয়েছিল। এ ধরনের স্থানীয় প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের ঘটনা বিশেষ প্রচারিত হয়নি। তেমন জোরালো-প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে না উঠলেও কয়েকটি বিরল ঘটনার নজির রয়েছে।

অলোক মজুমদার জানাচ্ছেন, সি পি এম-এর পক্ষ থেকে একদিন সারা কলকাতায় 'স্বৈর-তন্ত্র নিপাত যাক' পোস্টার সাঁটা হয়। আর একদিন হাজরার মোড়ে ও কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে 'বন্দীমুক্তি কমিটি'র নামে অঘোষিত মিছিল বার হয়। পুলিশ এসে পড়াতে মিছিলগুলি অবশ্যি দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

আসলে 'জরুরি অবস্থা' পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোনও বিভীষিকা সৃষ্টি করেনি। সমর সেন লিখছেন, 'কলকাতায় কিন্তু আতঙ্ক ছিল না। এটা ঠিক যে অনেকে গ্রেফতার হন, কিন্তু বঙ্গদেশে গ্রেফতার হওয়া, বাড়িতে, মাঠে-ঘাটে জেলে খুন হওয়া তো বেশ কিছু বছর ধরে চলে আসছে। সুতরাং কয়েকশ ব্যক্তি জরুরি অবস্থার সময় গ্রেফতার হলে বাবুরা বিচলিত হননি—আটক ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীরা ছাড়া। জরুরি অবস্থায় আমরা কিছুটা সতর্কভাবে অবশ্য থেকেছি। কিন্তু উত্তরভারতের সেই ব্যাপক ত্রাস ছিল আলাদা ব্যাপার।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১)

২৪

ত্রাস দিল্লীতে, ত্রাস হরিয়ানায়, ত্রাস বিহার ও ইউ পি তে এবং ত্রাস সর্বত্র। সৌজন্য সঞ্জয় গান্ধী ও বংশীলাল, ভিন্দার প্রমুখ পরিকরবৃন্দ—যারা মনে করে গোটা দেশ তাদের খাস তালুক। মন্ত্রী ও আমলারা সঞ্জয়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের সামিল। শ্রীমতী থাপারের ভাষায়, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

যোশী নিজের পিঠ পেতে দিয়েছিলেন, হাতী থেকে নামার সময় সঞ্জয় যাতে পা রাখতে পারে। অন্য একজন মুখ্যমন্ত্রী নাকি সঞ্জয়ের চপ্পল বহন করে কৃতার্থ হয়েছেন।

কথা কম কাজ বেশি—এই নীতিতে বিশ্বাসী সঞ্জয় গান্ধী। এবং তার মধ্যে প্রধান কাজ পরিবার পরিকল্পনার নামে নির্বীজকরণের কার্যক্রম। রাজ থাপার দেখছেন, গোটা দিল্লী জুড়ে পরিবার পরিকল্পনার নামে এক নতুন হিস্টিরিয়ার আবির্ভাব। সঞ্জয়ের শ্লোগান, 'ধরে ধরে সবাইকে খাসি করে দাও'। অতএব প্রতিটি রাস্তার মোড়ে রাতারাতি নির্বীজকরণ শিবির তৈরি হল ভাঙা টিন-কাঠ-কুটো দিয়ে। সেখানে অহরহ মাইকে বাজছে হিন্দি ফিল্মের চটুল গান, কোথাও বা 'ওম্ জগদীশ হরে'। মাঝে মাঝে ঘোষণা : এস, অপারেশন করিয়ে যাও আর ছোট ও সুখী পরিবার বানাও। শোনা যাচ্ছে পদোন্নতি, চাকরির স্থায়িত্ব— সবেরই জন্য নির্বীজকরণ অপরিহার্য। মহারাষ্ট্রের এক ডাক্তার নাকি খোলাখুলি বলেছেন, তিনি ভারতবর্ষের জনসংখ্যা কমিয়ে দেবেনই দেবেন।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানায় ও মধ্যপ্রদেশে নির্বীজকরণ বা 'নাসবন্দি' আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। জীপের হর্ন শোন মাত্র গ্রামকে গ্রাম খালি করে সব পুরুষ মানুষ উধাও হয়ে যেত। রাজস্থানের মরদরা, শোনা যায়, বিবিদের ঘাঘরা পরে 'নাসবন্দির' খপ্পর থেকে বাঁচতে চাইত। পরিবার পরিকল্পনার নামে, অশোক মিত্রের ভাষায়, সঞ্জয় গান্ধী ভারতীয় নারী-পুরুষের মান মর্যাদা ইজ্জত পদদলিত করেছে। (*The Hoodlum Years* p. 184)

রাজ থাপার লিখছেন, মে, ১৯৭৬ থেকে নাসবন্দি অভিযান পুরোদমে চলতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে সমস্ত পুরুষ মানুষকে ধরে আনা হত নির্বীজকরণ শিবিরে। বয়সের কোন বাছ বিচার নেই। এমন কি সড়কের উপর ট্রাক থামিয়ে ধরে আনা হত শিবিরে। হরিজন ও আদিবাসী গ্রাম নির্বীজকরণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত। শ্রীমতী থাপারের মনে প্রশ্ন: সঞ্জয় কি হরিজন ও আদিবাসী এবং গরীব-গুর্বোদের নির্বংশ করে দিয়ে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে? অবশ্যি বিদেশীদের অনেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এ হেন কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু যারা এই নাসবন্দির শিকার তারা যে সব অখ্যাত অজ্ঞাত নামহারা মানুষ। (*All These Years*, pp. 424-25)

অবশেষে এই নামহারা মানুষেরাই রুখে দাঁড়াল। নাসবন্দির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধের খবর এল ঐতিহাসিক তুর্কমান গেটের মুসলমান মহল্লা থেকে। সে খবর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দিল্লীবাসীর মুখে মুখে ফিরেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন কীভাবে বুলডোজার এসে গোটা মহল্লা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েরা পর্যন্ত রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং কত মৃতদেহ যে ইঁট পাথর ও সিমেন্টের চাঙ্গরের তলায় চাপা পড়েছে! জবরদস্তি নাসবন্দি নিয়ে তারপর নানা জায়গা থেকে সংঘর্ষের খবর আসতে থাকে। দিল্লীর উপকণ্ঠে ফরিদাবাদ, মুজফ্‌র নগর, পিপলি, রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গা ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে—নাসবন্দির বিরুদ্ধে সোচ্চার বিক্ষোভ। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫)

সঞ্জয়ের আর একটি খেয়াল: শহরকে শ্রীমণ্ডিত করা। তার জন্য বস্তি ও ঝোপরিবাসীদের উৎখাত করা অপরিহার্য। অতএব বুলডোজার দিয়ে দিল্লীর যাবতীয় ঝোপরি রাতারাতি গুঁড়িয়ে দেয়া হল। শ্রীমতী থাপারের ঝাড়ুদার কেঁদে এসে জানাল, তাদের বাড়িঘর বুলডোজারের তলায় নিশ্চিহ্ন। তারা কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেছে। তাদের নাকি দিল্লী থেকে চোদ্দো মাইল দূরে ঘর তোলার জন্য জমি দেয়া হবে।

অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন, অন্যান্য শহরেও শ্রীমণ্ডনের কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ আসে, যার ফলে অগণিত বাড়ির কার্নিশ, অলিন্দ ও গাড়ি বারান্দা ভাঙা হয়; তবে তা কোথাও দিল্লীর নৃশংসতা ছুঁতে পারেনি (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮ জুলাই ১৯৯৩)। জামামসজিদের শাহী ইমাম জানাচ্ছেন, অর্জুননগর, তুর্কমান গেট এবং মুজফ্‌ফর নগরে অবাধে বুলডোজার চলেছে সমস্ত গরীব মহল্লাকে ধূলিসাৎ করার জন্য। তাদের অপরাধ, তারা জবরদস্তি নাসবন্দির বিরুদ্ধতা করেছে। (*গণশক্তি*, ২৬.২.৭৭)

ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রেন চলাচল ও অফিসে হাজিরা প্রভৃতি জরুরি অবস্থার 'সদর্থক দিক'-এর প্রশস্তি যাঁরা গাইছিলেন, তাঁরা নিজেরাও পরিব্যাপ্ত ত্রাসের পরিবেশে আতঙ্কিত। জরুরি অবস্থা শেষ পর্যন্ত, সমর সেনের ভাষায়, 'হাজার হাজার লোক বিনা কারণে বন্দী, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, মৌলিক অধিকার খর্ব, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ, সভাসমিতি, ধর্মঘট করা চলবে না, বোনাস বন্ধ, বিচারব্যবস্থা খণ্ডিত, লক্ষ লক্ষ লোকের লিবিডো (libido) ব্যাহত, রাতারাতি নেতাদের তাণ্ডব'—প্রভৃতির সমাহার। ইন্দিরার সাধের বিশদফা তলিয়ে গিয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল সঞ্জয়ের খেয়ালিপনা। এসব খেয়ালিপনার মধ্যে ছক হয়তো আছে এবং শাসনতন্ত্র যে ক্রমেই আরো স্বৈরাচারের দিকে, একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছে, তার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।

২৫

দমন মে তেরা দম হ্যায় কেত্‌না
—-দেখ লিয়া, আউর দেখেগা
... জেল্ মে তেরা জায়গা হ্যায় কেতনা
দেখ লিয়া আউর দেখেগা—

—বসে আছি রাও-এর ঘরের দাওয়ায়। হঠাৎ বাচ্চাটা আমাদের চমকে দিল। বিক্রম রাও-এর ছেলে বছর পাঁচেক বয়স। কারাগারে বন্দীরা এই শ্লোগান দিত। মায়ের কোলে চেপে বাচ্চাটা শুনে এসেছে। তার বাবা বিনা অপরাধে অত্যাচারিত হয়েছে। (আমার ডায়েরি, ১২.৪.৭৭)

হে অত্যাচারী, তোমার অত্যাচারের যে শেষ আছে তা আমি জানি। আমি এতটুকু দমব না। কারণ তোমার দমের সীমা আছে। কথাগুলি হয়তো তিহার জেলের বন্দীদের মুখের ভাষা নয়, এ দেশের আটপৌরে মানুষের মনেরও ভাষা। কিন্তু সে পাঠ সেদিন ইন্দিরা নিতে পারেননি। তাই, অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায়, 'অকস্মাৎ তিনি আত্মবিশ্বাসে প্রসন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর পরামর্শে ১৯৭৭-এর ১৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেন, এবং মার্চে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮.৭.৯৩)

অশোক মিত্রের মতে, পাকা জুয়াড়ির মতো ইন্দিরা বড় রকমের বাজি ধরেছেন এবং এই 'আত্মবিশ্বাস' আসলে জুয়াড়ির আত্মবিশ্বাস। নির্বাচনে জিতলে জরুরি অবস্থাকালীন যাবতীয় কুকর্ম বৈধতা অর্জন করবে এবং হারলে সর্বস্ব খোয়া যাবে।

ইন্দিরার ধারণা ছিল বিরোধীদলগুলি সুবিধা করতে পারবে না অর্থ ও লোকবল ও সংগঠনের অভাবে—তাছাড়া বিরোধীরা শতধাছিন্ন। এমন কি জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজেও জয়ের আশা দেখছেন না। শ্রীমতী থাপার জানাচ্ছেন, 'গোয়েঙ্কার *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর অফিস ঘরে বসে জে পি-র খেদোক্তি : প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য অন্তত পাঁচহাজার স্বেচ্ছাসেবক চাই অথচ আমাদের সংগঠন বলতে প্রায় কিছুই নেই।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬)

অবশ্যি তিনি আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সোস্যালিস্ট পার্টি প্রমুখ যাবতীয় অ-বাম বিরোধীদলকে একই তাঁবুর তলায় জড়ো করেন। মোরারজি দেশাই সভাপতি, চরণ সিং সহ-সভাপতি, সুরেন্দ্রমোহন সম্পাদক—গড়ে উঠল জনতা পার্টি। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের কার্যক্রম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা মুক্তিলাভ করেছেন। সরকার পক্ষ থেকেও জরুরি অবস্থার কঠোর বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়, ঘোষণা করা হয় সংবাদ সেন্সর করার নীতি কার্যকর করা হবে না।

শ্রীমতী থাপারের মনে হচ্ছে, মানুষ যেন অতিমাত্রায় সাবধানী— কিছুতেই মুখ খুলবে না। মানুষ যেন হঠাৎ দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর খামারের চাষী জয় সিং-কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কাকে ভোট দেবে?

—কাকে আবার, যারা সরকার চালাচ্ছে, তাদেরই দেবো।

—তোমরা কি সরকারকে ভালবাস যে তাদের ভোট দেবে?

—আমরা কী করে সরকারকে ভালবাসব? তবে তাদের ভোট না দিলে আমাদের রক্ষে থাকবে না।

—ভোট তো গোপন, কাকে দিচ্ছ কেউ জানতে পারবে না।

—গোপন তোমাদের কাছে, তোমরা যারা শহরে থাক, আমাদের বেলায় নয়, তারা ঠিকই জানতে পারবে, কাকে দিচ্ছি।

শ্রীমতী থাপার উপলব্ধি করলেন জরুরি অবস্থা মানুষের সাহস ও মনোবল কীভাবে কেড়ে নিয়েছে।

যতই দিন যাচ্ছে হাওয়া কিন্তু ঘুরছে। বরফ গলার মুহূর্ত সমাসন্ন। সেই পরিবর্তমান দিনগুলি ডায়েরির পাতায় যেভাবে ধরা পড়েছে তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হচ্ছে।

৩.২.৭৭. : বাগবাজার খাল-ধারে তিন নম্বর বাস অচল। কারণ, ছাত্র পরিষদের এক বেহায়া ছোকরা বাস ড্রাইভারকে মেরেছে। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন এক বৃদ্ধ। অকুণ্ঠভাষায় গালমন্দ করলেন ছাত্র পরিষদ আর যুব কংগ্রেসীদের। এরা দেশটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে। অনেকের মনের কথা ভাষা পেল। তবে কি মানুষ আবার মুখ খুলছে?

৫.২.৭৭: সিনেমার নাইট শো। ইন্দিরাকে পর্দায় অনেকক্ষণ ধরে দেখান হল। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চীৎকার—গালাগাল—খিস্তি।

Thaw (বরফগলা) শুরু হয়ে গিয়েছে।

... ...

এসবের পশ্চাৎপট কি জগজীবন রামের সরকার ও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের মতো বিস্ফোরক ঘটনা? ২ ফেব্রুয়ারি '৭৭ সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে রাম তাঁর পদত্যাগের কথা

ঘোষণা করেন। তিনি, হেমবতীনন্দন বহুগুণা, নন্দিনী শতপথী প্রমুখ মিলে গঠন করেন নতুন এক দল—কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসি।

কলকাতার শ্যামবাজারের মোড়ের চেহারা অন্যদিনের মতো। 'জোর খবর', 'জোর খবর', বলে হকারদের চেঁচামেচি নেই। দিল্লীর চেহারা কিন্তু আলাদা, সেখানে কাগজের হকারদের উত্তেজিত চীৎকার, 'ডুব গয়ি' 'ডুব গয়ি'। অর্থাৎ ইন্দিরা এখন স্বখাত সলিলে! তার কয়েকদিন পর শ্রীমতী থাপারকে খামারের চাষী জয় সিং জানান : তারা এবার সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। কারণ বাবুজী সরকারকে ভেঙেছে।

জনগণের উদ্দেশে জয়প্রকাশ, জগজীবন রাম এবং দেশাই এক আবেদনে বলেন, গণতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র একটিকে এই সঙ্কট মুহূর্তে বেছে নিতে হবে।

শাহী ইমাম আহ্বান জানালেন : স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যে স্বেচ্ছাচারী সরকার সমস্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেই সরকারের প্রতি কোনো সমর্থন নয়। আমাকে ১৯৭৫ সালে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন আমি মুক্ত। আমি রাজনীতি করি না। কিন্তু আমি জানি জনগণের কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ। শাহী ইমাম হিসাবে জনগণকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। (*গণশক্তি*, ২৬.২.৭৭)

দৃশ্যপটে দ্রুত পরিবর্তন। তার প্রমাণ ৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লীর রামলীলা ময়দানে বিরোধীপক্ষের প্রথম নির্বাচনী সভা। যতরকম বাধা সৃষ্টি করা যায় তার কিছু কসুর করেনি সরকারি কর্তৃপক্ষ। এমন কি যাত্রীবাহী বাসগুলিকে পর্যন্ত সভাস্থলের কয়েক মাইল দূরে থামিয়ে দেয়া হয়। তবুও মানুষ এসেছে পায়ে হেঁটে কাতারে কাতারে। প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাবেশ। সবাই উৎকর্ণ হয়ে জয়প্রকাশের প্রতিটি কথা শুনেছে। শ্রীমতী থাপারের মনে হচ্ছে আবার বুঝি বিয়াল্লিশের দিনগুলি ফিরে এল—মনে পড়ে যায় বোম্বের চৌপট্টিতে অনুষ্ঠিত ৮ আগস্ট '৪২-এর ঐতিহাসিক সভাটির কথা।

মতী থাপার লিখছেন, তার পাশাপাশি কয়েকদিন পরেকার বোট ক্লাবে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভার কী করুণ চেহারা। শ্রোতাদের অধিকাংশই সরকারি কর্মচারী। কোনোরকম বেচাল যাদের ক্ষেত্রে বরদাস্ত করা হবে না। জরুরি অবস্থা এখনও রীতিমতো অব্যাহত। বক্তৃতার শেষে ইন্দিরা বললেন, 'ভুলো না তোমরা, গাই বাছুর চিহ্নে (কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক) অবশ্যই ছাপ দেবে'। শ্রোতাদের সবাই তারস্বরে জবাব দিল, 'না...না...না'।

এটা যে সম্ভব, দুদিন আগেও কি ভাবা গিয়েছিল! (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০)

২৬

আসন্ন পালা বদলের পূর্বাভাস কিন্তু সি পি আই-এর নজর এড়িয়ে গিয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থায়ও তাদের রাজনৈতিক অবস্থান অপরিবর্তিত। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই আসন্ন নির্বাচনে আসন সমঝোতায় গেলেন। সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের

সম্পাদক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবারে আমরা কোনও মোর্চা গড়িনি। আমরা আসন বণ্টন নিয়ে সমঝোতা গড়েছি। অবশ্যই আমাদের দুটি পার্টির কর্মীরা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নির্বাচনী প্রচার অভিযান ও কাজকর্মে পরস্পরের সহযোগিতা করবেন।' (*কালান্তর,* ১৪.২.৭৭)

সি পি আই-এর মধ্যে যে এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিল তার প্রমাণ পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা শিবুলাল বর্ধনের দলত্যাগ। তিনি কাগজে বিবৃতি দিয়ে পার্টির জরুরি অবস্থার প্রতি সমর্থন জানানো ও কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী-জোট বাঁধা নীতির সমালোচনা করেন।

অপরদিকে জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতায় গেলেন সি পি এম। তার কারণ প্রসঙ্গে জানান হচ্ছে, '... যে সমস্ত বিরোধীদল এবং গ্রুপ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ও কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে চায় কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সমস্ত দলের সাথে আসন্ন নির্বাচনে আসন সমঝোতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

... এটা সকলেরই জানা যে, জনতা পার্টির অধিকাংশ দলগুলিই, যেমন স্বতন্ত্র, বি কে ডি, সংগঠন কংগ্রেস এবং জনসংঘ চরম দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে আসছে। তাই জনতা পার্টির সঙ্গে কোনরূপ রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট অথবা একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোন নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন করতে পারে না।

অবশ্য যে সমস্ত দল নিয়ে জনতা পার্টি গঠিত হয়েছে তাদের সকলেই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, ৪২-তম সংবিধানের সংশোধনী বাতিল, সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কংগ্রেস দলের একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা এবং 'আপত্তিকর বিষয়' প্রকাশনা নিষিদ্ধ আইনের বিরোধিতা করে আসছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মা.) জনতা পার্টি সম্পর্কে কোনরূপ মোহ না রেখেই এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের প্রতি অবিচল থেকেই জরুরি অবস্থা এবং ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কে জনতা পার্টির সিদ্ধান্তকে বিচার করতে চায়। এ জন্যই আমরা এদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে চাই।

দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে : এরা শাসকদলের জরুরি অবস্থার শাসন ও ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী পুরোপুরি সমর্থন করেছে। সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধেছে। পশ্চিমবাংলা, কেরল, তামিলনাড়ু ও অন্যান্য রাজ্যে এর জাজ্বল্য প্রমাণ মিলবে। আমরা দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের এখনও বলছি—কংগ্রেসের সাথে মৈত্রীর আত্মঘাতী নীতি পরিহার করুন। কংগ্রেস দলের একদলীয় একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অভিযানের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে এক হোন।

কলকাতায় সি পি এম দৃশ্যত বহুকাল অনুপস্থিত। এমন কি একটা পোস্টারও চোখে পড়ে না। তাছাড়া জরুরি অবস্থায় অবাধে সভা সমিতি ও মিছিলের অধিকার নেই। দীর্ঘ উনিশ মাস পর ৩ ফেব্রুয়ারি বামপন্থীদের প্রথম মিছিলটি বেরুল কলকাতার রাস্তায়। 'জরুরি অবস্থার অবসান' ও 'ন্যায় ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে' এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল সি পি এম, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, সোস্যালিস্ট পার্টি, আর সি পি আই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বিপ্লবী কংগ্রেস। মিছিলনগরী কলকাতার রাজপথে কতদিন মিছিল দেখেনি কলকাতার মানুষ। দুপাশের অগণিত মানুষের চোখের সামনে মিছিল এগুতে থাকে। শহিদ মিনার ময়দান

থেকে কলেজ স্ট্রীট, তারপর মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে শিয়ালদহ হয়ে মৌলালিতে শেষ। (*গণশক্তি*, ৪.২.৭৭)

ময়দানে পরবর্তী জনসমাবেশটি ঠিক আট দিন পর ১১ ফেব্রুয়ারি যেদিন রাষ্ট্রপতি ফক্‌রউদ্দিন আমেদ প্রয়াত হলেন। সমাবেশ ডেকেছে সি পি এম একা।

সমাবেশটি দেখে যা মনে হয়েছিল ডায়েরির পাতা থেকে তুলে ধরা হল :

প্রায় দু'বছর পরে কলকাতার লোক আবার লাল পতাকা হাতে মিছিল দেখল। সেই পরিচিত মুখ যাদের প্রায়ই দেখতাম বছর পাঁচ সাত আগে তারা আবার কাতারে কাতারে আসছে। না, আছে তারা, হারিয়ে যায়নি। যারা ইতিহাসের চাকা প্রবলভাবে ঘোরায় তারা যে পথে বেরিয়ে এসেছে। ভাঙাচোরা সংগঠন, বিক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত ঝরাপাতার মতো, সংশয়ে ত্রস্ত হতাশায় দিশেহারা যেসব লোকজন ভরসা খুঁজে পাচ্ছিল না, পথ হারিয়ে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছিল তারা আবার বেরিয়ে এসেছে। (ডায়েরি ১১.২.৭৭)

এখনও প্রকাশ্যে সি পি এম অথবা বামদলগুলির কর্মীদের নড়াচড়া চোখে পড়ে না। তাতে কিছু যায় আসে না। সি পি এম অথবা বাম রাজনীতির বৃত্তের বাইরের লোকজনই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা তেতে ওঠার মতো যথেষ্ট খোরাক পাচ্ছে। এবং তা যোগাচ্ছে খবরের কাগজ— বিশেষ করে *আনন্দবাজার পত্রিকা* ও *দ্য স্টেটসম্যান*।

কাগজে বেরিয়েছে, 'স্বৈরতন্ত্রী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন। কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি জগজীবন রামের আহ্বান।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩.২.৭৭)

... ...

সকল ধর্মের মানুষ
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিন।

—শাহী ইমাম

(*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩.৩.৭৭)

রাজনৈতিক পালাবদলের দিন যে সমাসন্ন তার লক্ষণ যত দিন যাচ্ছে ততই লোকের চোখে মুখে ফুটে উঠছে। এক একটা অভিঘাতময় ঘটনার ধাক্কায় মানুষ সচকিত। প্রতিদিনই কাগজের পাতায় বেরুচ্ছে চমক লাগানো খবর একটার পর একটা।

৯.২.৭৭: আজ সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, সমর সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি বেরিয়েছে 'জরুরি অবস্থা' প্রত্যাহারের দাবিতে। আসলে তাঁরা পশ্চিমবাংলার শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিভূ। তাঁদের বিবৃতির ভাষায় অনেকের বচন-চিন্তা-আবেগ উচ্চারিত।

১০.২.৭৭: জেলখানা থেকে কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল ও সৌরেন বসু সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, নকশাল ছেলেরাও নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর কলকাতার কুমারটুলী অঞ্চলে। চীৎপুর-বি. কে .পাল এভিনিয়ুর মোড়ে সি পি এম নেতা হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি মিছিলের নেতৃত্ব করতে গিয়ে মার খেলেন কংগ্রেসীদের হাতে। কিন্তু পরের দিনই অন্য একটা মিছিল এবং তারাও মার খেল। এই মিছিলের বেশির ভাগই সি পি আই (এম-এল)-এর সমর্থক।

২৭.২.৭৭: ময়দানে জগজীবন রামের জনসভায় বিশাল জমায়েত। জনসভার পর প্রেস ক্লাবে ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক সম্মেলনে জগজীবন রাম প্রশ্নোত্তরে তুখোড়। সমর সেন সভাপতির

আসনে। সাংবাদিকদের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব আরও উস্কে দিলেন বাবুজী।

৬.৩.৭৭: বাঘা যতীনের মোড়ে জনতা পার্টির প্রার্থী অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী কংগ্রেসীদের ডাণ্ডায় অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত। দিলীপ চক্রবর্তী অধ্যাপক সমিতির প্রথম সারির নেতা, অতএব কলেজে কলেজে এই ঘটনার নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশের ধূম পড়ে গেল।

৭.৩.৭৭: সমর সেন *আনন্দবাজারে*-এ লিখলেন: ভোটার-তালিকায় নাম থাকলে ভোর ছটায় ভোট দিতে খুব সম্ভব যাব। তার মিনিট দুয়েক আগে সূর্য ওঠে আজকাল। কাকে ভোট দেব? বিরোধীদলকে দিলে শুনছি স্থিতি থাকবে না। নাই থাকুক। তিরিশ বছর 'স্থিতি' যাঁরা রক্ষা করে এসেছেন তাঁরা বিদায় নিলে সমূহ সর্বনাশ বোধহয় হবে না।

৮.৩.৭৭: কলেজ স্কোয়ারে স্টুডেন্টস্ হলে বুদ্ধিজীবীদের সভা। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'কংগ্রেস ও তার গোপাল ভাঁড় সি পি আই-কে হারাতে হবে, তার জন্যে দরকার হলে একটা খুঁটিকেও ভোট দিতে হবে। নাহলে যেতে হবে সেখানে, যেখানে *অনীক*-এর সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী রয়েছে।

এস্প্লেনেডে অসীম চ্যাটার্জির স্ত্রী রমা হাতে পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে তাতে লেখা: 'ইন্দিরার জেলখানা থেকে রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।' রাণাঘাটে একজন পোস্টার শিল্পী একমনে 'কাস্তে হাতুড়ি' এঁকে চলেছে। আজকের *স্টেটসম্যান* কাগজের প্রথম পাতায় ছবি দুটি রয়েছে। একই লক্ষ্য নিয়ে দুজন আলাদা মানুষ কাজ করে চলেছে।

... ...

মানুষ এখনও নীরব কিন্তু সঙ্কল্পে স্থির। তাকে ফের সাহসী হতে হবে। অশোক মিত্রের ভাষায়, 'সাহস ছাড়া তো ইতিহাস হয় না, মানুষের ইতিহাস আসলে সাহসের ইতিহাস।'

২৭

১৬ মার্চ ১৯৭৭। আজ ভোট। কয়েকদিন আগেই মনে হচ্ছিল পাথরটা বোধহয় নড়ছে। ভোটের দিন সকালে দেখা গেল, হ্যাঁ নড়েছে। শহর ছেড়ে অনেকে চলে গিয়েছে গ্রামে— বাবুদের বাড়ির কাজ ফেলে রাজমিস্ত্রীরাও চলে গিয়েছে ভোট দিতে। নাহলে সর্ষের তেলের দাম আঠাশ টাকায় চড়বে। গ্রামেগঞ্জে ভোর থেকেই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছে কাতারে কাতারে মানুষ, যেন মকর সংক্রান্তির স্নানে বেরিয়েছে।

১৯৭৪ সালে কাঁচড়াপাড়া রেল কলোনি থেকে উৎখাত হওয়া গৃহবধূ রমা চক্রবর্তী উঠেছে আজ ভোর সাড়ে চারটেয়। ঘরদোর পরিষ্কার করল, স্বামী ও ছেলে মেয়েদের জাগাল, একটুখানি খাবার তৈরি করল, ঠাকুরের পটে মাথা ঠেকাল— ঠিক সাতটায় ভোটের লাইনে দাঁড়াল রমা স্বামীকে নিয়ে। ঠিক সাতটা চল্লিশে ভোট দিল রমা। আজ যে হিসাবনিকেশের দিন।

যাদের ভোটের ব্যাপারে চিরকাল উদাসীন মনে হয়েছে, তারাও ভোট দিতে বেরিয়েছে। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে বিধ্বস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক বৃদ্ধাও ভোট দিতে এলেন উত্তর কলকাতার মণীন্দ্র নন্দী কলেজ বুথে। তাঁকে বহন করে এনেছেন তাঁর ছেলে ও একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। যারা

অশক্ত অচল তারাও মনে করে তাদেরও হাতে পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা রয়েছে। চেতনার একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে তারাও পৌঁছে গিয়েছে— ভালোমন্দ-হ্যাঁ-না বলার অধিকার তাদেরও রয়েছে।

প্রতিবাদের ফুলকি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ভোট দিতে দেবে না মানে— আমরা ভোট দিতে যাবই। নেতাজীনগর-আজাদগড়-বাঘাযতীন কলোনিগুলি থেকে মেয়েরা দলে দলে বেরিয়ে আসে।

ভোট দিয়ে মানুষ যখন আবার ঘরে ফিরছে, তাকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই— অভিব্যক্তিহীন সব মুখ।

নানা জায়গায় নাকি গোলমাল হয়েছে। *গণশক্তি* (১৭.৩.৭৭) লিখছে : কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যাপক সন্ত্রাস, হামলা ও রিগিং হয়েছে। যে সমস্ত কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা বাছাই করে বুথে বুথে সশস্ত্র হামলা করে সেগুলি হলো কলকাতায় উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, আরামবাগ, মালদহ, হাওড়া প্রভৃতি কেন্দ্রে। হামলার ফলে শতাধিক সি পি এম কর্মী আহত ও একজন কমরেড নিহত হন। আমাদের হাতে যে হিসাব এসেছে তাতে বলা যায়, জোর করে দশ লক্ষাধিক ভোটারকে ভোটের লাইন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর বিপুল সংখ্যক ভোটপত্রে জোর করে ছাপ দেওয়া হয়। জ্যোতির্ময় বসু, মহম্মদ ইসমাইল, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার এই তিনজন প্রার্থীর উপর আক্রমণ হয়। দমদম ও ব্যারাকপুর কেন্দ্রে পুনরায় নির্বাচনের দাবি করা হয়েছে।

... ...

তারপর সব জল্পনা-কল্পনা সব আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে ২০ মার্চ মধ্যরাত্রিতে বেতারে ঘোষিত হল ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত। কংগ্রেস উত্তর মধ্য পশ্চিম ও পূর্বভারতে বিধ্বস্ত, সংসদে সংখ্যালঘুদলে পরিণত। জনতা পার্টি ও তার সহাযোগীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী।

সে রাতে দিল্লীর বাহাদুর শা জাফর মার্গ সড়কের উপর জোর নাচগান। লোকে চটজলদি গান বানিয়ে ফেলেছে : 'মাম্মী মেরি কার গয়ি—বেটা মেরি সরকার গযি...'। *ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকা বাড়িগুলির সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য— নির্বাচনী ফলাফল জানার জন্য। ইন্দিরার সুনিশ্চিত পরাজয়ের খবর ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুঠো মুঠো পয়সা ছুঁড়ে দিতে লাগল লোকে পত্রিকা বাড়ির দিকে। শ্রীমতী থাপার জীবনে কখনো মানুষের এরকম আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেননি।

সত্যিই তো, আজকের রাত সেই নামহারা কুশীলবদের। তারা তো একটু আনন্দ করবেই। একটু জয়ের স্বাদ তাদের পেতে দাও। যারা তাদের এতদিন গোরু-ভেড়া ভেবে এসেছে তাদের তারা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে।

কলকাতা ও পশ্চিমবাংলা অপেক্ষাকৃত নিরুচ্ছ্বাস। এখন শুধু ঘরে ফেরার পালা। *গণশক্তি* (৩১.৩.৭৭) লিখছে : ১৯৭১-৭২ সাল থেকে শুরু হয়েছিল পুলিশ প্রশাসন ও গুণ্ডা বাহিনীর যৌথ আক্রমণ— সি পি এম কর্মীদের ঘর বাড়ি থেকে, এলাকা থেকে উৎখাত করার অভিযান। প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ নিজের নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন ঘরছাড়া নেতা ও কর্মীরা ঘরে ফিরছেন—বিজয়ীর বেশে অগণিত মানুষের সোচ্চার উল্লাস ও অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে। টালিগঞ্জ বেলেঘাটা দমদম সর্বত্রই একই চিত্র।

এই দিনটির কথা ভেবেই হয়তো বিকাশ চৌধুরী এঁকেছিলেন ছবিখানি। আটফুট লম্বা ক্যানভাসের গায়ে ফুটে উঠেছে সেই রক্তাক্ত বিক্ষত ভূপাতিত বীরদের ফিরে আসার দৃশ্য। সারেঙ্গি বাজিয়ে একজন নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তারা আবার ফিরে আসছে। সামনে রয়েছে একটি বড় সূর্যমুখী ফুল।

২৮

সুবাসসিঞ্চন রায় বললেন : লোকে কী অসাধারণ অভিনয় করল! কেউ জানতে পারল না কাকে ভোট দিচ্ছে তারা।

সত্যিই তো, অভিনয় তাকে করতেই হবে—সে যে গত পাঁচ বছর অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া। তাই ’৬৭ ও ’৬৯ সালের সেই পরিচিত দৃশ্য অনুপস্থিত। কান ফাটানো শ্লোগান, আবীর নিয়ে মাতামাতি নাচানাচি— কোথায় গেল সেসব? তখন তো ছিল অজেয় স্বর্গের দরজায় প্রথম করাঘাত। তারপর ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। অনেক রক্ত আর আগুনের মহড়া— অনেক মৃত্যু অনেক বেদনা আর শোক—মানুষের ভেতরে আর এক মানুষের জন্ম দিয়েছে।

দৃশ্যান্তরে দেখা যাচ্ছে, তেজী গলায় ক্রেতা জিজ্ঞেস করছে—ঢেঁড়স কত করে?

—আশি পয়সা বাবু।

দ্যাখো, যেন কিছুই জানে না। বড়তলার মধ্যবিত্ত প্রৌঢ় আর মগরাহাটের চাষী যেন কিছুই জানে না। আসলে তারা ঠিক করেছে আর উচ্ছল হয়ে উঠবে না। একবার উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণিতে জড়িয়ে পড়ে অনেক খেসারত দিয়েছে তারা। একটুখানি অধিকার পেয়ে তারা অনেক স্পর্ধার পরিচয় দিয়ে ফেলেছিল। ভুল করে একতাল স্বপ্ন দেখে বসেছিল। সেই স্বপ্ন দেখার ভোগান্তিও তো কম নয়। বিজ্ঞজনেরা বলেছে, বাড়াবাড়ি, বাড়াবাড়ি, ভয়ংকর বাড়াবাড়ি করেছ তুমি। বারবার সে মাথা নেড়ে বলতে চেয়েছে, সে স্বপ্ন দেখেছিল মাত্র—তার অপরাধ কোথায়? না, স্বপ্ন দেখাটাই যে মস্ত অপরাধ। অবশেষে সাব্যস্ত হল—সে আর স্বপ্ন দেখবে না।

না, বছর পাঁচ-সাত পরেও দেখা যাচ্ছে, তার অপরাধপ্রবণতা এতটুকুও কমেনি। সে এখন প্রতীক্ষায় রয়েছে আর এক আরম্ভের জন্য।

পরিশিষ্ট ১

শিক্ষাজগৎ ও নকশাল আন্দোলন নিয়ে আলোচনাচক্র

২৬ ও ২৭ মে ১৯৭২, নয়াদিল্লী

আয়োজক : কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তর।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ:

(১) অধ্যাপক মুনিশ রাজা (জবহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়)

(২) এ. কে. ব্যানার্জি (ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা)

(৩) ড. জি. এস. ভাল্লা (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়)

(৪) আর. এন. ভট্টাচার্য, আই. পি. এস (পুলিশ সুপার, ২৪ পরগণা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ)

(৫) শ্রীমতী বেলা বসু (শিক্ষাব্রতী, শান্তিনিকেতন)

(৬) অধ্যাপক এন. কে. বসু (ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

(৭) অধ্যাপক বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় (জবহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়)

(৮) শ্রীমতী মনীষা দাশগুপ্ত (অধ্যক্ষ, শ্রীশিক্ষায়তন, কলকাতা)

(৯) অধ্যাপক বরুণ দে (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা)

(১০) অধ্যাপক জিষ্ণু দে (পদার্থবিদ্যা, প্রেসিডেন্সি কলেজ)

(১১) দেবেশ রায় (লেখক)

(১২) অধ্যাপক অনিল সরকার (বাণিজ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

(১৩) অধ্যাপক সুনীল সেনগুপ্ত (শান্তিনিকেতন)

(১৪) শ্রী সি. সুদর্শন (অধ্যক্ষ, নিউ সায়েন্স কলেজ, হায়দ্রাবাদ)

(১৫) ড. ধরমবীর (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়)

(১৬) শ্রীমতী এস. দোরাইস্বামী (সহকারী শিক্ষাউপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রক, নয়াদিল্লী)

আলোচনাচক্রের চারটি অধিবেশনে মোট তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় :

(১) পশ্চিমবাংলায় ও অন্যত্র যেসব নকশাল তরুণ কারাবাস করছে অথবা আত্মগোপন করে রয়েছে—তাদের আশু পুনর্বাসন সমস্যা।

(২) সাধারণভাবে তরুণদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কীভাবে সদর্থক উপায়ে কাজে লাগানো যায়।

(৩) শিক্ষাব্যবস্থাকে তরুণদের কাছে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য ঢেলে সাজানো।

কারারুদ্ধ ও আত্মগোপনকারী নকশাল ছাত্রদের আশুসমস্যা ও তাদের পুনর্বাসন :

(ক) নকশালপন্থী ছাত্র অথবা প্রাক্তন ছাত্ররা যে তাদের অনুসৃত পথ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। অতএব তাদের কোনো হিতোপদেশ না দিয়ে তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা কর্তব্য।

(খ) শিক্ষামন্ত্রক স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহযোগিতায় নকশালপন্থী ছাত্রদের পুনর্বাসনের জন্য

সরাসরি পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন—

—তরুণ প্রতিভার অপচয়ের জন্য যথোচিত বেদনা প্রকাশ করা।

—আর যাতে তাদের গ্রেপ্তার বা অত্যাচার করা না হয়—সেটা দেখা।

—ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার অথবা কারমুক্তির পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের কাছ থেকে যেন কোনো মুচলেকা আদায় করা না হয়। তাহলে তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা সহজসাধ্য হবে।

পরিশিষ্ট ২

কাঁচড়াপাড়া রেলকলোনি : উচ্ছেদকাহিনী

সুশান্ত চক্রবর্তী, বয়স ৩৫, কাঁচড়াপাড়া লোকোশেডের অ্যাসিস্টেন্ট স্টোরকীপার। মূল বেতন ও ডি এ সহ যাবতীয় অ্যালাউন্স নিয়ে মাস গেলে ৫৫০ টাকা হাতে পায়। বৌ, দুই বাচ্চা, বুড়ি মা ও বেকার ভাইকে নিয়ে সুশান্তর সংসার। সুশান্তর কপাল ভালো বলতে হবে, সে তার কর্মস্থল লোকোশেডের কাছাকাছি কোয়ার্টার পেয়েছে। একই ঢং-এর ছিরিছাঁদ বর্জিত লাল ইঁটের একই মাপের পঞ্চাশ খানা কোয়ার্টার। ঘরগুলিতে আলো হাওয়া ঢোকে না বললেই হয়। নামকাওয়াস্তে কলপায়খানার বন্দোবস্ত এবং সংস্কারের অভাবে বাড়িগুলির বেহাল অবস্থা। অতএব লোককে বড়ো মুখ করে বলার মতো কিছু নয়। তবুও কোয়ার্টার তো। নাহলে সুশান্ত চালাত কী করে? বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত করতে হলে সুশান্ত-র দম বেরিয়ে যেত। দুই শিফ্‌টের মাঝখানে সুশান্ত ঘরে আসতে পারে, তাতে টিফিনের খরচটা বেঁচে যায়। সুশান্তর সাতবছরের বড় ছেলে রেলের প্রাইমারি স্কুলে এই সবে ভর্তি হয়েছে, ছোটটি ছ'মাসের মেয়ে, এখনো মায়ের কোল ছাড়েনি, ভাইটা তো বেকার, তার উপর বুড়ি মা প্রায়ই হাঁপানিতে ভোগে।

আর পাঁচটা ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের চেয়ে আলাদা কিছু নয় সুশান্তর সংসার। বৌ রমা বুদ্ধিমতী ও হিসেবি, ঠিক চালিয়ে দেয়। অবশ্যি মাসের শেষাশেষি অল্প কিছু ধারকর্জ হয়। মাইনে পেলে সুশান্ত মাসের গোড়ায় আবার শোধ করে দেয়। কারও সাতে পাঁচে থাকে না আমাদের সুশান্ত, এমনকি কোনও ইউনিয়নের সদস্যও নয় সে।

কিন্তু ২ মে, ১৯৭৪ যখন লোকোশেড সুদ্ধ সব কিছু অচল হয়ে গেল, তখন আমাদের সুশান্ত-ও বুঝল বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ইউনিয়ন নেতাদের পরামর্শ মেনে নিয়ে সুশান্ত ও তার ভাই পালিয়ে গেল রেল কলোনি থেকে। রইল গিয়ে ব্যারাকপুরে এক আত্মীয়-বাড়ি। কলোনির সব পুরুষ মানুষই তাই করল। যতদিন ধর্মঘট চলবে তারা ফিরবে না। শুধু মেয়েরা পড়ে রইল বাচ্চা ও অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে। তবে গোপন সংবাদ আদানপ্রদান চলত পলাতকদের সঙ্গে বাড়ির লোকজনের। হঠাৎ যেন গোটা কলোনি জনশূন্য। রেল ইয়ার্ড খাঁ খাঁ করছে। যারা হাসপাতালে ছিল, তাদের বলা হল ধর্মঘট বিরোধিতার ঘোষণাপত্রে সই করতে। যারা করল না তাদের তক্ষুনি হাসপাতাল থেকে বিদায় করা হল। যাদের অসুখ তত মারাত্মক নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে ব্যারাকপুর সাব-জেলে পাঠানো হল।

কাঁচড়াপাড়া থেকে চারদিন কোনো ট্রেন যায়নি এবং চারদিন কোনো ট্রেন আসেনি। ওয়ার্কশপ পুরোপুরি অচল। অথচ রেডিওতে বলা হচ্ছে দেশের সর্বত্র ট্রেন ঠিকঠাক চলছে, লোকোম্যানরা ইঞ্জিন চালাচ্ছে। সব জায়গায় উপস্থিতির হার সন্তোষজনক এবং এমনকি কাঁচড়াপাড়াতেও হাজিরা শতকরা পঁচানব্বই। রমার ঘরের রেডিওতে এসব শুনে রমা ও প্রতিবেশি মেয়েরা হেসে গড়াগড়ি যেত। তবে একটা জিনিস তাদের চোখে পড়ত : পুলিশের আনাগোনা অনেক বেড়েছে। নানা রকমের পুলিশ আসছে ট্রলি করে ও ট্রাক বোঝাই হয়ে। আর পি এফ তো

তাদের চেনা, তাছাড়া মেয়েরা চিনবে কি করে কাদের সি. আর পি বলে, আর কারাই বা বি এস এফ। শোনা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি বা দুটি ইউনিটও কাঁচড়াপাড়া রেল ইয়ার্ডে মোতায়েন হয়েছে। সত্যি হতে পারে, আবার গুজবও হতে পারে।

৮ মে ১৯৭৪। রাত দুটো তখন। তুমুল ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে রাতের প্রথম দিকে। কাল-বৈশাখীর আচমকা আবির্ভাবে একটা ঠাণ্ডার আমেজ এসেছে, না হলে গোটা দিন কেটেছে অসহ্য গরমের মধ্যে। তবে রমার শ্বাশুড়ির হাঁপানির টান বেড়েছে, পাশের ঘরে তাই বুড়ি অনবরত কাশছে, ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাশির শব্দে রমার ঘুম চটে গেছে, কোলের বাচ্চাটা শুয়ে শুয়ে মায়ের দুধ খাচ্ছে।

সেই মুহূর্তে কোনও হুঁশিয়ারি না দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক হানাদারি দস্যুর মতো। হুইস্‌লের তীব্র শব্দ, শত শত আলোর চোখ ধাঁধানো ঝলক। অনেকগুলো রাইফেলের বাঁটের ঠকাঠক শব্দ, কলোনির সরু গলিপথ বেয়ে আসা অনেকগুলো ট্রাক আর জিপের গর্জন। যে বীরপুঙ্গবরা লাথি মেরে দরজা ভেঙে কোয়ার্টারগুলিতে ঢুকে পড়ল—তারা কারা—আইনশৃঙ্খলা রক্ষক বাহিনীর কোন্ কোন্ শাখার প্রতিনিধি তারা—রমা ও তার প্রতিবেশিনীদের তো জানার কথা নয়। তবে বলা চলে, সমস্ত কাজই তারা ফৌজী কায়দায় নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করল। এবং কলোনি থেকে উচ্ছেদ অভিযান সার্থকভাবেই সম্পাদিত। রাতের বৃষ্টিতে কলোনির পথঘাট পিছল, তাতেও কোনও অসুবিধে হয়নি আইনশৃঙ্খলার রক্ষকদের। কাদাটে বুটের লাথিতে আর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পলকা দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঘরে ঢুকেছে। তারা রমার শ্বাশুড়ি বুড়িকে বিছানা থেকে টেনে হিঁচড়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এই টানা-হ্যাঁচড়ায় বুড়ির কোমরের হাড় সরে গেল। ঘুমিয়ে কাদা ছেলেটাকে চুলের মুঠি ধরে তারা টেনে তুলল। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে যখন চোখ কচলাচ্ছে, তক্ষুনি বি এস এফ-এর এক কীর্তিমান সপাটে এক চড় বসিয়ে দিল ছেলেটার গালে। রমা ও কোলের বাচ্চাটি ভয়ে চীৎকার করে উঠল। রমা বাচ্চাটিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল তাই তার একটি স্তন বেরিয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ মত্ত উল্লাসে সি আর পি-র জনৈক সুযোগ্য সদস্য এক বিশাল থাবা বসিয়ে দিল তাতে। পরের মুহূর্তে কোলের বাচ্চাটি সহ রমাকেও ছুঁড়ে ফেলা হল সেই উঠোনে যেখানে শ্বাশুড়ি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বেপরোয়া লুঠপাট! একটা নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে কী-ই বা দামী আসবাব বা তৈজস থাকতে পারে! কয়েকটি আধাভাঙা ট্রাঙ্ক ছিল, সেগুলি টেনে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হল। যে খাটে রমা শুয়েছিল, মোক্ষম কয়েকটা লাথিতে সেটা চুরমার। আলমারিটারও একই দশা। যা কিছু জামাকাপড় আর টুকিটাকি জিনিস ছিল তাতে, সেগুলি সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রাকার। মাত্র কয়েকটা লাথি, তারপর রান্না ঘরটিরও দফা সারা। উনুনটি চুরমার আর থালাবাসন সবই উঠোনে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এরকম কাণ্ড যে রমাদের কোয়ার্টারে শুধু ঘটছে তা নয়, গোটা কলোনির পঞ্চাশটা কোয়ার্টারেই তাণ্ডব চলছে তখন। যারা ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে, খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রাত দুটোয় জন্মের মতো শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাদের।

সমস্ত অপারেশন আধ ঘণ্টায় শেষ। শুধু যে ঘর থেকে বাসিন্দাদের বার করে দিয়ে কোয়ার্টারগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হল তা নয়—যেসব তরুণ বোকার মতো নিজের ঘরেই রাত কাটাত, তাদের সক্কলকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর বাকি যারা, স্ত্রীলোক অশক্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর শিশুরা তাদের সকলকে কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল। তখন রাত আড়াইটে। রাস্তাঘাট

কাদাটে আর পিছল। কোথায় যাবে তারা এই শেষ রাত্রিতে? কে দেবে আশ্রয় এই অসহায় নারী শিশু অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দলটিকে? বুড়োবুড়ি কয়েকজনের আবার হাতে পায়ে চোট, হাঁটা দূরে থাকুক—দাঁড়াতে পর্যন্ত পাচ্ছে না।

তাঁরা সবাই মিলে সংখ্যায় দুশোর মতো। তবে একজোট হলে সাহসও বাড়ে, বুদ্ধিও খেলে। রমা ও কয়েকজন ঘরের বৌ মিলে ঠিক করল, তারা পাশের গাঁয়ের দিকে হাঁটা দেবে। কলোনির পাশের গ্রাম বলতে সেও মাইলখানেক দূরে। পথে পড়বে দু'প্রস্থ রেললাইন—তারপর একটা জলা-জঙ্গলা জায়গা, সেটার পাশ কাটালে পড়বে ধানক্ষেত এবং তার ওপারে তাদের উদ্দিষ্ট গ্রাম। যেটুকু বেঁচেছিল হানাদারদের লুটপাট থেকে সেই সামান্য জিনিসপত্তর বাসনকোসন গুছিয়ে নেয়া হল, দুটি হ্যারিকেনও জ্বালিয়ে নেয়া হল আর বাচ্চাদের এক জায়গায় জড়ো করা হল। তারপর পালা করে কাঁধে তুলে নিয়ে মেয়েদের পুরো দলটি হাঁটা শুরু করল।

রেললাইন পার হবার পরে ঠিক হল মেয়েদের মধ্যে চারজন আগাম গিয়ে খবর দেবে পাশের গাঁয়ে, ততক্ষণ অন্যরা অপেক্ষা করবে জলাভূমির ধারে। খবর পাওয়া মাত্র পাশের গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল। মুসলমান চাষী ও ক্ষেতমজুরের গ্রাম এটা, যেখানে একঘরও হিন্দু নেই। তারা সবাই গরীব ও নিঃস্ব মানুষ। তাতে কী? সঙ্গে সঙ্গে তারা অতিথিদের জন্য বেশ কয়েকটি কুঁড়েঘর খালি করে দিল। একদল দৌড়াল বুড়োবুড়ি আর বাচ্চাদের কোলেপিঠে করে আনার জন্য। কয়েকজন ছুটল পাশের গাঁয়ে ডাক্তারের খোঁজে। গোটা গ্রাম জুড়ে কী ছুটোছুটি আর কর্মব্যস্ততা। রাত ভোর হলে দেখা গেল নতুন অতিথিরা ঠাঁই পেয়েছে। আর মাননীয় হিন্দু অতিথিদের ঘিরে গোটা মুসলমান গ্রাম যেন নতুন এক উৎসবে মেতেছে।

... ...

১৯৭৭ সাল। তিন বছর কেটে গেছে। সকাল সাতটায় দেখা গেল রমা ও তার স্বামী পোলিং বুথের দরজায় দাঁড়িয়ে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ৭-৪০ মিনিটে রমা ভোট দিল। সে আর এক কাহিনী। (*The Hoodlum Years*, pp. 46-52)

পরিশিষ্ট ৩

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে :

অজিত রায় : সম্পাদক, *মার্কসিস্ট রিভিয়ু*। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্য।

অন্নদাশংকর রায়: প্রখ্যাত কথাশিল্পী।

অমিতাভ চন্দ্র : শিক্ষাব্রতী ও গবেষক।

অলোক মজুমদার: সি পি আই (এম) কলকাতা জেলা কমিটির বিশিষ্ট নেতা।

অবনী লাহিড়ী: তেভাগা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক-যোশী অধিকারী ইন্সটিটিউট।

অশোক মিত্র : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও লেখক।

কমল চ্যাটার্জি : চল্লিশের দশকে হুগলি জেলার কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, বর্তমানে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান।

কৃষ্ণ চক্রবর্তী : শিক্ষাবিদ, কথাসাহিত্যিক, চল্লিশের দশকের কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী।

গোপাল আচার্য : ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় : ঐতিহাসিক, প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও বর্তমানে সি পি আই-এর একজন বিশিষ্ট নেতা।

চিত্তব্রত মজুমদার : বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

চিত্ত মৈত্র : শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট সংগঠক। বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি।

জলি কল : অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে সাংবাদিক।

তাপস সেন : প্রখ্যাত আলোকশিল্পী।

দিলীপ ভাদুড়ী : চল্লিশের দশকের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য। শিক্ষাবিদ।

দীপেন ঘোষ : ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সি পি আই (এম)-এর বিশিষ্ট রাজ্যনেতা।

নরহরি কবিরাজ : ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক।

নৃপেন ব্যানার্জি : চল্লিশের দশকের ছাত্র নেতা। বর্তমানে সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সদস্য।

প্রবীর রায়চৌধুরী : প্রাক্তন ছাত্রনেতা, বর্তমানে সি পি আই (এম) নেতা।

বিজন চৌধুরী : প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী।

বীরেন রায় :	বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।
বিমলেন্দু সরকার :	প্রাক্তন কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী। বর্তমানে সমাজসেবী।
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়:	সাংবাদিক।
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়:	শিক্ষাবিদ।
মৃণাল সেন :	প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক।
মায়া ভট্টাচার্য :	সমাজসেবী।
রণজিৎ দাশগুপ্ত :	অর্থনীতিবিদ ও গবেষক।
রণেন সেন :	প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা। সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় :	সাংবাদিক।
রাম বসু :	সুপরিচিত কবি।
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য :	শিক্ষাবিদ, লেখক ও প্রাক্তন ছাত্রনেতা।
রামরমণ ভট্টাচার্য :	শিক্ষক ও লেখক।
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় :	প্রয়াত লেখক, গবেষক, রবীন্দ্রবিশারদ।
শৈবাল মিত্র :	শিক্ষাবিদ ও কথাশিল্পী।
সত্যব্রত সেন :	অর্থনীতিবিদ ও বিশিষ্ট সি পি আই (এম) নেতা।
সন্তোষ বসু :	শিক্ষাবিদ, শান্তিনিকেতন।
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় :	সমাজসেবী ও গবেষক।
সলিল চট্টোপাধ্যায় :	নাট্যকর্মী ও পুরপিতা (সি পি আই এম)
সাধন গুপ্ত :	বিশিষ্ট আইনবিদ ও সি পি আই (এম) নেতা।
সুধী প্রধান :	বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী নেতা। বর্তমানে গবেষক ও লেখক।
সুনীতি ঘোষ :	প্রাক্তন সি পি আই (এম. এল) নেতা। বর্তমানে লেখক।
সুবাসসিঞ্চন রায় :	শিক্ষাব্রতী। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বে-আইনী যুগে প্রাদেশিক কেন্দ্রের কর্মী।
সৌরি ঘটক :	লেখক ও গবেষক। কাটোয়ার প্রাক্তন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কর্মী।

আকরপঞ্জি

(বাংলা বইয়ের বেলায় শুধু প্রকাশের বছর উল্লিখিত হল, বইগুলি সব কলকাতা থেকে প্রকাশিত)

ক. রাজনৈতিক পুস্তক-পুস্তিকা

১। অমিত রায়—*অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার* (১৯৮৯)

২। অরবিন্দ পোদ্দার—'ঘরের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ ভিতরে', *আনন্দবাজার* (২৮.৭.৯৩)

৩। অসীম চট্টোপাধ্যায়—'নকশালবাড়ির পথ ও নকশালদের পথ', *নন্দন* (মে, ১৯৯৩)

৪। কানাই ব্যানার্জী—'১৯৭৪-এর ধর্মঘট ও রেলশ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত', *শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে* (পি. সি. মৈত্র ট্রেড ইউনিয়ন স্টাডি সেন্টার, পূর্বরেল, ১৯৮৮)

৫। গৌরকিশোর ঘোষ—*আমাকে বলতে দাও* (১৯৭৭)

৬। চারু মজুমদার—*ঐতিহাসিক আটটি দলিল* (১৯৮৬)

৭। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*নক্সালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা* (১৯৭৮)

৮। পরিমল দাশগুপ্ত—*নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম সূত্রে আবর্তিত রাজনীতি* (১৯৮৬)

৯। পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র—*সেই দশক* (১৯৯৪)

১০। বরুণ সেনগুপ্ত—*পালাবদলের পালা* (১৯৭১)

১১। বিপ্লব দাশগুপ্ত—'জ্যোতিবাবুর সঙ্গে', *নন্দন* (জুলাই ১৯৯৪)

১২। ভবানী সেন—*নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ* (১৯৭৪)

১৩। *ভারতীয় রাজনীতির মূলধারা বনাম নকশালবাড়ি* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটি, সি. পি. আই (এম এল ১৯৯২)

১৪। রণেন সেন—*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা* (১৯৯২)

১৫। শিপ্রা সরকার—'অস্থিরতার দিন এল', *আনন্দবাজার* (২১.৭.৯৩)

১৬। শৈবাল মিত্র—*বামপন্থার আত্মদর্শন* (১৯৮৬)

১৭। শৈবাল মিত্র—*ষাটের ছাত্র আন্দোলন* (১৯৯০)

১৮। সরোজ দত্ত—*নির্বাচিত রচনাবলী* (১৯৮০)

১৯। সুধাংশু দাশগুপ্ত—*আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে* (১৯৮৯)

২০। সৌরেন বসু—*চারু মজুমদারের কথা* (১৯৮৯)

২১। হরিনারায়ণ অধিকারী—*ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী* (১৯৮৯)

২২। Banerjee Sumanta—In the Wake of Naalbari (Subarnarekha, 1980)

২৩। Chakraborty Prafula Kumar—*The Marginal Men* (1990)

২৪। Chandra Amitabha—'The Naxalite Movement', *The Indian Journal of Politi cal Science* (Vol. I) Calcutta, 1992

২৫। Chatterji Sankar Prasad—*The Historic Railway Strike-1974* (1981)

২৬। Dasgupta Biplab—*The Naxalite Movement* (Allied Publishers, 1974)

২৭। Ghosh Sankar—The Naxalite Movement—*A Maoist Experiment* (Firma K.L.M 1974)

২৮। Ghosh Suniti—'The Historic Turning-point', *A Liberation Anthology* Vol. I (Calcutta, 1992)

২৯। Gupta Ranjit—'The Revolution That Failed', *The Illustrated Weekly of India* (21 April, 1985)

৩০। Mitra Ashok—*The Hoodlum Years* (1979)

৩১। Mohan Ram—*Indian communism*—split within split (Vikas Publication, 1969)

৩২। Mohan Ram—*Maoism in India* (Vikas Publication, 1971)

৩৩। Nayar Kuldip—India—*The Critical Years* (Vikas Publication, 1971)

৩৪। Ray Rabindra—*The Naxalites and their Idology* (Oxford University Press, 1988)

৩৫। Roy Ajit—JP's Movement and Indian Democracy (A slightly enlarged ver sion of a paper read at the session of the Indian school of Social Sciences, Calcutta on 15 April, 1975)

৩৬। Roy A. K.—'Naxalite Days', *The Statesman* (4.11.92)

৩৭। Bertrand Russell—*Unarmed Victory* (Penguin Publication 1963)

৩৮। Sengupta Bhabani—*Communism in Indian Politics* (Columbia University Press 1972)

খ. সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা

১। অজিত রায়—'বাঙালী বুদ্ধিজীবী : ঐতিহাসিক পটভূমি', মিহির সিংহ সম্পাদিত *বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসা* (১৩৮৮)

২। অশোক মিত্র—*কলকাতা প্রতিদিন* (অনুবাদ : মালিনী ভট্টাচার্য ও মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৩)

৩। অশোক মিত্র—*সংকটের স্বরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৫)

৪। অশোক মিত্র—*কবিতা থেকে মিছিলে* (১৯৮৯)

৫। অশোক মিত্র—*পটভূমি* (১৯৯২)

৬। অশোক মিত্র—'পদাতিক বাহিনী', *অনুষ্টুপ* শারদীয় (১৯৯৬)

৭। অসীম রায়—*অসংলগ্ন কাব্য* (১৯৭৩)

৮। উৎপল দত্ত—*জপেনদা জপেন যা* (১৯৮৪)

৯। কৃষ্ণ চক্রবর্তী—*অমানবিক* (১৯৭৭)

১০। চিত্তরঞ্জন ঘোষ—*কেয়ার বই* (১৯৮১)

১১। তাপস সেন—*অন্তরঙ্গ আলো* (১৯৮২)

১২। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—*কফির কাপে সময়ের ছবি* (১৯৮৯)

১৩। নন্দিতা সেনগুপ্ত—'ডাক এসেছে', *একসাথে* (জুন ১৯৭১)

১৪। *পঁচিশ বছরের কবিতা* (*অনীক* সঙ্কলন ১৯৯১)

১৫। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—*মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে* (১৯৭২)

১৬। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—*ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ* (১৯৭৪)

১৭। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—*আর এক আরম্ভের জন্য* (১৩৮৮)

১৮। মণিকুন্তলা সেন—*সেদিনের কথা* (১৯৮২)

১৯। মহাশ্বেতা দেবী—*হাজার চুরাশির মা* (১৯৮৮)

২০। মানস রায়চৌধুরী—'শতবর্ষে হো চি মিনকে', *দেশ* (১ জুন ১৯৯১)

২১। রজত রায়—*চলচ্চিত্রের সন্ধানে* (১৩৮৪)

২২। রাম বসু—*শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৭২)

২৩। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—'ঝড় ঝরাপোতা, বাঙলা কথাসাহিত্য', *নতুন পরিবেশ* (১৩৮১)

২৪। রূপদর্শী—*রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য* (১৯৮২)

২৫। শংকর বসু—*কমুনিস* (১৩৯১)
২৬। শঙ্খ ঘোষ—*এখন সব অলীক* (১৪০১)
২৭। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—*শ্যাওলা* (১৯৮৩)
২৮। সমর সেন—*বাবুবৃত্তান্ত* (১৯৭৮)
২৯। সুরমা ঘটক—*ঋত্বিক* (১৩৮৪)
৩০। স্বপন দাসাধিকারী সম্পাদিত—*স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত* (জলার্ক প্রকাশন, ১৯৯৫)
৩১। Ehrenburg Ilya—*Memoirs* (The University Library N.Y.)
৩২। Gopal Sarvepalli—*Jawaharlal Nehru* (Vol. ৩, 1984)
৩৩। Moynihan Daniel Patrick—*A Dangerous Place* (Allied Publishers, 1979)
৩৪। Naipaul V.S.—*India—A Million Mutinies Now* (Minerva Ed. 1990)
৩৫। Suyin Han—*Wind in the Tower* (Panther Books, 1978)
৩৬। Thapar Raj—*All These Years* (Penguin Books, 1991)

গ. পার্টি দলিল

(কেবলমাত্র পার্টি সদস্যদের জন্য)

1. E.M.S. Namboodripad—*Revisionism and Dogmatism in the CPI* (1963)
2. A Note submitted to the National Council (1963) by M. Basavapunniah and sixteen comrades.
3. S. A. Dange's reply to the note of the seventeen comrades (1963).
4. A note submitted to the National council by ten comrades including Jyoti Basu.
5. Information documents on the occasion of Party Plenum (CPM) 1968

ঘ. কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকা

১। দৈনিক *কালান্তর*
২। সান্ধ্য দৈনিক *গণশক্তি*
৩। *প্রতিদিন* (অধুনালুপ্ত সান্ধ্য দৈনিক, সম্পাদক : অজিত রায়)
৪। সাপ্তাহিক *দেশব্রতী*

ঙ. অন্যান্য পত্র-পত্রিকা

১। *আজকাল* (২৪ মে, ১৯৯২)
২। *আনন্দবাজার পত্রিকা*
৩। *দেশ* (১৫ অগ্রহায়ণ, ২০ অগ্রহায়ণ, ২০ পৌষ, ৩ ফাল্গুন, ২ চৈত্র ১৩৬৯)

চ. বিবিধ

১। *সমর সনের চিঠি*—*অনুষ্টুপ* শারদীয় ১৩৯৯
২। *যুদ্ধে ছিলাম স্বপ্নে আছি* (শহীদ স্মরণে সংকলন)—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী ছাত্র সংসদের পক্ষে হিমেন্দু বিশ্বাস, ডীন অব স্টুডেন্টস্ কর্তৃক প্রকাশিত। সাল তারিখ নেই।
৩। মায়া ভট্টাচার্য—একটি প্রতিবেদন
৪। ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি প্রতিবেদন
৫। লেখকের অপ্রকাশিত ডায়েরী।

নির্দেশিকা

সমাজবিজ্ঞান/ইতিহাস

সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় দুঃখের সময় নয় — এইভাবেই হয়তো চিহ্নিত করা যায় বিশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকের বাংলাকে। চীনের সঙ্গে সীমান্তযুদ্ধ দিয়ে এই পর্বের শুরু। তারই সুযোগে প্রতিক্রিয়ার শক্তি দানা বাঁধল ভারতে। কয়েক বছরের মধ্যেই তার ছক গেল উল্টে। গ্রামে-গঞ্জে দেখা দিল দুর্বার খাদ্য আন্দোলন : স্বতঃস্ফূর্ত কিশোর-বিদ্রোহ। এরই মধ্যে ভেঙে গেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ধাক্কা খেল আবার।

১৯৬৭-তে তা সত্ত্বেও নির্বাচনে পরাজিত হল কংগ্রেস। নতুন আশায় বুক বাঁধল মানুষ। কিন্তু তখনই এল যুক্তফ্রন্টে ভাঙন। ১৯৬৯-এ নতুন করে নয়, কিন্তু তার পরিণাম? অবিরাম রক্তাক্ত শরিকী সংঘর্ষ। তরাই থেকে উঠে এল নকশালবাড়ীর ডাক। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকল্পনা মিলিয়ে গেল সন্ত্রাস আর রাজশক্তির পাল্টা সন্ত্রাসে। ওপার বাংলায় যখন স্বাধীনতার সূর্যোদয় — এখানে অন্ধকার। ব্যর্থ হল সারা-ভারত রেল ধর্মঘট। ১৯৭৫-এ ঘোষিত হল জরুরি অবস্থা।

অবশেষে ১৯৭৭। কেন্দ্রে কংগ্রেস রাজ খতম। আবার মানুষের স্বপ্ন দেখার শুরু ...

পরিস্থিতির ক্রমাগত উত্থান-পতনের এক তথ্যচিত্র জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর। *লেখকের* উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*-এর উত্তরপর্ব। চলমান ইতিহাসের দ্বন্দ্বসংকুল নানা অধ্যায়ের দলিল।*

ওপার বাংলার চট্টগ্রামে (১৯৩০) জন্মান অমলেন্দু সেনগুপ্ত। শিক্ষা কলকাতায়, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগে। ছাত্র আন্দোলনের সূত্রেই যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া (হুগলি) -এ দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পর অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। এখন আর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন, কিন্তু মার্কসবাদে আস্থাশীল, মানুষের ওপর ভরসা অটুট।

তাঁর অন্যান্য বই : পারী কমিউন (তৃতীয় সংস্করণ), উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব (প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত)

ISBN 81-85777-34-9

দাম : ১৫০.০০

পার্ল পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৬